সংস্কৃতির রূপান্তর

নিখিলনাথ রায়

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

বাঙালা দেশের যে যুগ আজ শেষ হইয়াছে
তাহার সংস্কৃতির
শুভ্র ও সানন্দ প্রকাশ যাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম,
আমার সেই
পরলোকগত পিতৃদেব সীতাকান্ত হালদার মহাশয়ের
চরণোদ্দেশে—

লেখকের নিবেদন

'সংস্কৃতির রূপান্তরে'র এই সপ্তম সংস্করণ বহুলাংশে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত,—অবশ্য 'আমূল পরিবর্তিত' বলিবার উপায় নাই। এ গ্রন্থ যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন ইং ১৯৪১-এর মধ্যভাগ—নাৎসি-বাহিনী তখন মস্কোর দুয়ারে, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ তখন অনেকেরই নিকট মনে হইয়াছিল অনিশ্চিত। বিশ্ব-সংকটের সেই বিশেষ মুহূর্তে মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির মূল পরিচয় আমরা এই গ্রন্থে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলাম। ভারতের জাতীয় বিকাশের মূলধারা ও তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি নাই। সেই মূল দৃষ্টি এখনো অক্ষুন্ন, তাই 'আমূল পরিবর্তনের' প্রশ্ন উঠে না।

মহাযুদ্ধের পরে পৃথিবী জুড়িয়া বৈপ্লবিক পরিবর্তন আরম্ভ হয়। এ গ্রন্থেরও প্রতি-সংস্করণে আমরা তাহার রূপ ও তাৎপর্য যথাসম্ভব আলোচনা করি। অর্থাৎ এ গ্রন্থের প্রতি-সংস্করণেই কিছু-না-কিছু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এই চব্বিশ বৎসরে বলা যায় গ্রন্থের মূল কথাই আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইতিহাস এখন এমন একটা স্তরে পৌঁছিয়াছে যখন মানুষের ভবিষ্যৎ ধ্বংস ও উজ্জীবনের মধ্যে দোদুল্যমান। বিপ্লবেরও ছন্দে তাই রূপে প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্তন হইতেছে। এই পটভূমি হইতে সমগ্র ভাবেই আবার মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি, ভারতবর্ষের জাতীয় বিকাশের ধারা এবং সমারব্ধ বিশ্ব-বিপ্লবের ও সংস্কৃতির রূপান্তরের কথা নূতন করিয়া আলোচিত হইল। বলা বাহুল্য, অনেক অধ্যায় নূতন রচিত হইয়াছে। আবার পুরাতন সংস্করণের কিছু কিছু অনাবশ্যক বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। কোথাওবা তাহাতে পাদটীকা সংযোজিত করিয়া নূতন তথ্য বা তাৎপর্যের উল্লেখ করা হইল। একটি কারণে প্রথম সংস্করণের 'কথারম্ভ' এবার 'পরিশিষ্ট' রূপে গ্রথিত হইতেছে। বর্তমান সংস্করণের 'কথামুখের' সঙ্গে উহা মিলাইয়া পড়িলে পাঠকের বুঝিতে দেরী হইবে না—এই বিশ-বাইশ বৎসরে (১৯৪১-১৯৬৩ পর্যন্ত) মানুষের জিজ্ঞাসায় ও ধারণায় কত বড় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আজ কে না স্বীকার করিবে—সোভিয়েত সমাজ ও সংস্কৃতি পরিবর্ধমান ও অগ্রগামী, বিপ্লব অর্থ ধ্বংস নয়, সৃষ্টি? একটা বড় প্রশ্ন Two Cultures-এর সমন্বয়ের।

একটি কথা কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করিতে হইবে—সংস্কৃতির রূপান্তর প্রথমাবধি পাঠকের নিকট যে সমাদর লাভ করিয়াছে, এদেশে অতি অল্প বাঙলা গ্রন্থের

ভাগ্যেই তাহা ঘটে। ইহা লেখকের বিশেষ সৌভাগ্য। সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করি—এরূপ একটি গ্রন্থে আজ আর পাঠকের জিজ্ঞাসা মিটিতে পারে না। হয়তো একাধিক খণ্ডে বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর সম্মিলিত চেষ্টায় এখন এ জাতীয় বিশদ গ্রন্থ রচিত হওয়া উচিত। ততক্ষণ পর্যন্ত এই গ্রন্থ একদিন যেমন পাঠকের মনে জিজ্ঞাসা জাগাইয়াছিল তেমনি যদি এখনো জিজ্ঞাসা জাগাইতে পারে, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব।

পূর্ববর্তী বহু লেখকের ও বহু গ্রন্থের নিকট আমি ঋণী—গ্রন্থমধ্যে তাহা জানাইয়াছি। গ্রন্থপঞ্জীতে আমি মাত্র সহজলভ্য ও স্বল্প মূল্যের বইএরই উল্লেখ করিয়াছি; বইএর দামে ও তালিকায় পাঠকদের ভীত ও বিভ্রান্ত করিতে চাই নাই। না হইলে আমার ঋণ এত লোকের নিকট যে তাহার তালিকা করা অসম্ভব।

শেষ-কথা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে অতি-সংক্ষেপে বহু কথা বলিবার মতো দুঃসাহস আমি করিয়াছি। তাহাতে বহু ভুলভ্রান্তি ঘটা অনিবার্য। মুদ্রণ ভুলের কথা বলিতেছি না—তাহাও আছে। কিন্তু এই বয়সে অন্ততঃ জানি আমার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কী পর্যন্ত। এই অবকাশে তাই সমস্ত রকম ভ্রম-প্রমাদ, অসাবধানতা ও অক্ষমতার জন্য আমি পাঠকদের নিকট মার্জনা ভিক্ষা

সূচীপত্র

[বন্ধনীমধ্যে প্রতি-প্রসঙ্গের পৃষ্ঠাঙ্ক উল্লিখিত হইল]

প্রথম ভাগ ঃ সংস্কৃতি-জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় ভাগ ঃ ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশ-ধারা

প্রথম অধ্যায়

কথামুখ

স্থান লেনিনগ্রাদ, কাল ১৯৬২ সালের অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ। হেমন্তের অপ্রত্যাশিত সহৃদয়তাকে সপ্তাহের প্রারম্ভে অপ্রত্যাশিত তুষারপাতে আবৃত করিয়া দিয়া প্রকৃতি তখন আবার সদয় হইয়াছেন। বরফ গলিয়া গিয়াছে। লেনিনগ্রাদের শীশায়-মোড়া আকাশ ও বায়ুতাড়িত বৃষ্টিকণার মধ্যে অভ্যস্ত মানুষের মতো পথ চলিতেছি—এখানে-ওখানে 'প্রাভ্‌দা', 'ইজ্‌ভেস্তিয়া' বা 'সোভিয়েত রুশ্‌কি'র সম্মুখে পথযাত্রীরা দাঁড়াইয়া সংবাদ পড়িতেছে। পড়িয়াও দাঁড়াইয়া আছে কিছুক্ষণ; বিশেষ কোনো সংবাদ আছে বুঝিতেছি। অন্যদিনের অপেক্ষা আজ প্রত্যেক পত্রের সম্মুখেই পাঠকের সংখ্যাও একটু বেশি, অন্যদিনের অপেক্ষা বেশি তাহাদের উদ্‌গ্রীবতা। বেশি তাহাদের গাম্ভীর্য, বেশি উন্মনস্কতা পাঠশেষে পথে পুনর্যাত্রার সময়ে। সম্ভবতঃ আলুর উৎপাদনের সম্বন্ধে বা ডিমের দুষ্প্রাপ্যতা বিষয়ে নৈরাশ্যজনক সংবাদ আছে। অন্য কোনো কারণে ইহারা চিন্তিত হইত না। আর্থিক পরিকল্পনার ব্যবস্থা বা অব্যবস্থাই রুশদের নিকট বড় খবর। যে ভাষা জানি না সে ভাষার সংবাদ-পত্রের মর্মগ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়া কি লাভ? স্বাভাবিক পদেই গৃহে ফিরিলাম। একটু পরেই টেলিফোন্‌ বাজিয়া উঠিল। এখনি বলিতে হইবে "ক্ষমা করবেন—রুশ ভাষা জানি না"। সঙ্কুচিত চিত্তে যন্ত্র তুলিয়া লইলাম।

'অ্যালো' বলিতেই ইংরেজিতে নাম শুনিলাম, তারপর বাঙলায় "নমস্কার।" পরিচিত অধ্যাপকের কণ্ঠ: "খবর দেখেছেন?"

"কী করে দেখ্‌ব? ভাষা যে আমার অজ্ঞাত।"

"কুবার দিকে মার্কিন রণতরী প্রেরিত হয়েছে—সমুদ্রে অবরোধ রচনা চলেছে। বাইরের কোনো জাহাজ কুবা যেতে পারবে না। বিশেষ করে সোভিয়েত সহায়তা বন্ধ করা হবে।"

চমকিত হইলাম। চিন্তা মাথায় চাপিয়া আসিল। চুপ করিয়া থাকিয়া শান্ত স্বরে বলিলাম ইংরেজিতে, 'ব্যাড্‌ নিউজ্‌'।

"হাঁ, ব্যাড্‌ নিউজ।"—ওপার হইতেও শান্ত স্বরে উত্তর হইল।

দুইজনেই মানিলাম পৃথিবীর পক্ষেই দুঃসংবাদ।

টেলিফোন্ ছাড়িয়া দিতে গৃহিণী পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখনো আমরা ভারতীয়রা ২০শে অক্টোবরের চীনা আক্রমণের কথা জানিতে পারি নাই। কেরিব্বিয়ান্ সাগরের এই ঘনঘটার সংবাদে দুইজনাই ভাবিত হইলাম—হয়তো পৃথিবীর দুঃসময়। 'কী হবে?' সত্যই, কী হইবে আমরা কেহ কি জানি?

পথের দিকের জানালায় গিয়া দুইজনা দাঁড়াইলাম। কীরভ্স্কি প্রস্পেক্টের প্রশস্ত পথে তেমনি লোকজন যানবাহন চলিয়াছে। প্রাতরাশ শেষে নর-নারী কার্যস্থলে ছুটিয়াছে। ওপারে বরফ-মুক্ত পার্কের বেঞ্চে দুই-একটি বৃদ্ধবৃদ্ধা। কয়েকটি ক্রীড়ারত শিশু বালি লইয়া ঘর তৈরী করিতেছে, খেলনার মোটর বলিতে বোঝাই করিতেছে—দুইটি তরুণী শিক্ষিকা অদূরে। সবই স্বাভাবিক। কোথাও উত্তেজনা নাই, কাহারও গতিতে নাই ত্রস্ত অস্বচ্ছন্দতা। এই সেদিন মহাকাশযাত্রীদের তথ্য যোগাইতেই পথের উপরে রেডিওর ঘোষণা মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আজ কেন বিশেষ ঘোষণা নাই? ঘরের রেডিও খুলিলাম। সুনির্ধারিত কর্মসূচী তেমনি চলিয়াছে। বেলা বাড়িল। আহারান্তে পথে বাহির হইলাম। লাইব্রেরিতে পড়িতে গেলাম। প্রতিদিনকার মতো নমস্কার জ্ঞাপন করিলাম, সস্মিত প্রতি-সম্ভাষণ শুনিলাম। ইংরেজি জানা যিনি আছেন তিনিও মাথা নাড়িয়া সম্ভাষণ জানাইয়া নিজের গবেষণার লেখায় ডুবিয়া গেলেন। আমিই বা কতক্ষণ তবে ভাবিব?—লেনিনগ্রাদে পথে-ঘাটে, দোকানে, বাসে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, গ্রন্থশালায়, খাদ্যশালায়, ভোজনশালায় কোথাও সমস্ত দিনে কোনো উত্তেজনা দেখিলাম না। শুধু একটু গাম্ভীর্যের ছায়া, একবারের মতো দুই-একটি মন্তব্য, 'ভালো কথা নয়', তারপর, 'অপেক্ষা করো।' দিন দুই পরে চীনা আক্রমণের সংবাদে আমরা ভারত-চীনের বিরোধে চিন্তিত, উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম। অন্যদিকে রুশদের মুখের সেই গাম্ভীর্য ২০শে অক্টোবরের পরে আবার স্বচ্ছন্দ নির্ভাবনায় মিলাইয়া গেল। "খ্রুশ্চফ্ ক্ষেপণাস্ত্র ফিরিয়ে আনছেন—কেনেডিও কুবার অনাক্রমণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" মানুষের ইতিহাস বিপদ মুক্ত হইল।

লণ্ডন যখন উৎকণ্ঠায় নিদ্রাহীন, পৃথিবীতে যখন ত্রাসে দুশ্চিন্তায় মানুষের মুখ অন্ধকার, তখনো মস্কো-লেনিনগ্রাদের অধিবাসীদের চক্ষে ত্রাসের চিহ্ন দেখি নাই। কথায় শান্ত স্থিরতা, মুখে শান্ত ভাবনার গভীর ছাপ, মনে

ধ্রুব বিশ্বাস—"শান্তি অব্যাহত রাখিতে হইবে—পৃথিবীর দুঃসময় আমরা রোধ করিব।" সমস্ত সোভিয়েত নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধের মুখে দেখিয়াছি এই অবিচলিত সংকল্প—শান্তি চাই। আমার ইহাও বিশ্বাস, যদি যুদ্ধ বাধিত, নেতৃত্বের নির্দেশে তাঁহারা আবার আত্মবিসর্জন করিতে দ্বিধা করিতেন না। তাহাও করিতেন এই শান্তির সংকল্প লইয়া।

একবারের মতো মানুষের ইতিহাস নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। পৃথিবীতে আজ কাহারও সন্দেহ নাই, ১৯৬২ সালের সেই সময়টিতে একটি বৃহৎ সত্যের স্বাক্ষর দেখা গেল—কমিউনিজম্ এযুগের মানবতার নাম। 'সবার উপরে মানুষ সত্য', এই মানব সত্যের বাস্তব রূপায়ণই এই যুগের সংস্কৃতির, তাহার অধ্যাত্মচেতনার প্রাণ-সম্পদ। সোভিয়েত সেই মানব সত্যকেই পরম মূল্য দেয়—এই কথাই কুবার সংকট-উপলক্ষে বিশ্বের মানুষের সম্মুখে প্রকটিত হইয়া গেল। সমস্ত ছোট-বড় সফলতা-নিষ্ফলতা সত্ত্বেও যদি এই মানব সত্যকে সোভিয়েত রূপায়িত করিতে পারে, তাহা হইলে মানুষের ইতিহাসে তাহার দান—তাহার সমস্ত সফলতা-নিষ্ফলতার উপর—জয়ী হইবে, কমিউ-নিজম্‌ও 'মানবতার ধর্ম' বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

ধ্বংস নয়—'Not to Destroy But to Fulfil'

সত্যই তো, সোভিয়েতের এই ৪৫ বৎসরের উদ্যোগ-উৎসাহ ও ভুলভ্রান্তিতে-ভরা জীবন তো নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণের কাহিনী নয়; স্তালিন-বিদায়ের পরে সেই সত্য এখন স্বীকৃত। আমিই কি এখনো সঠিক বলিতে পারি 'সমাজতন্ত্র হইতে সাম্যবাদ' সৃষ্টির পথে সোভিয়েত-তন্ত্র সত্যই অগ্রসর হইতেছে কিনা? ১৯১৭ হইতে ভিতরে-বাহিরে পূর্বাপর শত্রু-পরিবৃত জীবনযাত্রায় বর্ধিত হইয়া সোভিয়েত নর-নারী একনায়কত্ববাদী নেতৃগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে চলিতে এখনো পর্যন্ত যেরূপ সহজে অভ্যস্ত, তাহাতে একদিকে স্বাধীন সমালোচনা ও অন্যদিকে সামাজিক দায়িত্ব, এই দুই নীতির সমন্বয় সাধন করিয়া তাঁহারা সচেতন ভাবে সাম্যবাদ গঠনে এখন প্রস্তুত হইতেছে,—অভাবমুক্ত তরুণ-তরুণী নিশ্চিন্ত জীবনোল্লাসে,—মার্কিন বেশভূষার মতো মার্কিন-মার্কা বেপরোয়া উদ্দামতা আরাম ও ভোগের নেশায় না মাতিয়া,—দৃঢ় সংকল্পে, উজ্জ্বল চৈতন্যে কমিউনিজম গড়িতে পারিবে,—আমার এই ধারণাও কি ভুল হইতে পারে

না ? —বিপুলা সোভিয়েত ভূমির কতটুকু আমি জানি ? —সত্য কথা। তথাপি আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও আজ কম নয়। সোভিয়েত দেশ সম্বন্ধে আজ বহু তথ্যই সুবিদিত। ভারতবাসী আজ সোভিয়েত নর-নারীকে প্রত্যক্ষ দেখে, ভিলাই সুরতগড় প্রভৃতি বহু কর্মক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করে। অনেক ভারতবাসী সেই দেশ, সেই জীবনযাত্রারও সঙ্গে সুপরিচিত। সেই পরিচয়ের ফলে কাহারও সম্বন্ধে কাহারও মোহ পোষণ করিবার অবকাশ নাই। অন্তত সোভিয়েত দেশ বিষয়ে খ্রুশ্চভ্ রিপোর্ট ও মার্কিন 'ড্রেন্ ইন্স্পেক্টর'দের রিপোর্ট ভারতবর্ষে দুইই সুলভ। বাইশ বৎসর পূর্বে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) ভারতবাসীকে বুঝাইতে হইত—সোভিয়েতের বিপ্লবী জীবন একটা কালাপাহাড়ী জীবন নয় ; অতীতের রুশ্ অতীতের উজবেগ্ প্রভৃতি জাতিদের সকল জাতীয় ঐতিহ্যের ধ্বংস নয় ; সেই অতীতের মাত্র পুনরাবৃত্তিও নয়। বরং প্রত্যেক ইতিহাসের সচেতন পরিণতি, মানব-সংস্কৃতির রূপান্তরের ইঙ্গিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় অগ্নিশুদ্ধ 'সোভিয়েত দেশপ্রীতি' এই সত্যও প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, যে-সমাজে শোষক ও শোষিত নাই সে-সমাজের প্রত্যেক মানুষই জানে দেশ তাহার আপনার, উহা কোনো মালিকশ্রেণীর সম্পত্তি মাত্র নয়। তাই, এই সমাজে রুশ-উক্রেইনী হইতে উজবেগী কাজাক-বুরিয়েত্ মঙ্গোল পর্যন্ত প্রায় দেড়শতটি ছোট বড় জাতি ও গোষ্ঠীর সমান অধিকার, সমরূপ সামাজিক বিকাশ, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সম্ভব। আর রুশ উজবেগ প্রভৃতি প্রত্যেকেই 'স্বদেশী' হইয়াও সেখানে আবার একই 'সোভিয়েত-দেশীয়'—প্রত্যেকেই যেমন আমরা 'বাঙালী', 'তামিল' প্রভৃতি হইয়াও আরও গভীররূপে 'ভারতীয়' হইতে পারি—যদি শোষণ-শাসন-জাত বৈষম্যের সন্দেহের অবকাশ না থাকে। তৃতীয় সত্যও আজ স্বীকৃত—শিক্ষা ও সংস্কৃতি সার্বজনীন সম্পদে পরিণত করিয়া সোভিয়েত-সংঘ "শতকরা ৯৮টি মানুষকে দিয়াছে স্বরাজ", দিয়াছে 'মানুষের অধিকার', ব্যক্তিসত্তার বিকাশের ব্যাপক সুযোগ। চতুর্থ সত্যতো এখন সর্বত্র পরিজ্ঞাত —সোভিয়েত সংঘই আর্থিক পরিকল্পনা দ্বারা মানুষকে আপন ভাগ্য গড়িবার অধিকার ও দায়িত্বের পথ প্রদর্শন করিয়াছে। মানুষের ইতিহাসে ইহার তাৎপর্যও কি সামান্য ? পঞ্চম কথাটিও সেই সঙ্গে এখন সর্বমান্য : শোষণমুক্ত সোভিয়েত সমাজ বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ প্রয়োগে একদিকে প্রাকৃতিক সম্পদের সুপ্রযুক্তি সম্ভব করিতেছে, অন্যদিকে বিজ্ঞানসম্মত সমাজবিন্যাসে মানবশক্তিকে সার্থক করিয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর। তাই, বাইশ বৎসর পূর্বে যাহা বলা প্রয়োজন

হইত আজ তাহার অনেক কথা ভারতবর্ষে বলা নিষ্প্রয়োজন। স্পুৎনিক ভোস্তকের পরে ভারতবাসী ইহাও বুঝিতে পারিয়াছে যে, ৪৫ বৎসরের মধ্যে— গৃহযুদ্ধ, বৈদেশিক আক্রমণ, অনিবার্য অর্থসংকট, ধনিকতন্ত্রের দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ, এবং শেষে ফ্যাশিজম্-এর পৈশাচিক ধ্বংসলীলা আর আপনাদের ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও,—সোভিয়েত দেশে মানুষের সৃষ্টিপ্রতিভা আত্মপ্রকাশের যেরূপ সুযোগ আয়ত্ত করিয়াছে, ইতিহাসের তাহা এক অভিনব শিক্ষা, পশ্চাৎপদ জাতিদের পক্ষে তাহা আত্ম-উন্নয়নের দিগ্‌দর্শনী। ৪৫ বৎসরে একটি পশ্চাৎপদ সমাজ পৃথিবীর অগ্রগণ্য সমাজে উন্নীত হইয়াছে, অনেক অগ্রগামী সমাজকে সে পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে, কোন্ বিশেষ জ্ঞানকর্মের উদ্যোগে? বৈজ্ঞানিক সমাজ-তন্ত্রে পরিচালিত শোষণমুক্ত সমাজেই বিকাশের এই ব্যাপক অবকাশ পাওয়া যায়—সোভিয়েত নেতৃত্বের সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি মানিয়া লইয়াও শেষ পর্যন্ত ইহা স্বীকার করিতে হয়। ইহাই এই যুগের ইতিহাসের মূল শিক্ষা।

এই সত্যটা অবশ্য এখনো আমাদের অনেকের চক্ষে স্পষ্ট নয়। কারণ, আমেরিকা ও জার্মানি প্রভৃতি ধনিকতন্ত্রী দেশেও তো প্রকৃতির দানকে দুই হাত পাতিয়া লইতে বিজ্ঞান পূর্বেই শিক্ষা দিয়াছে, মানুষকে করিয়াছে প্রকৃতির সহযোগী। সত্য কথা, ইহাই বিজ্ঞানের ধর্ম। তথাপি সেই সব ধনিকতন্ত্রী দেশে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সঙ্কুচিত। প্রধানতঃ মুনাফার প্রয়োজনেই সেই সব দেশে বিজ্ঞানের সমাদর। আর, সেই মুনাফাকে জয়ী করিবার জন্য সামরিক উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ এখন সেই সব দেশে বিজ্ঞান প্রযুক্ত। অন্ততঃ সামাজিক সেবায়, সার্বজনীন কল্যাণে তাহার স্থান সেসব দেশে গৌণ। বিজ্ঞান-সম্মত সমাজবিন্যাস তো মুনাফাতন্ত্রী সমাজে মুনাফার দেবতার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ। ইহাই তাই বুঝিবার মতো সত্য, বিজ্ঞানের বৈপ্লবিক সাধনা সোভিয়েত সংস্কৃতির অঙ্গ। একদিকে **সর্বাঙ্গীন বিজ্ঞানের** সাধনা অন্যদিকে **সার্বজনীন মানবতার** সাধনা,—একদিকে মহাকাশে রকেট পরিচালনা অন্যদিকে কুবা হইতে ক্ষেপণাস্ত্র প্রত্যাহার,—দুয়েরই সম্মেলনে এইরূপে সায়েন্টিফিক্ সোশ্যালিজম আর সায়েন্টিফিক হিউম্যানিজম্ একত্রিত;—তাহাতেই সোভিয়েত সংস্কৃতির যথার্থ পরিচয়। একই কালে তাহা মানুষের অফুরন্ত সম্ভাব্যতার প্রমাণ, মানববিক মূল্যবোধের সমুন্নত প্রকাশেরও অভিব্যক্তি,—সকল কালের বিপ্লবের এই মর্মবাণী: **I come to fulfil, not to destroy.**

বিজ্ঞান ও বিশ্ববিপ্লব

'বিশ্ববিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে', তুই বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে এই কথা শুনিয়াছিলাম। কথাটা ভারতীয় এক তরুণ বৈজ্ঞানিক বন্ধুর, কথাটা এখন মনে পড়িল। চমকিত হইবার কারণ নাই, ইহাও তিনি জানাইলেন।—যে তারকা আজ আমরা চোখে দেখিতেছি লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে হয়তো তাহার দীপ্তিরেখা মহাশূন্য পাড়ি দিয়া পৃথিবীর দিকে রওয়ানা হইয়াছিল। আজ যখন পৃথিবী মুখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকাইতেছে, হইতে পারে, ততক্ষণে সেই তারাটি আর নাই—ইতিমধ্যে তাহা নিবিয়া মহাশূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। যে সত্য মহাবিশ্বে ইতিপুর্বেই মিথ্যা হইয়া গিয়াছে আমাদের পৃথিবীতে তাহার জলন্ত সাক্ষ্য উপস্থিত থাকিলেও তাহা শুধু অতীতেরই সাক্ষ্য—ভবিষ্যতের অভাস নয়,—ইহাও বুঝিয়া রাখা ভালো। 'বিশ্ববিপ্লবও' যে সেইরূপ এই মানব-সমাজের অপাতদৃশ্যমান্ জীবনাকাশের প্রান্তে প্রান্তে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে আজ চারিদিকের অতি-প্রত্যক্ষ নিওন্ রশ্মির উদ্দাম ছটার মধ্যে সেই সুদূরের রশ্মি-রেখা হারাইয়া গেলেও তাহার প্রমাণ সমাজ বিজ্ঞানীর অগোচর নয়। দূরদর্শী বৈজ্ঞানিকের দূরবীক্ষণই শুধু ইহা ঘোষণা করে না, আমাদের সাধারণ বুদ্ধির সমীক্ষা ও নিরীক্ষার সহায়েও আজ তাহার বার্তা আমরা লাভ করিতে পারি।

বন্ধু বুঝাইয়া বলিলেন, "শতাব্দীর প্রথম পর্বে ঠিক যেই ভাবে বিশ্ববিপ্লব সমাগত হইবে বলিয়া তোমাদের সমাজবিপ্লবীরা কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাই শুধু ভ্রান্ত হইয়াছে। রুশিয়ার পরে গণবিপ্লব ১৯১৮তে জার্মানিতে পাড়ি দিয়া পশ্চিম ইয়ুরোপ ও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে আবর্তন ঘটায় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি রুশিয়াতেও তাহার আবির্ভাবটা মিথ্যা? অথবা, ১৯১৭-এর 'অক্টোবর বিপ্লবকেই' বা বিশ্ববিপ্লবের প্রধান পরিচয় বলিয়া তোমরা ধরিয়া লইতেছ কেন? বরং, যদি তাহার আগমনী লক্ষ্য করিতে চাও তাহা হইলে তাহা লক্ষ্য করিতে পারিবে উনবিংশ শতকে। না, মার্কস্-এঙ্গেলস্-এর সমাজ-দর্শনেও ততটা নয়, বরং বিজলী শক্তির মানবীয় কর্মে বিনিয়োগে তাহার সূচনা। তাহাতেই লেখা হইয়া গিয়াছে মানব-সমাজের পরিবর্তন আবশ্যম্ভাবী। বারুদ যেমন পৃথিবীতে মধ্যযুগের তলোয়ার বর্শার, শৌর্যবীর্যের ও ক্ষাত্র-আধিপত্যের অবসান

ঘটাইয়াছে, বিজলী ও পেট্রলে তেমনি করিয়া বিদ্যুল্লেখায় পৃথিবীতে শিল্পোন্নত সমাজের গৌরব-বার্তা লিখিতে লিখিতে তাহারই শেষ অধ্যায়ে তাহাকে বিংশ শতকের প্রারম্ভে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। আর, সেই অগ্রগতির নিয়মেই ধনিক-সমাজের সভ্যতারও অবসান ঘোষণা করিয়া বিশ্ববিপ্লবের এই নূতন বার্তা বজ্র-নির্ঘোষে ধ্বনিত হইয়াছে ১৯৪৫-এর ৬ই মে। কাজটা সোভিয়েত বিপ্লবীরা করে নাই। না, না, শুধু মার্কিন সামরিক রাজনৈতিক চক্রও করে নাই। করিয়াছে নানা দেশের বৈজ্ঞানিকদের প্রতিভা,—মার্কিন দেশ উহার ভাগ্যবান্ উদ্যোগ-ক্ষেত্র, আর হিরোশিমা উহার হতভাগ্য বিজ্ঞাপনী।

"সত্য কথা, হিরোশিমা একই কালে 'হোমো সেপিয়ানের' সংস্কৃতির অসামান্য স্ফূর্তির ও উহার নিকৃষ্ট বিকৃতির প্রমাণ। নিঃসন্দেহ, ইয়ুরোপে ফ্যাশিজমের পরাজয়ে যুদ্ধ তখন শেষ হইতেছিল, এই বিভীষিকা সৃষ্টির কোনো প্রয়োজন ছিল না। এই বিধ্বংস-বৃষ্টি ব্যতীতও পৃথিবীতে আণবিক শক্তির সুপ্রয়োগে ফ্যাশিস্ত-ইতরতামুক্ত মানব-সভ্যতার অপরূপ বিকাশ সম্ভব হইত। কিন্তু রাষ্ট্রনায়ক ও যুদ্ধনায়করা তাহা হইতে দেয় নাই। এখনো দিতেছে না। তাই বলিয়া বিজ্ঞানের জয়যাত্রা কে রুদ্ধ করিবে? সেই বিশ্ববিপ্লব ঠেকাইতে গেলে সভ্যতার বিপর্যয় অনিবার্য। মানুষের অস্তিত্বই হইবে বিপন্ন। হোমো সেপিয়ান্-এর বুদ্ধি যেমন অমেয়, তাহার দুর্বুদ্ধিও তেমনি নিতান্ত কম নয়। তবু বুদ্ধি উহার কাছে কোনো দিনই নিঃশেষে হার মানে নাই। তাই আশা করা যাইতে পারে—রাষ্ট্রনায়করা স্বার্থে জড়াইয়া পড়িয়া বিজ্ঞানকে বিকৃতির মধ্য দিয়া পথ করিয়া দিতে দিতে সুবুদ্ধিরও পথ করিয়া দিতেছে; —সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিপ্লবের পথে বাধা দিতে দিতেও বিশ্ববিপ্লবকেই আগাইয়া আনিতেছে। ১৯৪৬এর ৮ বৎসর মধ্যে আণবিক শক্তির একচেটিয়া অধিকার ভাঙিয়া সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়ক ও বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করিয়া দিলেন—বৈজ্ঞানিক বিপ্লব জাতিগত একাধিপত্যকে চূর্ণ করিয়া দিবে। কোনো একটি বিশেষ জাতির স্বার্থে মানব জাতি বলি যাইবে না। অপরদিকে পৃথিবীর মানুষ জাতিতে জাতিতে ব্যবধান রচনা করিয়া নিজেদের বেড়ার আড়ালে পরস্পরের হইতে যুগ-যুগান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া ছিল। তবু তো পুঁজিবাদের যুগেই জাতীয় স্বার্থের ও শোষণ স্বার্থের তাড়নায় জাতিতে জাতিতে সেই অপরিচয় ঘুচিয়া গিয়াছিল। এখন আণবিক শক্তির আয়োজনে পৃথিবীর সকল জাতির সেই পরিচয়-সূত্র নিকট বন্ধনে পরিণত হইতে থাকিবে। সংকীর্ণ জাত্যাভিমানের আর স্থান নাই।

আণবিক বোমার 'মনোপলি' যখন বিজ্ঞান টিকিতে দিল না তখন স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদ ও একচ্ছত্র পুঁজিবাদের বা মনোপলি ক্যাপিটালিজম্-এর সর্বাধিপত্যই বা আর কিরূপে টিকিবে?

বলিতে পার, ১৯১৭এর অক্টোবর বিপ্লবেই তো সোভিয়েত বিজ্ঞানের জন্ম। আর এই আণবিক শক্তির মনোপলি ভাঙিবার মতো সামাজিক বৈজ্ঞানিক আয়োজনও তো তাহা হইলে সেই অক্টোবর বিপ্লবেই আয়োজিত। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ, পৃথিবীর সামাজিক-রাষ্ট্রিক, বৈজ্ঞানিক-ঔদ্যোগিক বহুবিধ ও অগণিত সংখ্যক প্রচেষ্টার ও অপচেষ্টার মধ্য দিয়া যে যুগসন্ধি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই 'অক্টোবর বিপ্লব' একটা বিশিষ্ট বিরাট মহাফলপ্রসূ আয়োজন, বিশ্ববিপ্লবের স্বপক্ষে উহাই সুস্পষ্ট পদক্ষেপ। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিপ্লবও অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক শক্তির আয়োজনেই প্রয়োজনীয়; পৃথিবীব্যাপী শিল্পবিজ্ঞানের বিকাশে ও প্রয়োজনেই তাই সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্ভব। এক অনুন্নত সমাজের দুর্বল ব্যবস্থাকে চূর্ণ করিয়া 'অক্টোবর বিপ্লব' রূপে যাহা প্রকাশিত হইল তাহাও আসলে বিজ্ঞানোন্নত দেশের মুনাফা-বন্ধন পীড়িত বিজ্ঞানের মুক্তি প্রয়োজনে আরব্ধ। এই হিসাবেই ১৯১৭এর অক্টোবর বিপ্লব উনবিংশ ও বিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক ও কারুকৃতিগত বিপ্লবের পাদপূরণ এবং অনারব্ধ বিশ্ববিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ। সেই বিশ্ববিপ্লবই সুনিশ্চিত হইয়া গেল ১৯৪৬-এ মানুষের আণবিক শক্তির অধিকার অর্জনে। বলিতে চাও বলিতে পার—সেই বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ১৯৫৭ এর ৪ঠা অক্টোবরের 'স্পুৎনিক' যাত্রা হইতে ১৯৬১এর ১২ই এপ্রিলের প্রথম ভোস্তক-এর মহাকাশ পরিক্রমা সূত্রে ইতিমধ্যেই বিশ্ববিপ্লবের নবতর রূপটিকেও আমাদের চেতন-লোকে আনিয়া স্থাপন করিতেছে। এই মহাবিশ্বের মধ্যে এই পৃথিবীর বাসগৃহটিতে বিশ্বমানবের আত্মীয়তাবোধ ইহার মধ্য দিয়া একটা সত্য হইয়া উঠিতেও বাধ্য। বিশ্বের পরিচয়ই কি মানুষের মনে কম বিস্ময়ের বা কম প্রজ্ঞাদৃষ্টির সঞ্চার করিবে? শুধু বিজ্ঞানের বিপ্লব নয়, মানুষের মানবিক বোধের, জীবন-বোধের ও বিশ্ববোধের এক নবতর অভিব্যক্তি এইরূপে অনিবার্য। বিজ্ঞানের বিস্তারের ফল চৈতন্যের মধ্যে প্রতিফলিত হইলেই তৎক্ষণাৎ চৈতন্যের বিস্তার ঘটে না। অনেক ধীরে, অনেক সূক্ষ্মতর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার শৃঙ্খলের মধ্য দিয়া চৈতন্যের সে বিস্তার ও পরিবর্তন ঘটে—তাহা দুর্নিরীক্ষ্য হইলেও দুর্জ্ঞেয় নয়। সংস্কৃতির যে রূপান্তর এই চৈতন্যের

আলোড়নে অবশ্যম্ভাবী, নিশ্চয়ই আজও তাহা আমাদের কল্পলোকের বিষয়। কিন্তু সংস্কৃতির যে রূপান্তর-সম্ভাবনা এখনি আমাদের নিকট স্পষ্ট তাহার প্রধান বাহন বিজ্ঞান; বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞান দুইই। হয়তো বিশুদ্ধ বিজ্ঞান অপেক্ষাও ফলিত বিজ্ঞানরূপেই আমরা তাহার সহিত বেশি পরিচিত হই। কারণ, আপেক্ষিকতাবাদের গণিত বুঝি বা না বুঝি, আণবিক বিজ্ঞানের সূত্রসমূহ একবর্ণও না জানিতে পারি, কিন্তু আণবিক শক্তির ফলিত দান তো প্রত্যক্ষ; প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই চেতনায় তাহা স্বীকৃত হইতেছে। 'অটোমেশন' বা স্বয়ংচালিত উৎপাদন ব্যবস্থা, সিবারনিটিক্‌স্ বা 'সম্বাতিক বিদ্যা' এবং আণবিক বিজ্ঞান,—আধুনিক বিজ্ঞানের এই তিন প্রধান দানে মানুষের জীবনযাত্রায় বিপ্লব যে ঘটিতেছে তাহাদের কোনোটিকে না চিনিয়া আমরা পারি না। এই সব বিজ্ঞানই আজ জীবনযাত্রার রূপদান করিতেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিরও রূপায়ণ চলিতেছে। আণবিক বিজ্ঞানের বিপ্লব অপরাজেয় বলিয়াই বলিতেছি বিশ্ববিপ্লবও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।"

পৃথিবীর রূপান্তর

বিশ্ববিপ্লব জিনিসটা সত্যই বাস্তবে যখন আসিয়াছে তখন ঠিক মার্কস্-লেনিনের পূর্বানুমিত ছকে-বাঁধা পথে আসে নাই,—সেই গতিতেও নয়, সেই রূপেও নয়। তাই বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে আমরা বিপ্লবের যুগ বলিয়া মানিলেও, এ যুগের পৃথিবীকে বিশ্ববিপ্লবে আবর্তিত ও বিবর্তিত পৃথিবী বলিয়া চিনিতে পারি না। সাধারণতঃ আমরা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক রূপ দিয়াই পৃথিবীর রূপ নির্ণয় করি। মূলতঃ ভুলও করি না। কারণ, রাষ্ট্রশক্তিই শম দম দণ্ড ভেদের মালিক, সমাজ পরিচালনার জন্য দায়ী। এই রাষ্ট্রশক্তি অধিকৃত না হইলে বিপ্লবও সার্থক হয় না। বৈপ্লবিক শক্তি কিন্তু তাই বলিয়া কখনো অবরুদ্ধ হইয়া থাকে না। কোথাও তাহা থাকে আবর্তনের অভ্যুত্থানের অপেক্ষায়, কোথাও বিবর্তনের মধ্য দিয়া পরিণতির প্রতীক্ষায়। ভৌগোলিক ঐতিহাসিক নানা বাস্তব ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপ্লবেরও বিভিন্ন স্তর থাকিতে পারে, এই কথাটিও বুঝা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, চারিদিকের পরিবর্তমান ঘটনা-সংঘাতের মধ্যে জীবনধারণ করিতে করিতে বিপ্লবের বাতাস আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্য দিয়া রক্তে নবশক্তি সঞ্চার করিয়া চলে। বৈপ্লবিক

পরিবর্তনকেও অনেকাংশে তাই ক্রমেই সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। 'কন্‌ট্রোল', 'পাব্‌লিক্ ওনারশিপ্' এসব কি বিংশ শতকের পূর্বে সহজ সাধ্য ছিল? এই সব কথা মনে রাখিলে পৃথিবীর বর্তমান রূপান্তরকে কি না চিনিয়া পারা যায়?

সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রশক্তি

প্রথমেই তো চক্ষে পড়ে প্রধান সত্যটা—১৯১৭তে বিশ্ববিপ্লবের পাদপীঠ মাত্র একটি দেশে—পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশে—রচিত হইয়াছিল। তখন মাত্র বারো (পরে আঠারো) কোটি মানুষের জীবনকে নবরূপদানের অধিকার সোভিয়েত পাইয়াছিল। এখন তো যুগোস্লাভিয়া ও পূর্বজার্মানির জার্মান গণরাষ্ট্র শুদ্ধ সমস্ত পূর্ব ইয়ুরোপের আটটি রাষ্ট্রে সেই বিপ্লবী শক্তিই রাষ্ট্রশক্তি—তাহা সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। এশিয়াতে মঙ্গোলিয়া ও সোভিয়েত-এশিয়া বাদ দিলেও মহাচীনশুদ্ধ তিনটি নতুন রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রী বিপ্লব সার্থক। এমন কি আমেরিকাতেও তাহার একটি আশ্রয় কুবায় স্থাপিত হইয়াছে—যতই হউক তাহা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের চক্ষে ক্ষুদ্রের স্পর্ধা, দক্ষিণ আমেরিকার পক্ষে একটা 'কুদৃষ্টান্ত'। সমাজতন্ত্রী পৃথিবীর এই শক্তিবৃদ্ধি এই যুগের প্রধান সত্য। এই সত্যের দ্বারাই পৃথিবীর রূপ মৌলিকভাবে প্রভাবিত হইতেছে কি হইতেছে না, তাহা অবশ্য তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু এই পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষের জীবন যে আজ এই বৈপ্লবিক আদর্শে রূপান্তরিত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যথা, এই এক-তৃতীয়াংশ পৃথিবীতে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ এখনই প্রায় অতীতের বস্তু; কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় আর্থিক জীবন বিন্যস্ত; বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীন প্রয়োগপথ সেখানে উন্মুক্ত; শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে মোটের উপর সমাজমঙ্গলের আদর্শে বুদ্ধিজীবীরা অনুপ্রাণিত। ব্যতিক্রম ঘটিলেও ইহাই সাধারণ সত্য।

নিশ্চয়ই এই বৈপ্লবিক রূপান্তরের অর্থ সকলের রূপহীনতা বা কাহারও বৈশিষ্ট্যহীনতা নয়। বরং একটি দেশ যখন আর কমিউনিজম-এর কাণ্ডারী নয়, তখন যতই অনুধ্যেয় ও অনুকরণীয় হোক তাহার প্রদর্শিত সমাজতন্ত্রী সাধন-পদ্ধতি, যতই দুশ্ছেদ্য হোক কমিউনিষ্ট মৈত্রীবন্ধন, নানা ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক প্রভাবে এই সব দেশের প্রত্যেকেরই রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে, কর্মকাণ্ডে, কৌশলে ও পদ্ধতিতে ছোট বড় নানা পার্থক্যও থাকা অবশ্যম্ভাবী। আর তাহাই

স্বাভাবিক। বিচিত্র পৃথিবী সমাজতন্ত্রের নিয়মে বৈচিত্র্যহীন হইলে তো নিদারুণ ভয়ের কথা,—'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' আনিয়াই তো সমাজতন্ত্র সার্থক হইবার কথা।

সোভিয়েত ও চীনের সমাজতন্ত্রী দলের মতপার্থক্য প্রকাশ্যে আলোচিত হইয়া বহুদিন অমীমাংসিত থাকাও আশ্চর্য নয়। কারণ, বাস্তব জগৎ সহস্র জটিলতায় সমাচ্ছন্ন। বর্তমান পৃথিবীর মূলগতি সম্বন্ধে তাহারা সকলেই একমত, যথা, বৈপ্লবিক শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু আপেক্ষিক কার্যক্ষেত্রে কোন্ মূহূর্তে কী যে মূল অবস্থা এবং তাই কৌশলও যে কখন্ কী, তাহা বুঝিয়া উঠা তত সুসাধ্য নয়। সুসাধ্য হইলে অবশ্য কাজটি জ্যামিতির সমস্যার মতো স্কেল মাপিয়া দাগ টানিয়াই শেষ করিয়া দেওয়া যাইত। নানা দৃষ্টিভঙ্গির ও নানা মতের পারস্পরিক আদান-প্রদানে পৃথিবীর প্রগতির রূপ নির্ণয় না করিয়া কোনো এক নেতৃত্বের কথাকে বিনা প্রশ্নে মাথা পাতিয়া লইলেই বরং ভুলের অবকাশ বেশি, ক্ষতির কারণও অধিক। কারণ, বিপ্লবীরাও সকল বিষয়ে অভ্রান্ত নয়—লেনিনও ভুল করিয়াছেন, অন্যেরাও নিশ্চয়ই করেন। তবে যত শীঘ্র ভুল বুঝিয়া সে ভুল যত শীঘ্র শুধরানো যায়, তাহাতেই বিপ্লবী বুদ্ধির সার্থকতা। নব-নব রাষ্ট্রে বিপ্লবের প্রকাশ সশস্ত্র, নিরস্ত্র বা অল্পাধিক সশস্ত্র, অল্পাধিক নিরস্ত্র প্রভৃতি নানা পদ্ধতিতেই হইতে পারে। বিপ্লব রূপায়ণেও নানা বৈশিষ্ট্যের, নানা বৈচিত্র্যের উদ্ভব সম্ভব। শুধু স্মরণীয় এই যে, সমাজতন্ত্রী সৌভ্রাত্র অপরিহার্য, সায়েন্টিফিক্ সোশ্যালিজম্-এর আদর্শ ও মূলনীতিগত ঐক্য অত্যাজ্য। অর্থাৎ রাষ্ট্রে চাই শ্রমিক ও সাধারণ মেহনতী মানুষের পূর্ণাধিপত্য; আর্থিক বিন্যাসে চাই উন্নততর উৎপাদন ও ব্যক্তির পরিবর্তে সমাজের সাধারণ মালিকানা; শিক্ষায় সংস্কৃতিতে বুদ্ধিজীবীদের সমাজবাদী দায়িত্ব পালন; মানবিক বোধের প্রসার। এই মূলনীতিও কার্যক্ষেত্রে বিশেষ দেশের বিশেষ আধারে যে প্রয়োজন মতো বিশিষ্ট হইবে—খর্বিত না হইয়াও বিশেষ অবস্থানুরূপে রূপায়িত হইবে,—তাহাও জানা কথা। এই বৈশিষ্ট্য কোথাও ঘটে অসমান অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য; কিম্বা অপরাপর পারিপার্শ্বিক কারণে। যেমন, চেকোস্লোভাকিয়া শ্রমশিল্পে উন্নত দেশ হইলেও সেখানকার কৃষিতে পূর্বে ভূম্যধিকারী ধনিকের প্রাধান্য ছিল। বুলগেরিয়া শিল্পোন্নত দেশ নয়, কিন্তু বুলগেরিয়ার সামন্ত জমিদাররা বহু পূর্বেই (১৮৭৭-৭৮) দেশত্যাগ করিয়াছিল, তাই সেখানে ভূমিব্যবস্থায় চেকোস্লোভাকিয়ার মতো জমিদার-সমস্যা ছিল না।

অতএব, দুই দেশে বিপ্লব রূপায়ণ-পদ্ধতিতেও এদিকে কিছু পার্থক্য থাকিবে। এইরূপ অসমানতা ছাড়া, পারিপার্শ্বিক বা তাৎকালীন বিশেষ পরিস্থিতিতেও এরূপ পার্থক্য দেশে দেশে ঘটিতে পারে। অনেক দেশেই বিপ্লব উদ্ভূত হইয়াছে যুদ্ধের রক্তস্নানের পরে—বিপ্লব অন্য অবস্থায় উদ্ভূত হইলে সেখানে অত রক্তাক্তরূপ গ্রহণ নাও করিতে পারিত। প্রথম বিপ্লবে বহির্বিশ্বের যত দৌরাত্ম্য রুশদের সহিতে হইয়াছে অন্যদের তাহা সহিতে হয় নাই; গৃহবিরোধও তত নির্মম হয় নাই। কাজেই রক্তপাতও তত বেশি হয় নাই। অবশ্য যতই সমাজতন্ত্রী রূপায়ণ সুসম্পন্ন হয় ততই এরূপ দেশে দেশে পার্থক্য বিলুপ্ত হয়, তখন থাকে শুধু বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বা জাতীয় নিজস্বতার ছাপ। উহাকে প্রাধান্য দিলে তাই ভুল হয়, আবার উড়াইয়া দিলেও চলে না। কিন্তু নিশ্চয়ই কখনো কখনো কেহ প্রাধান্য দিয়া বসে, কেহ বা আবার উড়াইয়া দিতেও চাহে। সমাজ-তন্ত্রীদের পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়া কোনো বিষয়ে মতভেদের সমাধান না হইলে কালের বাস্তব প্রমাণে ভুল কোথায়, তাহা ধরা পড়িতে বাধ্য। সমাজতন্ত্রী হইলেই কোনো দেশ ভুল করিতে পারে না, তাহা নয়। কিন্তু মূল কথাটা এই—সাধারণ নীতি এক হইলেও অসমান বিকাশের জন্য বা বিভিন্ন পরিস্থিতির জন্য বিপ্লবের রূপ ও রূপায়ণের পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হইতে পারে। ব্রিটেনের মতো পার্লেয়ামেণ্টারি গণতন্ত্রের দেশে সত্যই যদি শান্তিপূর্ণ পথে শ্রমিকবিপ্লব ঘটে, শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্য সেস্থলে তবে কী রূপ গ্রহণ করিবে তাহা কে বলিতে পারে? কারণ, দেখা যাইতেছে যেখানে গণতন্ত্রের ঐতিহ্য সুদৃঢ় সেখানে তো জনসাধারণ এখনো এরূপ বিপ্লবের অনুষ্ঠান করে নাই।

আফ্রেশীয়ায় জাতীয় বিপ্লবের জয়

সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রশক্তি যদি পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশের অধিকারী হইয়া থাকে, ধনিকতন্ত্রীরা কিন্তু পৃথিবীর বাকী দুই তৃতীয়াংশেরও আর নিঃসংশয়ে অধিকারী নাই। প্রথমতঃ, সাম্রাজ্যবাদের শাসন কাটাইয়া এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পৃথিবীর বিরাট অংশ স্বাধীন হইয়াছে, সাম্রাজ্যবাদী শাসন হইতে মুক্ত হইয়াছে। বহু নতুন জাতি ও নতুন শক্তি জন্ম লইয়াছে। এশিয়ায় ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্ম, সিংহল প্রভৃতির জানা নাম না করিলেও চলে। কিন্তু এই কথা বলিতেই হইবে—বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম বিস্ময় আফ্রিকার আত্ম-

প্রকাশ। শুধু মিশরের মতো পুরাতন জাতি নয়, অথবা আরবমণ্ডলের তুনিসিয়া, আলজিরিয়া প্রভৃতির স্বাধীনতাও নয়। কৃষ্ণ আফ্রিকার অভ্যুদয়ই জগতের রাজনৈতিক রূপান্তরের দিক হইতে এখন এক প্রধান ঘটনা। এখনো অবশ্য সমস্ত কৃষ্ণ আফ্রিকা স্বাধীন নয়; কঙ্গো মুক্ত নয়; পর্তুগাল-স্পেনের রক্ত-পায়ী সাম্রাজ্যবাদ আফ্রিকায় এখনও পরাভূত নয়; দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র ফ্যাশিজম্ নিরঙ্কুশ; রোডেশিয়ার নামাবলী-পরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও শেষ আশা ছাড়িতেছে না। কিন্তু এশিয়ার প্রায় শতকরা ৯৭ ভাগ ও আফ্রিকার শতকরা ৭৫ ভাগ এখন স্বাধীন (১৯৬৩)। মোটের উপর সাম্রাজ্যবাদের শক্তি এশিয়া-আফ্রিকায় ক্ষয় পাইয়াছে। তুই মহাদেশে এখনো মাত্র ৭·৬ শতাংশ এলেকা ও ১·৫ শতাংশ মানুষ উপনিবেশবাদের নিগড়ে আবদ্ধ। অবশ্য পৃথিবীতে ধনিকতন্ত্রের উগ্র আধিপত্য প্রধানত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রূপেই টিঁকিয়া থাকিতে চাহিতেছে—সাম্রাজ্যবাদী ইয়ুরোপীয়রা টিঁকিলে টিকিবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহযোগীরূপে, তাহারই আনুগত্যে।

এই নবজাত রাজ্যসমূহের দিকে তাকাইলেই বুঝিব এযুগের বিপ্লব কত বিভিন্ন পথে রূপ লাভ করিতেছে। যেমন, ঘানা, মালি প্রভৃতি রাষ্ট্র ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব পরিহার করিয়া রাষ্ট্রীয় মালিকানা বৃদ্ধি করিয়া সমাজতন্ত্রের দিকেই মুখ রাখিতেছে। জাতীয় বিপ্লবই এরূপে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবে পরিণত হওয়া আজ অসম্ভব নয়। আবার মিশরের কথা বুঝিলে বুঝিব এই ধারারও কত বিচিত্র রূপ—কোথাও তাহা কতকটা গণতন্ত্রী (ঘানা, এশিয়ার ভারত, সিংহল ও কতকাংশে ইন্দোনেশিয়ায়), কোথাও সামরিক একনায়কতন্ত্রী (মিশর, এশিয়ার ব্রহ্মে)। আবার কোথাও কোনো দেশ বিভ্রান্ত, কখনো পূর্ব-ঔপনিবেশিক (ফরাসী বা ব্রিটিশ) প্রভুদের আওতায় একটা দেশীয় মালিকশ্রেণী গড়িতে সচেষ্ট (যেমন, এশিয়ায় পাকিস্তান)। কোথাও বা তাহা এত বিভ্রান্ত যে স্বাধীনতাকে রূপায়ণ কারবার পথও বাছিয়া লইতে অক্ষম। এই সব রাজ্যের মধ্যে অসমানতা বহুদিকে। কেহ ঔপজাতিক (tribal) স্তর সর্বাংশে ছাড়াইয়া জাতীয়তার স্তরে আজও পৌছায় নাই (ঘানাও প্রায় সেরূপ দেশ), অথচ অসীম সাহসে কৃষি ও শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়া একেবারে ধনিকতন্ত্রের স্তর এড়াইয়া শিল্পায়ন করিতে চাহে, ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজবিকাশের স্তর ছাড়াইয়া লইয়া একেবারেই সমাজতন্ত্রের দিকে চলিতে দৃঢ়সংকল্প; সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনেই গণতন্ত্রকে সীমিত, নিয়ন্ত্রিত করিতেও

দ্বিধা করে না। কেহ বা সাম্রাজ্যবাদের আওতাতেই আধা-সামন্ততন্ত্রী জীবন যাপনে স্বীকৃত। মোটের উপর ইহাদের প্রবণতা দেখিয়া এই নতুন স্বাধীন দেশগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়: প্রথম, জাতীয় বিপ্লব যেখানে ধনিকতন্ত্র এড়াইয়া সমাজতন্ত্রে পরিণত হইতে যত্নপর। বলাবাহুল্য, তাহাদের বিবেচনায় অনুন্নত দেশের দ্রুত উন্নয়নের পথ নির্দেশ করিয়াছে সোভিয়েত রাষ্ট্র; আর পর-শাসনের ও শোষণের বিরোধ সোভিয়েতের মূলনীতি বলিয়া সোভিয়েত দেশই তাহাদের চোখে তাহাদের নিঃস্বার্থ সহায়ক, অকৃত্রিম বন্ধু। তথাপি ইহারা অনেকেই উত্তর কেরিয়া, উত্তর ভিয়েৎ নামের বা কুবার তুলনায় জাতীয় বিপ্লবকে দ্রুত সমাজতন্ত্রী বিপ্লবে পরিণত করিতে সংকুচিত। মিশর, ঘানা, গিনি, মালি, ইন্দোনেশিয়া, (ব্রহ্ম?) প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলিতে এরূপ লক্ষণ দেখা যায়। দ্বিতীয় ভাগ, ধনিকতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখিয়া গণতন্ত্রী পথে বিপ্লবকে সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রীয়করণের (state capitalism) দ্বারা সমাজতন্ত্রী ধাঁচে জাতীয় জীবন রূপায়ণ করিতে চায়। ভারত রাষ্ট্রই এই পথের প্রধান উদ্যোক্তা। এই ধরণের রাজ্যের মধ্যে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রের প্রতি বিরোধিতা স্পষ্ট। রাষ্ট্রীয়করণ অনেক সময়ে এসব দেশে সাধারণের আয়ত্তীকরণ নয়, যথার্থ সমাজতন্ত্রও নয়। তৃতীয় ভাগে মালয় পাকিস্তান হইতে পশ্চিম আফ্রিকার কয়েকটি রাজ্যও পড়ে। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম কিম্বা তাইওয়ানের চীনকে ধরাও যুক্তিসঙ্গত হইবে না। উহারা পশ্চিমী গণতন্ত্রের বিচিত্র 'গণতন্ত্রী' পোষ্যপুত্র, অর্থাৎ খোলাখুলি সাম্রাজ্যবাদেরই বেনামী জমিদারী।

প্রতিক্রিয়ার বিকৃতি

সাম্রাজ্যবাদেরও তাই আধুনিক রূপটা বুঝিবার মতো। তাহার নীতি—যেখানে সম্ভব শাসিতদের মধ্যে বিভাগ-সৃষ্টি; ভারতবর্ষ, কোরিয়া, চীন, ভিয়েৎনাম হইতে জার্মানি পর্যন্ত সর্বত্র ইহার প্রমাণ দেখা যায়। কিম্বা, যেখানে সম্ভব রাজনৈতিক শাসন প্রকাশ্যে গুটাইয়া আনিয়া ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও শোষণ অক্ষুণ্ণ রাখা—সেই উদ্দেশ্যে একদিকে 'সাহায্য' দান করা ও পুঁজি লগ্নি করা। অন্যদিকে, ঘাটি বাঁধা, যুদ্ধায়োজন করা, যুদ্ধের উৎপাদনে ও আতঙ্কে মুনাফাবাদী অর্থনীতি ও ধনিকতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ সংকটকে ঠেকাইয়া

রাখা। নিশ্চয়ই সাম্রাজ্যবাদেরও ধনিকতন্ত্রের অধিকার রাজনৈতিক ব্যাপ্তির হিসাবে অনেক সংকুচিত। কিন্তু তাই বলিয়া অস্ত্রশক্তিতে, ও সামরিক শক্তিতে, শিল্প-শক্তিতে, এমন কি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের শক্তিতেও মার্কিন নেতৃত্বে চালিত ধনিকতন্ত্রীরা একেবারেই হৃতবল নয়। বাজার মন্দা না হইলে বহুশোষণপুষ্ট জীবনমানও কাহারও কাহারও যথেষ্ট উচ্চে থাকিবে। অভ্যন্তরে যতই ক্ষয়িত হোক, রাজনৈতিক হিসাবে এখনো যে ধনিকতন্ত্র বাহ্যতঃ প্রবল তাহার প্রমাণ সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনেই পাওয়া যায়। সামরিক হিসাবে যে সে বরং অধিকতর অস্ত্রশক্তি, সৈন্যবল ও মারণ-সংকল্প আয়ত্ত করিতে বদ্ধপরিকর, ইহাও সত্য। নাটো, সিয়াটো, মেদো (বাগ্‌দাদ্‌ চুক্তি) প্রভৃতির দ্বারা বিশ্বজোড়া সামরিক ঘাঁটি বাঁধিয়া বিশ্বযুদ্ধের এমন ব্যূহ রচনা পূর্বে কেহ করে নাই—হিটলার মুসোলিনি তোজোও না। এমন মারণাস্ত্রের সজ্জা তো তখন অকল্পিতই ছিল। কিন্তু শক্তির অপেক্ষাও বড় সত্য—তাহার দৌর্বল্য। তাইওয়ানে, কোরিয়ায়, ভিয়েৎনামে যেরূপ দেখা গিয়াছে, কঙ্গোতে যাহা বুঝা গিয়াছে, এখনো ইন্দোচীনে লাওসে যাহা দেখা যায়, তাহাতে ধনিকতন্ত্রের অধঃপতন বুঝা যায়। স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী চেতনাকে গণতন্ত্রী বিপ্লবী চেতনায় সুস্থির হইতে না দিয়া স্বৈরতন্ত্রী প্রতিক্রিয়ায় বিকৃত করাই পৃথিবীর ধনিকতন্ত্রী নেতৃত্বের বর্তমানের অন্যতম কৌশল। অর্থাৎ, যে গণতন্ত্র ধনিকতন্ত্রের একদিনকার প্রধান মন্ত্র ছিল আজ ধনিকতন্ত্র তাহাই বাতিল করিতে ব্যস্ত। আবার, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্র ছাড়াইয়া ইহাদের বিভীষিকাবাদী সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি যে ধনিকতন্ত্রের এককালের সমস্ত অধ্যাত্ম-চেতনাকেই বিকৃত করিতেছে তাহাও সুস্পষ্ট। এখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিজ্ঞান ও টেকনোলজিতে সর্বাগ্রগণ্য। বিপুল তাহার বিজ্ঞান সাধনা। কিন্তু সেই বিজ্ঞান, সেই বিদ্যা অধিকাংশই উৎসর্গীকৃত সামরিক উদ্দেশ্যে। অপ্রতিহত তাহার প্রচার ক্ষমতা ; যুদ্ধের প্রচারে, আণবিক ধ্বংস সম্বন্ধে মানুষকে অজ্ঞ বা উদাসীন ও ভ্রান্ত রাখিতে তাহা প্রযুক্ত। শিল্পে সাহিত্যেও তাহাদের যে যুগ-যুগ আয়ত্ত কলানৈপুণ্য তাহাও প্রায়শঃ প্রযুক্ত হইতেছে রিরংসার চিত্রণে, অপরাধ-প্রবণ মানসিকতার ব্যাখ্যানে, পাশবিকতাকে পৌরুষ বলিয়া প্রশংসায়, মানবতার প্রতি (কোথাও রাষ্ট্রীয় পাপ বোধের নামে, কোথাও জৈববিজ্ঞানের নামে) অবিশ্বাস সৃষ্টিতে। ইহাই ক্ষয়িষ্ণু ধনিকতন্ত্রী সংস্কৃতির সর্বাধুনিক রূপ।

অবশ্য নিছক কলাকৃতিত্বের বা বিশুদ্ধ শিল্প-নৈপুণ্যের দিক হইতে পাশ্চাত্য ধনিকতন্ত্রী বা জাপানের মতো এশিয়ার ধনিকতন্ত্রী সংস্কৃতিকে বিচার করিলেও মানিতে হইবে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, কিম্বা সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নাট্য ও নৃত্যে ধনিকতন্ত্রী জাতিরা এখনো দীন নয়। বরং কোনো কোনো দিকে, অর্থের প্রাচুর্যের ফলে ও গতানুগতিক ঐতিহ্যের নিয়মে তাহাদের সাংস্কৃতিক রূপবিলাস, আঙ্গিক বিভ্রম, উদ্ভাবনার প্রয়াস এখন আরও বেশি চমকপ্রদ। কিন্তু 'নিছক কলাকৃতিত্ব' ও 'বিশুদ্ধ শিল্পনৈপুণ্য' কথাদুটিই শিল্পসৃষ্টির দিক হইতে চরম কথা নয়, বরং তাহা ভ্রমাত্মক ও মারাত্মক এক অর্ধসত্যের মায়াজাল। অনেক সময়েই ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার ও ক্ষয়িষ্ণু জীবন-বোধের বিষপুষ্প এইরূপ কলা-কৃতিত্ব।

শিল্পের নিজস্ব মূল্য নিশ্চয়ই আছে। কেবল মাত্র বাহিরের উপযোগিতা দিয়া শিল্পবস্তুর মূল্য স্থির হয় না,—এই পুরাতন সত্য চিরদিনই সত্য। কিন্তু জীবনের সাধনাতেই শিল্পের আসল মূল্য, জীবনবোধের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব দিয়াই তাহার চরম বিচার। আর ঠিক সেইখানেই ধনিকতন্ত্রের শিল্প-সাহিত্য দেউলিয়া হইতে বসিয়াছে। জীবনভ্রষ্ট হইয়া সে শিল্প প্রায়ই আত্মভ্রষ্ট। অথবা বিকৃত জীবনবোধের চক্রে ধনিকতন্ত্রের অতিনিপুণ কলা-কৃতিত্ব আজ বিকৃত, বিষাক্ত। এইখানেই আবার সোভিয়েত শিল্পকলার উৎকর্ষ—তাহার আদর্শ বিকৃত নয়। অবশ্য, জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে, সমাজ-প্রগতির উদ্দেশ্যে, 'নতুন মানুষ' গড়িবার আদর্শে, সোভিয়েত শিল্পকলা সেই কলা-কাণ্ড ('সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা') এত উগ্রভাবে অনুসরণে তৎপর যে, তাহা অনেক সময়ে রসোত্তীর্ণ হয় না। তাহাতে যে অভাব সে অভাব, আসলে জীবনচেতনার ক্ষয়িষ্ণু বিকৃতিতে নয়, বরং সদুদ্দেশ্যের মাত্রাধিক্যেই সোভিয়েত শিল্পীদের এই বিভ্রান্তি। সেই উদ্দেশ্যের চাপেই জীবন-রসের অফুরন্ত রহস্যময়তা, মানব-রসের অভাবনীয় বিস্ময় সম্বন্ধে সোভিয়েত শিল্পী সময়ে সময়ে অবহিত হন না। 'সামাজিক বাস্তবতা'র সুদৃঢ় সূত্রে কেন, কোনো ধরাবাঁধা সূত্রেই জীবনকে গাঁথিয়া ফেলা যায় না,—এবং তাহা করিতে গেলে সোভিয়েতের মূল মতাদর্শই অলক্ষ্যে লঙ্ঘিত হয়। চিত্রকলা ও সাহিত্যে যদি বা এই জীবনবোধ

বিষয়ে সন্দেহ থাকে, সোভিয়েত ব্যালে, সোভিয়েত অপেরা তো তাহা স্পষ্টই মানিয়া চলে। সঙ্গীতই কি না মানিয়া পারে? সৃষ্টির পক্ষে এই জীবনবোধের সত্যতাই চরম বস্তু, নিশ্চয়ই সৃষ্টির পরম অবলম্বন। তারপর আসে কলাকৃতিত্ব, উন্মেষশালিনী বুদ্ধি, রূপায়ণের সর্বাঙ্গীণ সুষমা প্রভৃতি। সোভিয়েত শিল্পকলা এই কলা-কৃতিত্বকে প্রায়ই নিতান্ত গৌণ করিয়া তোলাতে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় অনেকাংশে বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়ে। হয়তো সোভিয়েতের এক সাহিত্যিকের মুখে শোনা এই কথাটাই তাঁহাদের এই দিক্‌কার সমস্যার সন্ধান দেয়: 'নতুন সমাজের নতুন মানুষ আমরা গড়িতেছি। সাহিত্যেও আমরা সেই নতুন মানুষের পরিচয় উপস্থিত করিতে চাই। কিন্তু কি জানো, নতুন অপরিচিত বলিয়াই নতুন; চেনাকে চেনানো যত সহজ অচেনাকে চেনানো তেমনি কঠিন। ঠিক সেই কারণেই ক্ষয়িষ্ণুতাকে, বিকৃতিকে যত সহজে শিল্পরূপদান করা যায়, বিকাশোন্মুখকে, নবজাতককে তত সহজে শিল্পায়ত্ত করা যায় না। আমাদের সার্থকতা এখন পর্যন্ত সৃষ্টির সম্পূর্ণতায় নয়, বরং নতুনের সৃষ্টির প্রচেষ্টায়,—এই আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধায়, নতুন মানুষের প্রতি মমতায়, মানবতার প্রতি বিশ্বস্ততায়।'

মানবতার প্রতি বিশ্বস্ততা—ইহাই সোভিয়েত বিজ্ঞান, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতির পরম মন্ত্র। আর, বিশ্বসংস্কৃতিতে এই চিরন্তন সত্যকেই এই যুগে সোভিয়েত যেন নতুন করিয়া মূর্ত করিতেছে। কুবার সংকটের আত্মসংযমেও তাহারই প্রমাণ মিলিল। তাই যুদ্ধ-প্রচারও সোভিয়েত জগতে নিষিদ্ধ।

মানবভ্রাতৃত্ব

সোভিয়েত রাষ্ট্রে যুদ্ধ-প্রচারের 'স্বাধীনতা' কাহারও নাই—শ্রমিকের নাই, সাধারণ মানুষের নাই, বুদ্ধিজীবীরও নাই। এমন কি, শিল্পে, সাহিত্যে, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক গবেষণায়ও এই ধরণের 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' ও 'প্রকাশের স্বাধীনতা' অস্বীকৃত। মানুষে মানুষে আরও অনেক পার্থক্যকে কৃত্রিম ব্যবধানে পরিণত করিবার চেষ্টাও অগ্রাহ্য—জাতিতে-জাতিতে, ধর্মে-ধর্মে, এমন কি নারী-পুরুষের দৈহিক গঠনের নামে তাহাদের ধীশক্তি ও স্বভাবের অপকর্ষ উৎকর্ষ প্রচারও সম্পূর্ণ অবৈধ। তাই বলিয়া য়িহুদীদের সম্বন্ধে সংশয়ের ছায়া সকল রুশের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে, এখন পর্যন্ত তাহা বলা সঙ্গত হইবে না —এদিকে অতীতের জের সম্পূর্ণ কাটিয়া যায় নাই। তবে রুশে উক্রেইনীতে,

কিংবা তাতারে-উক্রেইনীতে আজ অতীতের বৈরিতা প্রায় অবলুপ্ত। অথচ উক্রেইনী ও রুশের বিরোধকে পুঁজি করিয়া সোভিয়েত সংঘকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আশা হিটলারও করিয়াছিলেন, মার্কিন নেতাদের কমিউনিজম-নিসূদনের এখনো তাহা একটা স্বপ্ন।

মানবভ্রাতৃত্ব অবশ্য শুধু সোভিয়েত সঙ্ঘের জাতিদের ভ্রাতৃত্ব বুঝায় না—নিশ্চয়ই একই সামাজিক ও আর্থিক মতাদর্শের বন্ধনে তাহাদের সৌভ্রাত্র প্রায় অচ্ছেদ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মানবভ্রাতৃত্বের নীতি অনুযায়ী জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব কেন, সোভিয়েত মানবতায় এই বর্ণ-বৈষম্যও নিষিদ্ধ। বিশ্বরাষ্ট্রসম্মেলনে সর্ব জাতির ও সর্ব বর্ণের মানুষের প্রতিনিধিরা আজ সমাধিকারে অধিকারী। কিন্তু নিউইয়র্কে সম্মেলন-ভবনের আওতা ছাড়াইয়া শ্বেতাঙ্গ পাড়ার কোনো হোটেলে, কোনো রন্ধনশালায় প্রবেশ করিবার অধিকার শ্বেত ছাড়া অন্য বর্ণের মানুষের আছে কিনা জানি না। অন্তত কালা আদমীর নাই, কৃষ্ণ আফ্রিকানদের নাই, শ্যামল ভারতবাসীরও যে বিশেষ আছে তাহা নয়। অবশ্য মার্কিন জাতিরা বলিতে পারে—ভারতবর্ষেই কি আফ্রিকার ছাত্ররা ভারতীয় সমাজে তেমন স্বচ্ছন্দ সামাজিক মেলামেশার অধিকার ভোগ করে? নিশ্চয়ই এ বিষয়ে আমাদেরও আত্মবিচারের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—সোভিয়েত দেশ শ্বেত, শ্যামল, কৃষ্ণ, পীত সকল জাতির স্বচ্ছন্দ বাসভূমি। কৃষ্ণাঙ্গদের সমাদরই বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিক। এই সমাদর শুধু আজিকার জিনিস নয়। কোনো দিনই সম্ভবত রুশ জাতি কৃষ্ণাঙ্গদের অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে পারে নাই। মহাকবি পুশ্‌কিন্ তাই দেড়শত বৎসর পূর্বেও সগর্বে উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহার মাতৃকুলের কৃষ্ণ পূর্বপুরুষ ঈথোপীয় হ্যানিবলের কথা। কিন্তু ব্যাপকভাবে ইহা পরীক্ষার বা পরিচয়ের যথার্থ সুযোগ এই যুগেই আসিয়াছে—বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। অবশ্য কৃষ্ণাঙ্গ ঔপজাতিক কর্তৃগোষ্ঠীর আফ্রিকান্ সন্তানেরা আদরের এই সুযোগের অপব্যয় করিয়া সমাজতন্ত্রী দেশে আফ্রিকার সুনাম কিছুটা বিনষ্ট করিতেছে (১৯৬৩), তাহাও সত্য।

মহামানবের সাগরতীর

তথাপি, ব্রিটেন যখন ওয়েষ্টইণ্ডিয়ান্, পাকিস্তানী ও ভারতীয় শ্রমিকের বিরুদ্ধে 'বিদেশী প্রবেশ নিষেধ আইন' বিধিবদ্ধ করিতেছে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র

যখন স্বদেশের কৃষ্ণাঙ্গদের স্কুল-কলেজে পড়িবার সাধারণ অধিকারকেও কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারিতেছে না, সোভিয়েত শক্তি তখনি মস্কোতে খুলিয়া বসিল শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত সকল অনুন্নত জাতির জন্য 'লুমুম্বা সৌভ্রাত্র বিশ্ববিদ্যালয়'। শুধু এই একটি আয়োজনই সোভিয়েত মানবতার যথেষ্ট পরিচয় বহন করিত—মানব ভ্রাতৃত্বের তাহা জীবন্ত প্রতীক। এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল পশ্চাৎপদ জাতিদের সোভিয়েতের প্রতি বিশ্বাসেরও সাক্ষ্য। কিন্তু শুধু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাতেই সোভিয়েতের বিশ্ব-মানবের অবাধ বিকাশের আশা সীমাবদ্ধ নয়। মস্কো, লেনিনগ্রাদ্ কীয়েফ্ প্রভৃতি শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেখা যায় আজ আফ্রিকার সকল দেশের অজস্র যুবক, অজস্র ছাত্র। শিক্ষালয়ের সঙ্গে নানা শিল্পক্ষেত্রে কারিগরী বিদ্যায় তাহারা শিক্ষা লাভ করিতেছে। আফ্রিকার নবকলেবর যেমন রাজনৈতিক সত্য হইয়া উঠিতেছে, তাহার সামাজিক-আর্থিক রূপান্তরের আয়োজনও তেমনি সোভিয়েত সুনির্বাহিত করিয়া দিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষিত আফ্রিকান্‌দের উদ্ভবে নতুন আফ্রিকার সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশও সন্নিকট হইয়া উঠিতেছে। কে বলিবে বিশ্ব-মানবের ইতিহাস এই অপমানিত মহাদেশের জাগরণে ভাবীকালে কী অভিনব ঐশ্বর্যলাভ করিবে? আফ্রিকান্ জীবনানন্দের স্পর্শে, প্রাণ-প্রাচুর্যের দানে, আফ্রিকান্ শিল্প-সঙ্গীত-নৃত্যের বিচিত্র বিকাশে আমাদের এই অতি-পরিশীলন-ক্লান্ত মানব সংস্কৃতির নব-স্ফূর্তি হইবে, ইহা হয়তো স্বপ্ন নয়।

সোভিয়েত প্রয়াস অবশ্য শুধু আফ্রিকান্ ছাত্রদের লইয়াই বসিয়া নাই। আমরা তো জানি—ভারতীয় শিক্ষার্থীদেরও কাছে তাহারা দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। এশিয়ার আফ্রিকার ইউরোপের আমেরিকার সকল জাতের সকল মানুষের জন্য শিক্ষার, সংস্কৃতির, বিজ্ঞানের, কারুবিদ্যার প্রধান তীর্থক্ষেত্র সোভিয়েত দেশ। জটিলতাই কি ইহাতে কম? আফ্রিকার যে ছাত্র আসিল সে হয়তো মধ্য শিক্ষার বিদ্যাও স্বদেশে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার সুযোগ পায় নাই। আরব মণ্ডলের ইরাকী ছাত্র হয়তো আসিয়াছে কলেজের অন্তর্বর্তী (ইণ্টার-মিডিয়েট) স্তরের শিক্ষা আয়ত্ত করিয়া। অথচ ভারতের শিক্ষার্থী গেল শিক্ষা শেষে দুই-চার বৎসর কলেজে অধ্যাপনা করিয়া বা গবেষণা করিয়া। এদিকে সোভিয়েত দেশের নিজের বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষায় আসে প্লাবনের মতো দিনে দিনে অধিকতর সংখ্যায়। ইহাদের সঙ্গে নানা স্তরের নানা ভাষার প্রত্যেকটি বিদেশীকে রুশ ভাষা শিখাইয়া তাহার নিজস্ব মানে, নিজস্ব বিষয়ে

সোভিয়েত শিক্ষায়োজনের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে মিলাইয়া লওয়া একটা জটিল সাংগঠনিক সমস্যা। আফ্রিকার ঔপজাতিক 'রাজার' (tribal cheif) পুত্রকন্যা, কোনো কোনো আরব দেশের সেরূপ সম্পন্ন ছাত্রগণ অনেকে জীবনে গণতন্ত্রের পক্ষপাতী নয়, ও ছাত্রাবস্থায় ছাত্রোচিত সংযম নিয়মের ঐতিহ্যেও অভ্যস্ত নয়। তাহারা তাই জটিল সমস্যা সৃষ্টি করিতে পারে। তাহা জটিলতর হইয়া উঠিতে পারে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন নৈতিক আদর্শের তরুণ-তরুণীর ব্যক্তিসম্পর্কের অবশ্যম্ভাবী আদান-প্রদানে। এই সব জটিল সমস্যার ঝুঁকি জানিয়া বুঝিয়াই সোভিয়েত সমাজ গ্রহণ করিতেছে। কেন? মানবভ্রাতৃত্বের সাধনা তাহার সাধনা বলিয়া।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে দাঁড়াইয়া, শহরের পথে চলিতে-চলিতে, গ্রীষ্মের স্বাস্থ্যনিবাসে বিশ্রাম করিতে করিতে, সোভিয়েতের সর্বত্র দেখিতে হয় এই কৃষ্ণ আফ্রিকান্, ইরাকী-মিশরী, চীনা-জাপানী, কোরীয়, ইন্দোনেশীয়-ইন্দোচীনী, ভারতীয়, জার্মান-পূর্ব ইউরোপীয় আর সর্বশেষে কুবান্ ছাত্রদের সমারোহ। মানব-মহাজীবনের সঙ্গীত কানে আসিয়া পৌছয়। তখন নিজেকেও বিবাট পুরুষের অবয়ব রূপে না চিনিয়া উপায় থাকে না—এই তো 'মহামানবের সাগর তীর'।

তারপর যখন 'এশিয়ার লোক-জীবন পরিষদ্' ও 'আফ্রিকার লোক-জীবন পরিষদে'র আয়োজন লক্ষ্য করা যায় তখন বুঝিতে কষ্ট হয় না—কী আগ্রহ সোভিয়েত সংস্কৃতির পৃথিবীর সকল জাতির, সকল মানুষের ভাষা শিখিবার, তাহাদের আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিচয় সংগ্রহ করিবার। ভারতের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সোভিয়েত সমাদরের কথা আমরা জানি—উহাতে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিতেছে, তাহা আরও বেশি করিয়াই জানি। কিন্তু আমরা একবার কল্পনা করিয়া দেখি কি—শুধু ভারতের বাঙলা, হিন্দী, উর্দু প্রভৃতি আধুনিক প্রধান ভাষা সমূহ নয়, শুধু রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত অনুবাদ-আয়োজন নয়, কিম্বা সংস্কৃত ও আরবী-পারসীও নয়,—জাপান কোরিয়া হইতে ব্রহ্ম সিংহল, আফ্রিকার ইউরোপের সকল প্রধান প্রধান ভাষার জন্য সোভিয়েত দেশে পাঠক্রম প্রস্তুত আছে, শিক্ষক আছে, শিক্ষা চলিতেছে,—অনুবাদ চলিতেছে, দোভাষী তৈয়ারী হইতেছে, গবেষণা আরম্ভ হইতেছে। আর এই সবই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরম্ভ হইয়াছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে—একদিকে যখন যুদ্ধের ধ্বংস সরাইয়া সোভিয়েতের মানুষ আপনাকে পুনর্গঠন করিতেছে, আরদিকে যখন বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ অনুশীলনেও তাহারা উৎসর্গীকৃত-চিত্ত।

সেই সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন—সত্যই সোভিয়েত-ভূমি প্রাচুর্যের দেশ নয়; এখনো তাহার ভোগ্যবস্তুর আয়োজন অনেক দিকেই সীমাবদ্ধ। জীবনমানে সোভিয়েতের মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় কেন, সুইডেন-নরওয়ের তুলনায় ও ব্রিটেন-অস্ট্রেলিয়ার তুলনায়ও দরিদ্র, নিম্নস্থ। অমন শীতের দেশে পশমের জামা বা চামড়ার জুতাও এখনো প্রত্যেকের সহজপ্রাপ্য নয়, যদিও বাজারে উহা পাইলে তাহা ক্রয় করিবার মতো অর্থ সকলেরই আছে। ইহা সত্ত্বেও সোভিয়েত বিশ্বমানুষের শিক্ষার মহাব্রত গ্রহণ করিল,—কতখানি মানব-ভ্রাতৃত্বের প্রেরণায়, কতখানি অনুন্নত জাতিদের প্রতি শ্রদ্ধার বশে। মার্কিন ঐশ্বর্যের তুলনায় সোভিয়েত রিক্ত, তথাপি পশ্চাৎপদ জাতিদের জন্য আর্থিক সাহায্যেই বা কেন সোভিয়েত সাগ্রহে অগ্রসর হইয়া আসিল—বিনা শর্তে, সামরিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধিও দাবী না করিয়া? সেই সাহায্যও যে কতখানি আন্তরিক, কতখানি অকৃত্রিম, তাহা তো ভারতে ভিলাই, সুরতগড় ছাড়া মিগ্ জঙ্গীবিমানের কারখানা গঠনের ব্যাপারেও বুঝিতে পারি। ভিলাইর পার্শ্বে দুর্গাপুরে ব্রিটিশ ধনিক-প্রয়াসের ও রাউঢ়কেলার পশ্চিম জার্মান ধনিক প্রয়াসের কথা মনে রাখিলে আরও বুঝি। বোকারোর ব্যাপারও তাহারই প্রমাণ। মানবতার প্রেরণা ও মুনাফার প্রেরণাতে এইরূপই তফাৎ—না হইলে মার্কিন রাজ্যের তো পুঁজির পরিসীমা নাই; জার্মান বা ব্রিটিশ কারিগররাও বিদ্যায়, অভিজ্ঞতায়, শিক্ষাসংগঠনে, ঐতিহ্যে তো কাহারও অপেক্ষা ছোট নন।

মুনাফার পলিটিক্স্ ও মানবতার পলিটিক্স্

নিশ্চয়ই তর্ক উঠিবে, এসব মানবতার নয়, পলিটিক্সের প্রমাণ। পলিটিক্সের জন্যই সোভিয়েতের এই আর্থিক সহায়তা নবজাত জাতিদের দেশে, এই দরদ তাহাদের ভাষার জন্য, সাহিত্যের জন্য। পলিটিক্সেরই জন্য ওই সর্বজাতির ছাত্র সংগ্রহ—কমিউনিজমের পাঠে তাহাদের দীক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে। এই কথা নিশ্চয়ই মিথ্যা নয়। সাম্রাজ্যের পলিটিক্সের জন্যই তো ব্রিটেনও একটি বিশিষ্ট গবেষক পরিষদ্ গঠন করিয়াছিল (British Society of Oriental and African Studies); তাহার গবেষণা-মান, শিক্ষামান বহুদিনে বহু যত্নে সে সমুন্নতও করিয়াছিল। তাহার সেই প্রতিষ্ঠান ও সেই আয়োজনকে

তথাপি সশ্রদ্ধচিত্তে তাহাদের প্রয়াসের জন্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কেন সেই পলিটিক্স্ শত বৎসরেও ব্রিটনকে একটা লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয় গঠনে প্রেরণা দিল না? এখনো কেন শিল্পায়নে প্রয়োজনীয় কৃষ্ণ বা শ্যামল কারুবিদ্-গোষ্ঠী গঠনে প্রবৃত্ত করিল না? কারণ, তাহা ইম্পীরিয়ালিষ্ট পলিটিক্স্—শোষণের পলিটিক্স্—মানবস্বীকৃতির পলিটিক্স্ নয়। অপরিমেয় ঐশ্বর্যের ও অসামান্য কারুবিদ্যার দেশ—গণতন্ত্রের দেশ, 'মুক্তি পৃথিবীর' নায়ক, 'মানবাধিকারের' প্রবর্ত্তক—মার্কিন মুলুকই বা কেন এই পীত বা কৃষ্ণ রঙের দুর্ভাগা জাতিদের জন্য এইরূপ শিক্ষার আয়োজন করিল না? এখনো করে না? কেন শর্তের আর সুদের ফাঁসে না বাঁধিয়া আর্থিক সাহায্যও মার্কিন মহাজন দিতে পারে না—ভারতবর্ষকে কিম্বা সিংহলকে? কিম্বা ইন্দোনেশিয়াকে? সত্যই, ইহারও কারণ পলিটিক্স—মার্কিনের মুনাফাবাদের ও জঙ্গীবাদের পলিটিক্স্। এ্যারিস্ততলের কথা মতো মানুষই শুধু পলিটিক্যাল জীব নয়। সকল রাষ্ট্রই পলিটিক্স্ এর মূর্তশক্তি। কোন্ পলিটিক্স্ কাহার, তাহাই তাই লক্ষণীয়। কারণ, মুনাফা শিকারের পলিটিকস মুনাফার সংস্কৃতিকে মানুষ শিকারের সংস্কৃতিতে পরিণত করিয়া তোলে। আর, ওই শোষণ-মুক্তির পলিটিকস্ সৃজনমুখী সংস্কৃতিকে দেয় মানবতার দীক্ষা—পরিণত করে মানবভ্রাতৃত্বের সংস্কৃতিতে, মানব-বিশ্বাসের সংস্কৃতিতে। দুইই যদি পলিটিক্স্ হয়, তবে যেই পলিটিক্স মানবতার স্বপক্ষে তাহাই মানুষের জীবনদায়ী পলিটিক্স—মুনাফা শিকারের পলিটিক্স তো মানুষ শিকারের পলিটিক্স—অমানুষিক পলিটিক্স্।

বিচারকালে আবার মনে করিতে হয়—এই কথা তো মিথ্যা নয়, সোভিয়েতের সঙ্কল্প বিরাট হইলেও তাহার ঐশ্বর্য এখনো সীমাবদ্ধ। সম্ভবতঃ তাহার বৈজ্ঞানিক উদ্যোগও সর্বদিকে এখন পর্যন্ত সমানভাবে অগ্রসর নয়। অবশ্য সোভিয়েত বিরোধীবাও বলেন, কারুবিজ্ঞানের শিক্ষায়োজনে সোভিয়েত ইতিমধ্যেই মার্কিন, ব্রিটিশ, ফরাসী প্রভৃতি সকলকে পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে; তাই তাহার বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠতাও ভবিষ্যতে অবধারিত। ধনিকতন্ত্রের গণ্ডী-টানা (কর্দন স্যানিটের) ঘরের মধ্যে সুদীর্ঘ দিন যাপন করিয়া সোভিয়েত ভূমি পৃথিবী হইতে দীর্ঘদিন অনেকটা বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে, বিশ্বের নিত্য-বিবর্ধিত জ্ঞান সম্পদ হইতেও বঞ্চিত থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। ফলে তাহার মানস-ভঙ্গিতে একটা স্বয়ংসন্তুষ্ট ও আহত আত্মমর্যাদাবোধ প্রশ্রয় পাইয়াছে। সেই সঙ্গে অন্যের সম্বন্ধে সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। তাহার অতি দ্রুতগঠিত সাংস্কৃতিক আয়োজনের

মধ্যেও অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যাইতেছে,—যতটা তাহার ব্যাপ্তি আছে, ততটা গভীরতা জন্মায় নাই। আর্থিক বিকাশে ও আধ্যাত্মিক বিকাশে তাহার এক-একদিকে যতটা উন্নতি, কোনো কোন দিকে তেমনি শ্লথতা থাকিয়া গিয়াছে। যে দেশ চন্দ্রলোকের বার্তা সংগ্রহ করিতেছে, সে-দেশে টেলিফোনের পঞ্জিকা দুর্লভ, চিঠিপত্রের বিষয়ে সে অমনোযোগী। অটোমেশন, সিবারনেটিক্স লইয়া যাহারা নতুন জীবন গড়িতেছে, ভালো ফাউন্‌টেন্ পেন ও কালি তাহাদের নিকট দুর্লভ, ভারী দোয়াতদান ও মোটা কালিতেও তাহাদের আপত্তি নাই। এইরূপ অজস্র দৃষ্টান্ত যোগ করা চলিতে পারে। যে কোনো মানুষ সোভিয়েত দেশে সাধারণ ভাবে দুই-এক মাস যাপন করিয়াছে সে-ই তাহা বলিতে পারে। শুধু ইহাই বা কেন? সেখানে পোষাক-পরিচ্ছদে ছিম-ছাম দোরস্ত লোক কম দেখা যায়। দফ্‌তরে তাহাদের ফাইলফিতা ও কাগজপত্রের ব্যবহার সীমাবদ্ধ। লেখায় পড়ায়, প্রশ্নে উত্তরে কর্মচারীদের অমনোযোগ অসুবিধাজনক। জীবনযাত্রায় মোটা ধরণের স্বাচ্ছন্দ্যই যেন যথেষ্ট, বেশভূষায়, চলায় বলায়, কাজে কর্মে পরিপাটিতা, বা স্মার্টনেস-এ সোভিয়েত নরনারীর লক্ষ্য কম। অথচ, আজন্ম-মৃত্যু জীবনযাত্রার সকল বিভাগ সমাজতন্ত্রী কাঠামোতে বিধৃত বলিয়া সমাজতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ শত্রু আমলাতান্ত্রিক মূঢ়তা ও উগ্রতাও প্রশাসনের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া বসিতে চাহে এবং বসেও। অন্যদিকে আধুনিক বিজ্ঞান ও কারুবিদ্যার দ্রুত প্রবর্তনের ও অতিপ্রসারের সঙ্গে সোভিয়েতে চারুকলা ও সুকুমার শিল্পের অনুশীলন তাল রাখিয়া উঠিতে পারিতেছে কিনা সন্দেহ করা যায়। মার্কিন সংস্কৃতির মতোই সোভিয়েত সংস্কৃতির এই সমস্যাও এক প্রধান সমস্যা—কারুবিজ্ঞানের চাপে মানববিদ্যার অসমান বিকাশ। ইহার কিছুই মিথ্যা নয়। কিন্তু সোভিয়েত সমাজ গতিমান, তাহার গতির মাত্রা অন্যান্য অগ্রসর জাতিদের গতিমাত্রাকেও ছাড়াইয়া যাইতেছে, ইহা আরো সত্য। 'নিস্তালিনীয়' কর্মকাণ্ডে ভুলত্রুটী স্পষ্টই এখন স্বীকৃত হয়, দূর করিবার চেষ্টাও চলে। আর সকল রকম ছোট বড় ত্রুটি অসম্পূর্ণতাকে ছাড়াইয়া এই কথা সত্য—সোভিয়েত সমাজ জীবন্ত, চলন্ত, বিবর্ধমান। ঠিক সেইরূপ শত অসামঞ্জস্যের মধ্যেও সোভিয়েত সংস্কৃতির সম্বন্ধে প্রধান সত্য এই কথা: মানবতায় বিশ্বাস, বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ ও সার্বজনীন প্রয়োগ, বিশ্ব-মানবের মুক্তি, বিশ্বশান্তির দুশ্চর তপস্যা সোভিয়েতের মূল সাধনা।

যুগসন্ধির যন্ত্রণা

পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া বিংশ শতকের এই দ্বিতীয়ার্ধে কেহ বা অতি আশা পোষণ করেন, কেহ বা বিষম শঙ্কা বোধ করেন। কেহই বোধ হয় বিশেষ স্বস্তি বা সুস্থির বোধ করেন না। চিরদিনই পৃথিবী গতিমান। সেই গতির টেম্পো বা মাত্রা দিনের পর দিন দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতেছে। এবং, যদি আকস্মিক কোনো বিপর্যয় না ঘটে, তাহা হইলে এই মাত্রা আরও তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়াই চলিবে। সভ্যতার বিকাশ গাণিতিক তালে না হইয়া যেন জ্যামিতিক তালেই হইবে। ইহারই মধ্যে এক একটা যুগসন্ধিতে পৌছিলে অনেক মহানুভাব মানুষেব চিত্তে মানবভাগ্য ও আপন দায়িত্ব-চেতনায় যে গভীর মন্থন চলে তাহাতে হ্যামলেটের মতোই তাঁহারা অনুভব করেন—The world is out of joint! O cursed time, that I was e'er born to set it right.

মৃত্যুর সীমান্তে পৌছিতে পৌছিতে এ কালের মহত্তম বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের মুখেও এই মহামানবিক বেদনার বাণীই ফুটিয়াছিল: হায়, ইহার অপেক্ষা যদি সাধারণ কারিগর মিস্ত্রিও হইতাম! আণবিক শক্তির এই আবিষ্কার যাঁহাদের তপস্যার ফল সেই বিজ্ঞানীদের জ্যেষ্ঠ, ঋষিশ্রেষ্ঠ যেন নিজের তপঃফলে স্বস্তিবোধ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথই কি পারিয়াছিলেন মানুষে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্বাস লইয়া জীবনের শেষপ্রান্তের দিকে অগ্রসর হইতে? অথচ ১৯৪১ এও আণবিক বোমা ছিল অজ্ঞাত। আইনষ্টিন্ রবীন্দ্রনাথের মতো মানবপ্রেমিকদের এই মহৎ অস্বস্তিই মানুষের মহৎ সম্ভাব্যতারও একটা প্রমাণ, মানবতার পরম ধন। পৃথিবীর চিন্তাশীল মানুষদের যদি অন্তরে আজ এই আলোড়ন না জাগিত তাহা হইলে বুঝা যাইত মানুষ অধ্যাত্মবোধহীন একটা নিষ্প্রাণ যন্ত্র, একটা দানবীয় প্রকাশ মাত্র। অথবা, 'সভ্যতার নাড়ীতে নাড়ীতে নবজন্মের বেদনা'ও জাগে নাই। যে কোনো যুগসন্ধিই অস্থিরতার যুগ; যন্ত্রণাই তাহার মুখ্য অধ্যাত্ম লক্ষণ। আর, যে যুগসন্ধি গতিতীব্রতায় এত দুর্বার, দুর্নিরীক্ষ্য, তাহাতে মানুষের যন্ত্রণাও এরূপ তীব্র, এরূপ তীক্ষ্ণ হওয়া অনিবার্য। পৃথিবীর শিল্পে সাহিত্যে তাই এত অস্থিরতার ও যন্ত্রণার প্রতিফলন। সে যন্ত্রণা সৃষ্টির বেদনা, ইহাই বুঝিবার মতো কথা।

সভ্যতার এই মুহূর্তটিকে তাই কত বিভিন্ন দৃষ্টিপথ হইতে মানুষ বিভিন্ন রূপে দেখিয়াছে—কেহ দেখিয়াছে নিউরোটিক এক রূপে, কেহ দেখিয়াছে এশিয়া আফ্রিকার জীবনপ্রভাতরূপে, এমন কি, পাশ্চাত্যের জীবন-সন্ধ্যারূপে। এরূপ জটিলই তাহার লক্ষণ, কোনো দেখাই একেবারে মিথ্যা নয়। কিন্তু সকল দেখাই তাই বলিয়া সমান সত্যও নয়। একটা কথা প্রায় সত্য—পৃথিবীতে আজ একটা বিপ্লবের কাল আসিয়াছে। পূর্ব-পশ্চিমের সকল মনীষীরা এ বিষয়ে একমত—এক বৈজ্ঞানিক বিপ্লব সংঘটিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিকদের মতো আণবিক শক্তির অধিকার-লাভ হইতে তাহার কাল-গণনাও করা একেবারে আযৌক্তিক নয়—এই নবশক্তির প্রয়োগে শতাব্দীর প্রথমার্ধেই যে নূতন শিল্পবিপ্লবের সূচনা হইয়াছে তাহাও বলা চলে।

বিশ্বশান্তি ও বিশ্ববিপ্লব

কিন্তু এই কথা শেষ সত্য নয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ও প্রযুক্তিবিদ্যার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বিজ্ঞানের ইতিহাসে আণবিক শক্তির রহস্য আবিষ্কৃত হইযাছে। তাহার পর আণবিক শক্তির উপর অধিকারও অর্জিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের ইতিহাসের ইহা একটা নতুন অধ্যায়;—জানিবার মতো, বুঝিবার মতো। না জানিলে, না বুঝিলে মানুষের ইতিহাসেরও জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অবশ্য বিজ্ঞানের ইতিহাসও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা জ্ঞানযোগ মাত্র নয়। উহাও মানবেতিহাসের একটা অঙ্গ, মানুষের জ্ঞানযোগের ও কর্মযোগের একটা ক্রমাধিকৃত প্রকাশ। নিশ্চয়ই এই পথ একটানা অগ্রগতির পথ নয়, মানুষের সুবুদ্ধির অবাধ বিজয়ের কাহিনী নয়। আণবিক যুগের দুর্বুদ্ধিও সেইরূপ একেবারে নতুন জিনিস নয়। অগ্নির উপযোগিতা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই অগ্নিকে নির্বোধের মতো বা দুর্বুদ্ধির বশে প্রয়োগ করিলে সেই আদিম যুগ হইতে এখনো পর্যন্ত মানুষ জলিয়া পুড়িয়া মরে। তাই বলিয়া কোনো কালে কেহ কি বলিয়াছেন—আগুনে কাজ নাই; অগ্নির আবিষ্কার একটা দুর্ভাগ্য? তাহা যদি না বলেন, তবে আণবিক শক্তির বেলাই বা এইরূপ বলি কেন?—বলি, কারণ দুর্বুদ্ধির বা বুদ্ধিহীনতার হাতে তাহার প্রয়োগ লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি মারাত্মক হইবে বলিয়া। এই দুর্বুদ্ধি ও বুদ্ধিহীন বা বিকৃতবুদ্ধি উন্মাদ তো পৃথিবীতে একেবারে থাকিবে না। এমন না।

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিকৃতির বিশেষ অবস্থায় সেরূপ হিটলারী-বুদ্ধির মানুষ, জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়া বসিতে পারে, তাহাতো এই শতাব্দীতেই দেখিলাম। আণবিক শক্তির আবিষ্কারের পরেও যদি সমাজ-বিকৃতি বিদূরিত না হয়, তাহা হইলে যে কী হইতে পারে, তাহাও আজ বুঝিতে পারি। এই তো সেদিন তাহা ঘটিতেছিল শুধু একটি মার্কিন শঙ্কাঘোষক যন্ত্রের গোলযোগে। অতএব শুধু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের প্রবর্তনে নয় সামাজিক বিকৃতির মুলোৎপাটনেই বিজ্ঞানের বিপ্লব সম্পূর্ণ হইতে পাবে। তাহার সূচনাতেই আশু প্রয়োজন সামাজিক বিকৃতিরও শোধন—আর বিকৃত রাষ্ট্র ও সামরিক শক্তিব হাত হইতে এই প্রলয়াগ্নি দূরে সরাইয়া রাখা। বৈজ্ঞানিক বিপ্লব এজন্যই আপেক্ষিক সত্য কথা, সামাজিক বিপ্লবেব, অন্তত বহু পরিমাণে বিকৃত সামরিক বুদ্ধির দমনের, এবং সেই সঙ্গে নতুন মানবিক মঙ্গলবোধের তাহা মুখাপেক্ষী। যে সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে আণবিক বিজ্ঞানের জন্ম, সেই সামাজিক প্রয়োজন মিটাইবার মতো সার্থক আযোজন তখনি অগ্রসর হইতে পারিবে যখন আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ -হইবে, যখন সাধারণ ভাবে মারণাস্ত্র ত্যাগ করিয়া পৃথিবী দুর্বুদ্ধির ও নির্বুদ্ধিতার পথ বন্ধ করিবে, এবং রাষ্ট্রনেতা ও যুদ্ধনেতাদের হাত হইতে জাতিসমূহ এই প্রহরণ কাড়িয়া লইতে পারিবে—এক জাতির দ্বারা অপর জাতির শোষণ আর অস্ত্র বলে বজায় রাখা চলিবে না।

আণবিক বিদ্যার সার্থকতার জন্যও এই বিশ্বশান্তি প্রয়োজন। বিশ্ববিপ্লবের ফলে বিশ্বশান্তি আসিবে, না, বিশ্ববিপ্লব আসিবে বিশ্বশান্তির ফলে, —ইহা আণবিক শক্তিব আবিক্রিয়ার পরে আজ এক বিপ্লবী জগতের বড় বিতর্ক, মতভেদেরও কারণ। অনেকটা উহা কুতর্ক। একরোখা বিতর্কের পথে না গিয়া বরং বলা ভালো—বিশ্বশান্তির পথে যদি এক পা বাড়াই বিশ্ববিপ্লবের দিকেও আরএক পা বাড়ানো প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ও ঔপনিবেশিক শোষণের কবলমুক্ত সকল জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাতে বিশ্ববিপ্লবের সেইরূপ প্রথম পদবিন্যাস সুনিশ্চিত হইতেছে। আবার, বিশ্ববিপ্লবের এই পদস্থাপনা যদি সুদৃঢ় করিতে হয় তাহা হইলে বিশ্বশান্তির দ্বিতীয় পদক্ষেপও তখনি প্রয়োজন—অর্থাৎ, চাই অবিলম্বে আণবিক অস্ত্র নিষেধ। তখনি আবার আসিবে বিপ্লবের আরেক পদক্ষেপের সময়—প্রত্যেক জাতির অভ্যন্তরীণ আর্থিক বিকাশে ব্যক্তিগত মুনাফার পরিবর্তে সামাজিক সেবা ও সহযোগিতার নীতি ও পদ্ধতির প্রবর্তন, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রী

ব্যবস্থা। এইসব ব্যবস্থার কোনো-একটিকে একান্ত বা নির্বিশেষ বলিয়া গণ্য না করিয়া পরস্পরের সহায়ক রূপেই দেখা সম্ভব, ও তাহাই খাঁটি দেখা। কারণ, আণবিক যুগে অন্তত বিশ্ববিপ্লবের নামে 'আগে বিপ্লব পরে শান্তি' এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আঁকড়াইয়া থাকা চলে না—লেনিনের নামেও নয়। অবশ্য পরাধীন কোনো জাতির স্বাধীনতার চেষ্টাকেও শান্তির নামে গৌণ করা উচিত নয়—সে প্রশ্নও ওঠে না। মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রতিক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতি বুঝিয়াই কৌশল স্থির করিতে হইবে। তাহাতে মতভেদও ঘটা সম্ভব। কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, শান্তির সাধনাকেই বিশ্ববিপ্লবের অঙ্গ করিয়া তুলিতে হইবে। বিশ্বশান্তিই কি কম বড় বিশ্ববিপ্লব?

বিশ্বশান্তি যে বিশ্ববিপ্লবেরই পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে, এই সত্য অবশ্য মুনাফা-বাদী ও শোষণ-ধর্মী শক্তিদের অজ্ঞাত নয়। নয় বলিয়াই তো মুনাফা-বাদীরা শুধু সমাজতন্ত্র-বিরোধী নয়, তাহারা শান্তিবিরোধী ও যুদ্ধবাদী। পৃথিবীতে যুদ্ধ বা যুদ্ধের আতঙ্ক না থাকিলে মারণাস্ত্র ব্যবসায়ীরা নিশ্চয়ই দেউলিয়া হইবে। মারণাস্ত্র ব্যবসায়ের সঙ্গে মুনাফার জালে ফ্রি ওয়ার্ল্ড-এর ('মুক্তপৃথিবীর') 'ফ্রি এনটারপ্রাইজ' ('অবাধ ব্যবসায়') অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। তথাকথিত 'ফ্রিডম অব কালচার'ও সেই 'শোষণের ফ্রিডমেরই' পক্ষপাতী। যুদ্ধ না থাকিলে এ সবের দুর্দশা। মুনাফাতন্ত্রী সমাজ ব্যবস্থার পথে যুদ্ধ ও যুদ্ধাতঙ্ক তাই জীবন-মরণের প্রশ্ন। মরণাস্ত্রব্যবসায়ীরা অস্ত্রব্যবসায়কে অন্যবিধ যন্ত্র-উৎপাদন শিল্পে ও ভোগ্য-উৎপাদন শিল্পে লাগাইলে পৃথিবী অবশ্য ভোগ্য ও কল্যাণপ্রদ সমৃদ্ধিতে ভাসিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সে পণ্য কিনিবার মতো মানুষ থাকা চাই—যে দামে মানুষ উহা কিনিতে পারে, সেই দামে মুনাফাতন্ত্র কতটুকু বজায় থাকিবে? মুনাফা থাকিলে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা খর্বিত থাকিবে। সাধারণ মানুষের ক্রয়-শক্তি বাড়াইতে হইলে শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি প্রয়োজন; মুনাফা বজায় থাকিলে মজুরী বৃদ্ধিতে পণ্য-মূল্য বৃদ্ধিও অবশ্যম্ভাবী। আর তাহা হইলে আবার প্রশ্ন—সে পণ্য কিনিবার সামর্থ্য থাকিবে কয় জনার? মুনাফার পাপচক্রে অস্ত্রব্যবসায় ও প্রায় অন্যসমস্ত ব্যবসায় এইরূপে মরণায়োজন-রূপে বাড়িয়া চলিয়াছে। তাই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে এইরূপ মুনাফাতন্ত্রী ব্যবস্থার বিলোপ সুনিশ্চিত। শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হইলেও মুনাফাতন্ত্রী ব্যবস্থার সংকট ঘনাইবে, ব্যবসায় মন্দা সুকঠিন হইয়া পড়িবে—মুনাফাতন্ত্রী দেশেও তখন অন্তর্বিপ্লব ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না।—এই সত্যটা

স্পষ্টকণ্ঠে স্বীকার করিতেও মুনাফাবাদীদের কাহারও কাহারও এখন বাধে না—শান্তিতে সমাজতন্ত্রীদের লাভ। কারণ তাহাদের উৎপাদন, বণ্টন, সেবা ও পালন সবই সামাজিক স্বার্থে চলে, মুনাফার উপর নির্ভর করে না। তাই শান্তি থাকিলে বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ প্রয়োগে তাহাদের আর্থিক উদ্যোগের বিকাশমাত্রা দ্বিগুণ চৌগুণ হারে বাড়িয়া উঠিবে। শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতায় সমাজতন্ত্র নিঃসন্দেহে ধনিকতন্ত্রকে পরাভূত করিয়া দিবে। অন্যদিকে শান্তি থাকিলে 'ফ্রি ওয়ার্লডে'র 'ফ্রি এনটারপ্রাইজ' অবশ্যম্ভাবী সংকটে জড়াইয়া বিপ্লবের মুখে গিয়া পড়িবে। একটি গুলিও সমাজতন্ত্রীদের নষ্ট করিতে হইবে না, মুনাফাতন্ত্রী সমাজ আপনার আভ্যন্তরীণ অন্তর্বিরোধে সমাজ বিপ্লবকে সুনিশ্চিত করিয়া তুলিবে। বিশ্বশান্তি তাই মুনাফাবাদী জগতের বিভীষিকা,—জঙ্গীবাদী বিজ্ঞান, জঙ্গীবাদী সংস্কৃতি সাহিত্য শিল্প মুনাফাবাদীদের রক্ষাকবচ।

মার্কিন পুঁজিবাদ চতুর্দিকের অজস্র যুদ্ধঘাটি হইতে সমাজতন্ত্রী পৃথিবীর বুকের উপর সর্বদা বন্দুক ধরিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু মুনাফাতন্ত্রের তাহাতেও দুশ্চিন্তা ঘুচিতেছে না। এই কঠোর সত্য জানিয়া বুঝিয়া, 'ইউ টু'র পরেও মুনাফাবাদী শক্তিসমূহের যুদ্ধায়োজনে সমাজতন্ত্রী শক্তিরাও আত্মরক্ষায় উদাসীন থাকিতে পারেনা। কেন তাহারা তবে যুদ্ধবাদী প্রচার নিষিদ্ধ করিল? কেন শান্তির প্রচেষ্টাতেই সর্বস্ব পণ করিল? প্রথমতঃ, ইহাই সমাজতন্ত্রী মতাদর্শ সম্মত, ইহাই সমাজতন্ত্রী বিকাশেরও পরিপোষক। আর শেষ কারণ—এখন যাহা একটা প্রধান কারণও—আণবিক বোমা আবিষ্কারের পর যাহা অনস্বীকার্য—ইহা মানবতার নীতি। মানুষকে লইয়াই তো সাম্যবাদ—আশী কোটি মানুষকে বলি দিয়া সাম্যবাদ রচনা করিতে হইবে, এমন অমানুষিকতা সাম্যবাদে গ্রাহ্য নয়। সাম্যবাদ মানবতার উচ্চতর সাধনা, শ্রমিকশ্রেণীই সেই উচ্চতর মানবতার বাহক, পরিপোষক। কিন্তু সংস্কৃতির মহত্তর রূপান্তরেই সাম্যবাদের সার্থকতা।

কিন্তু প্রশ্ন হইবে সংস্কৃতির 'মহত্তর রূপের' অর্থ কী? কী সংস্কৃতির লক্ষ্য? হয়তো এক কথায় বলিলে তাহা নতুন কালের অর্থে সেই চিরকালের উত্তর: 'মানুষ'। নতুন কালের মতো করিয়া আমাদের ভাষার এই উত্তরই নানা ত্রুটী সত্ত্বেও সোভিয়েত সংস্কৃতির কণ্ঠেও ফুটিতেছে: সবার উপরে মানুষ সত্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংস্কৃতির গোড়ার কথা

সংস্কৃতির যে রূপান্তর হয়, সে রূপান্তর যে বারবার হইয়াছে—এই সহজ সত্যটি অনেকে একেবারেই হয়ত মানেন না ; আবার অনেকে মানিয়াও তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে চাহেন না। ইহার অনেক কারণ আছে। প্রথম কথা, সংস্কৃতি বলিতে কি বুঝায় তাহাই আমরা স্পষ্ট করিয়া জানি না। কেহ মনে করি, সংস্কৃতি বলিতে বুঝায়—কাব্য, গান, শিল্প, দর্শন, ধ্যান-ধারণা। কেহবা মনে করি—আচার-অনুষ্ঠান, ভদ্রতা-শিষ্টাচার ; সে সম্পর্কীয় ভাবনা-ধারণা, নীতি-নিয়ম, এই সবও উহার অন্তর্গত। কেহবা উহাদের কোনো একটি জিনিসকেই সব বলিয়া ধরিয়া লইবেন। যেমন, কেহ বলিবেন ধর্মই হইল সংস্কৃতি ; ধর্ম সর্বব্যাপক। কেহবা অপর কোনো জিনিসকে মনে করেন মুখ্য কথা। যেমন, ভদ্রতা, শিষ্টচার, ইহাকেই বলেন 'কাল্‌চার'। তাই সংস্কৃতির অর্থ কি, তাহার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা কি, প্রথমত এই কথাটাই আমাদের পরিষ্কার করিয়া জানা প্রয়োজন।[১]

(১) বাঙলা 'সংস্কৃতি' শব্দটি এই গ্রন্থে বরাবরই ইংরেজি 'কাল্‌চার' শব্দটির প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যতদূর জানি, শব্দটি নূতন গঠিত। ইহার বয়স চল্লিশ বৎসরের বেশি নয়। তৎপূর্বে 'কাল্‌চার'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে কখনো 'অনুশীলন' কখনো বা 'সভ্যতা' ব্যবহার করিয়া অনেক সময়ে কাজ চালাইতে হইত। মাঝে 'কৃষ্টি' শব্দটিও এই অর্থে প্রযুক্ত হইত, এখনো 'কৃষ্টি' সেই অর্থে অচল হয় নাই। 'কাল্‌চার' শব্দের মৌলিক অর্থ ও গঠন ধরিয়া কর্ষণাত্মক 'কৃষ্টি' শব্দ তৈয়ারী করা অন্যায় নয়। অবশ্য 'কৃষ্টি'ও অনেক পুরাতন শব্দ ; উহার বৈদিক অর্থ এখন বিস্মৃত। সেই অর্থ ছিল 'সমুদায় কৃষক দল'। (দ্রষ্টব্য ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি, ১ম ভাগ, পৃ ৬১)। 'সংস্কৃতি' শব্দটিও বৈদিক। 'সংস্কৃতি' শব্দটির মধ্যে মানুষের 'কৃতির' বা সৃষ্টিমূলক সক্রিয় প্রয়াসের একটি ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া তাহা সর্ব যুগের মানুষের উপযোগী। যে কারণেই হোক্, কাল্‌চারের প্রতিশব্দরূপে 'কৃষ্টি' অপেক্ষা 'সংস্কৃতি' শব্দটির প্রচলনও ক্রমশ বাড়িয়া গিয়াছে। 'সংস্কৃতি' এখানে সেই ব্যাপক ও সাধারণ অর্থেই মোটামুটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

বিচক্ষণ পাঠকের নিকট তথাপি প্রশ্ন শুনিতে হয়, 'সংস্কৃতি' শব্দটির কি অর্থে প্রয়োগ হইল ? ইহা কি 'কালচার' বুঝায় ? না বুঝায় 'সিভিলিজেশন' ?' নাৎসিতন্ত্রের দার্শনিক প্রবক্তা ওটো স্পেংলারের কৃপায় 'কাল্‌চার' ও 'সিভিলিজেশনের' মধ্যে একটা অচল প্রাচীর কল্পনা করা অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইতেছে। 'কাল্‌চার' এর মূল কথা—ব্যক্তিসত্তার ও জনসত্তার প্রাণময়, গতিময় বিকাশ' অভীপ্সা। আর 'সিভিলেজশনের' অর্থ সংগঠিত,পল্লবিত সমাজের সুস্থির স্থাণুত্ব-কামিতা।—

মূল একটি কথা স্পষ্ট—সংস্কৃতি শুধু মনের একটা বিলাস নয়, শুধু মাত্র মনের সৃষ্টি-সম্পদও নয়। উহা বাস্তব প্রয়োজনে জন্মে এবং মানুষের জীবন-সংগ্রামে শক্তি জোগায়, জীবনযাত্রার বাস্তব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। সেই জীবন-যাত্রারই ঘাত-প্রতিঘাতে সংস্কৃতির রূপ ও রঙও পরিবর্তিত হয়। আবার, সংস্কৃতির সহায়েও জীবনযাত্রা যেমন অগ্রসর হয় সংস্কৃতিও তেমনি জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রাখিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নূতন হইয়া উঠে। জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতির এই সম্বন্ধ যখন দেখিতে পাই তখনি বুঝি সংস্কৃতি নিশ্চল নয়,—তাহার রূপান্তর ঘটে।

সংস্কৃতির বিষয়ে দ্বিতীয় কথাটি তাই এই—কোন্ নিয়মে সংস্কৃতির রূপান্তর চলিয়াছে তাহা বুঝিয়া লওয়া, পরিবর্তনের মূল তত্ত্বটির পরিচয় লওয়া। ইহার ফলে সংস্কৃতির মোট অবয়ব ও অবলম্বন কী, কী তাহাদের পরস্পরের সম্পর্ক, তাহাও বুঝিতে পারি। সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারা তখন প্রায় স্পষ্ট হইয়া উঠে। শুধু ইতিহাসের সাক্ষ্যের দিকে তখন একবার লক্ষ্য করিতে হয়,—দেখিতে হয় ইতিহাসের স্তরে স্তরে সংস্কৃতির কোন্ কোন্ রূপ কি ভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে। তাহাই

এই মর্মের ব্যবধান টানা তথাপি শুধু অর্ধসত্য নয়, উহাকে বিকৃত করা, মিথ্যারই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। বলা বাহুল্য, সিভিলিজেশন মূলতঃ-পৌর-সদাচার। কিন্তু পৌর-জীবন ও পৌর সংস্কৃতির উদ্ভব বাস্তব কারণেই ঘটে। কেন্দ্র বিশেষে তাহার পতন ঘটিলেও পৌর সংস্কৃতির ঐতিহাসিক দাম তুচ্ছ নয়, তাহা শেষও হইয়া যায় নাই। বরং পৌর-সংস্কৃতির নব নব রূপই বিকশিত হইয়াছে, এবং পল্লী-সংস্কৃতি ও পৌর-সংস্কৃতির সমন্বয়েরও পথ এই কালের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ও ব্যবস্থাপনায় সুসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীন কোন কোন পৌর সভ্যতায় জরা-মরণ ঘনাইয়া আসিল এই জন্য যে—সেখানে সমাজ শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ বৈষম্যে ও বিরোধে ভরিয়া উঠিয়াছিল, আর পৌর-জীবনের আর্থিক প্রয়োজনে যুদ্ধ-বিজয়-শোষণ-পীড়ন প্রভৃতি বহির্বিরোধেও উহার আয়ুক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছিল (দ্রষ্টব্য, ভিঃ গর্ডন চাইলডের **Man Makes Himself**) অতএব, 'কাল্‌চার' ও 'সিভিলিজেশন এর নামে স্পেংলারী গবেষণা বা আধুনিক পৌর-সভ্যতার বিরুদ্ধে পল্লী-সভ্যতার 'বিকেন্দ্রীকরণ' প্রভৃতি প্রচারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। সময় ও ক্ষেত্রবিশেষে ঐ সব শব্দের পার্থক্য প্রদর্শনের আপেক্ষিক প্রয়োজন থাকিতে পারে, কিন্তু মুখ্যত ও কার্যতঃ কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই। এই গ্রন্থে অবশ্য আমরা 'সিভিলিজেশন' শব্দটির জন্য সাধারণ অর্থে 'সভ্যতা' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি; বিশেষ অর্থে উহাকে 'পৌর-সংস্কৃতি' দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

প্রথম-সংস্করণে 'কৃষ্টি' শব্দটি পরিহাসচ্ছলে ('বাঙলার কাল্‌চার' অধ্যায়ে) প্রযুক্ত হইয়াছিল। উহা যুক্তিযুক্ত নয়। তাই এবার সেইরূপ অর্থে উহার প্রয়োগ হইল না। এই সংস্করণে 'কৃষ্টি' বিশেষরূপে প্রযুক্ত হইল 'লোক-সংস্কৃতি' বুঝাইতে; কিংবা প্রাথমিক কৃষি-জীবীদের সংস্কৃতি বুঝাইতে; এবং স্থল বিশেষে সেইরূপ কৃষি-জীবীদের শিল্প-সামগ্রী বুঝাইতে। বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানে কালচারেরও বিশেষ অর্থ আছে, তাহা না বলিলেও চলে। সাধারণ ভাবে 'সংস্কৃতি' শব্দটি কাল্‌চারের প্রতিশব্দরূপে প্রযোজ্য।

এই প্রসঙ্গের শেষে প্রয়োজন—ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সংস্কৃতির পরিচয় সাধন। অর্থাৎ ইতিহাসের প্রবাহের পরিচয় লওয়া; বুঝিয়া লওয়া ইতিহাসের ধারা কোন্ দিক হইতে বহিয়া আসিয়াছে, কোন্ দিকে বহিয়া চলিয়াছে;—আমাদের দেশেই বা তাহা কোন্ খাত হইতে কোন্ খাতে বহিয়া আসিতেছে। ইহা বুঝিলে আর সন্দেহ থাকে না—দেশ-বিদেশের ইতিহাসের কোন্ নূতন রূপ আজ প্রকাশিত হইতেছে—সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারাও চলিয়াছে আজ কোন্ দিকে।

সংস্কৃতির অর্থ কী?

সংস্কৃতির অর্থ কী, এই প্রশ্ন করিবার সঙ্গেই একটা কথা আমাদের মনে জাগা উচিত—মানুষেরই সংস্কৃতি আছে, অন্য জীবের সংস্কৃতি বলিয়া কিছু নাই। তাহার অর্থ—মানুষ হিসাবে মানুষের আসল পরিচয়ই তাহার সংস্কৃতি; এই 'কৃতির' বা কাজের বলেই মানুষ মানুষ হইয়াছে, প্রকৃতির নিয়মও বুঝিয়া উঠিতেছে, বাধা ছাড়াইয়া যাইতেছে।

প্রাণী মাত্রেরই জীবনের মূল প্রেরণা—বাঁচিয়া থাকা। মানুষ এই তাড়নায় চাহে আপনার পরিবেশের সঙ্গে বুঝা-পড়া করিয়া টিকিয়া থাকিতে। অর্থাৎ মানুষ চায়, বাঁচিবার উপায় যতটা পারে প্রকৃতির নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে। ইহারই নাম জীবিকা-চেষ্টা। মানুষের সভ্যতা বা সংস্কৃতির মূল প্রেরণা তাই প্রকৃতির অন্ধ দাসত্ব হইতে মুক্ত হওয়া, অর্থাৎ জীবিকা আয়ত্ত করা, তাহা সহজসাধ্য করা। দৈহিক মানসিক প্রয়াস-প্রযত্নে এই জীবিকা সে ক্রমেই আয়ত্ত করিয়াছে—এই প্রয়াস-প্রযত্নেরই নাম পরিশ্রম। এবং এই পরিশ্রমেরই ফলে তাই মানুষ অন্য জীব অপেক্ষা উন্নত হইয়াছে, স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে, শেষে সভ্যতার এক-একটি উপাদান সৃষ্টি করিয়াছে। সংস্কৃতির মূলের কথা তাই জীবিকা-প্রয়াস, শ্রমশক্তি; আর সংস্কৃতির মোট অর্থ বিশ্বপ্রকৃতির সহযোগে মানব-প্রকৃতির এই স্বরাজ-সাধনা।

জীব-জগৎ প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা। সে নিয়মকেই আপনার নিয়ম বলিয়া মানিয়া লইয়া তাহারা বাঁচে, তাহারা মরে। কিন্তু মানুষ জীবজগতের মধ্যেও একটু স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। বাঁচিবার উপায়—জীবিকার উপাদান—সে নিজেই পরিশ্রমের দ্বারা সৃষ্টি করিতে পারে, নিষ্ক্রিয় হইয়া প্রকৃতির একান্ত

মুখাপেক্ষী থাকে না। তাই, সে চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে কি করিয়া জীবন যাত্রা তাহার সুলভ হয়, প্রাণধারণ তাহার সহজ হয়। এই লইয়াই তাহার বিপুল প্রয়াস, অফুরন্ত পরিশ্রম আর প্রকৃতির শক্তি আয়ত্ত করিবার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে তাহার অশেষ সংগ্রাম। এই সংগ্রামে সে যতটুকু জয়ী হইয়াছে, জীবিকার তাড়না ও জীবনের তাগিদ যতটুকু মিটাইতে পারিয়াছে, তাহার সভ্যতায় সংস্কৃতিতে ততটুকুরই নিদর্শন মিলে। তাই, এই সভ্যতা বা সংস্কৃতিই তাহার সেই চির-সংগ্রামের জয়চিহ্ন; আবার ইহাই তাহার জয়-অস্ত্র।

প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের অর্থাৎ জীবন-সংগ্রামের এই বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের এই যুদ্ধাস্ত্রেরও আবার বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন পর্যায় দেখা গিয়াছে, জয়-চিহ্নও হইয়াছে বিচিত্রতর।

সংস্কৃতির প্রচলিত নাম ও রূপ

গোড়াতেই তাহা হইলে দেখিতেছি—এই ভাবে আমরা সংস্কৃতিকে সাধারণত বুঝিতে চাহি না। সংস্কৃতি বলিতে আমরা বুঝি কাব্য, গান, শিল্প, দর্শন, আচার-বিচার, বড জোর এখন বিজ্ঞানও। কখনো আমরা ভাবি সংস্কৃতি দেশগত, কখনো বা ভাবি তাহা কালগত। যেমন, কখনও আমরা বলি ভারতীয় সংস্কৃতি, গ্রীক সভ্যতা, চীনা সভ্যতা, পাশ্চাত্য সভ্যতা। কিংবা আরও খণ্ড করিয়া বলি বাঙ্গালার কাল্‌চার, 'পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি', 'ভাগীরথী-সভ্যতা' ইত্যাদি (এইসব ক্ষেত্রে 'সংস্কৃতি' ও 'সভ্যতা' শব্দ দুটি 'কালচার' অর্থে যদৃচ্ছা ব্যবহার করি)। অথবা ধর্ম ও জাতিগত সূত্র ধরিয়া বলি হিন্দু সংস্কৃতি, 'ব্রাহ্মণিক কালচার', মোস্‌লেম সভ্যতা, ইত্যাদি। আবার কখনো কালের হিসাব মনে রাখিয়া বলি প্রাচীন সভ্যতা, মধ্যযুগের সভ্যতা, আধুনিক সভ্যতা, ইত্যাদি। এই সব হিসাব অবশ্য একেবারে মিথ্যা নয়, সব সময়ে এইগুলি পরস্পর-বিরোধীও নয়—কিন্তু এইরূপ হিসাব খুব যুক্তিসংগতও নয়। যেমন, ভারতীয় সভ্যতা বলিলে তাহার মধ্যে হিন্দু সভ্যতাও আসে; আবার তাহাতে প্রাচীন সভ্যতাও যেমন বুঝাইতে পারে, মধ্যযুগের সভ্যতাও তেমনি বুঝাইতে পারে।

এই সব নামে বিভিন্ন সংস্কৃতির ঠিক পার্থক্য বা প্রকৃতি বুঝা সম্ভব হয় না; উহাতে সংস্কৃতির বিজ্ঞান-সম্মত পরিচয় পাওয়া যায় না। তথাপি এইরূপ

নাম-দানে সুবিধা অনেক—জনমন সহজেই তাহা গ্রহণ করিতে পারে, আর তাহাদের মনের যৌথ-অহমিকা বা 'গ্রুপ প্রাইড' বেশ তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু সেই সূত্রে সেই নাম-মাহাত্ম্য আমাদের মনে এমনি এক-একটা কমপ্লেক্স বা মোহের ঘূর্ণী সৃষ্টি করে যে, আমরা ভুলিয়া যাই সংস্কৃতির ব্যাপক অর্থ কী, তাহার মূল কোথায়, আর তাহার বৈশিষ্ট্যই বা কি দিয়া নির্ণীত হয়। তাই এক-এক জাতি বা জন-যূথ ধরিয়া লয়—এই মূল আছে তাহার রক্তে। সে রক্ত 'নর্ডিক' রক্ত হইতে পারে, 'ল্যাতিন' রক্ত হইতে পারে, 'আর্য' রক্তও হইতে পারে, এমন কি 'বাঙালী রক্ত'ও হইতে পারে। কেহ বা আবার বলে, তাহার সংস্কৃতির মূল আছে তাহার ধর্মে—ইস্‌লামে, হিন্দুত্বে অথবা খ্রীষ্টধর্মে কিংবা ভূতপূজায়। আর সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যও তেমনি প্রত্যেকে নিজের অভিরুচি মত নির্ণয় করিয়া ফেলে। কোনো সংস্কৃতির নাম দেয় 'আধ্যাত্মিক', কোনো সংস্কৃতিকে বলে 'জড়বাদী'। হইতে পারে গোষ্ঠীর ও ধর্মের গুণাগুণ খানিকটা আছে; আর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও হয়ত খানিকটা সত্যই প্রত্যেকের থাকে। কিন্তু সে বৈশিষ্ট্য প্রায়ই আপেক্ষিক, কাহারও 'একান্ত' নয়। আর, সে 'বৈশিষ্ট্য'ও আবার নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাতে পরিবর্তিত হয়। তাহা ছাড়া, সংস্কৃতির মূল বিচারে, রূপ-নির্ণয়ে বা বৈশিষ্ট্য-বিশ্লেষণে সেই সব নিতান্তই গৌণ। সেখানে মুখ্য কথা এই—জীবন-যাত্রার কোন্ সৌকর্য-সাধন সে সংস্কৃতি করিতেছে? প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তারের যে অফুরন্ত প্রয়াস মানুষের, তাহার কোন্ স্তরের আভাস সেই সংস্কৃতি দেয়?

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যাঁহারা তাই সংস্কৃতির বিচার করেন তাঁহারা দেখিতে পান সংস্কৃতির অর্থ এই—মানুষের জীবন-সংগ্রামের বা প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তারের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি; আর সংস্কৃতির মূল ভিত্তিও অত্যন্ত বাস্তব—জীবিকা-প্রয়াস সহজায়ত্ত করা। কথাটাও তাই পরিষ্কার—জীবিকার প্রয়াসে মানুষ যেমন অগ্রসর হয় সংস্কৃতিরও তেমনি পরিবর্ধন ঘটে, পরিবর্জনও হয়, অর্থাৎ তাহার পরিবর্তন চলে।

এই কথাটাই আরও একটু তলাইয়া বুঝা দরকার—মানুষ নিজেও পরিবর্তিত হইতেছে; আর মানুষ ও তাহার পরিবেশ দুইই পরিবর্তনের স্রোতে পরস্পরকে পরিবর্তিত করিয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য মনে রাখা ভালো 'মানুষ পরিবর্তিত হয়', এই কথাটি কি অর্থে সত্য। মানুষের নাক-মুখ চোখ মোটামুটি সব একই আছে (অবশ্য প্রত্যেকেরই আবার

এই সবদিকেও একটু না একটু বৈশিষ্ট্য আছে)। মানুষের আবেগ-কামনা, ক্ষুধা, জরা-মরণ,—তাহাও তো ঠিকই আছে। তবে মানুষ পরিবর্তিত হয় কি অর্থে? সে অর্থ এই যে, মানুষ যেই পরিমাণে পশুপক্ষীর মতো মাত্র জীব সেই পরিমাণে সে প্রকৃতির বাধ্য, প্রাণ-বিজ্ঞানের বা বায়োলজির নিয়মের অধীন; সেই পরিমাণেই তাহার পরিবর্তনও হয় না। সে আহার চায়, সন্তান চায়, মৃত্যুতেও ভয় পায়, সঙ্গম খোঁজে। কিন্তু মানুষ তো শুধু মাত্র জীব নয়, সে আপনার জীবিকা আয়ত্ত করিয়াছে, আর্থিক জীবন গড়িয়াছে। প্রকৃতির রাজ্যে সে নানারূপে অধিকার স্থাপন করিতেছে। সে অন্য জীবের মত আহার করে, কিন্তু কত রকমে সে আহারও প্রস্তুত করে। সে সন্তান চায়, আবার কতকটা সেই ইচ্ছাকে নিয়মিতও করিতে পারে। সে মৃত্যুতে ভয় পায়, কিন্তু আবার অনেকাংশে ভয়কেও দূর করিতে পারে। ভূতপ্রেতের ভয়, পশু-শ্বাপদের ভয় কাটাইয়াও মানুষ উঠিতেছে। সে পুত্র পরিবারের জন্য, দেশ ও সমাজের জন্য, এমন কি, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাধনায়ও মৃত্যু বরণও করে। সে যৌন-কামনার অধীন, জরামরণের অধীন; কিন্তু তাহাও আবার কত ভাবে ছাড়াইয়া উঠে, বিচিত্র করিয়া তোলে। এই সব কারণেই তাহার পরিবর্তনের অসম্ভব সম্ভাবনা ও অবকাশ। জীবিকার প্রয়োজনে মানুষের জৈবধর্ম বিলুপ্ত হয় না, কিন্তু উহার প্রকাশভঙ্গী ও শক্তির মাত্রা পরিবর্তিত হয়,—যাহাতে তাহা জীবনযাত্রার বেশি সহায়ক হইয়া উঠে তাহা চায়। এইরূপেই জৈবধর্ম প্রথমতঃ মনুষ্যপ্রবৃত্তিতে পরিণত হয়। তাই সেই জীবিকার প্রয়োজনেই যেমন মানুষের আর্থিক জীবন পরিবর্তিত হয়, তেমনি তাহার প্রবৃত্তিও আবার বিকশিত হয়, বিচিত্র হয়; নূতন ভঙ্গীতে, নূতন শক্তিতে সংযমে-নিয়মে প্রকাশিত হয়। এই অর্থেই মনুষ্য-প্রকৃতিও পরিবর্তনশীল। মানুষ শুধু মাত্র জৈবপ্রেরণার বশে চলিলে এই প্রকৃতি পরিবর্তিত হইত না। মানুষের আর্থিক জীবন না থাকিলে, সাংস্কৃতিক জীবন না থাকিলে, তবেই থাকিত শুধু তাহার পশু-জীবন—যাহার পরিবর্তন নাই, যাহা নিজের পরিবেশকে বদলাইতে পারে না, নিজেও পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু মানুষের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠনের শক্তি আছে বলিয়াই সে মানুষ, আর ঠিক সেই কারণেই মানুষের প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে।

এই পরিবর্তন অবশ্য জানায়-অজানায় নিত্যই ঘটিতেছে। সাধারণত তাহা মানুষের চোখেও পড়ে না। কারণ জীবনযাত্রার এক স্তর হইতে অন্য

এক স্তরে মানুষ নিত্য উত্তীর্ণ হয় না। সেইরূপ বিরাট ভাঙা-গড়া, বিপুল বিপ্লব ঘটে এক-এক যুগের শেষে এক-একবার। সেই যুগান্তরে সমাজের দেহান্তর হয়, আর সংস্কৃতিরও হয় রূপান্তর। তাহাতে মানব-প্রকৃতিও আপনার বিকাশের পথে আর এক পদ অগ্রসর হইয়া যায়, আর বিশ্ব-প্রকৃতি মানুষের বিজয় স্বীকার করিয়া আরও একটু নতি স্বীকার করে।

এইভাবে মানুষ অগ্রসর হইয়াছে অনেকখানি। সেই প্রস্তরযুগের মানুষ আজ আর নাই। শিল্পযুগের মানুষ এখন সংঘবদ্ধ শক্তিতে সচেতন ও স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে চাহিতেছে। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না, এখনো তবু প্রকৃতির একাংশও মানুষ জয় করিতে পারে নাই। আর একটি কথা—প্রকৃতির সহিত মানুষের এই সংঘাত একেবারেই যেমন জন্মগত, তেমনি মনে রাখা দরকার মানুষও প্রকৃতির এক অংশ মাত্র। বিশ্ব-প্রকৃতিরই এক বিশিষ্ট শক্তি মানবপ্রকৃতি। প্রকৃতিরই সেই বিশেষ একটি প্রকাশ হিসাবে সে দাঁড়ায় আবার প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্বে। আর সেই দ্বন্দ্ব প্রথম চালায় বাহু-পদের সাহায্যে, বিশেষত হস্ত ও মস্তিষ্কের দ্বারা, দেহের স্বাভাবিক বলে—প্রকৃতিজাতকে আপনার প্রয়োজনানুরূপে পরিবর্তিত করিয়া লইতে। অন্য জীবের এই সব দৈহিক সুবিধা নাই, তাই তাহারা প্রকৃতির নিগড়ে বাঁধা। আবার বহিঃপ্রকৃতির সহিত এমনি প্রয়াসে এমনি ভাবে তাহাকে পরিবর্তিত করিতে পারে বলিয়াই মানবপ্রকৃতিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়া যায়: "He (man) opposes himself to nature as one of her own forces, setting in motion the arms and legs, head and hands, the natural forces of his body, in order to appropriate nature's productions in a form adapted to his own wants. By thus acting on the external world and changing it, he at the same time changes his nature." (*Capital*—Marx, Vol. I. Pt. III, Ch. vii, Sec I.)

রূপান্তরের মূলতত্ত্ব

সমস্ত পরিবর্তনের মূলতত্ত্বটি এইবার জানিয়া লওয়া প্রয়োজন। কারণ, সমাজ পরিবর্তিত হয় ও সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়, ইহা না হয় মানিলাম। কিন্তু কেন, কী নিয়মে এই পরিবর্তন ঘটে তাহা না জানিলে,—কোন্ কোন্ দিকে

মানব-সমাজের পরিবর্তন চলিয়াছে, আর তাই সংস্কৃতির আগামী রূপান্তরে কোন্ বিশেষ চেষ্টা সার্থক হইবে এবং কোন্ চেষ্টা নিষ্ফল হইবে,—তাহা বুঝিতে পারিব না। এই সত্য না বুঝিলে, বুঝিব না কেন সোভিয়েত প্রয়াস সার্থক হয়, কেন ফ্যাশিস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইতে বাধ্য; কেনই বা এই সোভিয়েত-প্রয়াসের আবির্ভাব, আর কেনই বা তাহার সঙ্গে পুরাতন অন্য তন্ত্রের, বিশেষ করিয়া প্রতিক্রিয়া-নেতা ফ্যাশিতন্ত্রের বিরোধ অনিবার্য; কেনই বা ফ্যাশিতন্ত্র পরাজিত হইলেও মার্কিন-বৃটিশ প্রতিক্রিয়া-শক্তি এখন মূলত সেই শোষণ-নীতিকেই আশ্রয় করিতেছে; এবং কেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এশিয়া, আফ্রিকার জাতিসমূহ রাষ্ট্রীয় শোষণের অবসান ঘটাইয়া এখন আর্থিক স্বাধীনতার বনিয়াদ গড়িতে চাহিতেছে; কেন সাম্রাজ্যবাদও বাধ্য হইয়া কোথাও তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় বিভাগ বা দেশ-বিভাগ সৃষ্টি করিয়া, কোথাও আর্থিক 'সাহায্যের' বেড়াজাল ফেলিয়া আপনাদের শোষণধর্মী ব্যবস্থাকে বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছে; এবং নূতন করিয়া আবার পৃথিবীর জাগ্রত জনশক্তির বিরুদ্ধে আণবিক যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিয়া গিয়াছে। এইসব কথা পরিষ্কার হইয়া যায় সভ্যতার রূপান্তরের মূলতত্ত্ব বুঝিয়া লইলে। অবশ্য এই মূলতত্ত্ব লইয়া বিচার-বিতর্কের অন্ত নাই, কিন্তু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিচারের পরীক্ষায় এই তত্ত্ব টিকিয়া গিয়াছে। এখানে শুধু তত্ত্বটি জানিয়া সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারা, অর্থাৎ সাধারণভাবে মানুষের ইতিহাসের ধারা, এই আলোকে আপাতত একবার দেখিয়া লইলেই যথেষ্ট হইবে—বুঝিতে পারিব সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারা কোন্ দিকে চলিয়াছে।

বস্তবাদের সাক্ষ্য

মানুষের সামাজিক জীবন ও মানুষের অন্তর্জগৎ এই সমস্তই যে নিয়ম মানিয়া চলে তাহা "আধ্যাত্মিক" নয়, নিতান্তই "বাস্তব"। অবশ্য এই বস্তবাদের মতে 'মন' যে নাই তাহা নহে; মনও আছে, তবে তাহা বস্তরই এক বিকাশ। বস্তই মূল জিনিস আর পৃথিবী এবং মানুষ সবই বাস্তব। কিন্তু বুঝিবার মতো কথা এই—কিছুই জড় নয়। বস্তও জড় নয়, প্রকৃতিও জড়-প্রকৃতি নয়—তাহাও চঞ্চল, পরিবর্তনমান, নূতন নূতন আবির্ভাবের উৎস।

বিশ্বপ্রকৃতির অন্তঃস্থলে যে একটি আলোড়ন অনির্বাণ জ্বলিতেছে, তাহারই ফলে সেই নূতন নূতন সৃষ্টির আবির্ভাব—ইহাই বিজ্ঞানেরও সাক্ষ্য। বস্তুপুঞ্জের পঞ্জরে পঞ্জরে এক ঘূর্ণীর হাওয়া লাগিয়াই আছে—বৈজ্ঞানিক এই সন্ধান দিয়াছেন। উহার নিত্য নূতন তথ্য তাঁহারা আবিষ্কারও করিতেছেন। বিশ্বের মূল উপাদান খুঁজিয়া তাঁহারা একদিন পাইয়াছিলেন—ইলেক্‌ট্রন্ ও প্রোটোন; এখন আরও সন্ধান পাইয়াছেন নিউট্রন, পজিট্রন, মিসোট্রন (মসন), এবং সম্ভবত নিউট্রিনের। সূক্ষ্মতর আরও আবিষ্কারও হয়তো হইবে। তবে এই সব উপাদানের সংঘর্ষে জন্ম হয় নব নব বস্তুর। অবশ্য সেই নূতন আবির্ভাবের বুকের মধ্যেও গুপ্ত থাকে সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব। তাহাই আবার ক্রমে ফুটিয়া বাহির হয়, আবার বাধে সংঘর্ষ, আর তাহার সমাধান হয় নূতনতর আবির্ভাবে। এমনি করিয়া দ্বন্দ্বে-সমন্বয়ে চঞ্চল বস্তু আপনার অন্তর্দ্বন্দ্বের তাগিদে অভিনব হইয়া উঠিতেছে। যেমন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন কণিকার দ্বন্দ্বে হঠাৎ দেখা দেয় জল। জলকে শুধু হাইড্রোজেনও বলা যায় না, অক্সিজেনও বলা যায় না; দুই-ই উহাতে আছে, কিন্তু উহা জল হিসাবে একটা নূতন বস্তু। আবার জলও ফুটিতে ফুটিতে এক সময়ে বাষ্প হইয়া হঠাৎ উড়িয়া যায়। জল ও তাপ মাত্র নয়, বাষ্পও আবার একটা নূতন বস্তু। বস্তু-চাঞ্চল্যের মূলে আছে এই দ্বন্দ্ব, আর আভ্যন্তরীণ সেই দ্বন্দ্বের বশে বস্তু এমনি করিয়া বাড়িয়া চলে। কণিকার পরিমাণ বাড়িতে বাড়িতে (quantitative change) শেষে পুরানো বস্তুই একেবারে নূতন ধরণের, নূতন গুণযুক্ত (qualitative change) বস্তু হইয়া উঠে; আর সেই নূতন বস্তুর মধ্যে তখনকার মতো মিলাইয়া যায় পুরানো বিরোধ। কিন্তু দ্বন্দ্বই যখন মূল ধর্ম তখন এই নিয়মই অনুসরণ করিয়া নূতন বস্তুও নূতনতর হইবে। হইতেছেও তাহাই। তবে, পুরাতন হইতে নূতন, বা নূতন হইতে নূতনতর ধাপে সে সমুত্তীর্ণ হয় আকস্মিক রূপে—একটু বড় রকমের বাধা ডিঙাইয়া—এক উৎক্রান্তিতে ('jump')। মানুষের সমাজে এই উৎক্রান্তিরই নাম—বিপ্লব। ইহারই বশে হয় বিরোধের সাময়িক বিনাশ, নূতনের আবির্ভাব, —আবার নূতনের বুক ফাটিয়া নূতনতরের জন্ম। ইহাই 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ', ডায়েলেক্‌টিকাল মেটিরিয়ালিজম্। শুধু বিশ্ব-প্রকৃতিতে নয়, মানুষের ইতিহাসেও এই বাস্তব সত্যের প্রমাণ মিলে; এ জন্যই ইহাকে আবার বলা হয় 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ', হিস্টোরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্।

বস্তুর বুক চিরিয়া এমনি এক পরম মহৎ বিপ্লব ঘটে যখন পৃথিবীতে প্রাণবীজ বস্তুকেন্দ্রে জন্মাইল—যাহাকে প্রাণবিজ্ঞান নাম দিয়াছে প্রোটোপ্লাজম্। বস্তু হইতে প্রাণ, দূরত্বটা ভাবিলে আজ সংশয় জন্মে বটে; কিন্তু প্রোটোপ্লাজম্ বস্তুর বড় নিকটবর্তী। একবার প্রাণের আবির্ভাব হইলে পর দ্বন্দ্বমূলক বস্তু-প্রগতির যে ইতিহাস শুরু হইল, ডারউইনের শিষ্যবর্গের কল্যাণে তাহা এখন সুবিদিত, এবং আজ অবিসংবাদিত। প্রাণের আবির্ভাবে প্রাণীর 'জীবন-সংগ্রাম' চলিল। তথনো কিন্তু প্রাণী অচেতন। সেই অচেতন প্রাণীর জগতে শেষে হঠাৎ চেতন প্রাণীর আবির্ভাব হইল—যে চেতন প্রাণীর চরম নিদর্শন মানুষ। কিন্তু চেতনাহীন প্রাণী হইতে এই যে সচেতন প্রাণীতে উৎক্রান্তি—প্রাণীজগতে উহা আর এক সুবৃহৎ বিপ্লব। এখানেও হয়ত আবার আমাদের মনে সংশয় হানা দেয়। কিন্তু চেতন প্রাণী হইতে ক্ষীণ-চেতন, প্রায়-অচেতন ও অচেতন প্রাণীদের ক্রম-পর্যায় বাহিয়া নামিলে কথাটা অসম্ভব মনে হয় না। বস্তু-বিকাশের শেষ দান কিন্তু মানুষের এই ক্রম-পরিস্ফুট চৈতন্য—যাহার বলে সে বস্তুর উপর নির্ভরশীল হইয়াও বস্তুকে আপনার দাস করিয়া লইতে শিখিতেছে; প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা হইয়াও প্রকৃতিকে বন্দিনী করিতে শুরু করিয়াছে। কিন্তু তবু তাহার বুকে সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব, বিরোধের নব-নব সূত্র তাহারও সমস্ত সৃষ্টির মধ্য দিয়া অনুস্যূত হইয়া আছে। তাহা আছে বলিয়াই তাহার সভ্যতা-সংস্কৃতি সংঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়, নূতন হয়, উচ্চতর স্তরে উঠিয়া যায়। আর এই উচ্চতর স্তরে উঠিবার পথই হইল সংকট (crisis) এবং বিপ্লবের (revolution) পথ,—ইহাই তাহার ইতিহাসের সাক্ষ্য। 'অমিত্রয়ের' বেনামীতে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা এমনি ধরণের কথা আমাদের জানাইয়াছেন তাঁহার অনবদ্য ভাষায়—যদিও রবীন্দ্রনাথ দ্বন্দ্বমূলক বা বিপ্লবী বস্তুবাদে নিশ্চয়ই বিশ্বাসী নন: "মানুষের ইতিহাসটাই এই রকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা-গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায়, দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায়, ঝাঁপতালের লয়ে।"

ইতিহাসের সাক্ষ্য

বিশ্বনিয়মের পূর্বোক্ত মূলসূত্রটি যাঁহারা না মানিতে চান তাঁহারাও এইরূপে স্বীকার করেন ইতিহাসের পাতায় পাতায় এইরূপ বিপুল উৎক্রান্তির

সাক্ষাৎ মিলে। মানুষের ইতিহাসের তলায় কোন্ শক্তি জমিয়া উঠিয়া তাহাকে এমনি করিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া দেয়, বস্তুপ্রগতির সূত্র না জানিয়াও তাহার আভাস পাওয়া যায়। শুধুমাত্র ইতিহাসের ক্রমাভিব্যক্তির ধারা অনুসরণ করিলেও যে তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় তাহাই যথেষ্ট। দেখিয়াছি, মানুষের ইতিহাস মূলত শুরু হয় তাহার জীবিকা-প্রয়াস হইতে; কিন্তু কিছু পরেই তাহার ইতিহাস হইয়া উঠে তাহার আত্মবিরোধের ইতিহাস। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের সেই মূলত প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য শ্রেণী-বিরোধের কাহিনী, দ্বন্দ্ব-মূলক প্রগতির কাহিনী।

প্রাণিবিজ্ঞানের যাঁহারা ছাত্র তাঁহারা জানেন, সাধারণ জীবেরা প্রাণধারণের জন্য নিজ নিজ পরিবেশের উপর নির্ভর করে, পরিবেশ-বিজ্ঞানই (ecology) জীবজগতের বড় শাস্ত্র। কিন্তু মানুষের বেলা এই পরিবেশ বিজ্ঞান মানুষের নিজের গুণে রূপান্তরিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে অর্থবিজ্ঞানে। ecologyর স্থান লইয়াছে economics। ইহার সূচনা হইয়াছে সেদিন যেদিন মানুষের আদিপুরুষ উন্নত দেহ লাভ করিল, খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে শিখিল, সঙ্গে সঙ্গে লাভ করিল দুইখানি কর্মক্ষম হাত; উন্নত মস্তিষ্ক, উন্নত দৃষ্টিশক্তি। মননশীল মানুষের (হোমো সেপিয়ান্) পক্ষে দুই হাত ও মস্তিষ্কের সদ্ব্যবহার তখন সম্ভব হইল। তার দৈহিক গঠনের বলে নিজের জীবন সংস্থানের অবলম্বন (means) সে নিজে উৎপন্ন করিতেই অপরোক্ষভাবে মানুষের জীবন-যাত্রার বস্তু-উপকরণও (material) উৎপন্ন হইল। "They begin to differentiate themselves from animals as they begin to produce their means of subsistence, a step which is conditioned by their physical organisation. By producing their means of existence men indirectly produce their material life itself". (*German Ideology*—Marx-Engels)।

সংস্কৃতির গোড়াকার কথা তাই জীবিকা, অর্থাৎ আর্থিক উদ্যোগ। সেই জীবিকার তাড়নায় মানুষ তাহা আয়ত্ত করিবার উন্নততর উপায় সর্বদাই খোঁজে, সমাজ তাহার আর্থিক বুনিয়াদ বারে বারে বদলায়। কারণ প্রত্যেক ব্যবস্থার মধ্যেইতো লুকায়িত আছে বিরোধের বীজ। এক-একটা ব্যবস্থা চলিতে চলিতে ক্রমে ক্রমে তাই সমাজের মধ্যে উৎপাদন-শক্তির (forces of production) তেজ এত বাড়িয়া যায়, তাহা এত প্রবল হয় যে, তখন পুরানো সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থাৎ পরস্পরের উৎপাদন সম্পর্ক (production relations)

আর সেই উৎপাদন-শক্তিকে সেই সমাজ-কাঠামোর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে না। যেই দ্বন্দ্ব বিশ্ববস্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত রূপে দেখিয়াছি, তাহাই এই ক্ষেত্রে উৎপাদন-শক্তির ও উপাদান-সম্পর্কের দ্বন্দ্বরূপে দেখা দেয়। কিছুতেই কিন্তু পুরানো ব্যবস্থা আপনার বিনাশ বা বিলোপ চায় না, নূতনকে সে দাবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। কর্তাব্যক্তিরা অর্থাৎ প্রভুশ্রেণী তাহাদের অধিকার ছাড়ে না, নূতন শক্তিধর শ্রেণী বিপ্লবের দ্বারা তাহা কাড়িয়া লয়, প্রভুর শ্রেণীতে উঠিয়া গিয়া নিজেদের উৎপাদন-প্রথা প্রচলিত করে। এইরূপে বারবার নূতন শ্রেণী জয়ী হয়, পুরাতন প্রাচীর ফাটিয়া চৌচির হইয়া যায়। অবশ্য, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরানো শ্রেণীর অনেক সৃষ্টিও চুরমার হয়—তাহার ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-চিন্তা, সাহিত্য, সুকুমার-কলা, রস-নিদর্শন, যাহা কিছু সৌধশিখরের মুকুট-শোভা, সমাজ-সভ্যতার পরম গরিমা! উপায় নাই, যাহার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে তাহার আয়ু ফুরাইয়াছে। সান্ত্বনা এই যে, নূতন ভিত্তি গড়া হইতেছে; আর তাহা গড়া হইতেছে উন্নততর ভূমির উপর। আরও সান্ত্বনার কথা—পুরানো সংস্কৃতি তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাহার বাস্তব ও মানসিক সৃষ্টির সারবস্তু ও সৃষ্টিকলা নূতন স্রষ্টার প্রয়োজনানুরূপ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে—তাহা বিলুপ্ত হইবে না, প্রয়োজনমত মিশিয়া নবায়িত হইয়া উঠিবে, নতুন সৃষ্টিতে, নতুন রূপে সঞ্জীবিত হইবে। সমাজ এক ধাপ উঁচুতে উঠিয়া আবার কিছু দিনের মতো স্থির হইবে, গড়িয়া উঠিবে নূতন আর্থিক ব্যবস্থায় তদুপযোগী মানস-সম্পদ; হইবে পুরানো সংস্কৃতির রূপান্তর।

ইতিহাসের মুখ্যরূপ

মোটামুটি মানুষের ইতিহাস এই উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া ক্রমোন্নতির ইতিহাস, আর তাই ইহার অনেকটাই শ্রেণী-বৈষম্য ও শ্রেণী-সংঘর্ষের ইতিহাস। পুরাতত্ত্বের, নৃতত্ত্বের ও সমাজতত্ত্বের গবেষকদের হাতে ইহার প্রমাণ প্রচুর রহিয়াছে। আমরা অবশ্য সাধারণ-ভাবে শুনি—নানা কারণেই মানুষের ইতিহাস নূতন নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। যেমন, হয়ত কোন রাজার খেয়ালে, কোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণে, কোনো ধর্মপ্রচারকের ধর্মপ্রচারে। তদনুযায়ী রাজা-রাজড়ার রাজ্যারোহণ বা রাজ্যচ্যুতি দিয়া আমরা ইতিহাসের কাল নির্দেশ করিয়া

থাকি ; কিংবা কোনো রাজবংশের রাজ্যপ্রাপ্তি বা কোনো বিশেষ শক্তির রাজ্যাধিকার দিয়া ইতিহাসের যুগবিভাগ করি। বলি, আকবরের আমল কিংবা হিন্দু-রাজত্ব বা মুঘল-যুগ। এসব একেবারে মিথ্যা নয়, তাহা জানি,—তথাপি আবার মনে রাখা দরকার, এ সব গৌণ। এসবেও ইতিহাস প্রভাবিত হয়, কিন্তু ইতিহাসে মুখ্য প্রভাব আর্থিক অবস্থার, আর তাহারই জন্য ইতিহাসের মুখ্যরূপ শ্রেণী-সংগ্রাম।

বিশ্বচরাচরের এই বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্বটি বুঝিয়া লইলে সংস্কৃতির মূল উপাদান ও উহার রূপান্তরের নিয়ম সম্বন্ধে আর সংশয় থাকে না। গোড়াতেই দেখিয়াছি—মানুষেরই সংস্কৃতি আছে, কারণ মানুষ জীবিকার পথ আবিষ্কার করিতে পারে। অর্থাৎ, মানুষের একটা আর্থিক জীবন আছে, তাই মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনও সম্ভব হইয়াছে। সংস্কৃতির বনিয়াদ তাহার আর্থিক অবস্থায়। কিন্তু কেহ যেন মনে না করি—আর্থিক অবস্থাই সংস্কৃতির একমাত্র ব্যাখ্যা। মূলতঃ তাহা প্রধান বস্তু, কিন্তু একমাত্র বস্তু নয়। বাস্তব ও আধ্যাত্মিক আরও অনেক শক্তি থাকে।

সংস্কৃতির তিন অঙ্গ

সংস্কৃতি বলিতে তাই শুধু যে ঘরবাড়ি, ধন-দৌলত, যানবাহন বুঝায় তাহাও নয়। শুধু যে রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান বুঝায় তাহাও নয়। সংস্কৃতি বলিতে মানস-সম্পদও বুঝায়—চিন্তা, কল্পনা, দর্শন, ধ্যান-ধারণা, এই সবও বুঝায়,—তাহাও আমরা জানি। আসলে বাস্তব ও মানসিক সমস্ত 'কৃতি' বা সৃষ্টি লইয়াই সংস্কৃতি—মানুষের জীবন-সংগ্রামের মোট প্রচেষ্টার এই নাম।

এই জন্যই বৈজ্ঞানিক মতে, সংস্কৃতির মোট তিন অবয়ব বা তিন প্রকারের অবলম্বন আছে, দেখিতে পাই।

প্রথমত, উহার মূল ভিত্তি সেই জীবন-সংগ্রামের বাস্তব উপকরণসমূহ (material means); দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতির প্রধান আশ্রয় সমাজযাত্রার বাস্তব ব্যবস্থা (social structure); আর তৃতীয়ত, সংস্কৃতির শেষ পরিচয় মানস-সম্পদ। সেই মানস-সম্পদ এই হিসাবে সমাজ-সৌধের 'শিখরচূড়া' মাত্র (superstructure), সহজ কথায় উপরতলার উপকরণ। তাহা হইলে

সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কাল্‌চার জাতিগত, দেশগত বা ধর্মগত, তাহাও যেমন একটি অর্ধসত্য, তেমনি সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কাল্‌চার অর্থ কাব্য, গান, চারুকলা, বড় জোর দর্শন বা বিজ্ঞান পর্যন্ত, তাহাও তেমনি আর একটি অর্ধ-সত্য। কথা এই যে, সংস্কৃতি সমাজ-দেহের শুধু লাবণ্য-ছটা নয়, তাহার সমগ্র রূপ। তাই সমাজের পরিচয় দিয়াই সংস্কৃতির পরিচয়—এইটিই আসল কথা।

সমাজের রূপ ও উপাদানের দান

সমাজের পরিচয়ও অবশ্য আমরা আবার জাতি বা ধর্ম দিয়া নির্দেশ করি। কিন্তু একটু পিছনে দৃষ্টিপাত করিলেই যখন এই সব জাতির ও ধর্মের ঠিকানা দুর্লভ হয়, তখন সমাজকে আমরা চিহ্নিত করি বৈজ্ঞানিক উপায়ে—তখনকার দিনের জীবিকার উপাদান (means of living) দিয়াই তখনকার সমাজের পরিচয়। যেমন, আমরা বলি প্রস্তর যুগের মানুষ—প্রস্তরের ছুরিকা, বল্লম এবং কুঠার ও তীর ছিল ইহাদের জীবিকার অস্ত্র। স্বর্ণ ও তাম্রযুগের মানুষ—প্রস্তর ছাড়াও এই সব ধাতুর ব্যবহার তখন ইহারা শিখিয়াছে। শেষে বলি লৌহযুগের মানুষ—লৌহের উপকরণও ইহারা ব্যবহার করিতে পারিতেছে। এই সব মানুষের ধর্ম বা জাতি কি ছিল জানি না; কিন্তু বুঝি ইহারা কী উপকরণ দিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। আর সেই সব উপকরণের নামেই তাহাদের তখন নাম দিই, ঐ উপাদান হইতেই তাহাদের সমাজের রূপ চিনি।

অগ্রগতির বলে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতেছে। বৈজ্ঞানিকের গণনায় তাই তাহাদেরও 'সভ্যতার' নাম আছে; উপাদান দিয়াই সেই নাম স্থিরীকৃত হয়। কারণ ইহাদের সভ্যতার সাক্ষ্য, ইহাদের বিচারের উপাদান—ইহাদের ব্যবহৃত দ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র, আহার্য ও পানীয়-পাত্র, ইহাদের শব-সৎকারের ব্যবস্থা প্রভৃতি। এইসব বস্তুরই আমরা সন্ধান পাই, এখানো অন্য উপায়ে ইহাদের কথা জানিবার পথ নাই। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই সব উপাদানের বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রামাণিক রূপও (টাইপ্) চিনিতে পারেন। কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলে একই কালে এইরূপ যত বিশেষ ধরণের (টাইপের) উপকরণ মিলে তাহার একযোগে তাঁহারা নাম দেন সেই 'কালচার' বলিয়া। যেমন, সোয়ান নদীর উপত্যকার 'সোয়ান্ কালচার'—পাথরের একটা বিশেষ ধরণের কৃতি তাহাতে দেখা যায়।

এই সব বাস্তব উপকরণ হইতে আবার ইহাদের সামাজিক বা মানসিক গঠনেরও একটা আভাস আমরা লাভ করিতে পারি। আহার, শিকার প্রভৃতি একই উদ্দেশ্য সাধনে নানা উপকরণ ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্তু উপকরণের নির্মাণে ও ব্যবহারের রীতিতে একটি বিশিষ্ট সামাজিক ঐতিহ্যও হয়ত এক-একটি অঞ্চলে গড়িয়া উঠে। তাহার অনুসরণ করিয়াই সেই বিশিষ্ট 'টাইপের' ছবি, কুঠার, বাসগৃহ, সমাধিস্থল প্রভৃতি নির্মাণ চলে। সেই সামাজিক ঐতিহ্যের আভাসও তাই উপকরণে নিহিত থাকে। আল্‌তিমারা ও দর্দঞর গুহা-চিত্র এই কারণেই এত গবেষণার বস্তু। কারণ, মানুষ ও তাহার জীবিকার উপকরণ, এই দুই যেমন মানুষের সমস্ত ইতিহাসের গোড়ার বস্তু, তেমনি সে উপকরণের প্রয়োগ-সৌকর্যের জন্য মানুষ যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে—জীবিকার দায়ে মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ স্থাপন করে, যে যৌথ-বিন্যাস গঠন করিয়া চলে,—তাহারই নাম সমাজ। জীবিকার উপকরণ আর জীবন-যাত্রার পরস্পরের সম্পর্ক, উহা দিয়াই সমাজের মুখ্য পরিচয়; ধর্ম, জাতি এই সব দিয়া সমাজের নামকরণ এই জন্যই অবৈজ্ঞানিক এবং বিভ্রান্তিকর।

দ্বিতীয় অবয়ব ঃ সামাজিক রূপ

কিন্তু প্রশ্ন হইবে উপকরণ হইতে না হয় উৎপাদন-প্রথা অনুমান করা গেল, আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক রূপও অনুমান করা গেল, কিন্তু উহা

হইতে সেই সমাজের মানুষের মনের হিসাব পাওয়া যাইবে কি করিয়া? ইহার উত্তর এই যে, মানুষের মানসিক সৃষ্টি যেখানে পাই না, সেখানেও মানুষের মানসিক গঠনের কিছু পরিচয় তাহার জীবনযাত্রার উপকরণ হইতে সংগ্রহ করিতে পারি। যেমন, যে মানুষ পাথরের অস্ত্র দিয়া শিকার করিয়া খাইত, বুঝিতে পারি তাহারা দল বাঁধিয়া দুর্বল বা বৃদ্ধ পশুকে তাড়া করিত, তাহারা সকলে মিলিয়া দল বাঁধিয়া খাইত, শিকারের খোঁজে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহাদের মনে ক্ষুধা, পশু, শিকার, দল—এই সবই ছিল প্রধান কথা। কিন্তু যে মানুষ কৃষিকর্ম আবিষ্কার করিয়াছে তাহার মনে নদী, মেঘ, ঋতু, জমির মালিকানা এ সবই হইবে বড় চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষার বড় বিষয়। মানুষের মানসিক গঠনের অবশ্য আরও বেশি পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি তাহার সামাজিক ব্যবস্থা হইতে—তাহার পরস্পরের সম্বন্ধ, রীতিনীতি, আচার-বিচার, উৎসব-অনুষ্ঠান জানিলে।

যে মানস-সম্পদকে আমরা বিশেষভাবে সংস্কৃতি বলিয়া থাকি,—যেমন, দর্শন, কাব্য, চিন্তা, বিজ্ঞান প্রভৃতি—যেই যুগে মানুষের সেই সব রূপের খোঁজ পাই না সেখানেও তাহার সংস্কৃতির স্বরূপ অনুমান করিতে পারি—প্রথমত, সে যুগের জীবন-যাত্রার উপকরণ হইতে, দ্বিতীয়ত তাহার সামাজিক রূপ হইতে। কোন যুগে জীবন-যাত্রা তাই কী-কী প্রধান উপকরণ দিয়া নির্বাহ হইত, তাহা জানিলে আমরা বুঝিতে পারি সে যুগের সংস্কৃতি কোন্ স্তরে পৌঁছিয়াছিল। জীবন-যাত্রার উপকরণ দিয়া এই পথে প্রধানত সংস্কৃতির বাস্তব রূপ অনুমান করিতে পারি, কতকটা মানসিক ভাবনা-ধারণারও পরিচয় পাই। যেমন, পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে নব্য প্রস্তর যুগের (নিয়েন্ডারথাল) মানুষও মৃতসন্তান ও আত্মীয়বর্গের সমাধি মধ্যে খাদ্য পানীয় রক্ষা করিত। তাহাতে বুঝিতে পারি—'মানুষ মরে না', 'অমর' এরূপ একটা ধারণা সেই পঞ্চাশ হাজার বছরের আগেকার মানুষের মনেও জন্মিয়াছে। শুধু তাহা নয়, লাখ খানেক বৎসর পূর্বেকার মানুষ তাহার পাথরের অস্ত্রশস্ত্রকে এমন করিয়া সযত্নে পালিশ করিত যে তাহা দেখিয়া বুঝা যায়, শুধু শিকারের দায়ে নয়, নিজের মনেও জিনিসটি সুন্দর করিবার প্রয়োজন সে বোধ করিত। তারপর দেহসজ্জা, প্রসাধন:প্রভৃতির প্রমাণ উপকরণ দেখিয়া 'অসভ্য' মানুষের এই মানসিক ভাবনা-ধারণার রুচি-রীতির অনেক হদিসই পাওয়া যায়। কিন্তু উপাদান অপেক্ষাও মানুষের মানসিক গঠনের স্থিরতর পরিচয় পাই সামাজিক রূপে। যে যুগে আসিয়া সংস্কৃতির

এইরূপ ঐতিহাসিক উপাদান মিলে, অর্থাৎ যে যুগে সমাজ-ব্যবস্থা জানা যায়, সেখানে আর বৈজ্ঞানিকের পক্ষে শুধু মাত্র জীবিকার উপকরণ দিয়া সভ্যতার নামকরণ করা প্রয়োজন হয় না। সেখানে সমাজের সেই বিশেষ রূপ দিয়াই সেই সংস্কৃতিরও নামকরণ করা আরম্ভ হয়। যেমন, পশুচারিক (pastoral) সভ্যতা, কৃষিমূলক (agricultural) সভ্যতা। অবশ্য, এই সব সভ্যতার বা সংস্কৃতিরও আরও স্তর-বিভাগ করিতে হয়। কারণ, প্রত্যেক সভ্যতার মধ্যেই আবার নূতন নূতন স্তর ক্রমশ দেখা দেয়। জীবিকা-প্রণালীর বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীর দ্বারা সেই সব স্তর বিভক্ত। সেই স্তর-ভেদের মূলেও আছে জীবিকার্জনের নূতন প্রয়োজনের চিরন্তন তাগিদ।

"The special manner by which this union (between worker and means of production) is accomplished, distinguishes the different economic epochs from one another," (*Capital*— Marx, Vol II, Kerr end, p. 44). কোনো যুগের উপকরণ কি বিশেষ ভাবে প্রয়োগ করিয়া সে যুগের মানুষ জীবন-যাত্রার পথে অগ্রসর হইতেছে, উপকরণের প্রয়োগের সেই-সেই বিশেষ পদ্ধতি হইতেই সে যুগের সংস্কৃতির স্তর নির্ণীত হয়।

শেষ অবয়ব: মানস-সম্পদ

কিন্তু যেখান হইতে সামাজিক রূপের জ্ঞান আমাদের পক্ষে সুলভ সেখান হইতে সংস্কৃতির মানস-সম্পদেরও আমরা প্রায়ই সন্ধান পাই। আচার অনুষ্ঠানের বোঝা বহিয়া কখনও চিত্র, কখনও গান, কখনও কোনো মূর্তি বা বিগ্রহ আমাদের সম্মুখে সেই সব যুগের মানস-ইতিহাস খুলিয়া দেয়। নিজেদের শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সংস্কৃতি-সম্পদের বিচারে আমাদের সামাজিক ও আর্থিক বিন্যাসকে আমরা বড় মনে করি না বটে, কিন্তু যখন এইসব প্রাচীন বা আদিম জাতির এই গীত, গান নৃত্যের বা চিত্রের হিসাব লই, তখন আমরা উপলব্ধি করি সেই সব মানস-সম্পদ তাহাদের জীবনযাত্রা ও জীবিকা-প্রণালীর সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। পশুচারীর গান নাচ, বা কৃষিজীবীর গান নাচ, তাহার পশুপালন বা তাহার কৃষিকার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিল। অধিকাংশ প্রাচীন কবিতা, গান, চিত্র, আখ্যায়িকা, এইরূপ জীবিকা-প্রচেষ্টার

সহায়ক হিসাবেই রচিত হইয়াছে। ঐসব মানস-প্রয়াসে তখনকার জীবিকা প্রয়াস সবল ও সমৃদ্ধ হইয়াছে, সংস্কৃতি পূর্ণতর হইয়াছে। (এই প্রসঙ্গে কড্‌ওয়েল রচিত 'ইল্যুশন এণ্ড রিয়েলিটি' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

পরস্পরের সম্পর্ক

বাস্তব ক্ষেত্রে যেমন জীবিকার নূতন উপকরণ আবিষ্কার করাতে জীবন-যাত্রা অগ্রসর হইয়াছে,—তাহাতে সমাজ সম্পর্ক নূতন হইয়াছে, উন্নত হইয়াছে, আর উহারই ফলে মানসিক ক্ষেত্রে নূতন চেতনা, নূতন চিন্তা, নূতন সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে,—তেমনি আবার মানসিক ক্ষেত্রের সেই নূতনচেতনা, নূতন চিন্তা, নূতন সৃষ্টিও বাস্তব ক্ষেত্রে জীবিকার নূতনতর উপকরণ আবিষ্কারে ও নূতনতর বাস্তব সৃষ্টিতে মানুষকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে,—তাহার সামাজিক জীবনযাত্রাকেও ঐরূপ সৃষ্টির পক্ষে নূতনভাবে বিন্যাস করিতে প্রেরণা দিয়াছে। এইভাবে বাস্তব সৃষ্টি ও মানস-সৃষ্টি পরস্পরের সহায়ক হইয়াছে, সক্রিয়ভাবে এক ক্ষেত্রের সৃষ্টি অন্য ক্ষেত্রের সৃষ্টিকে পুষ্ট করিয়া চলিয়াছে। তাহাতেই আবার সমস্ত সংস্কৃতি উন্নত, ব্যাপক ও গভীর হইয়া উঠিয়াছে,—থামিয়া থাকে নাই, বাড়িয়াই চলিয়াছে।

জীবিকার বাস্তব উপকরণ, সমাজের বাস্তব রূপ ও মানসিক সম্পদ, এই তিনেরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, ঘাত-প্রতিঘাতে এইভাবে প্রতিযুগে সেই যুগের সংস্কৃতির সমগ্র রূপ ফুটিয়া উঠিতেছে।

উপমা দিলে বলা যায়—কাব্য, গান, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানসিক সম্পদ যেন গাছের ফুল ফল; সমাজ যেন গাছের কাণ্ড ও তাহার শাখা প্রশাখা; আর জীবিকার উৎপাদন-প্রথা যেন সেই গাছের মূল। মূলের সঙ্গে ফুলের সম্পর্ক ভুলিবার নয়। ফুলই যে গাছ বা কাণ্ড এই কথা মনে করিলেও ভুল হইবে। আবার মূল ও কাণ্ড হইতে ফুলকে একেবারে নিঃসম্পর্কিত বলিয়া মনে করিলেও ভুল হইবে। মূল যেমন ফুল নয়, ফুলও তেমন আকাশে ফোটে না। আর একটা উপমা লওয়া যাইতে পারে—উৎপাদন-প্রথা যেন গৃহের ভিত্তি; সমাজ-সম্বন্ধ যেন তাহার নিম্নতল বা গ্রাউণ্ড প্ল্যান, আর শিল্পকলা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানসিক সৃষ্টি যেন সে গৃহের কারুকার্যখচিত উপরতলা, বা সৌধ-

চূড়া। দূর হইতে দেখিলে উপরতলার রূপেই আকৃষ্ট হইতে হয় প্রথম; তারপর নিম্নতলের দিকেও দৃষ্টি যায়; কিন্তু ভিত্তির কথা স্মরণ না রাখিলেও তো ভুল হইবে। বৈজ্ঞানিক বোঝেন যে, আসল কথাটা হইল এই যে, সমাজ অবয়বের প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির গভীর যোগ আছে; সে যোগ সক্রিয় যোগ; আর উহার সমস্ত মিলাইয়া যে একটি রূপ ফুটিয়া উঠে তাহাই সংস্কৃতি—ফল-ফুল-ভরা বৃক্ষ বা নানা-কক্ষ-সমন্বিত প্রাসাদ। অবশ্য এইসব উপমাতে একটা ভুল ধারণা হইতে পারে—গাছ বা গৃহের মত সংস্কৃতি বুঝি স্থাণু, নিশ্চল। কিন্তু আমরা প্রথমেই দেখিয়াছি, মানুষ প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে একটু একটু করিয়া জয়ী হইতেছে—আর সংস্কৃতি তাহার সেই যুদ্ধের অস্ত্র, আবার সেই যুদ্ধেরই বিজয়-নিদর্শন। মানুষের সেই জীবন-যুদ্ধ যেমন নূতন নূতন রূপে অগ্রসর হইতেছে, তাহার সংস্কৃতিও তেমনি রূপান্তরিত হইতেছে। মানুষের ইতিহাসের দিকে তাকাইলেই তাহার সংস্কৃতির এই রূপান্তরের ধারাও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

মার্ক্সীয় দর্শন—সরোজ আচার্য

দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ—জোসেফ ষ্টালিন

স্বপ্ন ও সত্য—লেখক

Historical Materialism—Marx-Engels.
Man Makes Himself—Gordon Childe.
Illusion and Reality—Christopher Caudwell.
Dialectical Materialism—Cornforth.
Anti-Dühring—Engels.
Dialectic in Nature—Engels.

তৃতীয় অধ্যায়

ইতিহাসের ভূমিকা

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ইতিহাস মানুষের জীবিকোপায়ের হিসাব মতো যুগে যুগে বিভক্ত হয়। বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক সেই যুগগুলির মোটামুটি পরিচয় এবং তাহার বৈশিষ্ট্য বলিয়া দিতে পারেন। সেইসব যুগের নামকরণ হইয়াছে সেই-সেই যুগের বিশেষ জীবিকা-অবলম্বন ও উৎপাদন-প্রথা হইতে। সংস্কৃতির নামকরণও অনুরূপই হইবে। অবশ্য এইসব যুগ একেবারে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়; অনেক ক্ষেত্রেই পাশাপাশি দুই তিন যুগেরও উপায়-উপকরণ রক্ষিত হয়। কিন্তু যুগের নামকরণ হয় কোন্‌টি কখন মুখ্য তাহা হইতে; প্রাচীন প্রস্তর ও নব্য প্রস্তর, ব্রোঞ্জ, তামা, লৌহ ইত্যাদি মুখত প্রযুক্ত বাস্তব হাতিয়ারের উপাদান হইতে। না হইলে প্রাচীনতর যুগের চিহ্ন ও আধুনিকতর যুগের চিহ্ন অনেক সমাজেই পাশাপাশি খুঁজিলেই পাওয়া যায়। আমাদের দেশেই তো তাহা আছে; আদিম টোডা, ভীল, সিংহলের বেড্ডা প্রভৃতি জাতি হইতে নবজাত টাটা-বিড়লা প্রভৃতি ধনিক-শ্রেণী পর্যন্ত এই দেশেও আছে। আবার হস্ত শিল্পও আছে বিদ্যুৎচালিত কারখানাও আছে। তাই দেখিতে হইবে সমাজে কোন্ ধরণের যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন-প্রথা কখন্ মুখ্য, কাহার নেতৃত্বে তাহা চালিত।

প্রস্তর যুগ: প্রাচীন প্রস্তর যুগ

মানুষের ইতিহাস বহু বৎসর পর্যন্ত প্রায় প্রাঙ্নরের (hominids) ইতিহাস। চীনে, জাভায়, টাঙ্গনায়িকায় (আফ্রিকা), জার্মানিতে ইহাদের করোটি ও নানাচিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। তাহার পরে জন্মাইল 'হোমো সেপিয়ান্' বা সজ্ঞান নৃজাতি।

প্রস্তর যুগই এই মানুষের ইতিহাসের প্রথম যুগ—তাহার দুই ভাগ। প্রাচীন প্রস্তর যুগ ও নূতন প্রস্তর যুগ। পৃথিবীর বয়সের হিসাবে প্লেইষ্টোসিন্ যুগ তখন মোটামুটি চলিতেছে।

প্রাচীন প্রস্তর-যুগের কাল প্রায় লাখ দুই বৎসর। পাঁচ লক্ষ বা আড়াই লক্ষ বৎসর পূর্বে নাকি তাহা আরম্ভ হইয়াছিল। অবশ্য এই দীর্ঘকালের আবার আদি, মধ্য প্রভৃতি ভাগ আছে। ইহার মধ্যে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটিয়াছে, তাহা মনে রাখা দরকার। তত দিন মানুষ পাথরের করকুঠার ও ছুরি, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র চাঁছিয়া তৈয়ারী করিত; ছোট ছোট দলবদ্ধ হইয়া শিকার করিত; শিকারের পশু আগুনে পোড়াইয়া ঝল্‌সাইয়া লইত, সবাই মিলিয়া-মিশিয়া ফলমুল ও মাংস খাইত। নদী ও সমুদ্র হইতে মাছও তাহারা ধরিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু মোটের উপর খাদ্য তখন বড় অনিশ্চিত। বহুকাল যাবত অন্য প্রাণীরই মত মানুষ খাদ্য কুড়াইয়া লইত, 'সংগ্রহ করিত'; ইহার পরে সামান্য হাতিয়ার দ্বারা শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ আরম্ভ হয়। মার্গ্যান এই যুগটাকেই বলিয়াছেন 'স্যাভেজারি'র যুগ। বাংলায় 'অসভ্য' না বলিয়া ইহাকে বলা ভালো 'নিষাদ সমাজের' যুগ। মানুষের না ছিল তখন পরিবারের চিহ্ন, না সম্পত্তি। কাজে কাজেই সমাজ-সম্পর্ক ছিল জীবিকাগত আর মানসবোধও তেমনি। শ্রেণী-বিভাগও তখন পর্যন্ত এই আর্থিক গড়নে প্রথম দেখা দেয় নাই। তাই সেই অবস্থাকে 'আদিম সাম্যতন্ত্র' বলা হয়। পনের কুড়ি জনে এক সঙ্গে শিকার করে, একসঙ্গে ভাগ করিয়া খায়; মেয়েরা কুটনা কুটে, শিশুপালন করে। তবু ইহারই শেষার্ধে এই নিষাদ-জীবনেও ওরিগ্‌নেশিয়ান হইতে ম্যাগ্‌ডেলিয়ান স্তর পর্যন্ত সংস্কৃতি বার পাঁচেক রূপান্তরিত হয়। এইসব স্তরের সব চিহ্ন-যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা নয়। এখনো মালয়ে, মধ্য আফ্রিকায়, উত্তর-পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায়, মেরু প্রদেশের অপেক্ষাকৃত দুর্গম অঞ্চলে, এমন কি আন্দামানেও এরূপ স্তরের মনুষ্য-গোষ্ঠী বাঁচিয়া আছে, তাহা মনে রাখা উচিত। অবশ্য এই জাতীয় প্রস্তরাস্ত্র শুধু ইউরোপে, আফ্রিকায়, এশিয়ায় নয়, দক্ষিণ ভারতে ও পাঞ্জাবের সোয়ান নদীর উপত্যকায়ও পাওয়া গিয়াছে, তাহাও স্মরণীয়।

প্রাচীন প্রস্তরযুগের 'নিষাদ-জীবনের' বিশিষ্ট সামাজিক গড়ন দেখা যায় তাহাদের 'টোটেম'-এ। 'টোটেম' এই শব্দটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় কম, কিন্তু জিনিসটির সঙ্গে তাই বলিয়া আমাদের যে পরিচয় একেবারে নাই তাহা নয়। কথাটা এই—সেই যুগের এক-একটি আদিম উপজাতির (ট্রাইবের) অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুল (ক্ল্যান) উদ্ভূত হয়। অনেক সময়েই দেখা যায়—

এইরূপ এক-একটি কুল কোনো জীবজন্তুকে, কিংবা বৃক্ষলতাকে নিজেদের আদিপুরুষ বা আদিমাতা বলিয়া জানে; হয়ত সেই কুলের জীবন-যাত্রায় খাদ্য বা সম্পদ হিসাবে প্রথমতঃ ঐ প্রাণীটি ছিল বিশেষ উপযোগী। অবশ্য তাহার পর হইতে সেই টোটেম-পিতা বা টোটেম-মাতা হইয়া যায় পবিত্রতম বস্তু, আর তাই টোটেমেরও তাহা অভক্ষ্য ('তাবু')। তাহার নামেই সেই কুলের পরিচয় হয়। আর কুলস্থ সকলে তাহার সন্তান-সন্ততি বলিয়া জাতভাই; তাহাদের পরস্পরে তাই বিবাহ চলে না। 'তাবু' সেই আদিম বিধি-নিষেধ আইন-কানুন; উহা সর্বতঃ পালনীয়। শুধু তাহাই নয়, আসল 'পিতা' এবং কুলস্থ পিতৃ-পর্যায়ের সকলেই তখন হয় পিতা ('তাত' ?), মাতৃ-পর্যায়ের সকলেই মাতা। প্রথম দিকে শিকারের প্রয়োজনে কুলবৃদ্ধই তাহার অভিজ্ঞতার জন্য এই টোটেমের নেতা বা কুলপতি নির্বাচিত হইত; এইসব অভিজ্ঞ বৃদ্ধদের লইয়া টোটেমের পঞ্চায়েত বসিত। জন্মসূত্রেই অবশ্য টোটেমের লোক বলিয়া প্রত্যেকে নিজেকে জানিত; তবু যৌবনাগমে তাহাদের আবার টোটেমের নিজস্ব প্রণালীতে দীক্ষা না হইলে তাহারা পুরাপুরি টোটেমে গৃহীত হইত না। (দ্রষ্টব্য *What Happened in History, Gordon Childe P 14*).

এই সমাজ-পদ্ধতিকেই বলে টোটেমিক সমাজ। উহার স্মৃতি কি আমাদের মধ্যে একেবারে লোপ পাইয়াছে? টোটেম বলিতে আমাদের হিন্দুদের 'গোত্রের' ('গোত্র' ও 'গোষ্ঠ' গো-ধন সম্পর্কিত এক একটি সমাজ-সম্পর্কের পরিচায়ক) কথা মনে পড়ে; টোটেমের জীবপিতার কথা বলিতে হনুমান, জাম্ববানদের কথা মনে পড়ে, আর বিবাহ বা দীক্ষার কথা বলিতেও উপনয়ন ও বিবাহের নানা আচার নিয়মের কথা মনে পড়ে।

এই সমাজ-গড়ন হইতে আমরা নিশ্চয়ই এই নিষাদজীবনের মানসিক চিন্তাভাবনারও কিছুটা পরিচয় পাই। পবিত্রাপবিত্র, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, বিবাহ উপনয়ন প্রভৃতিতে ধর্মনীতির ধারণা দেখিতে পাই। কিন্তু ইহা ছাড়াও সেই প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মানুষের মন বুঝিবার মত আরও কিছু কিছু চিহ্ন আছে : উত্তর স্পেন ও দক্ষিণ ফ্রান্সে প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষ পর্বে ম্যাগ্‌ডেলিয়ান কৃষ্টির যে সব চিহ্ন আছে (আল্‌তামিরা ও ফোঁ দ্য গ্যোম্‌-এ) তাহাতে দেখি গুহাগাত্রে ও অন্যত্র তাঁহাদের আশ্চর্য চিত্র-নৈপুণ্য। হাতিয়ার সুন্দর করিয়া গড়িতে দেখিয়া বুঝিতে পারি প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষের মনে জাগিতেছে প্রথম সৌন্দর্যবোধ। উহার পিছনে

সে কালের যাদুর তাগিদও ছিল—শিকারের প্রাণী ও মাতৃকা মূর্তির ('ভেনাস্' এর মূল) এই জন্যই প্রাচুর্য বেশি। চিত্রিত মৃগয়া-দৃশ্যের যাদুশক্তি আছে ; সেই চিত্রিত যাদুর সাহায্যে দুর্লভ শিকারের পশুকে ঐরূপে আয়ত্ত করা যায় ; মাতৃকা-মূর্তি সুফলা ধরণীরই উদ্বোধক ;—হয়ত এই সব ধারণা হইতেই তাহাদের গুহাচিত্রের ও এসব 'ভেনাস্' মূর্তির বিকাশ হয়। শিকারের উপর জীবন নির্ভর করে, শিকারের পশুর ধ্যানেই তাই তখনকার শিল্পীও মগ্ন। আর কী আশ্চর্য তীক্ষ্ণ ও সত্যসন্ধ তাহার এই পশুজগৎ বিষয়ক দৃষ্টি ! আধুনিক কালের শিল্পীরাও নিষাদশিল্পীদের এই শিল্পকুশলতা ও এই দৃষ্টিক্ষমতার জন্য তাঁহাদিগকে নিজেদের আত্মীয় বলিয়া গণনা করিতে পারেন। তবু মনে রাখিতে পারি—উহা জীবনবিচ্ছিন্ন শিল্পচর্চা নয়, জীবনের দায়ে একরূপ জীবিকা-চর্চা। প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের 'ধর্মবোধ' বা 'মতাদর্শের' এক বিশেষ পরিচয় এই 'যাদুতে' (ম্যাজিক-এ)। অজ্ঞতা, ভয় আর বিস্ময় হইতে আদিম মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে স্বভাবতই নিজের ভাগ্যবিধাতা, ভূত বা দেবতা বলিয়া সন্তুষ্ট করিতে চাহিত। এখনো অসভ্য জাতির মধ্যে তাহাই 'ধর্ম'। সেই সন্তুষ্ট করিবার একটা প্রাচীন কৌশল যাদু বা মন্ত্রতন্ত্র। জীবিকার প্রয়োজনে ও নিজ কামনার অনুরূপে মানুষ শুধু চিত্রে নয়, মন্ত্রতন্ত্রের সঙ্গে নাচে-গানে, নানা অনুকৃতিমূলক কাজে জীবজন্তু, বৃক্ষলতাপাতা হইতে প্রকৃতির নানা ব্যবস্থাকে আপনাদের কবলে আনয়ন করিতে চাহিত। যেই ফল-লাভ তাহাদের অভীষ্ট, সেই ফল-লাভ যেন ঐ অনুকৃতি-মূলক প্রক্রিয়াতেই আয়ত্ত হয়, লক্ষ্য ও পদ্ধতি যেন অভিন্ন, সম্ভবত এইরূপই ছিল সে দিনের মানুষের ধারণা। হয়তো যাদুর নিয়ম-নীতি ও সংযমের মধ্য দিয়া সত্যই এইরূপে মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তিরও এতটা উদ্বোধন ও অনুশীলন হইত যে, মানুষ সত্যই মৃগয়ায় বা জীবিকাযুদ্ধে এই ভাবে ক্ষিপ্রতর, কুশলতর এবং বিচক্ষণ শিকারী হইয়া উঠিত। জীবিকাচর্চা হিসাবে নাচ-গান-চিত্র-নাট্য, নানা রীতিনীতি এইভাবে গড়িয়া উঠিতে থাকে এই যাদুকে আশ্রয় করিয়া। আবার, যাদুই হয় একদিকে ধর্মবোধ ও ধর্মাচরণের মূল ; অন্য দিকে বৈদ্যের-ওঝার ঝাড়-ফুঁকের, মন্ত্র-তন্ত্রের ও ঔষধ-প্রলেপের ও বিজ্ঞানের মূল। পরে তাই এই যাদুকর—একাধারে যে মন্ত্রজ্ঞাতা পুরোহিত ও প্রাণদাতা বৈদ্য—অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারীও হইতে থাকিবে, তাহাও সহজেই অনুমেয়। তখন পুরোহিততন্ত্রের জন্মের আর দেরী হইবে না।

নব্য প্রস্তরযুগ

নূতন প্রস্তরযুগের কাল কম,—হাজার দশ বারো বৎসর পূর্বে তাহা আরম্ভ হইয়া থাকিবে। এই সময়ে প্রস্তরাস্ত্র ক্রমশ মসৃণ ও সূক্ষ্ম হইল, এই সময়ে কুঠার আর তীর দেখা দিল। পাথর ঠুকিয়া আগুন জ্বালিতে মানুষ আগেই (প্রথম যুগে) শিখিয়াছিল—তাহার সংস্কৃতির পক্ষে কম বড় কথা নয় সেই আবিষ্কার। এই স্তরই মর্গ্যানের কথিত 'বারবারিজম'—বর্বর-জীবন কাল।

তারপরে হাজার পাঁচেক বৎসর পরে—হাজার সাতেক বৎসর হইল হয়তো —কৃষিবিদ্যা মানুষের আয়ত্ত হয়। ঘট ও পাত্র নির্মাণ চলিল, পশুপালনও একটু আগে বা পরে শুরু হয়। শেষে সূতাকাটা ও কাপড় বোনা আরম্ভ হইল। এই সব কাজে মেয়েরাই ছিল মুখ্য। তাই মাতৃকর্তৃত্ব ছিল তখন স্বাভাবিক। এই হাজার কয় বছরের মধ্যে মানুষের সমাজ যে দুইটি নূতন রূপ পাইল তাহার একটির বনিয়াদ ছিল পশুপালন, অন্যটির কৃষিকর্ম;—কোনোটিই আজও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, শুধু অনেক সমাজে তাহা গৌণ হইয়া পড়িয়াছে।

পশুপালনের পরিণতি

পশুপালনের দিনে জীবিকা একটু সুস্থির হইল; সম্পত্তি জুটিতে লাগিল—গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ, শূকর ইত্যাদি সেই সম্পত্তি।—ইহাদেরই নাম আমাদের ভাষায় 'গোধন'। পার্বত্য ও মরু প্রদেশের মানুষদের চারণ-ক্ষেত্রের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, তাই সেরূপ মানুষ ছিল যাযাবর। ঘোড়া, উট প্রভৃতির আদর এইজন্য আরও বৃদ্ধি পায়। 'গোধন' বৃদ্ধি পাইলে একদিকে সমাজ বৃদ্ধি পাইল; পনের কুড়ি জনের পরিবর্তে দুশ তিনশ লোকও এক সঙ্গে এক কুলে (caln) বসবাস করিত। বংশ ও পশুর সংখ্যা বৃদ্ধিতে পশুচারণের জন্য অন্যের জমি কাড়িয়া লওয়া দরকার হইত। তাই এই আর্থিক আত্মীয়কুল এক সঙ্গে মিলিয়া সামরিক উপজাতি বা কৌম (tribe) গড়িত। পরাজিতকে প্রথম প্রথম এই বিজেতারা হত্যা করিত; পরের দিকে তাহাকে হত্যা না করিয়া কাজে লাগাইল, করিল দাস। নিজের খোরাক অপেক্ষা সে তখন বেশি উৎপাদন করিতে পারে, লাভ দেয়। এই দাস ও পশুর ভাগাভাগি লইয়াই

নাকি সম্পত্তির ভাগাভাগির সূত্রপাত। আদিম সাম্যতন্ত্র এইভাবে ভাঙ্গিয়া পড়ে। অন্যদিকে এই যুদ্ধবিগ্রহে ক্রমেই দেখা দেয় পিতৃকর্তৃত্বের যুগ। গোষ্ঠী-পিতাই কর্তা, সমাজের স্ত্রী ও শিশুরা তাহারই উপর নির্ভর করে। গো-মেষ পালনের জন্য প্রয়োজন মতো বহু স্ত্রী গ্রহণ চলে। ধর্ম আগে ছিল প্রকৃতিপুজা, ভূতপুজা, মন্ত্রতন্ত্র ও যাদুর দ্বারা প্রকৃতিকে বশ করিবার, বন্য জন্তুকে বধ করিবার কামনা-কল্পনা। পরে, কুল ও কৌমের যে ধর্ম ছিল আগে টোটেম-তাবু-গত, সেই ধর্মই হইল গোষ্ঠী-পিতার পুজা; পরের দিকে তাহারই প্রতিচ্ছায়ায় দেবতা হইলেন গোষ্ঠী-পতি (Lord of Hosts)। এইরূপে জীবিকার উপকরণের অনুযায়ী হইল তাহাদের সামাজিক ব্যবস্থা; আবার সেই সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাদের মানস-দৃষ্টিতে।

কৃষির দান

ইতিহাসে এমন ঘটনা আর তৎপুর্বে ঘটে নাই—কৃষিকার্যের প্রচলনের মত বিপ্লবী ব্যাপার। পুরাতত্ত্ববিদরা তাই ইহাকে 'প্রথম বিপ্লব' বলেন। কৃষির আবিষ্কার হইয়াছিল যখন তখনো মানুষ "বর্বর-জীবনের" স্তরে। ধাতু বিশেষে, কাঠের খুন্তি বা পাথরের কোদালি দিয়া, জমি খুঁড়িয়া বীজ ছড়াইয়াই তখন চাষ চলিত। কিন্তু ক্রমে উহার বিস্তার হইল,—সমাজে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হইল, মানুষ "সভ্য-জীবনে" উত্তীর্ণ হইল। এই বিরাট পরিবর্তন প্রধানত ঘটিয়াছিল 'নব্য প্রস্তরযুগে'র শেষে উত্তর আফ্রিকায়, দক্ষিণ ইউরোপে, পুর্ব এশিয়ার বিশাল নদনদীর ধারে। তাই পরবর্তী কালে মিশরের নীল নদ, ইরাকের তাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেতিস্ নদী, চীনদেশে হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং, আর ভারতবর্ষে সিন্ধু নদের তীরে সভ্য জীবনের প্রথম পৌরকেন্দ্রগুলি গড়িয়া উঠে। সেই সব সভ্য-সমাজের সাধারণ নাম—'এশিয়াটিক সমাজ।' কিন্তু নব্য প্রস্তরযুগের শেষে মানুষ পশুপালন ও কৃষিকর্ম আয়ত্ত করিয়া এই ঈষদুষ্ণ মণ্ডলের এক-একটা জায়গায় স্থির হইয়া বসিল, অর্থাৎ 'গৃহস্থ' হইল। জমি হইল তাহার সম্পত্তি, অবশ্য পশুও আছে। এই অবস্থায় কৃষির প্রধান প্রয়োজন সেচের, অর্থাৎ বৃষ্টির কিংবা নদীর; তাই মেঘবা ইন্দ্র—দেবশ্রেষ্ঠ, নীল নদ—দেবতা, গঙ্গা—দেবী। প্রাকৃতিক শক্তিগুলি পুর্বযুগে ছিল 'ভূত'; ক্রমে তাহারা 'দেবতার'

আসল দখল করিল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পূর্তবিদ্যারও পত্তন হইল, আর কৃষির 'খন্দ' বুঝিবার দায়ে গ্রহ-নক্ষত্র বিচার বা জ্যোতির্বিদ্যারও সূচনা হইল। কৃষির প্রথম দিকেও অবশ্য এই জমিজমা সবই ছিল 'জিন্' বা 'জনের' সম্পত্তি; 'জন' বলিতে বুঝাইত এক একটা গোষ্ঠীকে, আর 'জনপদ' বলিতে এক এক গোষ্ঠীর বাসভূমি। তখন মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়াই জীবন যাপন করিত, সব সাধারণ-সত্ব। প্রথমদিকে বিবাহও হইত অনেক স্থলে গোষ্ঠীগত—এক গোষ্ঠীর মেয়ে মাত্রই হইত অন্য গোষ্ঠীর স্ত্রী। অবশ্য ইহারও অনেক রকমফের ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। জমির বিভাগও ক্রমে বৈষম্যের সৃষ্টি করিল, আদিম সাম্য-তন্ত্রের দিন ফুরাইল। উহাতে আর মানুষের জীবিকোপায় তখন পরিপুষ্ট হইতেছিল না—প্রত্যেকের উৎপাদনশক্তি বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দীর্ঘ নব্যপ্রস্তর-যুগ ব্যাপিয়া নানা কেন্দ্রে মানবের জীবন-যাত্রা অবশ্য বিবিধ রূপ হাতিয়ারের প্রয়োগে বিবিধ রূপ ধারণ করিয়াছিল, আর নানা পর্বে সেই বিবিধ কেন্দ্রের বিবিধ কৃষ্টিও আবার নানারূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল। তবু নব্য প্রস্তরযুগের প্রথমার্ধে 'বর্বর-জীবনের' একটা সাধারণ রূপ ছিল বলা যায়। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইয়ুরোপের মধ্যে মিশরের নীলনদের তীরবর্তী ফায়ুম্, মেরিম্দে প্রভৃতি কেন্দ্র হইতে এশিয়া মাইনরের রাস্ শাম্‌রা, ইরাকের নদীউপকূলস্থ নিনেভা, সাম্‌রা, সূসা, উর প্রভৃতি কেন্দ্র, এবং ইরানের তুর্কিস্থানের সিয়াল্‌ক, হিস্‌সার, ও সিন্ধুনদতীরের হরপ্পা, মোহেন্‌জোদড়ো প্রভৃতি কেন্দ্রের দিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রধান প্রধান মনুষ্যবসতিগুলি বিস্তৃত ছিল, ইহা দেখা যায়। আর ব্রোঞ্জ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে (তাম্রযুগে) সেই সব কেন্দ্রে 'বর্বর-জীবন' মোটামুটি আর একটা নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাও বুঝা যায়। মানুষের কৃষ্টির যে পরিচয় আমরা এই নব্য প্রস্তরযুগে পাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাহার একবার হিসাব লওয়া উচিত।

'নব্যপ্রস্তর-যুগের' বর্বর-জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যখন প্রত্যেকে নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের মত সামর্থ্য লাভ করিল—কৃষি, ও পশুপালনে তাহা সম্ভব হইল। তাহাতেই ঘটনির্মাণ, বয়ন প্রভৃতি অন্যান্য বৃত্তির উদ্ভব হয়; আর সেই সূত্রে আবার সেই আদিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের, কারুবিদ্যারও জন্ম-সম্ভাবনা ঘটে। পাথরের বা গাছের ডাল দিয়া 'জুমের' মত চাষ (লাঙ্গল তখনো আবিষ্কৃত হয় নাই), টেকোয় সূতা কাটা, কাপড় বোনা, মৃৎপাত্র-নির্মাণ—জীবিকার এই প্রধান কাজগুলি তখনো ছিল স্ত্রীলোকের

হাতে; পুরুষেরা প্রধানত করিত শিকার ও গোচারণ। তাই তখন জীবনেও স্ত্রীজাতি প্রাধান্য খোয়ায় নাই। সে যুগের চিন্তা-ভাবনার কিছু কিছু আমরা সন্ধান পাই। তাহাদের শব-সমাধিতে তখন আরও বিধিনিয়ম ও আড়ম্বর বাড়িয়াছে। মাতৃকামূর্তিগুলিও নিশ্চয়ই শস্যপ্রসবিণী পৃথিবীরই যাদু-প্রতীক। এইরূপ আরও অনেক দিকে যাদু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। জীবিকা-জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট গ্রামগুলি ছাড়িয়া নূতন গ্রামের পত্তন হইতেছিল। প্রথম দিকে মনে হয় গ্রামগুলি আত্মনির্ভর, মোটামুটি তাহার শান্তিও অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু ইহার পরেই দেখি সেইসব প্রত্নবস্তুতে যুদ্ধাস্ত্রের প্রাচুর্য—বুঝিতে পারি যুদ্ধবিগ্রহ, বিজয় ও দাসত্ব দেখা দিয়াছে (দ্রঃ Neolithic Barbarism, *What Happened in History*, pp. 38).

ধাতুর আবিষ্কার—তাম্র যুগ

'নব্যপ্রস্তর-যুগ' শেষ হইয়া গেল ধাতু ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে—পাথরের প্রহরণ ও যন্ত্রপাতি লোপ পাইল না, উহার অনেক জিনিস রহিয়া গেল, কিন্তু ধাতব যন্ত্র ও অস্ত্র প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপ্লব ঘটিয়া গেল। সেই বিপ্লবে বর্বর-জীবনের প্রথমার্ধের অবসান হইল, আরম্ভ হইল দ্বিতীয় পর্বের 'উচ্চতর বর্বর-জীবনের' পালা। ইহার মধ্য হইতেই উদ্ভূত হইবে প্রথম 'পৌর সভ্যতা'; তাম্র ও ব্রোঞ্জ; ও পরে (খ্রীঃ পূঃ ১০০০) লৌহ যখন প্রচলিত হয় তখন এই পৌরসভ্যতা অগ্রসর হইয়া যায়।

খুব বেশি দিন নয়, হাজার ছয় বৎসর পূর্বে (অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ বৎসরের কাছাকাছি সময়ে) নিকট প্রাচ্যে প্রথম আবিষ্কার হইল তামার, পরে ব্রোঞ্জের প্রয়োগ—তামার হাজার দেড়েক বৎসর পরে আসে ব্রোঞ্জ (তামা ও টিনের মিশ্রিত ধাতু)। এই দুইয়ের ফলে সমাজ গঠনেও পরিবর্তন ঘটিবেই। কারণ, বিশেষজ্ঞ কারিগরেই তামা ও ব্রোঞ্জের বস্তু নির্মাণ করিতে পারে। অন্যেরা নিশ্চয়ই চাষ করিয়া, শিকার করিয়া, পশু পালন করিয়া তাহাদের খাদ্য জোগাইত। এই দক্ষ কারিগরদেরও যাদুকর বলিয়া মান ও সম্মান থাকা স্বাভাবিক। আর খনি হইতে এই ধাতু তুলিতে, চুল্লীতে তাহা গলাইতে, ঢালাই করিতে, খাদ মিশাইতে, গড়িয়া পিটিয়া হাতিয়ার তৈয়ারী করিতে শুধু বুদ্ধি আর ধাতুবিদ্যার জ্ঞান নয়, নানা নূতন

যন্ত্রপাতিও প্রয়োজন হইয়া পড়িল। তাই এই ধাতু যখন একবার আবিষ্কৃত হইল তখন তো ক্রমেই নূতন হইতে নূতনতর যন্ত্রপাতিও উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। চাষে, বস্ত্রবয়নে তো উহা লাগিলই। ক্রমে এই বহু বহু যন্ত্র-পাতির কারিগররূপে দেখা দিল সূত্রধর, রাজমিস্ত্রী, ভাস্কর, লোহার, খোদাই-কার, চর্মকার, স্বর্ণকার, মণিকার প্রভৃতি। অর্থাৎ শ্রমবিভাগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সমাজেও পরস্পরের উপর নির্ভরপরায়ণতা অপরিহার্য হইল। ধাতব যন্ত্র ব্যবহারের এই প্রথম দিককার হাজার বৎসরকে তাই পুরাতত্ত্ব-বিদ্‌রা বলেন বর্বরজীবনের "দ্বিতীয় বিপ্লবের" যুগ। অন্য দিকে কাঠের লাঙ্গল আবিষ্কারে ও কুম্ভকারের 'চক্র' প্রচলনে কৃষিতে ও মৃৎপাত্র শিল্পে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য কমিয়া গেল—পুরুষ ক্রমেই জীবনযাত্রায় সর্বে-সর্বা হইয়া উঠিল। এই সব ছাড়াও আবিষ্কৃত হইয়াছিল গো-যান, পালের নৌকা, অশ্বারোহণ প্রভৃতি যানবাহন। শ্রমবিভাগের ফলে শ্রেণীবিভাগ পূর্বেই শুরু হইতেছিল; জীবিকোপায়ের উন্নতি হইলে তাহা এই ব্রোঞ্জ যুগে সুস্পষ্ট হইল—আদিম সাম্যবাদ প্রায় ক্ষেত্রেই এই সময় নিঃশেষ হইল। 'সভ্য জীবনের' প্রারম্ভ হয় পশুপালন, দাসদাসী, জমি, যন্ত্রপাতিতে পরিবারগত সত্ব ও এই শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ লইয়া।

শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ

পশুপালন ও কৃষিকর্মের ফলে যেমন পশু, শস্য, যন্ত্রপাতি, জমির বৃদ্ধি হয় তেমনি গোষ্ঠীর জনসংখ্যা বাড়িল। চাষের সুবিধার জন্যই এক-এক খণ্ড বিশেষ বিশেষ জমি এক-এক গোষ্ঠীর হাতে গেল, পরে সেই গোষ্ঠী ভাঙিয়া তাহাও উহার অংশস্বরূপ পরিবারের হাতে জমির খণ্ড থাকিয়া যাইতে লাগিল। এদিকে সেই পশুর ও দাসদের ভাগাভাগি পাকা হইয়া উঠিয়াছে। ওদিকে তখন তাঁতে আবার বস্ত্র বয়ন শুরু হইয়াছে। ধাতব দ্রব্য গলাইয়া নূতন নূতন অস্ত্র ও অলঙ্কার তৈয়ারী হইতেছে, অর্থাৎ গৃহ-শিল্পের সূচনা হইতেছে। আর যাহারা দরিদ্র হীনাবস্থ তাহারা ওইসব অস্ত্র ও যন্ত্র পায় না। পশুপালন, কৃষিকর্ম ও কুটির-শিল্প—এই সবের জন্য ক্রমেই আবার দাসদের উপযোগিতা বাড়িল। তবু দরকার হইল আরও শ্রম-বিভাগ,—কারণ কৃষির ও পশুপালনের উন্নতিতে উৎপাদন বাড়িয়াছে, সকলের সব কাজ

করা দরকার নাই। এবং কুম্ভকার, কর্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি বিশিষ্ট বৃত্তিধারী যখন দেখা দিল তখন উৎপাদন-শক্তি আরও বৃদ্ধি পাইল। আর এইরূপ শ্রম-বিভাগের সঙ্গে শ্রেণী-বিভাগও আরও পাকা হইয়া উঠিতে লাগিল। কৌম বা গোষ্ঠীগত অধিকার আর তখন চলে না; তাই সম্পত্তি পরিবারগত হইয়া দাঁড়াইল। অনেক দিন পর্যন্ত জমি ও উৎপন্ন দ্রব্য তবু পরিবারগতই ছিল, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয় নাই।

এই পরিবারের আবির্ভাব মানুষের মানসিক জীবনেও একটা বড় ঘটনা। আজও আমরা পারিবারিক সম্পর্কের অপেক্ষা পবিত্র সম্পর্কের কথা কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু মূলত ইহার আবির্ভাব সমাজের আর্থিক পরিবর্তনে, একটা আর্থিক বিন্যাসের তাগিদে। সন্তানের জন্য মমতা স্তন্যপায়ী জীবদের জননীর পক্ষে প্রায়ই একটা জৈবিক ধর্ম;—কিন্তু তাহাদের জনকের পক্ষে তাহা ততটা নয়। এই জননীর কৃপায় মানব-শিশুর জীবন সম্ভব হয়; মানব-মাতাও এই শিশুর মায়ার বশ। সেই কারণেই নারী একদিন ছিল কর্ত্রী। প্রাচীন সমাজ প্রায়ই ছিল মাতৃ-প্রধান সমাজ। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহের যুগে নারী আর আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া শিশুর প্রাণরক্ষার্থে পুরুষের মুখাপেক্ষী হইল। এই ভাবেই হইল মানব-শিশুর পিতৃ-পরিচয় ও পিতৃ-স্নেহের প্রথম সূচনা, আর নারীরও কর্ত্রীত্ব হইতে ধীরে ধীরে অপসরণ। পরিবার সৃষ্টি হইলে এইবার স্ত্রীরা গৃহলক্ষ্মী হইল, অর্থাৎ গৃহাবদ্ধ হইল। যুদ্ধবিগ্রহ, হলকর্ষণ ও ধাতুশিল্প তখন পুরুষ-সাধ্য কঠিন কর্ম, অন্যদিকে শ্রমবিভাগের বিস্তৃতিতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট বৃত্তিধারীও দেখা দিয়াছে। ঐসব পরিশ্রমের কাজেও তখন নারীর স্থান হইয়াছে গৌণ। সংসারেও তাই তাহাদের স্থান গৌণ হইয়া পড়িল—প্রধান কাজ হইল ঘরকন্না করা আর সন্তান ধারণ ও পালন করা। বিবাহও এইবার অনেকটা পরিচিত রূপে দেখা দিল। তাহার একটি প্রধান কারণ এই: সম্পত্তির সঙ্গেই উত্তরাধিকারের কথা উঠে—তাহা কে পাইবে? এইখানে সন্তানের দর বাড়িল। ফলে তাহার মাতার সঙ্গে পিতার সম্পর্কও অপেক্ষাকৃত বেশী স্থায়ী হইল; বিবাহ একটি স্থায়ী সম্পর্করূপে দেখা দিল। অবশ্য তখনো সম্পত্তি পরিবারগত, ব্যক্তিগত নয়; তাই বিবাহ এই প্রথম স্তরে কখনো কখনো পরিবারগত ছিল—এখনো কোথাও কোথাও তাহা আছে। আর সেদিন বহুবিবাহও ছিল, বিবাহবিচ্ছেদও ছিল।

এদিকে যখন কৃষির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া চলিল শিল্প তখন ধীরে ধীরে জিনিস-

পত্রের বিনিময় শুরু হইল। দেখা দিল কেনা-বেচা, লেন-দেন, পণ্যের উদ্ভব ;—বর্তমান যুগের উৎপাদনের যাহা সব চেয়ে বড় লক্ষণ সেই পণ্যজাত এই ভাবেই সমাজে প্রথম আসিল। এই বিনিময়ের কাজটা সরাসরি এখনো এদেশের কোথাও কোথাও চলে। কিন্তু গোধন, কার্ষাপণ হইতে ক্রমে টাকা পয়সা আর নোট ও চেকের যুগও আজ এদেশে আসিয়া গিয়াছে।

ইহার পরের স্তরগুলিও এই শ্রমবিভক্ত ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মধ্যে হইতে ক্রমাগত ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। বহিঃশত্রু হইতে রক্ষার তাগিদে পরিবারগুলি ঐক্যবদ্ধ হইত ; clan বা কুল একত্র হইত tribe বা উপজাতি বা কৌমে। যুদ্ধের প্রয়োজনে তাহারা চাহিল নেতা, যাদুশক্তির (ধর্মের) প্রয়োজনে চাহিল পুরোহিত। অনেক প্রাচীন দেশেই এরূপ বিভাগ ছিল, কিন্তু কোন কোনোখানে এইরূপে সৃষ্টি হইল চাতুর্বণ্য—একবারে ইস্পাত-মোড়া শ্রমবিভাগ, শ্রেণীবিভাগকে তাহা পাকা ও অনড় করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সবখানেই ধীরে ধীরে দেখা দিল এক ক্ষাত্রশক্তি—যুদ্ধ যাহার কাজ ; আর পুরোহিতশক্তি—সেকালের গোষ্ঠীগত বিধি-নিষেধ, 'টোটেম', 'তাবু' হইতে মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, যাদুবিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত 'ধর্মগত' রহস্যের যে ছিল সংরক্ষক,—সে-ই আবার কখনো পুরোহিততান্ত্রিক সমাজে ব্রাহ্মণ্য-শক্তিও হইয়া উঠিত। প্রাচীন মিশরের মত অনেক দেশে এই পুরোহিত শক্তিই হইতেন শাসক। শেষে শাসক শ্রেণী হইতেই উদ্ভূত হইলেন রাজা। অর্থাৎ এইবার রাজ্যের জন্ম। বৈশ্যদের অর্থাৎ বৃত্তিজীবী ব্যবসায়ীদের স্থান তখনো ইহাদের নিম্নে। কারণ, তখনো বিনিময় সমুদ্রতীরের দেশে (এশিয়া মাইনরে ও পশ্চিম ভারতে) ছাড়া তত প্রভাব বিস্তার করে নাই। অন্যান্য বৈশ্য উৎপাদকেরা, বৃত্তিজীবীরা প্রাচীন গ্রীসে ছাড়া উৎপাদন-প্রথায় মুখ্যস্থান অধিকার করিতে পরে নাই—ভারতবর্ষেও না, রোমেও না, চীনেও না। আসল প্রভুশক্তি ক্ষত্রিয় আর পুরোহিতেরা, বণিকেরা তাহাদের নিচে,—তাহাদেরই সহযোগী, কিন্তু স্বশ্রেণীর নয়। ক্রমে পরাজিত বন্দী ও শোষিত দাসদের কাজ হইল এই তিন শক্তির সেবা, অর্থাৎ সকলের জন্য পরিশ্রম ও খাদ্য উৎপাদন ; আর সমাজশীর্ষে প্রভুশক্তির কাজ হইল তাহা ভোগ করা ; ক্ষাত্রশক্তির কাজ পররাজ্য লুণ্ঠন, গোধন কাড়িয়া লওয়া, ইত্যাদি। একদল পরিশ্রম করিবে অন্য দল তাহার ফল ভোগ করিবে,—সমাজের মধ্যখানে এই একটা দারুণ বৈষম্য ও বিরোধিতার সম্পর্ক এইরূপে আদিম সাম্যবাদ ভাঙিয়া 'সভ্য সমাজের' যুগে পৌছাইতে পৌছাইতে স্থায়ী হইয়া উঠিল।

শ্রেণী সংঘর্ষ

'সভ্য জীবনের' সময় ('আদিম সাম্যবাদের' শেষ ও 'দাসপ্রথার' প্রারম্ভ) হইতে আজ পর্যন্ত আমাদের ইতিহাস এই শ্রেণীবৈষম্যের ইতিহাস— যেখানে একদল ক্ষমতাশালী পরশ্রমভোগী বহুসংখ্যক শ্রমজীবীর শ্রমের উপরে জীবন যাপন করে। আমাদের পরিচিত সভ্যতার বনিয়াদ এই কঠিন সত্যের উপর স্থাপিত। একথা যাঁহারা সভ্যতায় সমাজে শ্রেণীবিলোপ বা সাম্যবাদ মানেন না তাঁহারাও স্বীকার করিয়া ফেলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেও এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তটি এইরূপে বলিতে পারি : "মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশী, তারাই বাহন, তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। ...তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।"

রাষ্ট্রের স্বরূপ

সভ্যসমাজ, শাসকশ্রেণী ও রাষ্ট্রের জন্ম-সম্ভাবনা অবশ্য হইয়াছিল কৃষির আরম্ভ হইতেই; নব্যপ্রস্তর যুগ ছাড়াইয়া তাম্রযুগে পৌঁছিতে পৌঁছিতে সে সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। কৃষি-প্রধান গ্রাম ও জনপদগুলিতে শ্রম-বিভাগের দ্বারা দ্রব্য উৎপাদন এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় আরম্ভ হইলে 'সভ্যতার' যুগ আসিতে থাকে। যতই এই সভ্যসমাজ গড়িয়া উঠিতে লাগিল, ধনবৈষম্য, শ্রেণীভেদ ততই পাকা হইতে লাগিল, শাসক ও শাসিত শ্রেণী স্পষ্টরূপে দেখা দিল,—অর্থাৎ রাষ্ট্র নামক শাসন-যন্ত্রটির উন্মেষ হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, শ্রেণীভেদের ফলে শ্রেণীবৈষম্য বজায় রাখিবার জন্যই রাষ্ট্রের উদ্ভব, শাসক শ্রেণীর প্রবর্তিত সম্পত্তিব্যবস্থা বজায় রাখাই উহার প্রধান ও মূল কাজ; মূলগত হিংসার উপরই রাষ্ট্রের ভিত্তি। সেই উদ্দেশ্যানুযায়ী আবার রাষ্ট্রেরও রূপ প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তিত হয়; রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, সাধারণতন্ত্র এইরূপ নানা তন্ত্রে শাসক শ্রেণী নিজ নিজ শ্রেণীস্বার্থই সিদ্ধ করে। কিন্তু যদি শ্রেণীভেদ দূর করিয়া শ্রেণীহীন সমাজ গঠিত হয়—তাহা হইলে

সমাজে শাসক ও শাসিত থাকিবেনা। তাহা হইলে দমনমূলক, হিংসামূলক এই পীড়নযন্ত্রেরও প্রয়োজন ফুরাইবে,—তখন সেই সাম্যবাদী সমাজ পরিচালনা করিবে তাহার উৎপাদক জনগণ সমাজের প্রয়োজনানুরূপ পরিকল্পনা প্রণয়ণ করিয়া, উৎপাদন-বণ্টন প্রভৃতি সংস্থার সমবেত পরিচালক-মণ্ডলীর দ্বারা।

সভ্য-সমাজ ও যুগ-বিভাগ

সভ্যসমাজের প্রথম উন্মেষ হয় প্রধানত আফ্রিকা ও এশিয়ায় বিশাল নদীতীরগুলিতে—দক্ষিণ ইউরোপের 'উচ্চতর বর্বর-জীবন' এই স্তরে উন্নীত হইবার সুযোগ তখন পায় নাই। কিন্তু উত্তর চীনের হোয়াং হো উপত্যকায় সম্ভবতঃ সেখানকার মঙ্গোলজাতীয় মানুষরাও এই সভ্য সমাজের স্তরে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তবে, সমাজ-বিকাশ পৃথিবীর সর্বত্র সমান গতিতে সমছন্দে হয় না, কেহ আগাইয়া যায় কখনো, কেহ পিছাইয়া পড়ে। নব্যপ্রস্তর-যুগের শেষ ধাপ হইতে যাহারা তাম্রযুগে অগ্রসর হইয়া গেল তাহাদের প্রধান কেন্দ্রগুলি আফ্রিকার মিশর হইতে নিকট প্রাচ্যের পূর্ব-উত্তর ঈরান ও তুর্কিস্থান এবং সিন্ধু ও উত্তর পাঞ্জাবের মধ্যে, এবং দূরপ্রাচ্যে চীনে অবস্থিত ছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এইসব অঞ্চলের নদীর উর্বর উপকূলের বন্যার জল, পলিমাটি, নাতিশীতল আবহাওয়া কৃষির অনুকূল; সেচ ব্যবস্থায় তাহা আরও উর্বর হইল। ইহারই মধ্যে মিশরে নীলনদের ধারে, ইরাকের ইউফ্রেতিস্ ও তাইগ্রিসের তীরে-তীরে দেখা দিল প্রথম সভ্য-সমাজ প্রায় সাত হাজার বৎসর পূর্বে ;—এই অংশের বিষয়েই পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা বেশি গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সম্ভবত ইরাকের এই 'দোয়াবে' সভ্যতার সর্বপ্রথম বিকাশ ঘটে; বাইবেলে সে দেশের নাম শিনার। সেখানে দক্ষিণে সমুদ্রের কাছাকাছি বাস ছিল সুমের জাতির, আর উত্তরে বাস ছিল আরব হইতে আগত সেম গোষ্ঠীর আকাদ জাতির। বলা হয়, ইহারাই প্রাচীনতম সভ্য-সমাজের পত্তন করে। মিশরের প্রাচীন সভ্যতাও প্রায় ইহাদের সমসাময়িক। একটু পরেই (প্রায় খ্রীঃ পূঃ ২,৫০০) সিন্ধুনদের তীরে ইহার অনুরূপ সভ্যতার সন্ধান পাই মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পায়। প্রায় তেমনি সময়ে চীনের হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদী দুইটির তীরেও দেখি এক স্বতন্ত্র সভ্যতা বিকাশ লাভ করিতেছে। অবশ্য স্থান কাল অনুযায়ী প্রত্যেক কেন্দ্রেই উপকরণ,

উৎপাদন ও রীতিনীতির রকমফের থাকিবার কথা, তাহা ছিলও; কিন্তু মোটামুটি এই সভ্য-সমাজের রূপে একটা মিলও পাওয়া যায়। কয়েকটা সাধারণ লক্ষণও দেখি—ইহাদের সকলের সেচ-ব্যবস্থায় ও হল-কর্ষণে; ইহাদের পৌরজীবনে ও ইটপাথরের বাসগৃহে; সমাজে কারিগর, মিস্ত্রি, পুরোহিত, রাজা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায়; ধাতুবিদ্যা ও মৃৎপাত্রের উন্নতিতে; জিনিসপত্রের বিনিময়, আমদানী-রপ্তানী ও তুলাদণ্ডের প্রচলনে; পালের নৌকা ও চক্র-চালিত রথের ব্যবস্থায়; এবং শীলমোহর ও লিপির উদ্ভাবনায়। এই সকলে দেখি সভ্যতার সেই প্রারম্ভ কালের রূপ।

এই আফ্রিকা-এশিয়ার মধ্যস্থ প্রাচীনতম সভ্য-সমাজেরই সাধারণ নাম পণ্ডিতেরা দিয়াছেন—'এশিয়াটিক সমাজ'।

'তাম্রযুগ' পেছনে ফেলিয়া এশিয়াটিক সমাজ 'ব্রোঞ্জের যুগ' আরম্ভ করে; খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ উহার প্রসার কাল। তাহার পর সে নাগাল পাইল 'লৌহযুগের'। মনে হয়, সর্বাগ্রে আর্মানিয়ার প্রাচীন মিতন্নি দেশে কোনো এক অখ্যাত আর্যভাষী শাখা লোহার আবিষ্কার করে (খ্রীঃ পূঃ ১০০০ শতাব্দের দিকে)—সঙ্গে সঙ্গে উপকরণ-বস্তুর ও উৎপাদন-প্রথারও দ্রুত পরিবর্তন হইল। কিন্তু ব্রোঞ্জ যুগের পূর্বেই 'সভ্য-সমাজ' আরম্ভ হইয়াছে। ইতিহাসে তখন হইতে উহার সুসংবদ্ধ লিখিত কাহিনী মিলে। তাই সভ্যসমাজের আরম্ভ হইতে আর উপকরণ দিয়া যুগ-বিভাগের প্রয়োজন থাকে না। কেহ কেহ ভাগকরেন তাহা সুমের, মিশর প্রভৃতি দেশ বা জাতির নাম দিয়া; কিন্তু সমাজ-বৈজ্ঞানিক যুগ-বিভাগ করেন উৎপাদন প্রথার বিপ্লব-বিবর্তন অনুযায়ী। তাই সেই আদিম মনুষ্য সমাজ হইতে আজ পর্যন্ত জীবিকা উৎপাদনের পদ্ধতি অনুযায়ী মানুষের ইতিহাসে পাঁচটি প্রধান যুগ দেখিতে পাওয়া যায়:

১। আদিম সাম্যতন্ত্রের যুগ:—প্রধানত, 'সভ্য-জীবনের' উদ্ভবের পূর্বেই প্রায় উহার অবসান হইয়াছে: নিষাদ-জীবন ও বর্বর-জীবনেই উহা সীমাবদ্ধ ছিল।

ইহার শেষে 'এশিয়াটিক সমাজে' উদ্ভূত হয় এক ধরনের প্রাচীন সামন্ত-তন্ত্র; আর ভূমধ্যমণ্ডলে উদ্ভূত হয় দাসপ্রথা।

২। দাস-প্রথার যুগ:—দাসদের উৎপাদনেই তখন মুখ্যত সমাজ চলিত। গ্রীস ও রোমের সভ্য সমাজের বনিয়াদ ছিল মোটের উপর এইরূপ

দাসপ্রথা। অবশ্য ইহার রকমফের আছে। আর ভারতীয় প্রাচীন সমাজে ঐরূপ দাসপ্রথা উৎপাদনের মুখ্য ব্যবস্থা ছিল না বলিয়াই মনে হয়।

৩। সামন্ততন্ত্রের যুগ :—ইহারই অন্য নাম বলা হয়, 'ক্ষুদ্র কৃষকতন্ত্র ও ক্ষুদ্র বণিকতন্ত্রের' যুগ, ঐরূপ উৎপাদন ব্যবস্থা উহার মুখ্য বৈশিষ্ট্য।

৪। পুঁজিতন্ত্রের যুগ :—যন্ত্র-শিল্পের সঙ্গে ইহার প্রারম্ভ ও প্রসার, পুঁজিদারের মুনাফার জন্য মজুরের দ্বারা পণ্য উৎপাদন ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৫। সমাজতন্ত্রের যুগ :—কলকারখানা ও জমি প্রভৃতি উৎপাদন-যন্ত্র সমূহ এই প্রথায় সমাজের ও সর্বসাধারণের সম্পত্তি, উহা পুঁজিদারের মুনাফা জোগানোর হাতিয়ার নয়।

'এশিয়াটিক সমাজ' ও পশ্চিম এশিয়া

সমাজ-বৈজ্ঞানিকের এই যুগ-বিভাগ মোটামুটি সত্য হইলেও যে কোনো সভ্য-সমাজকে যেমন করিয়া হউক এই ছকে ফেলিয়া দিতে গেলে তাহা বৈজ্ঞানিক কাজ হইবে না। তাই কি দাসতান্ত্রিক উৎপাদন, কি সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন, উহারও নানা দেশে, নানা পর্যায়ে রকমফের আছে। বিশেষত মধ্যযুগ পর্যন্তও যানবাহন যোগে ও আদানপ্রদানের সূত্রে সভ্যতার কেন্দ্রে-কেন্দ্রে যোগাযোগ একালের মত এত ঘনিষ্ট ছিল না; নানারূপ বৈচিত্র্য ও পার্থক্য সেই সময়ে একই স্তরের সভ্যতারও বিভিন্ন কেন্দ্রে সুস্পষ্ট থাকাই স্বাভাবিক। পুঁজিতন্ত্রের যুগ হইতে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে সেই স্থানীয় পার্থক্যের মাত্রা কমিতে থাকে; দ্বিতীয়ত, সমাজ-বৈজ্ঞানিকগণ প্রধানত ইয়ুরোপীয় মণ্ডলের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আদিম সাম্যবাদের পরেই গ্রীস-রোমের দাসতান্ত্রিব উৎপাদন হইতে ইতিহাস গণনা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার মধ্যখানে সভ্যতার প্রথম প্রারম্ভ হয় সুমের-আক্কাদ, প্রাচীন মিশর, সিন্ধু-উপত্যকাও উত্তর চীনে ; তাঁহারা নিকট প্রাচ্যের সেই সভ্য-সমাজের নাম দিয়াছেন 'এশিয়াটিক সমাজ'। কিন্তু এই সমাজকে ঠিক দাসতন্ত্রী সমাজ বলা সম্ভব নয়, বরং উহাকে এক ধরণের প্রাচীন সামন্তপ্রথা বলাই শ্রেয়ঃ। মধ্যযুগের ইউরোপের 'ফিউডাল সমাজে'র (মোটামুটি খ্রীষ্টাব্দের ১০০০-১৫০০ পর্যন্ত) সঙ্গে এশিয়ার এই প্রচীন সামন্ত সমাজের কিছু পার্থক্য থাকিলেও মিলও অনেক।

'এশিয়াটিক সমাজের' মোটামুটি রূপটা কী, তাহার আভাস আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহার উৎপাদনের ধাতব উপকরণের (তাম্র, ব্রোঞ্জ—উহা টিন ও তামার মিশাল ধাতু, যেমন দস্তা,—লৌহ) ব্যবহার হইতে ও তাহার সভ্য জীবন-যাত্রার পরিচয় হইতে। একটা বড় কথা, এই সভ্যতা পৌর-সভ্যতা। এরেক্, এরিদু, লাগাস্ এবং উর প্রভৃতি উহার কেন্দ্রগুলি জনসংখ্যায় ও আয়তনে গ্রাম নয়, রীতিমত 'নগর'। গ্রাম-জনপদের যুগ এই সভ্যতা কাটাইয়া উঠিয়াছে, তাই ইয়ুরোপীয় ভাষায় ইহা 'সিভিলিজেশন'। গোড়ায় এ সমাজের কল্পিত কর্তা ছিলেন পুরাধিষ্ঠাতা দেব-দেবী ; পুরবাসী সকালে যেন তাঁহারই পরিবারভুক্ত, তাই মন্দিরই তখন জীবন-কেন্দ্র ছিল। কিন্তু দেবতার মুখপাত্র হইতেন মানুষ, তিনিই প্রধান, আর তিনিই হইতেন প্রভু। খ্রীঃ পূঃ তিন হাজার অব্দের কাল হইতে ইহাদের লিপিচিত্রের নানা বিষয়ের পাঠোদ্ধার হইয়াছে—অর্থাৎ লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া লাগাস্-এর বাউ-দেবীর জমিজমা হিসাবপত্রই বেশি পাই। খ্রীঃ পূঃ ২৭০০ অব্দের দিকে দেখা যায় সুমের ও আক্কাদে খণ্ড খণ্ড পৌররাজ্য ছিল, উহার স্থানীয় প্রধান বা রাজাও ছিল, ইহাদের নাম ইশাক্কু। ইহারা একাধারে এই সব জমিদার ও পুরোহিতদের নেতা। ইশাক্কু ছাড়া পুরোহিততন্ত্রও ছিল প্রবল। চাষীদের নিকট হইতে ইশাক্কু রাজস্ব রূপে শস্যের সপ্তমাংশ আদায় করিত ; আর রাজ্যের বাঁধ খাল, মন্দির ও প্রাসাদ নির্মাণ করিতে চাষীদের 'বেগার' খাটাইত। এই আদায়-উশুল করিবার জন্য ও বেগার খাটাইবার জন্য নিয়োগ করিত এক ধরণের কর্মচারী—হয়ত কর্মচারীরা বেতনভুক। ইহা ছাড়া হিসাবপত্রের জন্য (অঙ্ক ও লিপিচিত্রে দেখা যায়) ও লিখিবার জন্য কেরানিও ছিল। আর মন্দিরের ও প্রাসাদের সঙ্গে থাকিত তাহাদের আশ্রিত কারিগর—হয়ত মধ্যযুগের ইয়ুরোপের কারিগরদের মতই। অবশ্য সমাজে দাসও ছিল, তাহারা প্রধানত গৃহকর্ম করিত। তবে প্রভুদের জমি চাষ করিবার জন্য প্রভু যাহাদের কাজে লাগাইত তাহারাও ছিল 'দাসের' সামিল। কিন্তু সমাজের প্রধান গঠন প্রভু-দাসের সম্পর্কের উপরই স্থাপিত হইয়াছিল, এই কথা বলা চলে না। প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিসপত্রের অবশ্য ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে বিনিময় হইত ; তাই ব্যবসায়ী বণিক শ্রেণীরও এইসব দেশে উদ্ভব হয়। কিন্তু বিক্রয়ের জন্য 'পণ্য' প্রস্তুত করা তখনো সাধারণ নিয়ম হইয়া উঠে নাই। আর এই বণিকেরাও ছিল প্রভুশ্রেণীর আশ্রিত ও শোষিত ; ব্যবসায়ের লভ্যাংশ

প্রধানত প্রভুরাই ভোগ করিত। এই সমাজ-ব্যবস্থাকে 'রাজস্বভোগী রাষ্ট্র' বলা হয়, কিন্তু ইহাকে 'সামন্ত তাঁবেদারি' ("ভ্যাসালেজ্") ব্যবস্থা বলাই বোধহয় আরও শ্রেয়ঃ। তবে এই ব্যবস্থার একটা বৈশিষ্ট্য হইল স্থাণুত্ব। দেবতা বা দেবতার প্রতিনিধি-রূপে রাজা ও পুরোহিতে মিলিয়া এই শাসক-শাসিতের সমাজকে অচলায়তন করিয়া তোলে। তাই সুমের ও আক্কাদে নানা শ্রেণীসংঘর্ষের মধ্যেও সহস্র সহস্র বৎসরে এই কাঠামো বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই। ছোট ছোট রাজ্য ভাঙিয়া যখন সুমের আক্কাদে শারুকিন (বা সারগোন্) নামক একজন নেতা সম্রাট হইয়া বসিলেন (খ্রীঃ পূঃ ২৮৭২-২৮১৭), তখনো আসলে সমাজ রূপান্তরিত হইল না। ইহার পরে কত সাম্রাজ্যের উত্থান পতন ঘটিল—কিন্তু তাহাতে কি? কত সম্রাটের কত কীর্তি-কলাপ, জয়-পরাজয়ে সুমেরের পৌর সভ্যতা প্রসারিত ও গৌরবান্বিত হইল;—পশ্চিমে মিশর ও পূর্বে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত এই সভ্যতার আদান-প্রদান চলিল;—সিন্ধু উপত্যকার শীলমোহর, মৃৎপাত্রাদি চিহ্ন এই কালের (খ্রীঃ পূঃ ২,৬০০-২,১০০) সুমের নগরীতে পাওয়া যায়। তারপর খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দের কাছাকাছি বাবিলন নগরীর প্রধানরা এই সুমের সাম্রাজ্য আয়ত্ত করিল, এই অঞ্চলের নাম হইল তখন 'বাবিলনিয়া'। আরও হাজার খানেক বৎসর পরে উত্তরের পাহাড় হইতে দুর্ধর্ষ আসিরীয় রাজারা লৌহাস্ত্রে ও সৈন্যবলে বিজয়ী হইয়া এই অঞ্চলের সম্রাট হইয়া বসিল; পারস্য হইতে মিশর পর্যন্ত ছিল তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত। শত দুই বৎসর পরে আর একবার স্বাধীন বাবিলনিয়া শত খানেক বৎসর-ব্যাপী নূতন সাম্রাজ্য পত্তন করিল, ইহারই নাম 'কালডিয়া-সাম্রাজ্য'। আর তাহার পরে আসিল ইরানী আর্যগোষ্ঠীর কাইরুসের প্রতিষ্ঠিত পারস্য সাম্রাজ্য। খৃঃ পূঃ ৩৩০ অব্দে সেই পারস্য সাম্রাজ্যও গ্রীক সম্রাট আলেকজেন্দার অধিকার করিলেন;—প্রাচীন 'এশিয়াটিক সমাজের' প্রধান প্রধান কেন্দ্র তখন ভাঙিয়া গেল। কিন্তু এই চার হাজার বৎসরে এত রাজা-রাজড়ার পরিবর্তনে সেই 'এশিয়াটিক সমাজের' মৌলিক কোনো রূপান্তর ঘটিয়াছে তাহা বলা যায় না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির প্রাসাদ, পূর্ত বিদ্যার উন্নতি, সময়ের হিসাব, বারো মাসে বছর, সাতদিনে সপ্তাহ, বারো ঘণ্টায় দিনের পরিমাপ: —গ্রহ নক্ষত্রের জ্ঞান, অঙ্ক ও হিসাব, আর লিপিচিত্রের পরিবর্তে ফিনিসিয়ার উদ্ভাবিত আক্ষরিক লিপির প্রচলন— পরবর্তী অন্যান্য সভ্যতা সুমেরের এইসব কীর্তি বিস্মৃত হয় নাই। কিন্তু পূর্বাপর সেই সামন্তপ্রথাই

সুমেরীয়দের মধ্যে এই চার হাজার বৎসর বলবৎ রহিয়াছে—সম্রাটেরা দুর্বল হইলে ছোট রাজারা সম্রাটকে বিব্রত করিত বা পরস্পরে যুদ্ধ বিগ্রহে মাতিত, জনগণকে উৎপীড়ন করিত; আর সম্রাট সবল হইলে শোষণ কেন্দ্রীভূত হইত; পুরোহিত, মালিক ও বণিকদের স্বার্থকে তিনি নিজের আশ্রয়ে সুদৃঢ় করিয়া তুলিতেন। কোন সময়েই কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার কোনো প্রকৃত পরিবর্তন হয় নাই, শোষণ-প্রথার কোনো ইতরবিশেষ ঘটে নাই।

সুমেরের সমসাময়িক ছিল মিশর, আর সুমেরের অপেক্ষা সামান্য কনিষ্ঠ হইলেও তাহার সমজাতীয় সভ্যতা ছিল মোহেন-জো-দড়ো-হরপ্পার সভ্যতাও (পরে দ্রষ্টব্য 'ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা, আদিপর্ব', উহাতে হরপ্পাদির উল্লেখ করা হইল)। মিশরীয় সমাজের সাধারণ পরিচয়ও মনে রাখা প্রয়োজন।

মিশর

মিশরের কীর্তি-কাহিনী কিন্তু সমেরের অপেক্ষাও বেশি বিস্ময়াবহ। তথাপি প্রাচীন মিশরের সামাজিক ব্যবস্থা ও ইতিহাস আসলে এই 'এশিয়াটিক সমাজের'ই একটা রকমফের—উহা সুমেরের সমসাময়িক ও সমতুল্য। হাজার সাতেক বৎসর পুর্বে মিশরের সভ্যতার উন্মেষ হইতে থাকে নীলনদের তীরস্থিত ফায়ুম্, মেরিমেদি প্রভৃতি কেন্দ্রে—তখনো 'বর্বর-জীবন' শেষ হয় নাই। সভ্য জন্-সমাজের প্রারম্ভকালে ছোট ছোট খণ্ড রাজ্য সেখানেও ছিল। জীবনযাত্রার দিক হইতে তবু এখানে বিশেষ লক্ষিত হয় দুইটি জিনিস:—টোটেমিক জীবন,—অর্থাৎ আদিপুরুষের বা আদিমাতার ধারণা, তাহার নামে গোত্র বিভাগ; এক একটি কেন্দ্র বা শহর ছিল এইরূপ গোত্রের বাসভূমি। সেই আদিমাতা বা আদিপুরুষ তাই সেখানে আদিদেব হয়। প্রাচীন মিশরও প্রায় 'দেবতার দেশ' হইয়া উঠে অর্থাৎ দেশ হইয়া উঠে কখনো দেবতার বংশধর 'পুরোহিত-রাজার', কখনো বা রাজ-বিরোধী দেবতার প্রতিনিধি 'পুরোহিত-তন্ত্রের'। দ্বিতীয়ত, অমরত্বের স্বাভাবিক কামনায় শব-রক্ষা অন্যত্রও বহু দিন হইতে চলিতেছিল। কিন্তু শব-সমাধি মিশরে এক বিরাট ব্যাপারে পরিণত হয়। 'মমি'রূপে দেহ-সংরক্ষণের বিস্তার তাই এক দিকে উন্নয়ন চলিত, অন্য দিকে পীরামিডের মধ্যে রাজা-রাজড়ার প্রত্যেকের ভোগ আড়ম্বরের অশেষ উপকণসমূহও সঞ্চিত হইতেছিল—পরকালের দেহযাত্রার জন্যই যেন ইহকালের

সমস্ত আয়োজন। মিশরীরা তাই ইহসর্বস্ব নয়, অথচ দেহসর্বস্ব নিশ্চয়; তাই মিশর পীরামিডের দেশ। অবশ্য সাহিত্য, কবিতা, পৌরাণিক গল্প, সমাধি-মন্দিরের স্থাপত্য, চিত্রকলা, মূর্তিশিল্প, ভাস্কর্য, আর নানা তৈজসপত্র,—দেশ বিদেশের বাণিজ্যের সাক্ষ্য, প্যালেষ্টাইন হইতে আনীত তাম্র, নুবিয়ার স্বর্ণ, লেবাননের দেবদারু কাষ্ঠ, আফঘানিস্তানের লেপাস্-লেজুলি প্রস্তর, ঈজিয়ান্ মণ্ডলের মর্মর প্রস্তর,—সভ্যতার এই সব অজস্র সম্পদ ব্যবহারের জন্য প্রাচীন মিশরের স্থান ইতিহাসে অতুলনীয়। মিশরের ঐতিহাসিক কাহিনী ও সম্রাট-গোষ্ঠীর পরম্পরাও মোটামুটি জানা গিয়াছে: গোটা চল্লিশেক ক্ষুদ্র রাজ্য ভাঙিয়া প্রথম উদিত হয় উত্তরে ও দক্ষিণে এক একটি রাজ্য, তাহার পর খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ হাজার অব্দের কাছাকাছি মিশর এক-রাজ্যে পরিণত হয়। সম্রাট মেনেস্ এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম ও দ্বিতীয় রাজবংশ জুড়িয়া (খ্রীঃ পূঃ ৩১৮৮ হইতে ২৮১৫) চলে মিশরের "প্রাচীন" যুগ। তারপর উত্থান-পতনে ১১টি রাজ-বংশের কথা আছে, এই রাজাদের উপাধি আমরা জানি—'ফেরো' বা 'ফেরাও'। পুরোহিত ও প্রধানরা তবু কম ক্ষমতাবান ছিল না। সেই সব বিত্তবান্দের শোষণেরও সীমা ছিল না। রাজস্ব জোগানো, বেগার খাটা, এই ছিল। সাধারণের ভাগ্যলিপি। চাবুকের জোরে খাজনা আদায় হয়, দুর্ভিক্ষে আগাছা খাইয়া চাষীরা বাঁচে—এই রূপ বহু চিত্রে এই অবস্থার প্রমাণ মিশরীরাই রাখিয়া গিয়াছে। ইহার উপরেও ছিল রাজার শোষণ—পীড়ন করিয়া রাজস্ব আদায় করা আর পিরামিডের মত কীর্তি নির্মাণের জন্য চাবুক মারিয়া বেগার আদায় করা। কিন্তু মিশরীয়দের চক্ষে এই রাজারা দেবতার বংশধর; কেহ কেহ বা স্বয়ং দেবতাও। কাজেই তাহাদের ইচ্ছা অমান্য করিবার কথা ভাবাও সাধারণের পক্ষে সহজ ছিল না। তবু বারে বারে মিশরে প্রজা বিদ্রোহও হইয়াছে; রাজশক্তি ও পুরোহিততন্ত্র ও বিত্তবানরা মিলিয়া সেইসব বিদ্রোহ দমন করিত। প্রজাদের অসন্তোষ অবলম্বন করিয়াই খ্রীঃ পূঃ ৫০০ বৎসর পূর্বে থীবসের সামন্তরা ফেরো হইয়া বসে। আবার সাত শত বৎসর পরে এক প্রজাবিদ্রোহে তাহারা সাময়িকভাবে ক্ষমতা হারায়; মিশর তখন প্রকাণ্ড কেন্দ্রীভূত সামরিক সাম্রাজ্য হইয়া উঠে। ভাড়াটে সৈন্য থাকিত শান্তিরক্ষার জন্য; অন্য দেশ লুণ্ঠন করিয়া ধনরত্ন আহরণ করিত এই সম্রাটরা; পরকালের জন্য তাহা জমাইত পীরামিডে! শোষিত প্রজাদের অসন্তোষ কাজে লাগাইয়া শেষ দিকে পুরোহিততন্ত্র—তাহারাও সামন্তদেরই সগোত্র—ফেরাওদেরও

খর্ব করিয়া ফেলিয়াছিল। উহার কিছুকাল পরে এশিয়াস্থিত আসিরীয়রা মিশর জয় করে। তার পরে পারস্য-সাম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তির দিন, আর শেষে আসিলেন গ্রীক আলেকজেন্দার (৩৩২ খ্রীঃ পূঃ)।

ঈজিয়ান্ মণ্ডল

একদিকে সুমের ও সিন্ধুতীরবর্তী ভারতবর্ষ অন্যদিকে 'মিশর', গ্রীক বিজয়ের ফলে এই বিস্তৃত 'এশিয়াটিক সমাজের' শেষদিককার কীর্তি-কলাপ, উদ্ভাবনা ও আবিষ্কার প্রভৃতি সভ্যতার দানকে অবলম্বন করিয়া প্রাচীন পাশ্চাত্ত্য জগৎ তাহার সভ্যতা গঠনের সুযোগ লাভ করে। অবশ্য ইহা জানা কথা—গ্রীসদেশের মূল সভ্যতা বনিয়াদ স্বরূপ পাইয়াছিল ভূমধ্য সাগরের উপকূলস্থ 'উচ্চতর বর্বর-জীবনের' কেন্দ্রগুলিকে। সেখানেও সভ্য-সমাজ 'পৌর-সভ্যতা' রূপে ক্রিটে, এশিয়া মাইনরে, ট্রয় প্রভৃতি স্থলে ও সমুদ্র তীরবর্তী অন্যান্য শহরে জনপদে সভ্যতার এই পথেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল, তাম্রযুগ ও ব্রোঞ্জযুগের মধ্য দিয়া (খ্রীঃ পূঃ ৩০০০-১২০০)। সেই গ্রীকদেশের প্রাচীনতর মানুষদের জীবিকার অন্যতম প্রধান আশ্রয় ছিল পশুপালন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কারিগরি বিদ্যা; কারণ গ্রীসের অনুর্বর ভূমি কৃষিকার্যের অনুকূল ছিল না। মাইনোস্ (ক্রীট দ্বীপের) পর্ব হইতে মাইকেনী (নিজ গ্রীসের) পর্ব পর্যন্ত (খ্রীঃ পূঃ ২,০০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১,২০০ পর্যন্ত) ঈজিয়ান মণ্ডলের এই সভ্যতায় রাজা-রাজড়া আছে, মন্দির আছে (বিশেষত মাইনোস্-এ), যুদ্ধ-বিগ্রহ আছে, যোদ্ধশ্রেণীও আছে (ভাড়াটে সৈনিক নয়, বরং সামন্ত অধিনায়কের মত, মাইকেনীর রাজার বশ্যতা স্বীকার করা)। কিন্তু 'এশিয়াটিক সমাজের' মত কৃষি-নির্ভরতা ও সামন্ততন্ত্র বেশি বিকশিত হইবার পূর্বেই আর্য-ভাষী অ-সভ্য হেলেনিক বা গ্রীক-জাতির আক্রমণে ঈজিয়ানের এই প্রাচীনতর প্রাক্-আর্য সমাজ (খ্রীঃ পূঃ ১২০০-৭০০ এর মধ্যে) ভাঙিয়া পড়িল। আর আর্যভাষী হেলেনিকরা তখন সমাজ গড়িল 'দাস প্রথা'কে প্রধান অবলম্বন করিয়া। এই আর্যভাষী হেলেনিকরাই ইয়োরোপীয় ইতিহাসে 'গ্রীক' বলিয়া পরিচিত।

দাস প্রথার যুগ

সেই প্রায়-বর্বর জীবন হইতেই মনুষ্য সমাজে যে দাস আছে, তাহা সুবিদিত। ইহা যে এই যুগেও টিকিয়া ছিল,—দশ বৎসর পূর্বেও নেপালে

দাসপ্রথা চলিতেছিল,—তাহাও আমরা জানি। কিন্তু দাসদের পরিশ্রমেই সমাজে উৎপাদন ও আর্থিক জীবন মুখ্যরূপে সংগঠিত করে গ্রীস ও রোমের সভ্যসমাজ। তাহার পুর্বে 'এশিয়াটিক সমাজে'ও এইরূপ উৎপাদনের প্রাধান্য ছিল না, তাহার পরে ইয়ুরোপের প্রাচীন বা মধ্যযুগেও আর ঠিক দাস প্রথার প্রচলন রহে নাই; মধ্যযুগের সামন্ত সমাজে দাসপ্রথা পরিবর্তিত হইয়া 'ভূমিদাস প্রথার' উদ্ভব হয়। 'দাস-উৎপাদনের' প্রধান দৃষ্টান্ত গ্রীস ও রোম।

গ্রীস

গ্রীসের গ্রীক জাতীয় বিজেতারা ছিল আর্যভাষাভাষী (অর্ধ-বর্বর)। এক সময়ে তাহারাও সম্ভবতঃ আদিম সাম্যতন্ত্রী সমাজের অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিন্তু ব্রোঞ্জ যুগের প্রাচীন মাইকেনীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে যখন তাহারা জয়ী হইল তখন দেখি যুদ্ধের প্রয়োজনেই গ্রীকদের মধ্যে দলপতির উদ্ভব হইয়াছে। ছোট বিত্তবানদের শ্রেণীভেদ হইয়াছে। তাহাদেরই মধ্যে যে প্রধান দলপতি, সে আবার রাজা বলিয়া গণ্য হইতেছে, আর বিত্তবানরা মিলিয়া তাহার মন্ত্রণাসভা বা পঞ্চায়েৎ গঠন করিতেছে। এই সভার হাতে প্রভূত ক্ষমতা। হোমারের উল্লেখিত বিজয়ী গ্রীকদের সমাজ অনেকটা এইরূপ শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। এশিয়া মাইনরের এই উপকূলে ক্রমে গ্রীকদের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ গড়িয়া উঠে, তাহাদের সমবেত নাম আইওনিয়া,—সংস্কৃত 'যবন' কথাটির উৎপত্তি এই শব্দটি হইতে, 'যবন' নামে সাধারণভাবে পুর্বে গ্রীকদেরই বুঝাইত। হোমারের যুগে গ্রীক সমাজে দাসদাসী আছে বটে, তবু গ্রীক সমাজে দাসপ্রথা ঠিক মত গড়িয়া উঠিতে আরও শ৩ পাঁচেক বৎসর লাগে। তাহার পুর্বে লৌহ-উপাদানের ব্যবহার সুপ্রচলিত হইয়াছে, আর সেই পরাজিত মাইকেনীয় সভ্যতারও কিছু কিছু দান গ্রীকসমাজ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে—যেমন, ফিনিশিয়ার উদ্ভাবিত বর্ণমালা ও লিপিপদ্ধতি, মাইনোস-মাইকেনিয়ার নৌ-বিদ্যা ও বাণিজ্যবৃত্তি, এবং মুদ্রাপ্রচলন, আঙুর ও জলপাইর চাষ, জ্যামিতিক ক্ষেত্র নির্মাণ পদ্ধতি, ইত্যাদি। কিন্তু গ্রীসের ভূমি অনুর্বর, তাই পশুপালন এই গ্রীকদের একটা প্রধান জীবিকোপায় হইয়া রহে। প্রধানত এক একটি শহরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিতে থাকে একটি 'পলিস' বা পুররাষ্ট্র। পশুপালনের সঙ্গে আরম্ভ হয় ঐ অঞ্চলের তাম্র, রৌপ্য প্রভৃতি

খনিজ ধাতুর উত্তোলন, ধাতব যন্ত্রাদি নির্মাণ। এই সব জিনিসের বিনিময়ে বিদেশ হইতে শস্য, মাছ, প্রভৃতি আমদানী করা গ্রীক ব্যবসায়ীদের কাজ হইয়া উঠে। ক্রমে লেনদেনের ব্যবসায়, লগ্নী কারবারও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। তাহা ছাড়া সমুদ্রে অভিযান ও লুণ্ঠন, আর সমুদ্রের উপকূলে উপনিবেশ স্থাপনও চলে। আর আঙুরের মদ্য, জলপাইর তৈল, বাসনপত্র, ধাতু নির্মিত হাতিয়ার প্রভৃতি নির্মাণের কাজে মজুর কারিগরেরও দিনের পর দিন বেশি প্রয়োজন হইল। এশিয়াটিক সমাজে ব্যবসায়ী ও কারিগর ছিল মন্দির পুরোহিতের আশ্রিত, ভূ-সম্পত্তির অধিকারীদের অনুগত শ্রেণী মাত্র। কিন্তু অনুর্বর গ্রীসে ভূ-সম্পত্তির অধিকারীদের এত অর্থ ও বিত্ত ছিল না; গ্রীসে মালিক বণিকেরা ও বৃত্তিজীবীরাও তাই যথেষ্ট প্রভাবশালী হইবার সুযোগ পাইল। মালিকদের ব্যবসায় ও কারখানায় ক্রীতদাসের দ্বারা উৎপাদন ক্রমশ বিস্তার লাভ করে।

তবু গ্রীসের সভ্যতার প্রথম দিকে এই বণিক ও শিল্প-মালিকের দ্বারা উৎপাদন-উদ্যোগে দাসদের নিয়োগ তত বেশি হয় নাই। তাহার পুর্বেই গ্রীক সমাজের শ্রেণীদ্বন্দ্ব দেখা দেয়—মালিক ও অভিজাতবর্গও বঞ্চিতদের দমনার্থে যথারীতি রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে। রাষ্ট্র হইতে রাজাকে অপসারিত করিয়া অভিজাত শ্রেণী রাজ্যভার গ্রহণ করে। তখন এক দিকে অভিজাবর্গ, অন্য দিকে ডিমোস্‌ বা জনসাধারণ—এই দুইশ্রেণীর সংগ্রামের শেষে এথেন্সে জনসাধারণ জয়ী হইল, তাহারা ডিমোক্র্যাসি বা সাধারণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিল। আর স্পার্টায় জয়ী হইল যোদ্ধবর্গ—তাহারা প্রতিষ্ঠিত করিল একরূপ ক্ষাত্র-শাসন। ক্রমে প্রগতিশীল এথেন্স ব্যবসা-বাণিজ্য ও নৌবলে প্রবল হয়। তাহার বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য সমস্ত ঈজিয়ান-উপকূলে ছড়াইয়া পড়ে। প্রতিক্রিয়াশীল স্পার্টাও অস্ত্র শক্তিতে পেলোপোনিসিয়া অঞ্চলের সকলকে পরাজিত করিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। এই দুই নগরীর পরস্পর যুদ্ধের কাহিনী অনেকাংশে বণিকশক্তির আর ক্ষাত্রশক্তির সংঘর্ষ, আর সেকালের প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার সংঘর্ষও বটে। এথেন্সের বণিকরাষ্ট্রের দ্রুত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে বিকাশ ও পতন আবার সাম্রাজ্যবাদের এক শোচনীয় পরিণামের প্রমাণও। এবং যুদ্ধাবসন্ন স্পার্টা ও এথেন্সের অবসান ঘটাইয়া যখন ম্যাকিদনের অর্ধ-গ্রীক রাজা ফিলিপ (আলেকজেন্দারের পিতা) আপন সামরিক শক্তি লইয়া সমুত্থিত

হইলেন তখন গ্রীক বিত্তবানেরা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই স্বস্তি ও প্রতিষ্ঠা খুঁজিল। ইহার অর্থও বুঝিবার মত—শ্রেণী-স্বার্থের খাতিরে বিত্তবানেরা শেষ পর্যন্ত নিজ রাষ্ট্র ও নিজ জন্মভূমিকে বিদেশীর নিকট সমর্পণ করিতে দ্বিধা করে না—তা সেই বিদেশী বিত্তবান্ বণিকই হউক, কিংবা অভিজাত ক্ষত্রিয়ই হউক—কিংবা হউক ফ্যাশিস্তদের কালে ফ্রান্সের 'দুইশত পরিবার', ব্রিটেনের ক্লাইব্ডেন্ চক্র আর ইরাজের আমলে ভারতের ধনিক ও জমিদার। অবশ্য ম্যাকিদনের প্রতাপে গ্রীকমণ্ডলে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়, তারপর আলেকজেন্দারের দিগ্বিজয়ে গ্রীকেরা নূতন শক্তির ও সম্পদের আস্বাদন লাভ করে। এই দিগ্বিজয়ের ফলে গ্রীক সমাজেরও কম পরিবর্তন ঘটে নাই। গ্রীক ইতিহাসে আর এক নূতন পর্বের প্রারম্ভ হয়: ইহার নাম হেলেনিস্টিক পর্ব। তাহার তিনটি প্রধান কেন্দ্র: মিশরে টলেমি বংশীয় গ্রীক রাজারা রাজত্ব করিতে থাকেন; পশ্চিম এশিয়ায় সেলিউকাস-বংশীয় গ্রীক রাজরা রাজত্ব চালান (অবশ্য আফঘানিস্থানে ও ভারতবর্ষে গ্রীক 'যবন' রাজারাও ছিলেন); আর মিশরে পশ্চিম এশিয়ায় গ্রীক রাজারা কতকাংশে পুরাতন 'এশিয়াটিক সমাজের' ঐতিহ্য গ্রীক নামের আড়ালে মানিয়া লইয়া চলেন। ম্যাকিদনকে কেন্দ্র করিয়া কিন্তু গ্রীক দেশ বহন করিয়া চলে তাহার দাসপ্রথায় পরিচালিত সমাজ-যাত্রা। খ্রীঃ পুঃ ২০০-১৫৫ এর দিকে রোমের হাতে উহা তুলিয়া না দেওয়া পর্যন্ত ইহাই ছিল গ্রীস সমাজের মূলরূপ—দাসপ্রথার উৎপাদন।

কী সেই রূপ? এথেন্সে স্পার্টায় যতই রাজনৈতিক পরির্তন ঘটুক, চমকপ্রদ নানা রাজনৈতিক বিন্যাস (ডিমোক্র্যাসি, ওলিগার্কি বা মনার্কি) ও তাহার নীতি ও সূত্রের যত উদ্ভাবনা হউক—গ্রীকরা যখন শৈশব উত্তীর্ণ হইল তখন হইতে দাসপ্রথাই হয় তাহাদের প্রধান অবলম্বন। গৃহকর্মে তো নিশ্চয়ই, পশুচারণায়ও বটে, কিন্তু বিশেষ করিয়া কারখানায়, খনিতে, পরিশ্রমের সর্বক্ষেত্রে দাসেরাই হইয়া উঠে গ্রীক মালিকের, বণিকের, গ্রীক 'নাগরিকের' আর্থিক জীবনের নির্ভর। এথেন্সের সৌভাগ্যের দিনে দেখা গেল তাহার প্রয়োজনীয় শস্যের বারো আনি আসে বাণিজ্য-সূত্রে বিদেশ হইতে। তাহার মদ্য, জলপাই তৈল, মৃৎপাত্র, ধাতব দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে সেই চালানী ব্যবসায়ের রপ্তানী পণ্য হিসাবে। এমন কারখানাও গড়িয়া উঠিতেছে যেখানে এক শতের মত ক্রীতদাস কাজ করিত। যেমন দেখি, কেফালসের ঢাল তৈয়ারীর কারখানায় দাস খাটে ১২৪এর উপরে, ডিমোস্থেনিসের পিতার

খাটের মিস্ত্রিখানা, ও অস্ত্রের কারখানা প্রভৃতিতে ২৫।৩০ করিয়া দাস নিযুক্ত আছে। সমগ্র এথেন্‌সে এই দাসেরা তখন 'নাগরিকদের' অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক বেশি। কাহারও কাহারও মতে দাস অধিবাসীই বারো আনার বেশি। তাহা হইলে এথেন্‌সের 'ডিমোক্রাসির' অর্থ ছিল কি? শাসনে ও সাধারণ কাজে অধিকারী ছিল একমাত্র সেই সংখ্যাল্প 'পৌরজন' বা নাগরিকেরা, দাসদের কোনো অধিকার নাই! স্বাধীন বৃত্তিধারী মানুষ অবশ্য এথেন্সে যথেষ্ট ছিল। আবার দাসদেরও রাজ্যের ছোট ছোট কার্যে নিয়োগের প্রমাণ আছে। দাসেরা 'মুক্তি'ও লাভ করিত; শিল্প ও শিক্ষারও আস্বাদ দাসেরা কেহ কেহ লাভ করিতে পারিত। কিন্তু এই কথা ভুলিবার নয়—সেই 'গণতান্ত্রিক পুররাষ্ট্রে' সংখ্যাগুরু দাসদের অধিকার নাই, সমাজে তাহাদের কোনো দাবী নাই; গ্রীক সংস্কৃতির ও সভ্যতার তাহারা ভারবাহী মাত্র ছিল।

গ্রীক সংস্কৃতির সামান্য কিছু পরিচয় না জানিলে আধুনিক চিন্তা-ভাবনার অনেক সূত্রই অবশ্য অচেনা থাকিয়া যায়। কিন্তু এখানে তাহার সেইরূপ সামান্য পরিচয়-উল্লেখও সম্ভব নয়। সম্ভবত একটি ছোট জাতির পক্ষে এমন কীর্তি ইতিহাসে আর কখনো আয়ত্ত হয় নাই—এবং হইবে না। আজও আমরা গ্রীক সাহিত্য, তাহাদের মহাকাব্য, নাটক, কবিতা, ইতিহাস প্রভৃতি অনুবাদ সূত্রে পড়িয়া আনন্দ পাই। স্বীকার করিতে হইবে, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য নাটক প্রভৃতিও আমাদের আজ এতটা সমুন্নত জিনিস বলিয়া বোধ হয় না। গ্রীক শিল্পের, মূর্তির, মন্দিরের, মৃৎপাত্রের, চিত্রের অপরূপ সৌন্দর্য-সুষমা ও মাত্রাজ্ঞান আমাদের বিমুগ্ধ করে,—সেই তুলনায় আমাদের প্রাচীন শিল্পকলাও আমরা আজ এতটা উপভোগ করিতে পারি না। গ্রীক অলিম্পিক ক্রীড়াকলাতে গ্রীক জীবন-দৃষ্টির যে সুন্দর পরিচয় মিলে তাহাও অতুলনীয়। আমাদের দর্শন লইয়া আমরা গৌরব করি; কিন্তু গ্রীক দর্শন সমস্ত পাশ্চাত্য ও আধুনিক চিন্তা-ভাবনার মূল বনিয়াদ। আর গ্রীক চিন্তার স্বচ্ছতা, তাহার স্থির বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য অস্বীকার করা যায় না। ডিমোক্রিটাসের বস্তুবাদ, হেরাক্লাইটাসের পরিবর্তনবাদ, সোফিস্টদের জ্ঞান-জিজ্ঞাসা, এরিষ্টটল-প্লেটোর ভাববাদ আজ পৃথিবীর সম্পদ। এরিষ্টটলই মানুষের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সুসংবদ্ধ করিয়া যান—জগৎ ও জীবনকে দেখিবার, জানিবার, বুঝিবার ঠিক এমন ব্যাপক ও বাস্তব প্রয়াস তাহার পূর্বে আমরা আর কোথাও পাই না—সম্ভবত চীনেও না। পৃথিবীর প্রাচীন জাতিদের ইতিহাসবোধ

প্রায়ই অস্বচ্ছ। ভারতবর্ষে তো উহা দুর্লভ ও দুর্নিরীক্ষ্য। কিন্তু গ্রীকেরা প্রকৃত ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেন—চীনেরাও তাহা করিয়াছেন। আইওনিয়ার (যবন) পণ্ডিতেরা প্রাকৃতিক সত্য লইয়া যে পরীক্ষা ও গবেষণা করেন তাহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উন্মেষ সূচিত হয়—প্রাচীন বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের দিক হইতে তাঁহাদের কীর্তি অসামান্য। পরবর্তী হেলেনিষ্টিক যুগে আলেকজেন্দ্রিয়ায় জ্যামিতির গোড়াপত্তন হয়, পূর্তবিজ্ঞান বা ইঞ্জিনিয়ারিংএর সূচনা হয়, ভূগোলের জ্ঞান প্রসারিত হইতে থাকে। গ্রীসে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি ঘটে। হয়ত ভারতে আয়ুর্বেদের ততোধিক উন্নতিও ঘটিয়াছিল। কিন্তু যে সহজ মানবীয় দৃষ্টিতে—মানব-জীবনের প্রতি মমতা ও মানুষের মহত্ত্ববোধের দ্বারা—গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয়, সেই মানবতা-বোধ আর কোন্ চিকিৎসক-সমাজের সহজ ধর্ম ছিল? সমস্ত গ্রীক সংস্কৃতির মধ্যে জীবন-ধর্মের ও মানবতাবাদের, অধ্যাত্ম ভাবনার সঙ্গে বাস্তব জীবনের একটা সমন্বিত প্রকাশের, এবং সুষমাবোধ ও অপ্রমত্ত মাত্রাজ্ঞানের যে পরিচয় রহিয়াছে তাহার তুলনা আর কোনো সংস্কৃতিতে—সমাজতন্ত্রের যুগে না পৌছিতে—এতদিনেও আর বিশেষ মিলে নাই।

গ্রীক সংস্কৃতির মধ্যে যে আধুনিক মনোবৃত্তির আভাস পাই তাহার একটা কারণ সম্ভবত এই—তাহাদের ক্ষুদ্রতর পরিবেশে ও স্বল্পকালের মধ্যে গ্রীক-সমাজ সেই প্রাচীনকালে কতকাংশে আধুনিক সভ্য-সমাজের অনুরূপ বিবর্তনের মধ্য দিয়া গিয়াছিল। গ্রীক বণিকদের বাণিজ্যসূত্রে, সমুদ্রযাত্রায়, কারবার কারখানার বিস্তারে গ্রীকদের মনের প্রসার ঘটিতেছিল। অন্যান্য অভিজাত সভ্যদেশে কৃষক লইয়া গঠিত সমাজ সাধারণত হইত স্থিতিশীল; এমন নানামুখী চেতনা সেরূপ সমাজে তাই দেখা যায় নাই। অন্যদিকে আধুনিক সমাজের মতই শ্রেণীভেদও গ্রীক সমাজে পরিস্ফুট। গ্রীক অভিজাতরা গর্বিত, গ্রীক সমাজে নারীর স্থান নিম্নে, আর দাসেরা মানুষের মধ্যেই গণ্য নয়, ইহাও লক্ষণীয়। এরিষ্টটলের মত যুক্তিবাদী মনস্বীরও মতে দাসপ্রথা প্রকৃতির বিধান; প্লেটোর মত অভিজাত আদর্শবাদী প্রায় ব্রাহ্মণ্যধর্মী শ্রেণী-বিভেদ পাকা করিয়া সেকালের স্থায়ী 'নেতৃরাষ্ট্র' গঠন করিতে চান, তাঁহার চক্ষে দৈহিক পরিশ্রম ও উৎপাদন একটা তুচ্ছ লজ্জাজনক কাজ। দাসপ্রথার প্রভাবেই এইরূপ ধারণা গ্রীকমনে বদ্ধমূল হয়। দাসপ্রথারই ফলে বাস্তব কাজকর্মের মধ্য দিয়া জ্ঞানার্জনের

প্রয়োজন গ্রীকদের ছিল না ; বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রয়োগেও তাহাদের তাগিদ নাই ;—দাসরূপ মনুষ্যযন্ত্রই তো কাজ করিতেছে। তাই গ্রীক বিজ্ঞানের পথ অনেক দিকে অবরুদ্ধ থাকে এবং দাসপ্রথা ক্রমে গ্রীক-সভ্যতার অধোগতি ঘটায় (তুলনীয় ভারতীয় জাতিভেদ প্রথা)।

রোম

রোমের ইতিহাসও দাসসমাজের ইতিহাস। গ্রীক দেশের মত সংস্কৃতিতে শিল্পে রোমকেরা অত পরাকাষ্ঠা দেখায় নাই। শিল্পকলায় তাহারা গ্রীক সংস্কৃতির দান আত্মসাৎ করিয়া তাহা লইয়াই প্রধানত কারবার করিয়াছে। কারণ রোম-সমাজে বণিক ও স্বাধীন কারিগরের প্রতিষ্ঠা ছিল না ; উহা প্রধানত রোম অভিজাত ভূস্বামীদের সমাজ। কিন্তু সাম্রাজ্যজয়ে, শাসন, আইন-কানুন বিধি-বিধানের ধারণায় ও ব্যবস্থায়, এবং পথ-নির্মাণ, পৌর ও সৌধ-স্থাপত্যে রোমকরা বর্তমান পৃথিবীর গুরুস্থানীয়। তবু সে সভ্যতাও দাসপ্রথারই উপর গঠিত, আর রোমেরও পতনের প্রধানতম কারণ এই দাসপ্রথার ভাঙন, ইহার অচল অবস্থা।

খ্রীঃ পূঃ ৮ম শতকে রোমের ইতিহাসের আরম্ভ, আর খ্রীষ্টীয় ২৫০ অব্দের পূর্বেই দেখি রোমের ঐশ্বর্য ফুরাইতে চলিয়াছে। তাহার পরেকার দেড় শত বৎসরে আসল রোম টিউটন জাতিদের ক্রমাগত আক্রমণে তাহাদের অধিকারে চলিয়া গেল। তারপরেও সাম্রাজ্যের পুর্বখণ্ডে বাইজান্টাইন্ সাম্রাজ্য দাস প্রথা ও এশিয়াটিক সামন্ততন্ত্র মিশাইয়া অনেক কাল টিকিয়া ছিল—তুর্কদের আক্রমণে একেবারে তাহা ভাঙিয়া গেল (খ্রীঃ ১৪৫৪)। কিন্তু রোমক সভ্যতার ও সমাজের বৈশিষ্ট্য খ্রীষ্টীয় ৩য়/৪র্থ শতকেই প্রায় ফুরাইয়া যায়। এই সুদীর্ঘ দিনের (প্রায় ১,২০০ বৎসরের) রোমের ইতিহাসের বহু তথ্যই জানিবার মত। কিন্তু এখানে বুঝিবার মত যাহা তাহা সংক্ষেপে এই :—আদিম সাম্যতন্ত্র ভাঙিয়া রোমেও প্রথম দেখা দেয় প্যাট্রিসিয়ান্ বা অভিজাত শ্রেণী ও প্লিবিয়ান্ বা আশ্রিত শ্রেণী। রাজা অবশ্য প্রথমে সেখানে ছিল, কিন্তু উহাতে জমিজমা খনি প্রভৃতির মালিক প্যাট্রিসিয়ান্রা ; অন্য রোমকরা কেহ বা গরীব চাষী, কেহ বা সাধারণ ব্যবসায়ী, বৃত্তিজীবী ; কিন্তু অধিকাংশেই প্যাট্রিসিয়ানদের অনুগ্রহজীবী, তাহাদের নিকটে ঋণে বাঁধা, তাহাদের লাঙল-বলদ লইয়া চাষ-

বাস করে, মজুর খাটে, প্রভুদের হইয়া কিছু কিছু ব্যবসাও করে। রোমেও রাজতন্ত্র নাচক করিয়া প্যাট্রিসিয়ানরা রাজ্যভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করে। তাহাদের রিপাব্লিকের পরিষদের নাম সেনেট, দুইজন অধ্যক্ষ, তাহাদের পদবী কন্‌সাল, এক বৎসরের মত সেনেটে তাহারা নির্বাচিত হইত। এই ছিল গোড়ার দিকের রোম। কিন্তু সেই গোড়ার দিকেও প্যাট্রিসিয়ানে প্লিবিয়ানে শ্রেণী-সংঘাত বাধিয়া যায়। একবাব সেই বিবাদের শেষে অবস্থাপন্ন প্লিবিয়ান্‌রা আপোষ রফা করিয়া বেশ কিছু ক্ষমতার ভাগ পাইয়া স্থির হইয়া বসে, কিন্তু দরিদ্র প্লিবিয়ান্‌রা তখনো রহিয়া গেল যে তিমিরে সে তিমিরে। এই দরিদ্রদের মধ্যে যাহাদের কোনো সম্পত্তি নাই, বা নিঃস্ব সর্বহারা, তাহাদের নাম হয় প্রোলিটেরিয়ান—'পুত্রদায়িক'। রোমের যুদ্ধে অন্য নাগরিকেরা টাকা পয়সা, অনুচর প্রভৃতি দিয়া নিজেরা সৈন্য না হইয়া আইনের হাত হইতে রেহাই পাইত, বিত্তহীনদের সেই সামর্থ্য নাই, তাই যুদ্ধে দিতে হইত নিজ নিজ পুত্রদের। আজ 'প্রোলিটেরিয়ান্‌' বলিতে অবশ্য বুঝায় 'নিঃস্ব' বা 'নির্বিত্ত', 'সর্বহারা' শ্রমিক শ্রেণী।

যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ্যজয়ে রোম নামিল সম্ভবত সাধারণেব অসন্তোষ চাপা দিবার জন্য ; লুণ্ঠনের একটা অংশ রোমের ইতর সাধারণকেও দেওয়া হইত, আর অধিকাংশ যাইত অভিজাতদের গৃহে। কিন্তু লুণ্ঠনের স্বাদ পাইয়া রোমকরা আর থামিতে পারিল না। অস্ত্রশস্ত্র বাড়িল, যুদ্ধবল বাড়িল, মধ্য ও দক্ষিণ ইতালি জয় সম্পূর্ণ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া উঠিল রোমের রাষ্ট্রশাসন রীতি পদ্ধতি, আইন-কানুনের বৃদ্ধি, গৃহে আসিল ধনরত্ন, আর দাস-সম্পদ। রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাই দাসপ্রথারও বহুল প্রচলন হইতে লাগিল।

ইহার পরে রোমের দিগ্বিজয়ের পালা—কার্থেজ ধ্বংস, সিসিলি স্পেনে রাজ্য বিস্তার, গ্রীস বিজয় ; তাহার পরে মিশর ও নিকট-প্রাচ্যের গ্রীক রাজ্যগুলি অধিকার। রোমের অভিজাতদের অগাধ ঐশ্বর্য, সাম্রাজ্য লুণ্ঠন, রাজস্ব আদায়, দাস-সংগ্রহ ও দাস-ব্যবসায়,—এই সবের সহিত দেখি দাসের পরিশ্রমে তো খনির কাজ চলেই, অস্ত্রশস্ত্রের ছোটখাটো কারখানাও চলে, কেরানির কাজ চলে, এমন কি গ্রীক-শিক্ষারও কাজ চালানো হয় দাস-শিক্ষকের দ্বারা। রোমের বৈশিষ্ট্য যাহা দেখি তাহা এই :—রোমের অভিজাতরা নানা উপায়ে সাম্রাজ্যের মধ্যে বড় বড জমিদারী গড়িয়া তুলিয়াছে, সেই সব জমিদারীর নাম 'লুটিফাণ্ডিয়া'। সময়ে সময়ে এইরূপ এক-একটা জমিদারী যেন ছোটখাট একটা

প্রদেশ। এই জমিদারীতেও চাষের কাজ করে দাসগণ, কর্মচারীরা লাঠি ও চাবুক লইয়া দাস চাষীদের তদারক করে।—এই হইল রোম সাম্রাজ্যের অর্থ নৈতিক গড়ন। এই সমাজের মধ্যে কৃষক রোমান ও শহরের দরিদ্র প্রোলিটেরিয়ানের অসন্তোষ বাড়িতেছে; মাঝে মাঝে সাম্রাজ্যের উদ্বৃত্ত শস্য বিলাইয়া তাহাদের শান্ত করিতে হইতেছে; সার্কাস ও মল্লযুদ্ধের 'খেলার' ব্যবস্থা করিয়া তাহাদেয় ভুলাইতে হয়। তথাপি বারে বারে দাস-বিদ্রোহ ঘটিতেছে: (তাহার মধ্যে খ্রীঃ পূঃ ৭৩ অব্দে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে যে দাস-বিদ্রোহ হয়, তাহাই সর্বাপেক্ষা বড়); সেনেট ও নির্বাচন অফুরন্ত ঘুষের ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে; প্রোলিটেরিয়ান-ভাড়াটে সৈনিক লইয়া অভিজাত নেতারা পরস্পরে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মাতিতেছে; সীজারের সঙ্গে সঙ্গে এক-নায়কত্ব দেখা দিয়াছে, সীজার বংশই প্রায় সম্রাট হইয়া বসিতেছে। প্রদেশে, গ্রামে, এদিকে অসহায় দাস ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের অধ্যাত্ম আশ্বাস শেষ ভরসা হইয়া উঠিতেছে; ওদিকে রোমের নাগরিকদের সাম্রাজ্যের ফসল দিয়া ও বৎসরের অর্ধেকদিন মল্লক্রীড়া দেখাইয়া সন্তুষ্ট রাখিতে হয়। রাজ্যজয়ের ফলে ক্রমে শিল্পী, কারিগর প্রভৃতি রোম ছাড়িয়া দূর দূর অঞ্চলে গিয়া অধ্যুষিত হইতেছে; সেখানে নতুন জীবন-কেন্দ্র গড়িতেছে; মহানগরীর ব্যবসা-বাণিজ্যেও তাই ক্রমে মন্দা লাগিতেছে। অন্যদিকে বড় বড় জমিদারীগুলি আর শহরের কারিগরের দিকে না চাহিয়া থাকিয়া গ্রামে নিজেদেরই 'ভিলার' বা প্রাসাদের নিকটে তাঁতী, কামার, কুমার মিস্ত্রী প্রভৃতি আনিয়া বসাইতেছে। ইহার উপর দেখা গেল সাম্রাজ্য হইতে দাস সংগ্রহও আর সুলভ নয়; শস্য রপ্তানীর অভাবে খাওয়া-পরা জোগাইয়া দাস দিয়া চাষে লাভ টিঁকে না। জমিদারীর চাষবাসের কাজে-তাই কৃষি-মজুর, ভাগ-চাষী, খাজনা-করা-প্রজা প্রভৃতির পত্তন বাড়িতে লাগিল:—তাহা হইলে সেই 'এশিয়াটিক সমাজের' দিকেই কি পশ্চিমের রোম সমাজ চলিয়াছে? অনেকটা তাহাই। কারণ, পূর্বেকার দাসপ্রথার স্থলে ক্রমে জমিদারী ভূমিদাস বা সার্ফ প্রথার প্রচলন আরম্ভ হইতেছে, ইয়ুরোপের মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের আয়োজন এইরূপে চলিতেছে। শেষের শত দেড়েক বৎসরে (খ্রীঃ ২৫০—৪০০) একবার, সম্রাটরা রোম সাম্রাজ্যের এই ঠাট বজায় রাখিবার জন্য সমস্ত শক্তি রাষ্ট্রে কেন্দ্রিত করিতে চাহিলেন, প্রজাসাধারণের সমস্ত অধিকার কাড়িয়া লইতে লাগিলেন; খ্রীষ্টীয় ধর্মও তাঁহাদিগকে যথানিয়মে 'প্রভু ও দেবতা' আখ্যা দিল,—রোম সাম্রাজ্য অনেকাংশে এক 'টোটে-

লিটেরিয়ান ষ্টেট' বা "সার্বিক রাষ্ট্রে" পরিণত হইল। কিন্তু তাই বলিয়া রোম সমাজ ও সাম্রাজ্য বাঁচিল না। অর্ধবর্বর জর্মান উপজাতিদের আক্রমণে সেই সাম্রাজ্য ভাঙিয়া গেল ; অবশ্য ইয়ুরোপের ইতিহাসেও তাহাতে কিছুকালের জন্য অন্ধকার নামিল।

ফিউডাল বা সামন্ত যুগ

রোমের পতনের পরে পাশ্চাত্য জগতে অন্ধকার যখন চাপিয়া বসিয়াছে তখন একটু একটু করিয়া ইয়োরোপে গড়িয়া উঠে যে সমাজ তাহাকে 'ফিউডাল সামন্ত সমাজ' বলে। জার্মান জাতির বিজেতা অসভ্যরা ততদিনে আদিম সাম্যতন্ত্র ও শিকারী জীবনতো ছাড়িয়াছেই, খ্রীষ্টান হইয়া এবং রোমের শেষ দিককার রাষ্ট্রনিয়ম-পদ্ধতি কতকাংশে গ্রহণ করিয়া এই জাতিরা রীতিমত রাজা, প্রধান ও সাধারণ লোক লইয়া নিজেদের রাজ্য গড়িয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের ছোট ছোট রাজ্য লইয়া ক্রমে হইল সাম্রাজ্য। নিজেদের সাম্রাজ্যের তাহারা 'রোম সাম্রাজ্য' বলিয়া পরিচয় দিতেও উৎসুক। ফ্রাংকদের রাজা শার্লমেন সেইরূপ চেষ্টা করেন। পরে জার্মান গোষ্ঠীর অটোও এ পরিচয় গ্রহণ করেন। কিন্তু ফিউডাল সমাজের মূল রূপটা কী? দুইটি শ্রেণীতে ফিউডাল সমাজ বিভক্ত—উপরে জমিদার স্বরূপ সামন্তরা আর নিচে সাধারণ সার্ফ বা ভূমিদাস কৃষক। কিন্তু সার্ফেরা ঠিক দাস নয়। তাহারা জমিতে বাঁধা, প্রভুর গ্রাম ও জমি ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিবে না। তাই তাহাদের বাঙলায় নাম 'ভূমিদাস'। ছোট এক-আধ খণ্ড জমি তাহাদের কখনো কখনো নিজেদের থাকিত, তাহারা উহা চাষ বাস করিত ; প্রভুর প্রাপ্য ভাগও দিত, রাজার খাজনাও দিত, নানা আবওয়াবও মিটাইত, নজরানা দিত, নতুন জমির সেলামি দিত। কিন্তু বছরের প্রায় অর্ধেক দিন প্রভুর নির্দেশ মত জমিদারের জমিতে সার্ফদের বেগার খাটিতে হইত, মুনিব বাড়িতে কাজকর্ম করিতে হইত, ফরমায়েস মত অন্য কাজও করিত। ইহা ছাড়া অবশ্য চর্চ বা ধর্মমণ্ডলী ও পুরোহিতের দাবীরও অন্ত ছিলনা। তাহাও মিটাইতে হইত। তদুপরি, জঙ্গলের কাঠ আহরণ, পশুপাখি শিকার, খালে-নদীতে-পুকুরে মাছ ধরারও খাজনা না দিলে চাষীদের অনেক সময়ে অধিকার ছিল না। রাস্তার মোড়ে, সাঁকোর মোড়েও কর দিতে হইত। উপরের জমিদারই ছিলেন সার্ফের শাসক, —রাজা বা রাষ্ট্রের সঙ্গে ভূমিদাসের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কম,—জমিদার কাছারিতে

তাহার বিচার হইত, জরিমানা হইত, কয়েদ হইত জমিদারের 'ঠাণ্ডা গারদে।' জমিদার ছিলেন নিজের এলেকায় গ্রামের প্রভু। এই এলেকার নাম 'ম্যানর'। জমিদারের খাশ দখলে নিজের খানিকটা জমি থাকিত, বাকিটায় সার্ফদের পত্তন হইত। ফিউডাল রাষ্ট্রও এইরূপ জমিদারদেরই সৃষ্টি। ছোট জমিদারের উপর বড় জমিদার, তাহার উপর আরও বড় জমিদার, সকলের উপরকার জমিদারই রাজা —ফিউডাল সমাজে এইরূপ শাসক-শ্রেণীর মধ্যে এই স্তরভেদ একটা বড় লক্ষণ। রাজা সামন্তদের সাহায্যে রাজকার্য চালাইবেন, তাহারাই সৈন্য জোগাইবে। রাজা দুর্বল হইলে তাই সামন্তরা নিজেদের ক্ষমতা বাড়াইয়া লইত, প্রবল সামন্ত নিজে রাজা হইয়াও বসিতে চাহিত। তাহা না হইলেও সামন্তদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের শেষ ছিল না—ইহাও ফিউডাল সমাজের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। আর এইসব দ্বন্দ্ব লইয়াই সেই সমাজের চারণদের গান, নাইটদের স্তুতিকথা। কিন্তু ফিউডাল সমাজের আরেক প্রধান বৈশিষ্ট্য গির্জার প্রভাব। রোমের প্রধান পুরোহিত, 'পোপ' বা ধর্মাধিপতি, যেন পুরানো রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট্, তাঁহার নিচে বিশপ্‌রা, তাহাদের নিচে নানা পর্যায়ের পাদ্রী পুরোহিত প্রভৃতি। এই চর্চ ছিল সবচেয়ে বড় জমিদার—ভারতবর্ষের মোহান্তদের মত। তাহাদের ক্ষমতার অন্ত ছিল না। দেশের রাজার সঙ্গে দেশস্থ চর্চেরও বিবাদ বাধিত, পোপের সঙ্গে বিবাদ বাধিত সম্রাট্‌দের—ইয়োরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস অনেকটা এই বিবাদের কথা। আবার, এই চর্চই ছিল সে দিনের সংস্কৃতির কেন্দ্র।

খ্রীঃ ১০ম হইতে ১৪শ শতকের মধ্যে ফিউডাল সমাজের এই বিশেষরূপ পশ্চিম ইয়োরোপ ফুটিয়া উঠে; তারপর তাহা সেখানে বিলুপ্ত হইতে থাকে—তবে পূর্ব ইয়োরোপ ও অন্যান্য অঞ্চলে উহা আরও অনেকদিন টিকিয়া ছিল।

ফিউডাল সমাজ তাই প্রধানত গ্রাম্য সমাজ, চাষী ও কারিগরের সমাজ। ইহা এশিয়াটিক সামন্ত সমাজের বা গ্রীক ও রোমান সমাজের সেই পৌরসভ্যতা নয়। ছোট খাটো শহর অবশ্য ছিল,—তীর্থক্ষেত্র, রাজার রাজধানী, ব্যবসায়ের কেন্দ্র থাকিবেই। কিন্তু ক্রমে হাট বাজার মেলা অবলম্বন করিয়া নতুন শহর বা 'বুর্গ' বসিতে লাগিল। পুরানো শহরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; ব্যবসাপত্র ঐসব স্থানে বাড়িতে থাকে, কারিগরদেরও তাহাতে পশার বাড়ে। পূর্বে এইসব কারিগর শিল্পীদের কাজের উপর প্রধান দাবী ছিল তাহাদের জমিদারদের। নিজ নিজ জমিদারের এলাকাতেই উহাদের কেনা-বেচাও হইত, উহাতে জমিদাররা ভাগ বসাইত—শহরের উপরও এইরূপ জমিদার-প্রভুর শোষণ ছিল।

কিন্তু ব্যবসাপত্র বাড়িতেই এই কারিগর ব্যবসায়ীদের মধ্যে জমিদারের গণ্ডী ও শোষণের সীমা ছাডাইবার তাগিদ আসিল। তাহারা "গিল্‌ডে" সংঘবদ্ধ হইবাব চেষ্টা করিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের শহরে কতকটা ব্যবসাবাণিজ্যের স্বাধীনতা অর্জনও করিয়া বসিল। জার্মান 'হান্‌সিয়াটিক লীগে'র নাম এইজন্য প্রসিদ্ধ। ক্রুসেড প্রভৃতি উপলক্ষ্য করিয়া ইতালিতে ভেনিস্‌ প্রভৃতি শহরে বেণে রাজারাও জাঁকিয়া বসিল,—কিন্তু তখন সামন্ত-তন্ত্রের শেষ দিন আসিতেছে। এই শহরে কারিগর কারবারীরা, শহুরে ও ব্যবসায়ী,—ইহারা 'বুর্গের' আসল অধিবাসী বলিয়াই ইহাদের নাম 'বুর্জোয়া', উহার অর্থ 'ব্যবসায়ী'। বলা বাহুল্য, কালক্রমে ব্যবসায়ী বণিকেরাই কারিগর রাখিয়া কারখানা গডিবে, পুঁজিপতি হিসাবে তাহারাই হইবে শিল্পপতি এবং পত্তন করিবে পুঁজিতন্ত্রের যুগ বা বুর্জোয়া যুগ। কিন্তু মধ্যযুগে শহরে বণিক কারিগর দের আত্মরক্ষার বিশেষ প্রতিষ্ঠান ছিল নিজ গিল্‌ড বা 'সংঘ'—তন্তুবায়, কর্মকার, স্বর্ণকার, শক্যকার প্রভৃতি প্রত্যেকের স্বতন্ত্র গিল্‌ড বা 'সংঘ' ছিল—অনেকটা আমাদের বৃত্তিজীবীর পঞ্চায়েতের মত। ভারতবর্ষে মধ্যযুগে এইরূপ গিল্‌ডেরই নাম ছিল 'শ্রেণী'। এই গিল্‌ডগুলি প্রভুদের শোষণের বিরুদ্ধে কারিগরদের শক্তিকেন্দ্র। ইহারা নিজেদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা কমাইয়া দাম বাঁধিয়া দিত, লাভের পরিমাণ ঠিক বাখিত। সাধারণতঃ ওস্তাদ কারিগর গিল্‌ড চালাইত, সাকরেদদের শিক্ষানবীশীর ব্যবস্থা করিত। কিন্তু ক্রমে এই ওস্তাদরাই গিল্‌ডের জোটের জোরে সাকরেদদেরও শোষক হইয়া উঠিল—তাহাও দেখা গেল। তবু গিল্‌ড মধ্যযুগের কারিগরদের পক্ষে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বড শক্তিকেন্দ্র—এ-কালে মজুরদের ট্রেড ইউনিয়নের মত,—ইহা উল্লেখযোগ্য।

আমাদের দেশে প্রকৃতির দাক্ষিণ্য প্রচুর। তাই এই সামন্ত স্তরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি যাহা, এদেশে আমরা প্রধানত তাহাই পাইয়াছি ভারতীয় সংস্কৃতিরূপে। আর এই দাক্ষিণ্যের জন্য এ-স্তরও এই দেশে স্থায়ী হইয়াছে দীর্ঘদিন। উৎপাদন-শক্তি এখানে বাধা না পাইয়া স্থির রহিয়াছে—একেবারে পাশ্চাত্ত্য বণিক আসিয়া ও বিদেশী পণ্য আসিয়া উহার ওলট-পালট না করিয়া দেওয়া পর্যন্ত। কিন্তু ইয়োরোপের কঠিন বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়া সেইখানকার লোকদের নূতন উৎপাদনশক্তির সৃষ্টি অহরহ করিতে হয়। তাই এক-একটা প্রথাও তাহারা তাড়াতাড়ি সেইখানে ছাড়াইয়া যায়। সামন্ত যুগও সেই উৎপাদন সেই মহাদেশে শেষ হইতে লাগিল চতুর্দশ শতকেই। আসিল বণিকের যুগ।

বণিকতন্ত্র

আমেরিকা আবিষ্কারের পর পেরুর লুঠ-করা সোনায় ইয়োরোপের বৈশ্যদের ঘর বোঝাই হইল, বাজার ফাঁপিয়া উঠিল। তখন নূতন নূতন শিল্প দেখা দিতেছে। সেই বৈশ্য-স্বভাব বণিক ও শহুরে মধ্যস্বত্বভোগীর দল তখন আর সামন্তপ্রভুদের মানিতে চায় না; বণিকেরাই ছিল এতদিন সামন্ত ভৌমিকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বঞ্চিত শ্রেণী। একটু অবস্থা ফিরিতেই তাহারা চাহিল রাষ্ট্রে স্বাধিকার ও সমাজে মুক্তি। নূতন ব্যবসাপত্র ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সমাজ হইতে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ দরকার হইয়া পড়িল;—নূতন উৎপাদন-শক্তি, অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্য, পুরাতন উৎপাদন-সম্পর্ককে অর্থাৎ সামন্ত ও গোলামের সম্পর্ককে, ভাঙিয়া দিতে লাগিল। ইহারই ফলে ইংলণ্ডে হয় ক্রমোয়েলের সময় হইতে চল্লিশ বৎসরের বিপ্লব (১৬৮৮); উহার পূর্ণ একশত বৎসর পরে ফ্রান্সে ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লব হইল (১৭৮৯)। সামন্তযুগের অবসান করিয়া আসিল এই বণিক-তন্ত্র ও বণিক-পুঁজিদারের যুগ। তাহারই পরিণতি হইল বুর্জোয়া ধনিকদের যুগ—শিল্পপতির পুঁজিতন্ত্র বা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্যাপিটালিজম-এর প্রসার। কিন্তু শিল্পপতিরাও পরশ্রমভোগী, শ্রমিকের উৎপন্ন পণ্য সস্তায় লইয়া মুনাফা করে, শ্রমিককে তাহার শ্রমমূল্য আসলে ফাঁকি দেয়। বুঝা দরকার, মুনাফা জিনিসটা শ্রমিকরই উদ্বৃত্ত শ্রম—শ্রমিকের যে পরিশ্রমের জন্য শ্রমিক মজুরী পায় না, তাহারই নাম মুনাফা। এই মূল কথাটা এই সম্পর্কে বারবার মনে রাখা দরকার। মুনাফার উপরই বুর্জোয়ার ঐশ্বর্য গড়া, বাণিজ্য গড়া, তাহার পুঁজি গড়া—আর গড়া এই বুর্জোয়া সভ্যতা। এই মুনাফার লোভই হইল তাহার সমস্ত প্রয়াসের মূলকথা। তাহার দান-খয়রাতি, আইনকানুন হইতে ধর্মকর্ম, কালচার—মুনাফার প্রসাদে; এবং প্রত্যক্ষে পরোক্ষে মুনাফার উদ্দেশ্যে। সেই মুনাফার লোভে সে বাণিজ্যের নামে সাম্রাজ্য আয়ত্ত করে; মুনাফার লোভে বিজিতদের শিল্প নষ্ট করিয়া নিজের মাল চালায়; একচ্ছত্র মুনাফা ভোগের আশায় সে সেখানে একচেটিয়া বাজার দখল করিয়া লয়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের উদ্ভব ও বিস্তারের ইতিহাসও ইহাই, এই মুনাফার শিকার।

পুঁজিতন্ত্রের যুগ

ব্রিটিশ বুর্জোয়া বণিকের সেই লুঠ-করা ঐশ্বর্যের দ্বারাই ব্রিটিশ শিল্প-বিপ্লবের প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ হয়; তাহাতেই আবার পৃথিবীতে শিল্প যুগের গোড়া-পত্তন হইল। কারণ, বিজ্ঞানের ক্রম-প্রসারিত জ্ঞান তখন কতকগুলি নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছে। কলে জিনিস তৈরী করা যায় অনেক বেশি, অনেক তাড়াতাড়ি মানুষের অপেক্ষা কলে কম খরচে বেশি মাল উৎপাদন হয়, এই কথা দাসপ্রথায় গ্রীস-রোম বা সমাজতন্ত্রী ভারতবর্ষ-চীনও বুঝে নাই, বুঝিল এই ইংরেজ বুর্জোয়া বণিকেরা। তাই নূতন কলকারখানা বসিতে লাগিল। ব্রিটেনের এই কারখানা বিস্তারের পুঁজিটা আসিয়াছিল প্রধানত ভারতবর্ষের লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য হইতে। বিদেশী বণিকই রাজা; আমাদের দেশের পুরানো হাতের কাজ বিলাতের কলের সম্মুখে তখন আরও টিঁকিতে পারিল না। দেশীয় শিল্পীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারিয়া গিয়া হয় চাষী হইতে চাহিল, নয় কলের মজুর হইতে লাগিল। যন্ত্রের মালিক কলওয়ালার কাছে মজুর খাটিতে গেলে মজুরদের নিজেদের উদরপূর্তির জন্য নিজেদের শ্রমশক্তি বাঁধা দিতে হয়। ইহাই পুঁজিতন্ত্র বা ধনিকতন্ত্র (capitalism)। এই প্রথায় যন্ত্র রহে মালিকের হাতে, তাহা মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি; যন্ত্রজাত দ্রব্য তৈয়ারী হয় কারখানার মজুরের সমষ্টিগত পরিশ্রমে (socialized labour)। উৎপন্ন দ্রব্যের মোট মূল্য যাহা সর্বাংশেই তাহা মজুরের পরিশ্রমের সমতুল্য, কিন্তু মজুর পায় সেই মূল্য হইতে শুধু নিজের বাঁচিবার মতো অংশটুকু মজুরীরূপে, বাকীটা গ্রহণ করে কলের মালিক মুনাফারূপে; এই মুনাফাটা আসলে তাই উদ্বৃত্ত শ্রমমূল্য (surplus value)। তাই মুনাফার অর্থ হইল মজুরের মেহনতের সেই মজুরী-ভাগ যাহা মজুরকে না দিয়া মালিক আত্মসাৎ করে। উহা 'উদ্বৃত্ত', কারণ মোট উৎপাদন-ব্যয়ের পরে উহাই থাকে উদ্বৃত্ত। এদিকে যত কল বাড়ে, যত বেশি সংখ্যায় মজুর খাটে, যত বেশি সময় মজুর কাজ দেয়—ততই এই মুনাফা ফাঁপিয়া উঠে। তাহাতে কলওয়ালার পুঁজি আরও বাড়ে; আবার সেই পুঁজিতেই বসে নূতন নূতন কল, নূতন নূতন কারখানা। এই কারণেই নূতন যন্ত্র আবিষ্কারের তাগিদ পড়ে; কারণ ভালো যন্ত্র হইলে আরও বেশি পণ্য উৎপন্ন হইবে, আরও মুনাফা বাড়িবে। যতক্ষণ ক্রেতার সামর্থ্য থাকে ততক্ষণ এইরূপ চলে। এই

নিয়মে দেড় শত বছরে আজ ইতিহাসে যন্ত্রযুগের বিবর্তনে অতিকায় কারখানার পর্ব দেখা দিয়াছে —যন্ত্রই যেখানে প্রধান, মজুরও সংখ্যায় সেখানে স্বল্প প্রয়োজন। যুগ হিসাবে আজ সভ্যতার ইতিহাসে দেখা দিয়াছে কৃষিযুগের শেষে এই শিল্পযুগ। বুঝিতে হইবে—যন্ত্রবলের প্রসারে এখন আবার উৎপাদন-শক্তির প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে এই মুনাফাদারীর হাত হইতে মুক্তি—সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সমাজ ও সভ্যতা রূপান্তরিত হইতে চাহিতেছে, তাহা লক্ষণীয়।

কিন্তু তাহার পুর্বে লক্ষণীয় এই পুঁজিদারের যুগের বিশেষ লক্ষণগুলি কী কী? সভ্যতার ইতিহাসে কী ইহার প্রধান দান?

(১) জাতীয়তাবাদ—যাহা এই যুগেই প্রকট হয়। এই জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজম্ আবার বাণিজ্য প্রসারের দায়ে পররাজ্যগ্রাসী হয় (predatory), অধীন জাতির 'জাতীয়তা বোধে'ও বাধা দেয়। যেমন, ওলন্দাজরা চাপা দিতে চাহিয়াছে ইন্দোনেশীয় জাতীয়তা বোধ, ইংরেজ চাহিয়াছে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদকে চাপা দিতে।

(২) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—একটু একটু করিয়া সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা বহুদিকে আয়ত্ত হইয়াছে। কারণ প্রথম দিকে পুঁজিদারের দরকার ছিল মজুরের। নবজাত বুর্জোয়া তখন বলিল, প্রত্যেকেই নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় করিবার অধিকারী হউক—কেহ কাহারও ক্রীতদাস বা ভূমিদাস বা গোলাম যেন না থাকে। কারণ মধ্যযুগে সামন্ত ভৌমিকের দাস ছিল শিল্পী ও কৃষকেরা; তাহারা চাকরানা ভোগ করে, তাই জমিদারের অনুমতি না পাইলে অন্যের কলে তাহারা কাজ করিতে পারিতনা। সামন্ত যুগের ভূমিদাসদের এইরূপ 'স্বাধীন' মজুরে পরিণত না করিতে পারিলে পুঁজিদার তখন কলের মজুরই পাইত না। তাই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী হইল পুঁজিদারেরা—মানুষ যেখানে খুশী বাস করিবে, যে ভাবে পারে জীবিকা অর্জন করিবে, এই স্বাধীনতা না থাকিলে সে মানুষ কিসে? এই কথা গ্রাহ্য হইলে এই নীতি অনুযায়ী নিজের সম্পত্তিতেও প্রত্যেকেই অখণ্ড অধিকারী বলিয়া (private property) স্বীকৃত হইয়াছিল। পুঁজিদারের নিজেরও কাম্য ব্যক্তিগত মুনফা, কাজেই private profit-এর পক্ষেও এইরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতিই গ্রাহ্য।

(৩) ডিমোক্র্যাসি বা গণতন্ত্র—'মানুষের অধিকারের' (Rights of Man) দাবী লইয়া সামন্তদের ও যাজকদের পুরুষানুক্রমিক privileges বণিক-

ধনিকেরা উচ্ছেদ করেন, সেই বণিকরা ক্রমে রাষ্ট্রযন্ত্র চালনায় নিজেরা প্রধান পদ গ্রহণ করেন। এই রাষ্ট্রক্ষমতা তাঁহারা আয়ত্ত করিতে পারেন জনগণের সাহায্য হইয়া। তাই তাঁহারা জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্বশীল রাষ্ট্র পত্তন করেন; ইহাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বুর্জোয়াদের এই গণতন্ত্রের অর্থ—রাষ্ট্রের চোখে সবাই সমান। উহার অর্থ কিন্তু ইহা নয় যে, আর্থিক বৈষম্যেও বিদূরিত হইবে। বরং ব্যক্তিগত মুনাফা সর্ব-স্বীকৃত হওয়ায় সম্পত্তি ব্যক্তিগত থাকিল; তাহাতে মুনিবে মজুরে ধনের বৈষম্য কার্যত আরও পাকা হইয়া পড়িল। ধনিক শ্রেণীর ভাগ্যবানেরা জন্ম হইতে টাকাকড়ি, শ্রেণী ও পরিবেশের বলে যে সুবিধা পায় তাহা বিত্তহীন শ্রেণীর লোকেরা শত চেষ্টায়ও পাইবে না। দরিদ্রশ্রেণী, বঞ্চিতশ্রেণী তাই এই বুর্জোয়া গণতন্ত্র সত্ত্বেও না পায় খাইতে, না পায় পরিতে, না পারে লেখাপড়া শিখিতে, না পায় রাজ্যচালনায় নিজেদের অধিকার আদায় করিতে। 'রাজনীতিক গণতন্ত্র, থাকিলেও 'অর্থ নৈতিক গণতন্ত্র' নাই। ধনিকের চালিত গণতন্ত্রের ভিতরের অবস্থা এইরূপ। যতক্ষণ ধনিকতন্ত্র আছে ততক্ষণ সত্যকার গণতন্ত্র তাই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

তবু এই পুঁজিদারের যুগ পূর্বযুগের তুলনায় অনেক উন্নত, তাহা তাহাদের এই সব দান হইতে প্রমাণিত হয়। এইসব নীতি অবশ্য নিজের প্রয়োজনেই পুঁজিদার গ্রহণ করিয়াছে, পরোপকারের ইচ্ছায় নয়। তবু তাহাতে মানুষের অধিকার কিছুটা প্রসারিত হইয়াছে, সভ্যতা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু শ্রেণীর স্বার্থে এই সব সংনীতিকে আজ আবার পুঁজিতন্ত্র খর্ব করিতেও বাধ্য হইতেছে, এমনই ক্ষীয়মাণ পুঁজিতন্ত্রের নিয়ম।

সাম্রাজ্যবাদের সংকট

কারণ পুঁজিতন্ত্র তাহার শেষ পর্যায়ে আসিয়াছে সাম্রাজ্যবাদে। ইহার রূপ আমাদের পরিচিত;—মুনাফার লোভে পরের দেশ পুঁজিতন্ত্র প্রথম জয় করিল। তারপর সেই দেশের শিল্প ধনিকেরা বিনষ্ট করিল নিজেদের দেশের মাল চালাইতে। বিজিত দেশের শিল্পীরা তখন বৃত্তি হারাইয়া হইল চাষী; বাড়াইল সেই হতভাগ্য দেশের চাষীর সংখ্যা। আবার সাম্রাজ্যের শাসন ও শোষণের সুবিধার জন্যই সাম্রাজ্যবাদী সেই অধীন দেশ হইতে বাছিয়া বাছিয়া তৈয়ারী করিল তাহার তল্পিদার এক শ্রেণী—রাজা, জমিদার, তালুকদার, মুৎসুদ্দি,

বেনিয়ান, আর শেষে—কেরানি। অথচ বিজিত দেশে প্রথম দিকে বিজেতা ধনিকতন্ত্র কলকারখানা গড়িতেও দিল না—পাছে নিজের দেশের পণ্যজাতের সঙ্গে ঐ সব অধীন দেশের কলের মাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এই ভয়ে। সেখানকার তেল, কয়লা, পাট, তুলা প্রভৃতি মাল নিজে একচেটিয়া করিয়া লইল। সেই সব দিয়া নিজের দেশের কারখানায় কাপড় বুনিয়া শাসক দেশের ধনিকেরা সেই পরাজিত দেশেই চালায় একচেটিয়া ব্যবসায়। ইহাকেই বলে ঔপনিবেশিক (colonial) ব্যবস্থা। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বড় কারখানারও দিন আসিল। তখন ক্রমে নিজের দেশের ব্যাংক, ইন্সিওরেন্স কোম্পানি প্রভৃতি হইয়া পড়িল এই সব ব্যবসায়ের মালিক। এই অবস্থাটাতেই লগ্নী পুঁজি (Finance Capital) হয় শিল্পের মালিক। শোষণের নেশা বাড়িয়া গেল, অথচ শোষিতদের রক্তল্পতা দেখা দিতেছে। পরাধীন দেশের নিজের হাতে শিল্প নাই, আছে শুধু চাষী; সেই চাষের উপর সবাই নির্ভর করে—রাজা-রাজড়া, জমিদার ও তালুকদার, মহাজন তো আছেই, সরকারের সমস্ত পাওনাও আছে, বড় মাহিনার কর্মচারী আছে, বিলাতী পেনশেন, ভাতা প্রভৃতিও আছে,—ইহাদের সকলকার এই লুটের বোঝা পড়িল গিয়া দেশের উৎপাদকের উপরে। কে সেই উৎপাদক? মুলত চাষী, আর জনকয়েক খনির মজুর ও কলকারখানার মজুর। ইহারা এই বোঝা বহন করিতে করিতে শেষে মুখ থুব্‌ড়াইয়া পড়ে,—দেশের রাজস্ব যোগাইতে আর পারে না, সাম্রাজ্যবাদীর চালানো মালও কিনিতে পারে না, পাওনাদারের পাওনাও পারেনা মিটাইতে।

এই যখন সাম্রাজ্যের দশা, অন্যদিকেও তখন পুঁজিতন্ত্র নানারূপেই অচল হইয়া পড়িতেছে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক জগতে পুঁজিদার জাতের মধ্যে রেষারেষি বাড়ে, যুদ্ধ বাধে, কিংবা বাধে-বাধে। শিল্পপ্রধান প্রত্যেক জাতিই নিজের শিল্পকে বাঁচাইতে চায় অন্যের শিল্পের আক্রমণ হইতে। তাই প্রত্যেক রাষ্ট্রই শুল্ক-প্রাচীরে নিজ নিজ দেশ ঘিরিয়া লয়। ফলে সকলকারই ক্রয়বাণিজ্য বাধা পায়। তাহাই ক্রমে আন্তর্জাতিক শুল্ক-দ্বন্দ্বরূপে দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, শিল্পোন্নত দেশের ঘরের মধ্যেও পুঁজিদার মুনাফা জমাইয়া ক্রমেই স্ফীত হয়, অথচ বঞ্চিত মজুর দুর্দশাপন্ন থাকে। ইহাতে দেশের ভিতরেও দুই শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য বাড়ে, বিরোধ ঘনাইয়া উঠে, শ্রেণী-সংগ্রাম দেখা দেয়—মূলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব আবার প্রকট হয়। তৃতীয়ত, ক্রমেই নূতন যন্ত্র আবিষ্কারে মজুরদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বাড়ে; আর মজুরেরাই যখন দেশে-বিদেশে সংখ্যায় বেশি তখন তাহারা

বেকার হইলে পণ্যক্রয়কারীর সংখ্যাও আসলে কমে। ফলে, উন্নততর যন্ত্রে পণ্য বেশি উৎপন্ন হয়; কিন্তু পণ্য বিক্রয় হয় কম। বিক্রয় না হইলে মুনাফা নাই; তাই পুঁজিদারও তখন কল বন্ধ রাখে। এইভাবে বাড়ে মজুরের বেকারসংখ্যা—আরও জমে দ্বন্দ্ব; দেখা দেয় আর্থিক সংকট।

এইজন্যই উৎপাদন-শক্তি প্রচুর বৃদ্ধি পাইলেও মুনাফাতন্ত্রের চক্রান্তে সেই উৎপাদনের সার্থকতা সমাজ আজ ভোগ করিতে পারিতেছে না। যদি 'ব্যক্তিগত মুনাফার' (private profit) দিন শেষ হইত, তাহা হইলে এই যুগের এই ঐশ্বর্য আয়ত্ত করিতে নাকি প্রত্যেক মানুষের সপ্তাহে মাত্র চার ঘণ্টা পরিশ্রমই হইত যথেষ্ট;—অবশ্য ইহাও ছিল ১৯৩০-৩৫ এর আমলের হিসাব। তাহার পরে যন্ত্র-বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের জন্য এখন পর্যন্ত চলিয়াছে এই উৎপাদনে, বণ্টনে, বিনিময়ে একটা অরাজকতা! তাই অর্থ-সংকট দেখা দিতেছে, যুদ্ধ বাধিতেছে। অন্যদিকে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম অপরাজেয় হইয়া উঠিতেছে,—আর সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থারও সাম্রাজ্যবাদের আয়ু শেষ হইতেছে, পুঁজিতন্ত্রেরও দম ফুরাইয়া আসিতেছে।

ভবিষ্যৎ ও সমাজতন্ত্র [১]

সেই নূতন সমাজতন্ত্রের যুগের বিশেষ রূপ কী হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে এখনো বলা শক্ত—কিন্তু ১৯১৭ হইতে ১৯৬৩ এই ৪৬ বৎসরের সোভিয়েততন্ত্রের বিকাশ হইতে তাহার রূপ এখন অনেকাংশেই বুঝা যায়। উহা আর এখন শুধু একটা অস্পষ্ট আনুমানিক বিষয় নাই। বুঝিতে পারি—এখনকার সমষ্টিগত উৎপাদনের মত সমষ্টিগত সম্পত্তিরও দিন আসিতেছে। অর্থাৎ কলকারখানা ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি থাকিবে না, হইবে সাধারণের সম্পত্তি। জমি প্রথমটা হয়ত হইবে চাষীর, পরে হইবে সাধারণের, চাষীরা তাহাতে সমবায় সূত্রে সম্মিলিত হইয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন করিবে শস্য। অর্থাৎ চাষীর কিংবা মজুরের উৎপন্ন দ্রব্যের অধিকারী হইবে তাহারা নিজেরা—

১ ১৯৪০-৪৮ সালের লেখা এই প্রস্তাবটি রাখা হইল—কারণ, ১৫ বৎসর পরে ও মূলত তাহা মিথ্যা নয়। কিন্তু ১৫ বৎসর সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে যে সংশয় দেখা দিয়াছে ও সমাজতন্ত্রেরই গঠনে যে ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে, তাহা না জানিলে, না বুঝিলে এই সব অভিজ্ঞতার [illegible] না। অতএব সেই সমাজতন্ত্র গঠনের চেষ্টার মূলবিচার করা হইল পরবর্তী অধ্যায়ে।

কোন মালিক পক্ষ নয়। সেই উদ্বৃত্ত মূল্যের খানিকটা থাকিবে নূতন যন্ত্রপাতি আয়ত্ত করার জন্য, কিন্তু মুনাফা না থাকাতে কেহ শ্রমিককে ঠকাইতে পারিবে না। আর সমাজে মুনাফাদার না থাকাতে একটা আর্থিক সাম্য ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। গণতন্ত্রের যাহা আসল লক্ষ্য—রাষ্ট্রে ও জীবনে মানুষের সমান অধিকার লাভ,—তাহাই এইভাবে ক্রমশ আয়ত্ত হইবে। এই যুগ আসিয়াছে সোভিয়েত ভূমিতে, তাহার জীবনযাত্রায় ও মানস-সম্পদে সেই রূপ দেখা দিয়াছে। অবশ্য সেখানেও এখনোও মাত্র উহার প্রথম ধাপ 'সমাজতন্ত্র' চলিতেছে, উহার নীতি এই—"From each one according to his ability, to each one according to his work."—অর্থাৎ কাজ অনুসারে বেতন। কাজেই মানুষে মানুষে বেতনের পার্থক্য আছে এই 'সমাজতন্ত্র' বা সোশ্যালিজমের স্তরে। কিন্তু এই স্তরেও উৎপাদন-যন্ত্রের মালিক সমাজ, উহা কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। তাই কেহ কাহাকেও শোষণ করিতে পারে না। ব্যক্তিগত মুনাফার আয় শেষ হওয়াতে সে দেশে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগও পরিত্যক্ত হইয়াছে। অন্য প্রধান প্রধান দেশেও এইরূপ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ ঘটিলে তবেই সোভিয়েত দেশ নিষ্কণ্টকে 'সমাজতন্ত্র' হইতে 'সাম্যবাদী সমাজের' দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে (১৯৪৫) পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র বিস্তৃত হওয়ায় ঐসব দিকে পদক্ষেপ আরম্ভ হইবে বলিয়া মনে হয়। পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক শক্তিদের উচ্ছেদ ঘটিলে মানুষও বিজ্ঞানের পূর্ণ প্রয়োগ করিতে পারিবে, আপনার সুস্থির পরিকল্পনা বা প্ল্যানিংএর সহায়ে কঠিন পরিশ্রমের হাত হইতে মুক্তি পাইবে। বিজ্ঞান এখনই সেই আশীর্বাদ কতকটা সম্ভব করিতে পারে, সাম্যবাদে তাহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারিবে। তাহা হইলে—"Man will at once leap from the realm of necessity to the realm of freedom." তাহাতে মানুষ ক্রমশ বাধ্যবাধকতার, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক ও বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াতে নিজের ব্যক্তি-স্বরূপকে সত্যরূপে চিনিতে পারিবে। সেই ব্যক্তিসত্তা সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব মানিয়া সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে—এখনকার মত খণ্ডিত হইয়া যাইবে না। সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায়ও এইরূপে মানবপ্রকৃতির নূতন বিকাশ এক-আধ দিনে সম্ভব হয় না—সমাজতন্ত্র বহুদেশে বিস্তৃত ও পৃথিবীতে বিপদমুক্ত না হইতে উচ্চ ব্যক্তিত্বের বিকাশ সেখানেও বাধামুক্ত হয় না। সেখানেও কিছু স্বার্থবুদ্ধি, দুর্নীতি থাকে।

তবে, যখন শোষক ও শোষিতই থাকিবে না, তখন যে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ ও তাগিদ কমিয়া যাইবে, তাহা সহজবোধ্য। সেই পথেই অবশেষে, ধীরে ধীরে আসিবে সেই দিন যেই দিন এই নীতি গ্রাহ্য—"From each one according to his ability, to each one according to his need,"—উহাই কমিউনিজমের সুর।

কিন্তু কথা হইল, মানুষের এই ভাবী যুগ আসিবে কি করিয়া? সামন্ত যুগ ভাঙিয়া নূতন যুগ আনিয়াছে (সামান্তদের) নিম্নেকার বুর্জোয়ারা। বুর্জোয়া যুগও তেমনি শেষ হইবে এই যুগে যাহারা উৎপাদন শক্তিকে বাড়াইতে পারে তাহাদের হাতে—তাহারা মজুর ও তাহাদের সহযোগী কিসান। আর হয়ত এই গণশক্তির পিছনে থাকিবে সেই নিম্নমধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী দল, যাহারা যুক্তি দিয়া বুঝিতেছে কেন বর্তমান অবস্থা অচল, আর কী হইবে ভবিষ্যৎ। এই যে রূপান্তরের পথ তাহা যতই সুগম হইবে ততই সমাজের মানুষ বুঝিতে পারিবে ইহার আবশ্যকতা ও ইহার অনিবার্যতা। এই জ্ঞানটা সমাজের সর্বস্তরে ছড়াইয়া দেওয়াই তাই প্রকৃত শান্তিকামীরও কাজ। এই চেতনা (cousciousness) জনসাধারণের মধ্যে, মজুরের মধ্যে কিসানের মধ্যে প্রাণের দায়েই আসিতেছে; বুদ্ধিজীবীরাও নিজেদের বেকার দশায় তাহা বুঝিতে পারিতেছে। তবুও সচেতন হইতে হইবে বুদ্ধিজীবীদেরই বেশি, চেতনা-সঞ্চারের দায়িত্ব তাহাদেরই হাতে, তাহাদেরই হাতে এখন পর্যন্ত সংস্কৃতির দায়ভাগ।

ইতিহাসের ছন্দ

মানুষের ইতিহাসের এই এক নিঃশ্বাসে দেওয়া অস্পষ্ট আভাস, এই বিশ্ববীক্ষা (Weltanschaung), আমাদের সম্মুখে রাখা দরকার,—জগৎ ও জীবনের দূরপ্রবাহী স্রোতের মধ্যে আমরা কোথায় দাঁড়াইয়াছি দরকার তাহা আমাদের বুঝা। বলা কি আবার প্রয়োজন, কোনো দেশের ইতিহাসই অন্য কোনো দেশের ইতিহাসের শুধুমাত্র পুনরুক্তি হয় না? ইতিহাস পয়ার ছন্দে লেখা পাঁচালী নয়, ইতিহাস অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মহাকাব্য। তাহার ছন্দের মিল পংক্তির অভ্যন্তরে; সূক্ষ্মতর নিবিড়তর সেই মিল। মানব-ইতিহাসের সেই বিরাট ছন্দের সঙ্গে স্বদেশের ইতিহাসের ছন্দটিও মিলাইয়া পড়িতে হয়। ইতিহাসের

এই পটভূমিকায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাটিকেও যাচাই করিতে হইবে এইরূপ বাস্তবদৃষ্টিতে। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব দেশে ও বিদেশে ইতিহাসের কোন্ নূতন রূপ প্রকাশিত হইতেছে—সংস্কৃতির রূপান্তর কেমন করিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—আমাদেরও সংস্কৃতি সকল জাতির সংস্কৃতির মতো কি করিয়া এক বিশ্বসংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হইতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী

ইতিহাসের ধারা—অমিত সেন

মানব সমাজ—রাহুল সাংকৃত্যায়ন

পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্র—এঙ্গেলস্

Imperialism—Lenin.
On Religion—Lenin.
What Happened in History—Gordon Childe (Pelican).
Man Makes Himself— ,, ,, (Watts & Co).
A Short History of Culture—Jack Lindsay.
Ancient Society—Morgan.
From Savagery to Civilisation—Graham Clark (Cobbett).
Science of Life—H. G. Wells, Julian Huxley, C. P. Wells.
The Story of Tools—Gordon Childe (Cobbett, London).

দ্বিতীয় ভাগ

ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশধারা

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা ও আদিরূপ

ভারতবর্ষের যে সংস্কৃতি নানা ভাঙা-গড়ার মধ্যদিয়া আমাদের হাতে আসিয়া পৌছিয়াছে তাহা প্রধানত কৃষিজীবী সমাজের সংস্কৃতি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতেই অবশ্য ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্প-উদ্যোগের সূচনা হইতে থাকে। তথাপি .দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের জীবনে বা মনে শিল্পযুগের রঙ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। তখনো ভারতীয় সমাজ প্রধানত কৃষি-নির্ভরই ছিল। কৃষি-সমাজ একান্তভাবেই প্রকৃতির নিয়মে চলে, ঋতুর সঙ্গে তাহার ভাগ্য বিজড়িত। কৃষি-সমাজের সংস্কৃতিতে, তাহার জীবন-যাত্রা ও মানস-সৃষ্টিতেও তাই এই বহিঃপ্রকৃতির প্রভাব প্রবল। কৃষিযুগে তাই বিশ্ব-প্রকৃতির নিকট মানবপ্রকৃতির বশ্যতার, অসহায়তার ও আত্মসমর্পণের চিহ্ন বেশি লক্ষিত হয়।

কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের মানুষেরাও তাই প্রধানতঃ আত্ম-নির্ভরশীল নহে। স্বভাবতই উপরের দেবতার দিকে চাহিয়া থাকে, অর্থাৎ অদৃষ্টবাদী ও রহস্যবাদী। তাহাদের সাহিত্যে, দর্শনেও তাই মানুষের বিজয়ের স্তব অল্প। আত্মপ্রত্যয় তাহাতে নাই, আছে অদৃষ্টবাদ, ভাববাদ ও সহজ আত্মসমর্পণ। ইহা কৃষি-সংস্কৃতিরই সাধারণ লক্ষণ। এই কারণেই প্রাচীন কৃষিসমাজে অদৃষ্টবাদ ও অধ্যাত্মবাদ স্বাভাবিক। তাহার উপর নানা বার পরাজয়ে ভাববাদ ভারতীয় সংস্কৃতির একটা বড় লক্ষণ হইয়া রহিয়াছে।

ভারতবর্ষের এই সংস্কৃতি অবশ্য আজ ভাঙিতে বসিয়াছে ; ইহারই রূপান্তর আমরা চোখের সম্মুখে দেখিতেছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ১৯৪৭-এর রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়া এই প্রকাণ্ড সত্য আংশিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, অবশ্য সমাজ ও রাষ্ট্রের সেই প্রয়োজনীয় রূপান্তর এখনো বহুদিকে অসমাপ্ত। তথাপি এই ভারতীয় সংস্কৃতির একটা সামান্য পরিচয় আমরা গ্রহণ করিতে পারি—বুঝিয়া দেখিতে পারি তাহার খাঁটি বৈশিষ্ট্য, ও আসল বৈচিত্র্য। ভারতীয় সংস্কৃতি মূলত কৃষিগত, ইহাতে ভুল নাই। কিন্তু এখানে শিল্পযুগ

আসিয়াছে ;—আগামী দিনে ভারতে শিল্প-উৎপাদনের শক্তিও ক্রমশ প্রসারিত হইতে বাধ্য, তাহাও ভোলা সম্ভব নয়। তখন শিল্প-প্রধান সভ্যতার লক্ষণও ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রকাশ পাইবে। কিন্তু কৃষি-সভ্যতার যে প্রধান দুই-একটি লক্ষণ বা বিশেষত্ব এই ভূখণ্ডে এতদিন স্পষ্ট দেখা গিয়াছে তাহার পরিচয় লওয়া সমীচীন।

ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রধান লক্ষণ মনে হয় ইহার **ধারাবাহিকতা**। এখানে কৃষি-সভ্যতা খুব দীর্ঘদিন টিঁকিতে পারিয়াছে। ইহা আরম্ভ হইয়াছে অনেক দিন—অন্তত হাজার পাঁচ বৎসর পূর্বে, আর চলিতেছে এখনো। কৃষিকার্য এ দেশে ব্রিটেনের মত একেবারে নগণ্য জীবিকাপ্রণালীতে বোধহয় কখনো পরিণত হইবে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ভূমির মত এই দেশেও শিল্প-চালিত কৃষির প্রভাব যথেষ্ট থাকিতে পারে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত কৃষি-সভ্যতার এই দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রসার সম্ভব হইয়াছে প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে ; সিন্ধু, গঙ্গা, গোদাবরী, কাবেরী প্রভৃতি নদী ও বিস্তৃত সমতলভূমি কৃষি-সমাজের বিকাশের পক্ষে ছিল পরম অনুকূল। আর 'দেবতাত্মা হিমালয়' ভারতীয় সমাজকে অনেকাংশে বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু এই কৃষি-সভ্যতাও দ্বন্দ্ববিরোধ বর্জিত নয়, ইহাতেও নানা বিপর্যয় ঘটিয়াছে। এই দীর্ঘ-জীবনের সম্পদ তবু ভারতবাসী মোটের উপর সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছে ; নীল-নদের উপকূলস্থ সভ্যতার মত, তাইগ্রিস-ইউফ্রেতিসের মধ্যবর্তী অঞ্চলের সভ্যতার মত উহা লুপ্ত হইয়া যায় নাই। এখানেও মাঝে মাঝে বড় বড় সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, 'অন্ধকার যুগ' আসিয়াছে, বহুকাল অনেক অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় সংবাদও বিশেষ পাওয়া যায় না ;—এই সব কথা সত্য। তথাপি তখনো সংস্কৃতির ধারা একেবারে মিলাইয়া যায় নাই, তাহা বুঝা যায়। ধ্বংসের মধ্য দিয়াও ইহার ধারাবাহিকতা অনেক জিনিস জীয়াইয়া রাখিয়াছে,—কোথাও নূতনকে একেবারে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে, কোথাও উহাকে রাখিয়াছে টানিয়া-বুনিয়া আপনার সঙ্গে শুধু যুক্ত করিয়া। এইরূপ নমনীয়তা-**সহনশীলতা**ও ভারতীয় সংস্কৃতির ছিল, আর উহাই তাহার দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহাকে কোন কোন

দার্শনিক বলিয়াছেন—ভারতবর্ষের সমন্বয়-শক্তি ; কেহ বলিয়াছেন—বহুকে এক করিবার সাধনা ; আর কেহ বা বলিয়াছেন—সবল গ্রহণশীলতা ; আর অন্য কেহ—অক্ষম নমনীয়তা। যাহাই তাহা হউক, আমাদের বর্তমান কালের সংস্কৃতির মধ্যেও এই দুই কারণে বহু বহু দিনের পুরাতন বীজকণা জমা হইয়া আছে, অতীতেরও নানা পর্যায়ের উদ্ভাবনা মিলাইয়া আছে, ইহা সর্বদাই মনে রাখা প্রয়োজন। আর তাহার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বপ্রধান লক্ষণও আমাদের সহজেই চোখে পড়ে—ইহার **বৈচিত্র্য**। পুরাতন কিছুকে আমরা একেবারে বিলুপ্ত হইতে দিই নাই ; আদিম জীবন-যাত্রার ছাপ নানাখানে দেখা যায়। আবার পরিবর্তনও ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষ বহু জাতির দেশ, দেশও প্রকাণ্ড, প্রায় একটি মহাদেশ। কাজেই বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ধ্যান-ধারনা উদ্ভূত ও বিকশিত (evolved) হইয়াছে, আমরা তাহাও নানাভাবে কালধর্ম, লোক-আচার, বা বিশেষ বর্ণের বা বিশেষ অঞ্চলের আচারধর্ম বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। ইহা ছাড়া বারেবারে বিদেশী শাসক আসিয়াছে ; বিদেশী-উদ্ভাবিত জীবিকা-ধারা ও উহার ধ্যান-ধারণা ভারতবর্ষেও প্রসারিত ('diffused') হইয়াছে—যখনি ভারতবর্ষে তদুপযোগী প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ তাহা লাভ করিয়াছে। সেই সব 'দান' আসিয়া ভারতের নিজস্ব 'অবদানকে' আরও নূতন করিয়া দিয়াছে। তাই সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতির একটা মোটামুটি—অত্যন্ত অস্পষ্ট হইলেও—'ঐক্যবদ্ধ' রূপ যেমন আছে, তেমনি আছে এই ভারতীয় সংস্কৃতির অফুরন্ত-বৈচিত্র্য। '**বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য**', ইহাও ভারতীয় সংস্কৃতির একটা বড় লক্ষণ ও সাধনা।

বৈশিষ্ট্যের অর্থ

ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য লইয়া যাঁহারা গর্ব করেন তাঁহারা বলিতে চান —ভারতীয় সংস্কৃতি অনাদি-অতীত, অপরিবর্তনীয় ; তাহা এক শাশ্বত সম্পদ। কিন্তু ইহার বৈশিষ্ট্য হইতেই প্রমাণ যে, (১) ভারতীয় সংস্কৃতি অপরিবর্তনীয় নয়, তাহার রূপান্তর হইয়াছে বারে বারে। (২) ভারতের একত্ব সাংস্কৃতিক হিসাবে সত্য এই কারণে যে, ভারতীয় সংস্কৃতি বৈচিত্র্যের সমাহার। (৩) এই সংস্কৃতি প্রাচীন হইলেও পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা নয়। জীবিত সভ্যতার

মধ্যে চীনা সভ্যতাও এমনি দীর্ঘায়ুর গর্ব করিতে পারে। (৪) মোটামুটি এই সংস্কৃতি সর্বাংশেই কৃষিযুগের মধ্যেই নিবদ্ধ।

সঙ্গে সঙ্গে স্মরণীয়: প্রথমত, কৃষি-সভ্যতার পূর্বেও মানুষ জীবিকা-সংগ্রামে ও প্রকৃতি-জয়ে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে—ভারতবর্ষেও সেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সংস্কৃতির চিহ্ন রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, কৃষি-সভ্যতাও আবার নানা স্তরের মধ্য দিয়া ক্রমশ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে—কোনো একটি বিশেষ স্তরে আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই, থাকিলে তাহারও মৃত্যু ছিল অনিবার্য। মোটামুটি ভারতীয় সংস্কৃতিতেও কৃষি-সভ্যতার সেই স্তরগুলি দেখিতে পাই। আর স্মরণীয় এই যে, কি প্রাগৈতিহাসিক কালে, কি ঐতিহাসিক কালে—এই কৃষি-সভ্যতার কাঠামোর মধ্যেও—সর্বস্তরে ও সর্বদেশেই যেমন, তেমনি ভারতবর্ষেও দেখিতে পাই,—জীবনযাত্রার নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া মানুষ পরস্পরের সম্পর্কের নূতন পরিবর্তন সাধিত করিয়াছে; আর সেই সামাজিক ব্যবস্থা ও আচার-বিচারকে অবলম্বন করিয়া আবার তাহার মানস-লোক নূতন সৃষ্টিতে (creations) মঞ্জরিত হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতিরও স্বরূপ বুঝিতে হইলে উহার বিভিন্ন যুগের পরিচয় এইরূপ ভাবেই গ্রহণ সম্ভব। সমাজের প্রত্যেক যুগের উপকরণগত, সমাজগত এবং মানসগত রূপ—এই তিন অঙ্গ, তিন অবয়ব, উহাদের পরস্পর সম্পর্ক ও সক্রিয় পরিণতি—এই সব প্রত্যেক স্তরেই বুঝিয়া দেখা প্রয়োজন;—তবেই এই পরিচয় বাস্তব ও সত্য হয়।

কিন্তু দেখিয়াছি, আমরা সচরাচর ভারতীয় সংস্কৃতির হিসাব লই অন্য রূপে। হয়ত ধর্ম দ্বারা; যেমন, হিন্দু সংস্কৃতি, বৌদ্ধ সংস্কৃতি বা ভারতীয় মুসলমান সংস্কৃতি। কিংবা ভৌগোলিক ভাগের দ্বারা; যেমন, বাংলার কাল্‌চার, "ভাগীরথ কাল্‌চার।" কিংবা ভাষাগত জাতি হিসাবে; যেমন, তামিল সংস্কৃতি, অন্ধ্র সংস্কৃতি, বাঙালী সংস্কৃতি, ইত্যাদি। বলিয়াছি, এই সব হিসাব যে একেবারে মিথ্যা তাহা নয়। ভারতীয় মুসলমান সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতিতে তফাৎ নিশ্চয়ই আছে। 'ভাগীরথ কালচারের' সঙ্গে নিশ্চয় পদ্মাপারের জীবন-পন্থারও পার্থক্য আছে। বাঙালীর ও হিন্দুস্থানীর কাল্‌চারেও তফাৎ আছে। কিন্তু এই সবই গৌণ তফাৎ। বরং এই বিভিন্ন ধরণের বাহ্য লক্ষণই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ। বারেবারেই মনে রাখা দরকার, সংস্কৃতির বিচারক্ষেত্রে মূলসূত্র ধর্ম নয়, দেশ নয়, জাতি নয়। সেই সূত্র জীবনযাত্রার বাস্তব উপকরণ, সামাজিক ব্যবস্থা, এবং তাহারই সহায়তায়

স্বষ্ট মানসিক সম্পদ। তাই, এই দিক হইতেই ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমপরি-বর্তিত ধারাও বিচার করিতে হয়।

প্রমাণ-পঞ্জী

কিন্তু কথা এই, জীবনযাত্রার বস্তু-উপকরণ ক্রমশই পরিবর্তিত হয়, তাই সমাজও পরিবর্তিত হয়, মানসিক রূপেরও পরিবর্তন ঘটে; তাহা হইলে ভারতবর্ষের প্রথম দিককার অধিবাসীদের প্রাথমিক জীবনযাত্রার রূপ আমরা জানিতে পারি কোথা হইতে? ইহার উত্তর অবশ্য আজ সুবিদিত। যে সব বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষ প্রাচীন মিশর, সুমের, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছে, সেই সব বৈজ্ঞানিক উপায়েই প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসও আমরা জানিতে পারি। এখানে সেই সব উপায়ের কথা আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। মোটামুটি এই বিদ্যারই নাম পুরাতত্ত্ব বা প্রত্নবিদ্যা। ভূতত্ত্ব, প্রত্নজীববিদ্যা ও নৃতত্ত্ব লইয়া ইহা শুরু হয়। প্রথমত, ভূতত্ত্ব বলিয়া দেয় কোন্ ভূ-কালে, কোন্ ভূখণ্ডে মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল কিরূপ। সেই নানা ভূস্তরে লুপ্ত জীবের হাড়গোড়, খুলি লইয়া আবার গবেষণা করে প্রত্নজীববিদ্যা। তারপর নৃতত্ত্বের বিবিধ শাখা বলিয়া দেয় কোন্ দিকে মানুষ দেহ-মন-জীবিকায় কোন্ রূপ গ্রহণ করিয়াছে। পুরাতত্ত্ব প্রাচীনকালের মানুষের ধ্বংসস্তূপের, ভূগর্ভের ও গুহা-গহ্বরের লুপ্ত ও লুক্কায়িত সাক্ষ্য খুঁজিয়া বাহির করে। এদিকে জাতিতত্ত্ব একদিকে বর্তমানের মানব-দেহের মাথা, চোখ, নাক, চুল, চোয়াল, নানা অবয়বের মাপ-জোঁক লইয়া তাহার মৌলিক বিবিধ গঠন বিশ্লেষণ করিয়া দেয়; আবার সেই দেহ-পরিমাণ-বিদ্যার দিক হইতেই তারপর পুরাতত্ত্বের প্রমাণের সঙ্গে মিলাইয়া দেখে প্রাচীন মানুষের অনুরূপ দেহাবশেষের প্রমাণগুলি। সমাজ-তত্ত্বও আধুনিক অনগ্রসর ও অগ্রসর মানব-গোষ্ঠীর রীতিনীতি আচারবিচারকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া বিশ্লেষণ করিয়া তাহার আদিম মূলকে বাহির করে। এমন কি, এইভাবে ভাষাতত্ত্ব পর্যন্ত মানুষের প্রাচীন সংস্কৃতির উপর এক-একবার এইরূপ অভিনব আলোকপাত করিতে পারে যে তাহা সাধারণত আমরা ভাবিতেই পারি না। এইসব বিবিধ বিজ্ঞানই সংস্কৃতির পথে আমাদের দিগ্‌দর্শনের পক্ষে নির্ভরযোগ্য যন্ত্র। মানব-সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক পরিচয়ে ইহাদের সাক্ষ্যই গ্রাহ্য—কল্পনাকুশল ভাবুকদলের ও ধর্মপরায়ণ

শাস্ত্রজ্ঞদের তাহাতে যতই আপত্তি থাকুক। অবশ্য এই বিবিধ শাখার প্রমাণসমূহ সবক্ষেত্রে পরস্পরের পরিপোষক নয়। তথাপি ইহাদের সকল সাক্ষ্য মিলাইয়া পাঠ করিলে প্রাচীনের একটা যুক্তিসহ ও বোধগম্য চিত্র লাভ করা যায়।—এইভাবেই পুরাতনের প্রমাণ-পঞ্জী সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হয়।

ভারতবর্ষে প্রস্তর-যুগের সভ্যতা

প্রস্তর-যুগের নিদর্শনগুলির কাল নিরূপণ ভূতাত্ত্বিকদের সহায়তাতেই করিতে হয়—এইরূপ প্রস্তর নিদর্শন ভারতবর্ষেও মিলে। বৈজ্ঞানিক কিন্তু ভারতবর্ষের প্রথম দিক্‌কার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার কথা, এমন কি, তাহাদের বাস্তব অবলম্বনের কথাও বেশি বলিতে পারেন না। ভূমিপৃষ্ঠের নানা স্তরে উত্তর-পশ্চিম ভারতের (পাকিস্তানে, শিবালিক অঞ্চলে ও হিমালয়ে), মধ্য ভারতের ও দক্ষিণ ভারতের শুষ্ক নদীতলে বা পর্বতকন্দরে অবশ্য প্রস্তরোপকরণ প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি পূর্ব ভারতেও এইরূপ যুগের তিনটি অঞ্চল স্বীকৃত হইয়াছে: আসামের নাগা পার্বত্য অঞ্চল ও তৎসংলগ্ন (?) চট্টগ্রাম (পাকিস্তান) অঞ্চলে; দ্বিতীয়ত দার্জিলিং ও হিমালয় অঞ্চলেও কিছুটা; আর পশ্চিমরাঢ় হইতে সাওঁতাল পরগনার আদিবাসী-অঞ্চলে উহার তৃতীয় ক্ষেত্র। ২৪ পরগনার বেড়াচাপার কাল, বর্ধমানের রাজার ঢিবির সম্বন্ধে স্থির করিয়া এখনো বলা যায় না—উহা তাম্র-প্রস্তর যুগের কিনা। তাহা হওয়া অসম্ভব নয়।

প্রাচীন ও নবীন, দুই প্রস্তর যুগের উপকরণই ভারতবর্ষে আছে—তাহার নানা স্তরের প্রমাণও রহিয়াছে। ইহার মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীন নিদর্শন সম্ভবত ঊর্ধ্ব-শিবালিক শৈলস্তরের মনুষ্য নির্মিত প্রাচীন প্রস্তর হাতিয়ারসমূহ—ইহাকে 'প্রাক্‌-সোয়ান্ প্রস্তরশিল্প'ও বলা হয়। ইহার পরে মোটামুটি দুইটি বিশিষ্ট ধারা দেখা যায়—উত্তরে সিন্ধু ও সোয়ান নদীর উপত্যকায়, দক্ষিণে নর্মদা ও দাক্ষিণাত্যের শৈলস্তরে। ইহার একটি 'সোয়ান উপকরণ' নামে, অন্যটি 'কারত্রাস উপকরণ' নামে অভিহিত হইতে পারে। উভয়ই 'প্রাচীন প্রস্তর-যুগে'র প্রমাণ। দক্ষিণাপথে এইরূপ প্রাচীন প্রস্তর-যুগের নিদর্শন চিঙ্গলিপুটের, এবং 'নব্য প্রস্তর-যুগে'র নিদর্শন দক্ষিণে বেরিলি জিলার ও ইউ-পি বা উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরের প্রাগৈতিহাসিক আবিষ্কারমালায় দেখা যায়। এইরূপ এক একটি স্তরের মধ্যে কত সুদীর্ঘ বিপুল প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা মনে

রাখা প্রয়োজন। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাগৈতিহাসিক কেন্দ্রের মত এই সব কোনো কোনো নিদর্শনও (যেমন, নিজাম রাজ্যের মস্‌কিতে) স্বর্ণখনির সন্নিকটেই লাভ করা যায়। খনির অভ্যন্তরে যে সে যুগের মানুষ নামিয়া সোনা কুড়াইয়াছে, তাহাতে তাই সন্দেহ নাই। অর্থাৎ 'অসভ্য' জাতিরাও স্বর্ণের সমাদর জানিত। এই স্বর্ণ-ব্যবহার অবশ্য নূতন প্রস্তর যুগেরও কালসূচনা করে। কারণ, ইহাতে বুঝা যায়, তখন ধাতুর মর্যাদা মানুষ বুঝিয়া উঠিতেছে। ইহা ছাড়া 'বৃহৎ-প্রস্তর' আচ্ছাদন (megalithic) হইতে তাহাদের জালায়-নিহিত শব-সংকার-পদ্ধতিও দেখিতে পাই। মৃতের সেই প্রকোষ্ঠে দেখি তাহাদের জীবন যাত্রার দ্রব্যাদি আছে,—মৃত্যুর পরেও মৃত মানুষের যেন ঐ সব ব্যবহার্য চাই! আর সঙ্গে সঙ্গে জানিতে পারি—মৃত্যু সম্বন্ধে ইহাদের ধারণা কিরূপ। প্রাচীন প্রস্তরযুগের প্রথম দিক হইতে নূতন প্রস্তরযুগের শেষ দিক পর্যন্ত 'হস্ত-কুঠার সভ্যতার' ('Hand-AxeCulture') নিদর্শন কাশ্মীরে, উত্তর মধ্য ও পশ্চিম ভারতেও যথেষ্ট আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার একটা স্তরবিভাগও করিতে পারিয়াছেন। তাহা হইতেও সে যুগের মানুষের জীবিকা ও জীবনের একটা অস্পষ্ট আভাস আমরা পাই। কিন্তু উহার বেশি তাহার সামাজিক রূপ জানিতে পারি না। আর তাহার মানসিক রূপেরও চিত্র পাই মাত্র ততটুকু যতটুকু আছে তাহার ঐ উপকরণ সমূহে। ইহার পরবর্তীকালের নিদর্শন পটোয়ার বা রাওলপিণ্ডির নিকটস্থ সোয়ান নদী উপত্যকার তথাকথিত "সোয়ান-সভ্যতা" ('Soan Culture')—পাথরের ছিল্‌কে ("flake industry') তাহাতে অপর্যাপ্ত। কিন্তু এই যুগের কোনো কোনো ভূ-পর্বের, যেমন সোলুট্রিয়ান ও ম্যাগ্‌ডালেনিয়ান্ পর্বের, নিদর্শন ভারতবর্ষে এখনো পাওয়া যায় নাই। এবং শেষ দিককার পাঞ্জাব, মধ্য ভারত ও দক্ষিণ ভারতের 'ক্ষুদ্র প্রস্তর, নিদর্শনের (মাইক্রোলিথিক) সঙ্গে আফ্রিকা ও সিরিয়ার অনুরূপ মধ্যপ্রস্তর পর্বের (মেসোলিথিক্) নিদর্শনের মিল আছে। নূতন প্রস্তরযুগের আদিক্ষণ (Proto-Neolithic) ও তাহার শেষ স্তর (Late Neolithic) পর্যন্ত সেই সব উপকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের সকল ক্ষেত্রেই এই মাইক্রোলিথিক্ প্রস্তর-যুগ নব্য প্রস্তরযুগে মিশিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীনগরের সন্নিকটস্থ বুর্জাহোম নামক স্থানের "বৃহৎ-প্রস্তর"-নিদর্শন-স্থলীতে পাওয়া গিয়াছে ইহারও পরেকার কালো বার্নিশ করা পোড়ামাটির জিনিস (ceramic ware)—ঠিক যেমনটি মোহেন-জো-দড়োতে আসিয়া পুরাতাত্ত্বিকের মিলিয়াছে। কিন্তু

ততক্ষণে প্রস্তর-যুগের মধ্যেই আমরা কৃষিযুগে আসিয়া পৌছিয়া গিয়াছি। নূতন প্রস্তর-যুগের সভ্যতা ভারতবর্ষে যে তাম্রপ্রস্তর (chalcolithic) যুগে উত্তীর্ণ হইতেছে, ইহা কাশ্মীর ও সিন্ধু উপত্যকার সেই নিদর্শন-সমূহ হইতে বুঝিতে পারি। তেমনি ঐ নিদর্শনগুলি হইতেই বুঝিতে পারি যে, নব্যপ্রস্তর যুগেরও মানবগণ প্রথম উত্তর-পশ্চিম ও সিন্ধু-উপত্যকা এবং ক্রমে তাহারও দক্ষিণস্থ নর্মদা উপত্যকার ও দক্ষিণাপথের উপর দিয়া ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন (দ্রষ্টব্য *An Outline of Racial Ethnology in India*, B. S. Guha, Royal Asiatic Society of Bengal, 1937,এবং '*Stone Age in India*, Krishnaswamy, *Ancient India*, No. 3 & No. 16) গঙ্গার উত্তরে ও পূর্বে ও প্রস্তরযুগের নিদর্শনের অভাব এখন নাই।১

১ 'ভারতবর্ষে প্রস্তর যুগ' বিষয়ক আবিষ্কৃত তথ্য ও তত্ত্বের একটি প্রামাণিক বিবরণ সংক্ষেপে দান করিয়াছিলেন সরকারী পুরাতত্ত্ব বিভাগের বুলেটিন 'Ancient India'র প্রথমে ৩য় সংখ্যায় (পৃঃ ১১-৫৭) এবং সম্প্রতি (১৯৬২) ১৬শ সংখ্যায় শ্রী ভি, ডি, কৃষ্ণস্বামী। সাধারণ পাঠকের নিকট সহজপাঠ্য না হইলেও প্রবন্ধটি তাহাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারে।— সোয়ান-প্রস্তর-শিল্প,' ও মাদ্রাজ প্রস্তর শিল্পের, এবং ১৬শ সংখ্যায় মধ্যভারত ও দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের তিন পৃথক ভাগের বিবরণ চিত্রাবলী ও 'প্রস্তর যুগের নিদর্শন সূচক ভারতবর্ষের মানচিত্র', প্রবন্ধের চিত্রসমূহ ও পরিভাষার নির্ঘণ্ট নানা তথ্য বুঝিবার পক্ষে অনেকটা সহায়তা করে। উপরেও এখানে তাহার সারাংশ এই গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। ভারতে আবিষ্কৃত প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রথম দিককার নিদর্শন মিলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে (অর্থাৎ পাকিস্তানের) প্রাক্-সোয়ান পাথরের ফ্লেক্ নিদর্শনে (শিবালিক পর্বতের উচ্চস্তরে উহা দেখা যায়)। ইহার পরে অনেক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরে মোটামুটি দুইটি শিল্পধারা দেখা দেয়:—একটিকে 'সোয়ান-শিল্পধারা' (ফ্লেক্ধারা) বলা হইয়াছে। প্রধানত উহার স্থান উত্তরে সিন্ধু ও সোয়ান নদীর উপত্যকায়। অন্যটিকে 'মাদ্রাজ শিল্পধারা' ("হস্ত কুঠার" ধারা) বলা হইত; প্রধানত দাক্ষিণাত্য ইহার কেন্দ্র, ইউরোপ-আফ্রিকার অনুরূপ ধারা ইহার সহিত তুলনীয়। ভারত-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রস্তর যুগের অঞ্চলগুলিকে (ঐ ১৬শ সংখ্যায়) তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) মধ্যাঞ্চল,—মধ্যভারত মহারাষ্ট্র গুজরাত ও দাক্ষিণাত্য; (২) দক্ষিণ কন্নড় ও সন্নিকটস্থ অঞ্চল। (৩) পূর্বাঞ্চল; আসামের নাগা দেশ এবং বাংলায় চট্টগ্রাম (ইহার সহিত মালয় যুনানের সম্পর্ক) এবং দার্জিলিং ও পশ্চিমরাঢ়। 'ক্ষুদ্র প্রস্তর' নিদর্শনগুলি পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের 'মেসোলিথিক' সন্ধিস্তরের সমতুল্য—প্রাচীন হইতে নব্য প্রস্তর যুগের সন্ধিকালের সৃষ্টি বলিয়া অনুমিত হয়—পাঞ্জাব, মধ্যভারত, গুজরাত, দক্ষিণ ভারতে এই ক্ষুদ্রপ্রস্তর নিদর্শনকেন্দ্র যথেষ্ট। কিন্তু নব্য প্রস্তর যুগের বীজক্ষেত্র ("প্রোটোলিথিক") উত্তর ও পশ্চিম ভারতেই সীমাবদ্ধ—সেখান হইতেই তাহা নব্য প্রস্তর যুগে দক্ষিণে প্রসারিত হয়, ইহা অনুমান করা চলে। বলা বাহুল্য, ভারতে আবিষ্কৃত এই সব বিবিধ স্তরের ও বিবিধ ধারার নিদর্শনের সহিত আফ্রিকার ও ইউরোপের, ও পশ্চিম এশিয়ার (নিকট প্রাচ্যের) অনুরূপ স্তরের ধারাগুলি নিঃসম্পর্কিত নয়। কিন্তু জাভার "হস্ত-কুঠার" প্রস্তর শিল্পের কোনো ধারা ব্রহ্মে মালয়ে পাওয়া যায় নাই। আবার জাভা ও ব্রহ্মের (এশিয়ায় চীনের প্রান্ত পর্যন্ত) অনুরূপ নিদর্শনের সহিত সোয়ান উপত্যকার ঐ জাতীয় নিদর্শনের পার্থক্য যথেষ্ট। গঙ্গারও পূর্ব দিকে ভারতবর্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। তাই পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার সহিত ভারতের সম্পর্ক আর অনুমান সাধ্য নয়, অনেকটা প্রমাণিত। জাতিতত্ত্বও সে সন্ধান দেয়।

ভারতের আদিবাসী

এই প্রকাণ্ড অঞ্চলের প্রাচীনতম আধিবাসীদের কথা আরও কিছু পরিমাণে বলিতে পারে জাতিতত্ত্ব। জাতিতত্ত্ব ভারতীয়দের দেহের গঠন বিশ্লেষণ করিয়া বলিতে চাহে—বর্তমান ভারতবাসীরও মধ্যে মোটামুটি এই কয়টি জাতির চিহ্ন এখনো লাভ কর যায় (*An Outline of Racial Ethnology in India* ঐ): (১) নিগ্রোবটু মানুষ:—আন্দামানে, মাদ্রাজ প্রদেশের আন্নাই-মালাই পর্বতের কাদর ও পুলয়ন, আসামের আঙ্গামী নাগা, আর রাজমহলের বাদাগাদের মধ্যে নাকি এই জাতির অস্তিত্বের প্রমাণ রহিয়াছে। এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে অবশ্য কেহ কেহ গভীর সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাও স্মরণীয়। কিন্তু একথা স্বীকার করিলে মনে হয়, দক্ষিণ ভারতের প্রাগৈতিহাসিক বৃহৎ-প্রস্তর-নিদর্শনগুলির সঙ্গে এই নিগ্রোবটু জাতীয় লোকদের সংযোগ থাকিবার কথা। "শিকারলব্ধ মাংস ও বন্য কন্দ মূল ইহাদের আহার ছিল, কৃষিকার্য ইহারা জানিত না এবং ইহাদের সভ্যতার কোনো বালাই ছিল না।" এক সময়ে আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষেও ভারত সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে এই জাতির বসবাস ও গতায়াত ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। হয়ত প্রস্তরযুগ জুড়িয়া ইহারাই ছিল ভারতের অধিবাসী। (২) আদি-অস্ট্রলয়েড্ বা অষ্ট্রিক, অর্থাৎ 'আদি পুরবীয়া' মানুষ:—ছোটনাগপুর ও মধ্য ভারতের মুণ্ডা, কোল, ভীল, কেরিয়, খরবার ভূমিজ, মালপাহাড়ী প্রভৃতি আজিকার 'আদিবাসী' (অবশ্য তাহাদেরও আদিতে নিগ্রোবটুরা হয়ত এই দেশে বাস করিত। তাহা সত্য হইলেও সেই নিগ্রোবটুদের সহিত অষ্ট্রিকাদেরও রক্তের সংমিশ্রণ নিশ্চয় ঘটিয়াছে), আর দাক্ষিণাত্যের চেঞ্চু, কুড়ম্ব, মালয়ন, য়েড়ুব প্রভৃতি গোষ্ঠীর মধ্যে সেই 'আদি পুরবীয়া' বংশধরদেরই এখনো পাওয়া যায়। দক্ষিণেই নাকি ইহাদের সঙ্গে নিগ্রোবটু সংমিশ্রণের চিহ্ন স্পষ্টতর। আমাদের সুপরিচিত খাসিয়া জাতি এই আদি-অস্ট্রলয়েড্ বা অস্ট্রিক জাতির খাঁটি নিদর্শন—ভাষা হিসাবেও বটে, জাতি হিসাবেও বটে। দাক্ষিণাত্যের টিনেভেলি জিলার 'বৃহৎ-প্রস্তরের' (মেগালিথিক্) নিদর্শনগুলির মধ্যে মানুষের দেহাবশেষও আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহাতে এই অষ্ট্রিক জাতীয় লোকেরই চিহ্ন দেখিতে পাই। মৃতের উপযোগী জীবনযাত্রার দ্রব্যাদি সেখানে রহিয়াছে ও মাটির জালায় ইহাদের

দেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে ; সেই শব ও উপকরণ দণ্ডায়মান সুবৃহৎ প্রস্তরের দ্বারা চিহ্নিত। ইহাতে বুঝিতে পারি মৃতকে ইহারাও একেবারে নিষ্প্রাণ মনে করিত না। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, তাহাদের বিস্তারের পথ ছিল এইরূপ : 'মনে হয়, ইন্দোচীনের কোথাও হয়ত এই জাতির প্রথম উদ্ভব ; তাহারপর দেশ-দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়া ইহাদেরই কোনো শাখা মালয় জাতিতে, পরে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে গিয়া পলেনিসীয় ও মেলেনসীয় জাতিতে, দক্ষিণ বর্মা ও শ্যামে মোন্ ও খ্মের প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের বিভিন্ন শাখা আসামের উপত্যকা-ভূমি দিয়া ভারতে আগমন করিতে থাকে।......উত্তর ভারতে ও বাঙ্গলাদেশে বিশুদ্ধ নিগ্রোবটু আর রহিল না।" ('জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য'—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ এবং *Ancient India*—Massoon-Oursel, Grabowska & Stein)। অবশ্য, ঠিক ইহার উল্টা পথও কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন :—ভূমধ্যসাগরের তীর হইতে বিস্তৃত হইয়া ভারতবর্ষের উপর দিয়া দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও উহার দ্বীপপুঞ্জে এই জাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

পূর্ব-ভারতের কৃষি-সভ্যতার প্রারম্ভ

এই অস্ট্রিক বা আদি-অস্ট্রেলয়েডদের সভ্যতার প্রমাণ অবশ্য ভাষাতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের মারফৎই আমরা পাই (কিন্তু ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত জাতিতত্ত্বের দিক হইতে ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে অনুধাবন করা কর্তব্য)। ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে আমাদের ভাষায় যেই-সব মূল শব্দ সম্ভবত অস্ট্রিক গোষ্ঠীর দান, মনে করিতে পারি সেই সব দ্রব্যের সঙ্গে অস্ট্রিকদেরই পরিচয় হয় সর্বাগ্রে। এই সব প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ভাষা-বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইহাদের সভ্যতার যে আভাস দিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে সে সভ্যতার বস্তু-উপকরণ ছিল এইরূপ : "অস্ট্রিক জাতীয় লোকেরাই ভারতে (পূর্ব ও মধ্য ভারতে ?) প্রথম কৃষিকার্য ও তদবলম্বনে সংঘবদ্ধ সুসভ্য জীবনের পত্তন করে। উহারা ধান, পান, কলা ও নারিকেলের চাষ করিত (দ্রষ্টব্য এই যে, বাংলাদেশে সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে এইসব কোনো-কোনো দ্রব্য না হইলে আজও চলে না।—বর্তমান লেখক); পাহাড়ের গা কাটিয়া ধানের ক্ষেত প্রস্তুত করিত।

প্রথমটা উহাদের চাষ ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলের জুমিয়াদের মত; লাঙ্গলের জন্য তীক্ষ্মমুখ কাষ্ঠদণ্ড ব্যবহার করিত (ধাতুর ব্যবহার তখনো জানা ছিল না বলিয়া)। ধনুর্বাণ ইহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল। একখণ্ড গুঁড়িকাঠে তৈয়ারী ডোঙ্গায় (দ্রষ্টব্য, আজও পূর্ব বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে তেমনি 'কোন্দা' বা খোঁদা নৌকা খালে-বিলে প্রধান বাহন।—বর্তমান লেখক) এবং কতকগুলি গুঁড়িকাঠ বাঁধিয়া তৈয়ারী ভেলার আকারের বড় বড় নৌকায় করিয়া উহারা বড় বড় নদী, এমন কি সাগরও পার হইত।" মোটামুটি এই জীবন চিত্র হয়ত গ্রহণযোগ্য। আসলে ইহা নব্য প্রস্তরযুগের 'বর্বর-জীবনে'র চিত্র, তাহা আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে দেখিয়াছি,—ভারতবর্ষের সেই সময়কার মানুষদের 'অষ্ট্রিক', বা যে জাতীয় বা যে গোষ্ঠীর বলিয়াই এখন আমরা নাম দিই। কৃষি-যুগের প্রথম সামাজিক রূপ ও গঠন এই সব দ্রব্যকে অবলম্বন করিয়াই এই দেশে গড়িয়া উঠে—ধান, পান, কলা, নারিকেল ইত্যাদি। ইহাদের সভ্য ও আদিবাসী দুই স্তরের বংশধরদের মধ্যে আজও অনেকাংশে তাহারই মূল রূপ হয়ত রক্ষিত হইতেছে।

কিন্তু 'বর্বর-যুগের' মানসিক ভাবনা ছিল কিরূপ? শব-সৎকার ও অন্যান্য পদ্ধতি হইতে তাহার যে আভাস অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স্থির করিয়াছেন তাহার সহিত পরবর্তী, এমন কি বর্তমান ভারতীয় অনুরূপ প্রথা ও ধারণার তুলনা চলে। এইরূপ তুলনায় দেখি যে, যেমন সেই আদি অস্ট্রলয়েডদের বা ঐরূপ প্রাচীন মানুষের উপকরণ ও আচার-ধারা এখনো আমরা অজ্ঞাতসারে কিছু কিছু বহন করিতেছি, তেমনি তাহাদের প্রাথমিক ভীতি, বিস্ময় ও পূজা ও ধর্মকর্মও নানা সূত্রে আমাদের 'অধ্যাত্ম-সম্পদের' মধ্যে আমাদের অজ্ঞাতে সঞ্জীবিত রহিয়াছে। "ইহারা মানুষের একাধিক আত্মায় বিশ্বাস করিত—মানুষের মৃত্যুর পরে তাহার আত্মা গাছে, পাহাড়ে, অথবা অন্য জীবজন্তুর ভিতরে প্রবেশ করিত, এইরূপই ধারণাই ইহাদের ছিল। এই ধারণাই পরবর্তীকালে ইহাদের লইয়া হিন্দুজাত সৃষ্টি হইবার পরে, হিন্দুদের মধ্যে উদ্ভূত পুনর্জন্মবাদে পরিণত হয়। শ্রাদ্ধের অনুরূপ রীতি—মৃতকে মধ্যে মধ্যে আহার্য দান —ইহাদের মধ্যেও ছিল বলিয়া মনে হয়। মৃতকে ইহারা হয় বৃক্ষ-সমাধি দিত, অর্থাৎ কাপড়ে বা বল্কলে জড়াইয়া বৃক্ষস্কন্ধে মৃতদেহ রাখিয়া দিত; অথবা ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া সমাধির উপরে দীর্ঘাকার প্রস্তরখণ্ড খাড়া করিয়া পুঁতিয়া দিত।...উত্তর ভারতে গঙ্গাতীরে প্রথমত এই অষ্ট্রিক জাতির লোকেরাই

বাস করে; সেখানে ইহারা কৃষিমূলক একটা সংস্কৃতি গড়িয়া তুলে। 'গঙ্গা' এই নামটি অষ্ট্রিক ভাষার শব্দ বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাদের কৃষিমূলক সংস্কৃতিই ভারতের সভ্যতার মৌলিক আধার বা ভিত্তি।"

যে কথাটি এইখানে প্রণিধানযোগ্য তাহা এই :—ভারতীয় সংস্কৃতি তখন হইতেই কৃষিগত; তাহার সেই কৃষিরূপ নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়াও সর্বাংশে পরিবর্তিত হয় নাই। তাই সেই আদিম ভিত্তি বা কৃষি যুগের প্রাথমিক দানের এত বিশেষভাবে পরিচয় আমরা গ্রহণ করিতে চাই—বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারে সেই জাতির বা গোষ্ঠীর নাম যাহাই স্থির হউক, তাহাতে মূলতঃ আসে যায় না। এইটুকু পরিচয় না লইলে ভারতীয় সভ্যতার এই দিককার রূপ আমাদের নিকট অস্পষ্ট থাকিয়া যাইবে, স্তরের পরে স্তরে ইহার যে পরিবর্তনও ঘটিয়াছে তাহারও মূল্য অপরিজ্ঞাত রহিবে,—বিশেষত যখন পূর্ব ও মধ্য ভারতের প্রাগৈতিহাসিক তথ্য এখনো বহু পরিমাণে অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই অষ্ট্রিক জাতির মানসিক প্রবণতার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখিত হইতে পারে। কিন্তু কোনো বাস্তব প্রাচীন প্রমাণের উপর তাহা গঠিত, না, আধুনিক অষ্ট্রিক বংশীয়দের মতিগতি ও অবস্থা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। অধ্যাপক মহাশয় বলিতেছেন :— 'অষ্ট্রিক জাতির নৈতিক প্রকৃতি এইরূপ ছিল বলিয়া মনে হয়—ইহারা সরল, নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, সহজেই অন্য প্রবল জাতির প্রভাবে আত্মসমর্পণকারী, কিঞ্চিৎ পরিমাণে কামুক, ভাবুক ও কল্পনাশীল, কবিত্বগুণযুক্ত, প্রফুল্লচিত্ত, দায়িত্বহীন, কিছু পরিমাণে অলস ও উৎসাহহীন, দৃঢ়তাবিহীন এবং সংহতিশক্তিতে হীন ছিল; কিন্তু লাঘব স্বীকার করার মধ্যেই ইহাদের অটুট প্রাণশক্তি নানা পরিবর্তনের মধ্যেও মৃত হয় নাই।...ইহা বেশ দৃঢ়নিশ্চয়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, ভারতের ধর্মানুষ্ঠানে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে—ধান, পান, হলুদ, সিন্দুর, কলা, সুপারি প্রভৃতির স্থান অষ্ট্রিক প্রভাবের ফল। অষ্ট্রিকেরা গো-পালন করিত না, কিন্তু বোধহয় তুলার কাপড় ইহারাই প্রথম প্রস্তুত করিয়াছিল।" এক একটা মানবযূথের মধ্যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণে মনের এক-একটা বিশেষ বিশেষ ঝোঁক বা প্রবণতা দেখা যায় বটে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহা "রক্তের গুণ" নয়; দ্বিতীয়ত, তাহাও আবার অপরিবর্তনীয় নয়; আর তৃতীয়ত, বর্তমানকালে কোন জাতিরই রক্ত অমিশ্রিত বা বিশুদ্ধ

নাই—সম্ভবত পূর্বেও বিশেষ ছিল না ; এই সব মনে রাখিয়া উপরকার উক্তিটি যথাভাবে গ্রহণ করা দরকার। উহা একটা অনুমান মাত্রই বলা চলে—সাধারণ যুক্তির অনুমান, বৈজ্ঞানিক যুক্তির অনুমান নয়।[১]

মোটামুটি ভারতীয় সংস্কৃতির খানিকটা প্রারম্ভ প্রায় আমরা এই সব বিবরণ হইতে বুঝিতে পারি। বিশেষত পুর্বভারতের জীবনযাত্রার বাস্তব উপকরণ, ইহার কৃষিমূলক সামাজিক রীতিনীতি ও ব্যবস্থা, এবং ইহার মানসিক ধারণা,— এই তিনেরই একটি আভাস পাই।

বহুশত বৎসর ধরিয়া এই যে কৃষি-সভ্যতা ভারতের নানা খণ্ডে এইরূপে ইতিহাসের অজ্ঞাতে কোনো স্থায়ী কীর্তি না রাখিয়া বহিয়া চলিয়াছিল, তাহা একই ভাবে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে নাই। তাহাও দিনের পর দিন বিকশিত হইয়া চলিয়াছে,—জীবিকার নূতন উপকরণ সন্ধান করিয়াছে, নূতন সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, দেশে সর্বত্র প্রস্তর-যুগ ছাড়াইয়া তাম্রযুগে তাহা পৌছাইল কিনা, ব্রোঞ্জ ও লৌহ প্রভৃতি ধাতব দ্রব্যের ব্যবহার আয়ত্ত করিল কিনা, তাহার কোনো সুনিশ্চিতনিদর্শন পাওয়া যায় নাই। বাঙলাদেশেও সম্প্রতি কয়েকটি প্রাচীন প্রাক্-ঐতিহাসিক নিদর্শনের কেন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা এখনো পরীক্ষাধীন। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উল্লেখিত 'নিষাদ', 'ভিল্ল-কোল্ল' প্রভৃতি আদিবাসী কোনো কোনো শাখা হয়ত আধুনিক কোল জাতির পূর্বপুরুষরূপে অরণ্য-পর্বতে শিকার করিয়াই বেড়াইত। 'নিষাদরা', আমাদের বিবেচনায়, সভ্যতার আদিম স্তরে নিবদ্ধ ছিল। 'কোল-ভীল' কিন্তু সে তুলনায় এক ধাপ উন্নত কৃষি-সমাজের জীবনযাত্রা বা চিন্তা-ভাবনা প্রথমে নিষাদদের মধ্যে উদ্ভূত হয় নাই—অন্য সমাজ হইতে পরোক্ষে তাহাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিতে পারে। তবে অনুমান করা যায়—এই অঞ্চলে কৃষি সেই অস্ট্রিকদের সময় হইতেই প্রচলিত ছিল।

১ অমুক 'জাতির' (race) মানসিক ধর্ম এইরূপ—এই মর্মের কথা বলার অর্থ—মানুষের চিন্তায় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও উৎপাদন-প্রথার প্রাধান্যকে পরোক্ষে অস্বীকার করা। স্বভাবতই শাসক-গোষ্ঠীর, বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবযুক্ত দেশের বৈজ্ঞানিকেরা, এইরূপ 'জাতির ধর্মের' উপর জোর দেন ;—সাম্রাজ্যবাদীরা 'প্রভুজাতি' (আর্য ?) আর শোষিতরা 'দাসজাতি', সাম্রাজ্যবাদী পণ্ডিতদের ইহা নানাভাবে প্রমাণ করা একটা নিয়ম। হিটলারী 'রক্তের মাহাত্ম্যবাদ' বা ব্লাড থিওরি উহারই চরম রূপ মাত্র—আর এই কথাটা যে কত অবৈজ্ঞানিক তাহাও এখন অন্তত স্পষ্ট। (দ্রষ্টব্য ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধাবলী।)

ভারতবর্ষে ধাতব যুগের প্রারম্ভ

উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে, হয়ত পূর্বাঞ্চলে অষ্ট্রিকদের এই 'বর্বর' জীবন যখন চলিতেছে, তখনি আর এক উন্নততর কৃষি-সভ্যতা আবির্ভূত হইতেছিল। অন্ততঃ সেখানেই ভারতের ধাতব যুগের সভ্যতার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কৃষি চলে ক্ষেত্রে, কৃষক সাধারণত গঠন করে গ্রাম, বাস করে গ্রামে। কৃষি-সভ্যতা তাই পল্লী-প্রধান। তবু এই সভ্যতা বাড়িয়া উঠিলে উৎপাদকের নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যখন খাদ্যাদি উৎপন্ন হয়, তখন বৃত্তিজীবী কারিগরেরাও উদ্ভূত হয়, শ্রমবিভাগ দেখা দেয়, এবং খাদ্য ও এই সব পণ্যের আদান-প্রদানের (exchange) প্রয়োজনে এক একটি পৌরকেন্দ্র বা নগর ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। এই সব কেন্দ্রের খাদ্য জোগায় চতুর্দিকের কৃষি-অঞ্চল; তাই কৃষি-সমাজের জীবন-যাত্রা কতকটা অগ্রসর হইলেই এইরূপ নগর পত্তন সম্ভব। সুমের, মিশরে যেমন, ভারতবর্ষে তেমনি এইরূপে দেখি এক পৌর সভ্যতাও গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্বতন কৃষিজীবীরা ছিল একান্ত ভাবে পল্লীবাসী। কিন্তু এই নূতন কৃষিজীবীদের মধ্যে ক্রমে তখন নগরেরও পত্তন হইতে শুরু করে। জাতি হিসাবে তাহারা কোনো বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত নয়; খুব সম্ভব তাহারা আসলে সেই সুমের-আক্কাদদেরও আত্মীয়, এমন কি হয়ত বা বর্তমান দ্রাবিড়-ভাষী জাতিদেরও সগোত্রের,—ভূমধ্য জাতিদের বংশধর বা জ্ঞাতি। ইহাদের বংশধারা লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে যে তর্ক আছে তাহা শেষ হয় নাই। কিন্তু সাধারণভাবে বলিতে পারি—প্রাচীন এশিয়াটিক সভ্যতার শাখারূপে উহার কৃষ্টিধারা তাহারা হয়ত বহিয়া আনিয়াছিল বা গ্রহণ করিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যভারতে এই সভ্যতার অনেক কেন্দ্র বর্তমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখন আর উহাকে 'সিন্ধু সভ্যতা' বলাও ঠিক নয়। পাকিস্তানের বালুচিস্তান, সিন্ধু, পশ্চিমপাঞ্জাব হইতে, ভারতবর্ষের গুজরাত, মধ্যভারত ও উত্তর প্রদেশের কোথাও কোথাও উহার কেন্দ্র ছিল। সর্বত্র উহা সম-বিকাশিত নয়। হরপ্পা মোহন-জো দড়োর মতো এত প্রচুর প্রমাণ আর কোথাও এখনো নাই। সাধারণ ভাবে 'হরপ্পা-সভ্যতা' বা 'সিন্ধু-সভ্যতা' বলিয়াই এখনো এই সর্বভারতীয় সভ্যতার পরিচয়। দেখা যায়, উহাতে প্রস্তরযুগের জীবন শেষ হইয়া অধিবাসীরা তখন ধাতুর ব্যবহার

আয়ত্ত করিয়াছে, তাম্রের উপকরণ লইয়া যাত্রা শুরু করিয়াছে, লৌহ-যুগে পৌছিতেছে,—কিন্তু মধ্যবর্তী ব্রোঞ্জযুগের কোনো নিদর্শন সেখানেও নাই। তথাপি তখন মানুষের সভ্যতায় এবং ভারতের কৃষি-সভ্যতায় দ্বিতীয় স্তরের সূচনা হইতেছে। ইহাই তাম্র-প্রস্তর (chalcolithic) যুগ। অষ্ট্রিকদের সভ্যতার সন্ধান দেয় আমাদের জাতি-বিজ্ঞান[১] ও ভাষা-বিজ্ঞান; আর এই ভারতীয় প্রাচীনতম পৌর-সংস্কৃতি আবিষ্কার করিয়াছে ভাবতীয় পুরাতত্ত্ব।

১ প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন জাতি-বিজ্ঞানের নৃতত্ত্বের চক্ষে বর্তমান ভারতবাসী কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। সংস্কৃতির এক-একটি যুগ হয়ত তাহাদের কাহারও কাহারও অতীতের সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত—যেমন নিগ্রোবটুদের সহিত প্রস্তর যুগ এবং আদি-অষ্ট্রলয়েডদের সহিত প্রস্তরের শেষ যুগ ও ধাতব যুগের প্রারম্ভকাল সংযুক্ত—ইত্যাদি। কিন্তু জাতিবিজ্ঞানের চক্ষে সেই সব যন্ত্র ও উপকরণ বড় কথা নয়; বড় কথা মানুষের দেহের মাপজোঁক। সেই হিসাবে ডাক্তার বিরজাশঙ্কর গুহ মহাশয়ের মতে (পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) বর্তমান ভারতবর্ষের এই সব জাতীয় লোক বসবাস করে, যথা:—(১) নিগ্রো বটু; পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে; (২) আদি-অষ্ট্রলয়েড: ইহাদের পরিচয়ও আমরা লইয়াছি; (৩) 'মূল লম্বা-মাথাওয়ালা জাতি'; দক্ষিণ ভারতের ও উত্তর ভারতের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ইহাদের পাওয়া যায়, (৪) 'বৃহৎ মস্তিষ্ক তাম্রযুগীয়' এবং তাহাদেরই একটু দুর্বল রূপ. সিন্ধু সৈভকের জাতি: হরপ্পা, মহেন-জো-দড়ো হইতে আধুনিক পাঞ্জাবীদের মধ্যে পর্যন্ত ইহাদের নিদর্শন মিলে—যদিও একথাও স্মরণীয় যে হরপ্পা মোহেন-জো-দড়োর দেহাবশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, সেখানে একজাতির নয়, নানাজাতির মানুষই ছিল। ইহারাই ডাক্তার গুহের মতে 'মূল ভারতীয় জাতি'। ইহার উপর আরও চাপিয়াছে—(৫) 'গোল মাথাওয়ালা আল্পো-দিনারিক জাতি': গুজরাত, কন্নড ও বাংলায় যাহাদের পাওয়া যায়, (৬) 'লম্বা মাথাওয়ালা আদি-নর্ডিক: উত্তর-পশ্চিমে সীমান্তের কাফির উপজাতির মধ্যে এবং ভারতের উচ্চবর্ণের মধ্যে ইহাদের নিদর্শন এখনো পাওয়া যায়; (৭) 'পূরবীয় (Orientals)'; পাঠান পাঞ্জাবী ও সংযুক্ত প্রদেশে যে দীর্ঘাকৃতি মানুষদের দেখা যায়; (৮) 'ভোটগষ্টির জাতি': হিমালয়ের পাদদেশে, আসামে এবং বঙ্গব্রহ্ম সীমান্তে ইহারা সুপরিচিত; (৯) 'লম্বা মাথাওয়ালা মঙ্গোলী'; আসামের নাগা প্রভৃতি জাতের মধ্যে ইহাদের প্রমাণ মিলে, (১০) 'গোল-মাথাওয়ালা মঙ্গোলী'; টিপরাই 'চাকমা প্রভৃতি, বাঙলাদেশে যাহাদের 'মগ' বলা হয় (১১) 'সামুদ্রিক (Oceanic)': ইহারা সমুদ্র-যোগে আগত; তামিলনাড় ও মালাবারে মঙ্গোল ধাঁজের এইরূপ লোক দেখা যায়। জাতিতত্ত্ব বিষয়ে নানা মত আছে, তাহা অবশ্য স্মরণীয়।

ভাষাবিজ্ঞানের কথা মিলাইয়া পড়া যাউক। কারণ মানসগত সংস্কৃতির পক্ষে বরং অন্যতম প্রধান বাহন ভাষা। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের চক্ষে ভারতের বিভাগ অন্যরূপ, তাহা জাতি-বিজ্ঞানের মত নয়। কারণ কোনো কোনো জাতির ভাষা হয়ত আজ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যেমন নিগ্রোবটুদের ভাষা।

হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োর আবিষ্কারে ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন কালের লুপ্ত অধ্যায় আমাদের সম্মুখে খুলিয়া যায়;—ইহার প্রথম কৃতিত্ব প্রাপ্য শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহানির ও পরলোকগত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পুরাতত্ত্বের এই আবিষ্কৃত তথ্যসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করেন পরে মার্শ্যাল, ম্যাক্‌কে, এবং মার্টিমার-উইলিয়ম প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিত ও অধ্যক্ষগণ। তাঁহাদের সেই কাহিনী আজ সকলকারই সাধারণভাবে পরিজ্ঞাত।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাঙ্‌মুহূর্ত

ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রাক্‌-ক্ষণের তথ্য সংগ্রহ করা যায় তাই উত্তর ও পশ্চিম ভারতে আবিষ্কৃত কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক ক্ষেত্র হইতে। প্রধানত এই ক্ষেত্রসমূহ যে অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত মোটামুটি ভাবে সেই সমুদায় অঞ্চলটি এখন পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতের পশ্চিম ও মধ্যবর্তী অঞ্চল।

এই সূত্রে স্মরণীয় এই যে, এই রাষ্ট্রীয় ভাগ-বিভাগ দিয়া সেকালের সভ্যতার ভাগ-বিভাগ বা গোষ্ঠী নির্ণয় করার প্রশ্নই উঠে না। এমন কি, যখনকার সভ্যতার আমরা সন্ধান করিতেছি, 'পাকিস্তান' 'হিন্দুস্থান' ডোমিনিয়ন তো দূরের কথা, তখনো ভারতবর্ষ বলিয়া আমাদের এই সুপরিচিত বিশিষ্ট দেশও চিহ্নিত হয় নাই, তাহার নামকরণও হয় নাই।

তাহার এক আধটি শব্দও খুঁজিলে আর পাওয়া যায় না। তাই ভারতে নিগ্রোবটু ভাষা নাই। ভাষা-বিজ্ঞানের হিসাবও তাই স্বতন্ত্র রাখা হয়। মোটামুটি তাহা এইরূপ:—(১) অষ্ট্রীক গোষ্ঠির ভাষা: খাসিয়া, শবর, কোল প্রভৃতি; (২) দ্রাবিড় গোষ্ঠির: তামিল, তেলুগু, মালায়ালাম, কানাড়ী, প্রভৃতি; ও মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি উপজাতির ভাষা (৩) আর্য গোষ্ঠির: বৈদিক, পরবর্তী প্রাকৃত (সংস্কৃত) ও বর্তমান কালীন বাংলা, হিন্দুস্থানী, মারাঠী, গুজরাতী প্রভৃতি, ভোট চীনা গোষ্ঠির: ভুটানী, আসামী, নাগা প্রভৃতি ভাষাসমূহ।

বিশেষ স্মরণীয় এই যে, 'দ্রাবিড়' বা 'আর্য এইগুলি বৈজ্ঞানিকদের মতে জাতি পরিচায়ক কথা নয়, মূলত ভাষা-গোষ্ঠির পরিচয় সূচক নাম। সাধারণ কথাবার্তায় এইগুলি দিয়া আমরা মানব-গোষ্ঠি বুঝাই; তাহা একটা মারাত্মক ভুল। তাহাতেই এই দেশীয় 'আর্যামির' ও 'দ্রাবিড়ামি'র জন্ম ও প্রশ্রয়লাভ ঘটিয়াছে; অন্য দেশেও হিটলারী 'আর্যামি'র প্রসারও সহজে সম্ভব হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সাধারণের ভুলে বর্বরে বর্বরতার সুযোগ পাইয়াছে।

তখনো পর্যন্ত অবিভক্ত ভারতবর্ষের এই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সহিত—এমন কি, সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলের সহিতও—বালুচিস্তানের মারফৎ প্রাগৈতিহাসিক ঈরাণ ও ইরাকের সম্পর্ক ছিল নিকটতর; এবং যে মানব-গোষ্ঠী ও মানব-সভ্যতা এই অঞ্চলে বর্তমান ছিল তাহারাও ছিল মোটামুটি পরস্পরের নিকট জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। ভূগোলের ও ইতিহাসের এই আদি সত্যকে পরবর্তী কালের 'দেশ', 'জাতি', 'রাষ্ট্র' প্রভৃতি সামাজিক বিকাশের সূত্র ধরিয়া ভাগ করা, খণ্ড খণ্ড করিয়া বিচ্ছিন্ন রূপে দেখা, এখন প্রায় আমাদের একটা সংস্কার হইয়া উঠিয়াছে; এবং সভ্যতার ইতিহাসের অনুসন্ধানে, উহার স্বরূপ বুঝিতে, এই সংস্কার তাই বাধাও হইয়া উঠিতে পারে। যেমন, এই বাঙলা দেশ হইতে আমরা যদি বলিয়া বসি ভারতবাসী হিসাবে আমরা মোহেন-জো-দড়োর উত্তরাধিকারী, তাহা হইলে স্মরণে রাখা প্রয়োজন—দেশ হিসাবে এইরূপ দাবী আরও বেশি করিতে পারে বালুচিস্তানের, ঈরানের, ইরাকের মেসোপটোমিয়ার অধিবাসীরা। কারণ, সেই প্রাচীন ও অতি-প্রাচীনকালে সেই সব অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল পরস্পরের আত্মীয়—গঙ্গার উত্তর-পূর্বে তাহাদের সমসাময়িক যোগসূত্র এখনো স্বল্প-আবিষ্কৃত। কিন্তু বাঙলাদেশে সম্প্রতি আবিষ্কৃত 'বেড়া চাপা' 'রাজার ঢিবি' প্রভৃতি অঞ্চলকে কোন সভ্যতার অংশীদার করা হইবে তাহা এখনো বিবেচনাধীন। আবার ঠিক এই ধরণের হাস্যকর ও অবৈজ্ঞানিক হিসাবে 'পাকিস্তানীরা' বলিয়া বসিতে পারে, তাহারাই সেই মোহেন-জো-দড়োর সভ্যতার উত্তরাধিকারী (সুপণ্ডিত মার্টিমার উইলিয়াম যেমন তাহার গ্রন্থের নাম দিয়াছেন 5,000 Years of Pakistan!) হয়তো কেহ তাহারা বলিবে তাহারা শুধু মোহেন-জো-দড়ো-হরপ্পার উত্তরাধিকারী নয়, তাহারা চিরদিনই সুমের-আক্কাদের জ্ঞাতি, ভারতের এই "হিন্দুস্থানী"দের হইতে স্বতন্ত্র।

প্রশ্ন হইবে—কী হিসাবে তাহা হইলে আমরা ভারতবাসীরা এই প্রাগৈতিহাসিক ও ইতিহাসের আদিপর্বকে ভারতীয় সংস্কৃতির ও ইতিহাসেরই প্রথম পর্ব বা প্রাক্‌ক্ষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারি? ইহার উত্তর এই যে, প্রথমত, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে এই সব কেন্দ্র অবস্থিত ছিল। দ্বিতীয়ত,—আমাদের প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে এই সব অঞ্চলের সেই সব প্রাগৈতিহাসিক বা ইতিহাসের প্রাথমিক পর্বের মানুষদের দান পৌঁছিয়াছে,—অর্থাৎ সত্যই আমরা তাহাদের সংস্কৃতির কিছু-না-কিছু

উত্তরাধিকারী। ইহাই আসল কারণ। কতটা আমরা তাঁহাদের দান গ্রহণ করিয়াছি, কতটা বা করি নাই, তাহা সম্পূর্ণ জানিবার উপায় নাই। কিন্তু পুরাতাত্ত্বিকের আবিষ্কৃত সেই বিলুপ্ত জীবন-চিহ্ন হইতে আমরা আমাদের উত্তরাধিকারেরও সন্ধান লাভ করি; এবং বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকের প্রদর্শিত পথে ভারতীয় সংস্কৃতির সেই বিস্মৃত আদিরূপেরও কতকটা ধারণা লাভ করিতে পারি।

ভারতীয় সংস্কৃতির সেই ঐতিহাসিক আদিযুগকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে আবিষ্কার করিতেছেন পুরাতাত্ত্বিকেরা। এই দিকে পুরাতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার আবিষ্কারের পর হইতে বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট হয়। স্যর অরেল ষ্টাইন্ উত্তর-পশ্চিম ভারত, বালুচিস্তান ও গোড্রেসিয়ায় (১৯২৯-৩৪) এই উদ্দেশ্যে বারে বারে পর্যটন করেন। ম্যাক্‌কে ও স্বর্গীয় ননীগোপাল মজুমদারও এই অঞ্চলে নূতন কেন্দ্র ও নূতন তথ্যের সন্ধান দেন। গর্ডন চাইল্‌ড্ এই সব আবিষ্কারের অর্থ, এশিয়ার প্রাচীনতম ইতিহাসে উহার স্থান, পূর্ব-ঈরানের আবিষ্কারমালার সহিত তাহার সম্পর্ক প্রভৃতি প্রামাণিকতার সহিত বিচার ও বিশ্লেষণ করেন (১৯৩৩-৩৪)। তাহা হইতে বুঝিতে পারি—ভারতের এই প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতাও সেই 'এশিয়াটিক সমাজের' (পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত) প্রাচীনতম একটি শাখাই। গর্ডন চাইল্‌ড্-এর আলোচনা অবলম্বন করিয়া ম্যাক্‌কোয়ান্ ও ষ্টুয়ার্ট পিগোট প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিকেরা প্রাচীনতম ইরাক (উবাইদ্, উরুক, জেম্‌দেত নসর্, 'আদি বংশ,' আক্কাদ, উর-এর তৃতীয় বংশ, লর্‌সা ইসিন্ ক্রমিক ধারার) ও ইরান-এর সুসা, সিয়াল্‌ক্, গিয়ান্, হিস্‌সার ও আনাউ প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্দ্রের সভ্যতা-ধারার সহিত ভারতের এই উত্তর-পশ্চিম সভ্যতা-কেন্দ্রের একটা কালানুক্রমিক কাঠামোও গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছেন। (দ্রষ্টব্য *Ancient India*, Vol. I, 'The Chronology of Pre-historic North West India' by Stuart Piggott, 1946; *Prehistoric India*, Stuart Piggott, Pelican, 1950) বলা বাহুল্য, এইরূপ ক্ষেত্রে কালের হিসাব খুবই মোটামুটি ভাবে করা সম্ভব, আর তাহাতেও ভুল ঘটা অসম্ভব নয়। কিন্তু ইরাক, ঈরান, ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রাচীনতম কৃষ্টির এই মোটামুটি সম্বন্ধ ও যোগাযোগ বিচার, এবং তাহার পারম্পর্য নির্ণয় গ্রহণযোগ্য। অবশ্য, এই কালানুক্রমিক পারম্পর্যের মতই আমাদের নিকট

বেশি কৌতূহলোদ্দীপক সভ্যতার এই বিস্তৃত ক্ষেত্রের বিবরণ ও বিশেষ রূপটি। সংক্ষেপে তাহাই আমরা এখানে স্মরণ করিতেছি।

এক হিসাবে এই সব কেন্দ্র ও উহার নিদর্শন চোখে দেখিলেই এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান পরিচ্ছন্ন হয়—অন্তত চিত্রাদি হইতে উহা খানিকটা সংগ্রহ করা বিশেষ বাঞ্ছনীয়। ভূতাত্ত্বিকের হিসাবে না হউক, ভূগোলের হিসাবে প্রাগৈতিহাসিক ভারতের এই 'হরপ্পা সভ্যতার' অঞ্চলটি কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ বালুচিস্তানের উষর পার্বত্য প্রদেশ, দ্বিতীয় ভাগ সিন্ধুনদ-পরিপুষ্ট পাঞ্জাব-সিন্ধুর সমতল ভূমি। পূর্ব-পাঞ্জাবেও তাহার বিস্তৃতি এখন অনুমিত হইতেছে। হরপ্পা-মোহেন্-জো-দড়োর আবিষ্কারের (১৯২১-২২) পরে ভারতবর্ষের সেই ধারার নিদর্শন গত বিশ বৎসরে (১৯৪০-এর পরে) আরও যে-যে অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার একটি অঞ্চল গুজরাত (সবরমতী নদীর তীরস্থ রংপুর, লোথাল, এবং উহার বিস্তার নর্মদার উপকূলস্থ প্রাগৈতিহাসিক কেন্দ্র পর্যন্ত), দ্বিতীয়টি পূর্ব-পাঞ্জাব (সিন্ধুনদী তীরস্থ রূপার); তৃতীয়টি রাজস্থান (লুপ্ত সরস্বতী নদীর তীরস্থ কালবেঙ্গা প্রভৃতি পৌরকেন্দ্র); চতুর্থটি মীরাট (হস্তিনাপুর, অহিচ্ছত্র)। এই সবকটিই হরপ্পার সহিত সম্পৃক্ত বা উহারই ক্রমবিস্তার বলিয়া মনে করা হয়। স্বভাবতই বালুচিস্তানের কেন্দ্রগুলি অনেকাংশে পর্বত-বেষ্টিত, দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন; দরিদ্র কৃষিজীবীর পল্লীসংস্কৃতি রূপেই তাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল। অপরদিকে নদীমাতৃক উর্বর সমতল ক্ষেত্রের কেন্দ্রগুলি পরস্পর সম্পর্কিত অধিকতর সম্পদশালী। শেষ পর্যন্ত 'সিন্ধু সভ্যতা' একটি বিরাট পৌর-সভ্যতায় বিকশিত হইয়াছিল—হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োর ছাড়াও পশ্চিম উপকূলে ও রাজস্থানে উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত এখন আমরা তাহার সন্ধান পাই। ভূতাত্ত্বিকের হিসাব পূর্ববর্তী প্রস্তর যুগের আলোচনাকালে আমাদের যতটা সহায়ক হয়, এ ক্ষেত্রে আর ততটা সহায়তা করিতে পারে না। পুরাতাত্ত্বিকের এখানে পৌর বাড়িঘরের পরেই মুখ্য অবলম্বন আবিষ্কৃত শিল্পবস্তু (artifacts),—এক্ষেত্রে বলিতে গেলে, মৃৎপাত্র ও মাটির ছোট ছোট মূর্তি, আর জীবিকার উপকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি। ইহার মধ্যে মৃৎপাত্রই প্রধান—উহার গঠন-পদ্ধতি, অলঙ্করণ-রীতি প্রভৃতি; এইসব জিনিসও আবিষ্কৃত অন্য উপকরণ দিয়াই এই সব "কৃষ্টির" গোষ্ঠীবিচার ও কোষ্ঠীবিচার চলে; অবশ্য ভূতাত্ত্বিকের বিদ্যা ও অন্যান্য প্রাচীনতম পুরাতাত্ত্বিক তথ্য ও তত্ত্ব দিয়া আবার তাহা যাচাই করিয়া লওয়া হয়। পুরাতাত্ত্বিক

বিচারের একটা সুসম্বন্ধ বিবরণ—বিশেষত প্রাগৈতিহাসিক ভারতের মোহেন-জো-দড়োর সভ্যতার বিবরণ—ষ্টুয়ার্ট পিগটের 'প্রিহিষ্টোরিক ইণ্ডিয়ায়' লাভ করা যায় (১৯৫০-এ প্রথম প্রকাশিত)। বলা বাহুল্য, এই বিচারও ক্রমশই নবাবিষ্কারে সংশোধিত হইয়া শুদ্ধ হইতে শুদ্ধতর হইয়া উঠিতেছে।

প্রাগৈতিহাসিক ভারতের কৃষ্টিকেন্দ্র

গোষ্ঠী-বিচারের দিক হইতে একটা বড় ভাগ অবশ্য পল্লী সংস্কৃতির ও পৌর সংস্কৃতির। মৃৎপাত্রের সাক্ষ্যানুযায়ী তেমনি আর একটা ভাগ এই দক্ষিণ বালুচিস্তান, মোটামুটি "পীতাভ সামগ্রীর" ক্ষেত্র—উহার যোগ নিকটস্থ দক্ষিণ ঈরানের কেন্দ্র সমূহের সঙ্গে; দ্বিতীয় ভাগ উত্তর বালুচিস্তান, "রক্তাভ সামগ্রীর" কেন্দ্র—উহার যোগ উত্তর ঈরানের কেন্দ্রগুলির সঙ্গে। এই দুই রকমের সামগ্রীর কেন্দ্রগুলিকে বৈশিষ্ট্যানুযায়ী কয়েকটি বিশেষ স্তরে আবার ভাগ করা চলে (*Anciect India*, No 1, Stuart Piggott এর মতানুযায়ী) সেই ভাগ ও তাহার স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

"রক্তাভ সামগ্রীর" ক্ষেত্র : প্রধানত তিনটি। যথা—

(১) "ঝোব্ কৃষ্টি" : উত্তর বালুচিস্তানের ঝোব্ উপত্যকায় সুর জংগল (ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন), রাণা ঘুণ্ডাই, মোগল ঘুণ্ডাই, পেরিয়ানো ঘুণ্ডাই (মধ্যবর্তী কালের নিদর্শন) প্রভৃতি গ্রামে ছিল ইহার কেন্দ্র। এই সব স্থানে মৃৎপাত্রের গায়ে কালোর সঙ্গে লাল রেখাঙ্কন দেখা যায়। মাটির তৈয়ারী ছোট ছোট স্ত্রীমূর্তি, গোরু ও লিঙ্গ-প্রতীক, মাটির ইটের বাড়িঘর, প্রস্তরের তীরের ফলা পাওয়া গিয়াছে। দেহভস্ম সমাধি দেওয়া হইত। তাম্রের ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই সব এক একটি গ্রাম এক একটি ছোট কৃষিজীবীর বসতিমাত্র। কাল হিসাবে ইহারা হরপ্পার অপেক্ষা বহু প্রাচীন—ইরাকের উরুকের সময় হইতে উহার "আদি বংশের" মধ্যে।

(২) "হরপ্পা কৃষ্টি" : মণ্টোগোমারি জেলার হরপ্পা ও সিন্ধু প্রদেশের মোহেন জো-দড়ো ছিল ইহার দুই প্রধান পৌর-কেন্দ্র, তাহা ছাড়াও চানহু-দড়ো প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র নগর ছিল ; আর দক্ষিণ-সিন্ধু প্রদেশে অনেক পল্লীকেন্দ্রও ছিল। পাত্রের রক্তাভ অঙ্কনরেখায় ছাড়া ইহার সহিত

ঝোব্ কৃষ্টির আর কোনো মিল নাই। সাধারণ ব্যবহার্য পাত্রাদি, নানা অলঙ্কৃত পাত্র, সীল, মুর্তি, পোড়া ইটের বাড়িঘর, কূপ, স্নানাগার, পয়ঃ-প্রণালী ইত্যাদি এই কৃষ্টিকেন্দ্রের বিপুল উপাদানের কথা পরে পৃথক ভাবে আমাদের বুঝিয়া দেখিতে হইবে। এখানে শুধু উল্লেখযোগ্য যে, "হরপ্পার কৃষ্টি ক্ষেত্রে" তাম্র ও ব্রোঞ্জের নির্মিত হাতিয়ারের অভাব নাই। খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ এর মধ্যে এ সভ্যতার কাল অনুমিত হইয়াছে।

(৩) হরপ্পার "এচ" সমাধিশালার উক্তরূপ রক্তাভ সামগ্রী। ইহাতে হরপ্পার শেষ দিককার অবস্থার নিদর্শনই পাওয়া যায়।

"পীতাভ সামগ্রীর" ক্ষেত্র, ইহার সবই কৃষিজীবীদের বাসভূমি, ইহাই প্রথম স্মরণীয়। বৈশিষ্ট্যযুক্ত ক্ষেত্র ছিল এই সাতটি—

(৪) "কোয়েটা সামগ্রী": কোয়েটার সন্নিহিত গ্রামের আবিষ্কৃত ঐরূপ পাত্রালঙ্করণ—রক্তাভ রেখা এইসবে নাই। ইহা হরপ্পারও পূর্বকার বলিয়া মনে হয়; ইহা যথেষ্ট প্রাচীন—হয়ত বা ইরাকের উরুকের সমকালীন।

(৫) 'আম্‌রী কৃষ্টি': সিন্ধুর এই দক্ষিণ অঞ্চলের কেন্দ্রে। তাম্র গুটির ব্যবহার ছিল দেখা যায়। ইহা কোয়েটার পরবর্তী, হয়ত ইরাকের "আদিবংশের" সমসাময়িক, কিন্তু হরপ্পারও পূর্বেকার।

(৬) "নাল কৃষ্টি": দক্ষিণ বালুচিস্তানে ও সিন্ধুদেশে ইহার নিদর্শন মিলে। তাম্রনির্মিত কুঠারের ছবির প্রচলন দেখি। সম্ভবত ইহা আমরীর পরবর্তী ইরাকের আক্কাদের সমসাময়িক।

(৭) "কুল্লি কৃষ্টি": দক্ষিণ বালুচিস্তানে প্রস্তরের, মাটির ইটের বাড়িঘর, সীল, ক্ষুদ্র মূর্তি প্রভৃতি ছাড়া উল্লেখযোগ্য তাম্রের পিন্, আরশী, প্রভৃতি। এখানে সম্ভবত দেহভস্ম সমাধি দেওয়া হইত। হয়ত নাল ও আমরীর মধ্যকালে ইহার প্রতিষ্ঠাকাল—মোহেন-জো-দড়োর নবস্তরের প্রথম দিক তখন চলিতেছে।

(৮) "শাহী-টুম্প কৃষ্টি": ইহাও দক্ষিণ বালুচিস্তানে অবস্থিত; শবসমাধি, ও তাম্রের কুঠার, বল্লম, শীলমোহর ইহার বৈশিষ্ট্য। কাল গণনায় উহা কুল্লির পরবর্তী, হয়ত হরপ্পা মোহেন-জো-দড়োর শেষ পাদের সম-সাময়িক।

(৯) "ঝুকর কৃষ্টি": মোহেন-জো-দড়োর নিকট উত্তরে অবস্থিত। নদীর পশ্চিম তীরে শুধু সিন্ধু প্রদেশে ইহার নিদর্শন মিলে, তাম্রের কুঠার, পিন্, ও ইটের বাড়িঘর পাওয়া যায়।

(১০) "ঝাংগর কৃষ্টি" : ইহাও সিন্ধু প্রদেশেই অবস্থিত। উত্তরে ঝুকর ও দক্ষিণে ঝাংগর, দুইটি কৃষ্টির আবির্ভাব দেখা যায় চন্হু-দড়োর চতুর্থ ও পঞ্চম স্তরে, (উহার প্রথম তিন স্তর হরপ্পার অন্তর্গত ও সমকালীন)—অর্থাৎ হরপ্পার যুগ তখন শেষ হইতেছে।

এই পুরাবস্তু ও কৃষ্টি-পীঠিকা হইতে প্রথম যাহা বুঝা গিয়াছিল তাহা এই যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই অতি-প্রাচীন কৃষ্টি আসলে ঈরান-ইরাকের এই ধরনের প্রাচীন কৃষ্টির মতই ছিল প্রাথমিক কৃষিজীবী সমাজের কৃষ্টি। তাহাদের গ্রামগুলি ছিল একর দুয়েকের ক্ষুদ্র গ্রাম। জীবন মোটামুটি ছিল যুদ্ধ-বিগ্রহ-শূন্য শান্তির জীবন (?); কারণ, গ্রাম রক্ষা করিবার মত ব্যবস্থা প্রথম পাওয়া যায় নাই। বৃষ এই কৃষিজীবীদের সুপরিচিত; পার্বত্য ছাগ ও হরিণ শিকারও চলিত। বিচ্ছিন্ন গ্রামে স্বয়ংসচ্ছল পল্লীসমাজ ধীরে সুস্থে চলিত; গতায়াত, বিনিময়, ব্যবসা বড় নাই। বাড়িঘর কখনো মাটির ইটের গাঁথুনির, কখনো পাথরের ইটের। ধাতুর মধ্যে তাম্রের প্রচলন আরম্ভ হইতেছে (ঝোব্ কৃষ্টিতে অবশ্য তাহার প্রমাণ পাওরা যায় নাই); পল্লীর কারুবৃত্তিও কিছু কিছু দেখা দিয়াছে। নানা কেন্দ্রের মৃৎপাত্রের অঙ্কনরীতি বিচার করিলে এখানে অন্তত গুটি ছয়েক বিশিষ্ট অঙ্কনরীতির ('স্কুলস্ অব্ পেন্টিং') পরিচয় পাওয়া যায়,—সবলতা ও উদ্ভাবন-কুশলতা সহজেই চক্ষে পড়ে। রেখার ও রঙের সবল সুনিশ্চিত প্রয়োগ ও ভারসাম্য, প্রকল্পনীয় ('ডিজাইন')। এসব হইতেই বুঝিতে পারি—এই বর্বর-জীবনেও সৌন্দর্যবোধের বিকাশ ঘটিয়াছে। (২) এই কৃষ্টি মূলত প্রাচীন ঈরানের কৃষ্টিকেন্দ্রের শাখা—ইরাকের কেন্দ্রের সহিতও স্বভাবতই সমুদ্র পথে সম্পর্কিত। মূল বা কাণ্ডের কোনো একটি বিশেষ রীতি বা পদ্ধতি শাখায় পৌঁছিতে বিলম্ব হয়, তাই সমপর্যায়ের সামগ্রীও কালানুসারে ভারতীয় শাখায় আবির্ভূত হয় (ইরাকী-ঈরানী) মূলের অপেক্ষা অনেক পরে, এইরূপ অনুমান করা চলে। (৩) কামানুক্রমে ইহার কাল খ্রীঃ পূঃ ৩,২০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ এর মধ্যে বলিতে পারা যায়। "হরপ্পার কৃষ্টি ধারার" (খ্রীঃ পূঃ ২,৩০০ ?="ইরাকের আদিবংশ" হইতে খ্রীঃ পূঃ ১,৫০০,=ইরাকের "উরের তৃতীয় বংশ", কিংবা তৎপরবর্তী 'ইসিন্ লর্‌সা'র সমকাল, পর্যন্ত) তুলনায় কোয়েটার সামগ্রী ও আম্রীর কৃষ্টি প্রাচীনতর (খ্রীঃ পূঃ ৪,০০০—৩,৫০০); কুল্লির কৃষ্টি হয়ত আংশিক ভাবে

হরপ্পার সমসাময়িক ; নালের কৃষ্টি কতকটা সমসাময়িক কতকটা পরবর্তী, ঝুকর, শাহীটুম্প, ঝংগর প্রভৃতি হরপ্পার পরবর্তী, উহার 'এচ্'-সমাধি-শালার সমকালীন (১,৫০০—১০০০ খ্রীঃ পূঃ)। হয়ত কুল্লি কৃষ্টির মধ্য দিয়া আমরা হরপ্পার কৃষ্টিধারার ও সূচনার অভাস পাই—যদিও হরপ্পার সুনিশ্চিত উদ্ভবক্ষেত্র এখনো অজ্ঞাত।

'হরপ্পা'র সভ্যতা-ক্ষেত্র

মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার নামই আমাদের নিকট সুপরিচিত। 'সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা' বলিলে আমরা বুঝি প্রথমত মোহন-জো-দড়োর আবিষ্কারাবলীকে, দ্বিতীয়ত হরপ্পার লুপ্তাবশেষকে। কিন্তু তাহার পরেকার বিশ বৎসরে (১৯৪৬-এর মধ্যে) আরব সমুদ্রের তীর হইতে প্রায় সিমলা শৈলের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশে—পুর্বে যাহার কাঠিয়াবাড় রাজপুতানার মরুভূমি, পশ্চিমে ওয়াজিরস্তান-বালুচিস্তানের সীমানা, উত্তরে হিমালয়—ইহার মধ্যে এই এক হাজার মাইল দীর্ঘ ভূ-ভাগে—সুমের সভ্যতার তুলনায় এই সভ্যতার ক্ষেত্র উহার অপেক্ষাও তিনগুণ বড়—সিন্ধু ও পাঞ্জাবের (ও বাহায়ালপুর), এই সমতল ক্ষেত্রে সেই 'সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার' ৩৭টি কেন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবত উহার ১টি ছাড়া [কোট্‌লা নিহান্ খাঁ ?] বাকী সবগুলিই ১৯৪৭-এর পরে পশ্চিম পাকিস্থান রাষ্ট্রের অন্তর্গত। ইহার মধ্যে অবশ্য সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়ো, এই দুই নগর, এবং পরে আবিষ্কৃত সিন্ধুপ্রদেশের চানহু-দড়ো ও লোহুম-জো-দড়ো ; অন্যগুলি শহর নয়, গ্রাম মাত্রের ধ্বংসাবশেষ। পুরাতাত্ত্বিকের খাতায় ইতিমধ্যে সমগ্র 'সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার' নামকরণ হইয়াছে 'হরপ্পা সভ্যতা' বলিয়া ;—কারণ, আবিষ্কারাবলীর দিক হইতে হরপ্পাই নাকি এই সমগ্র সভ্যতার প্রতিনিধি স্থানীয়, যথার্থ পরিচায়ক।

১৯৪৭ হইতে ভারতরাষ্ট্রের মধ্যেও এই হরপ্পার ধারার কেন্দ্র পশ্চিম-উপকূলের সবরমতী ও নর্মদার তীরে, রাজপুতনায়, পুর্বপাঞ্জাবে, উত্তর প্রদেশের মীরাট জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ 'সিন্ধু সভ্যতা' বা 'হরপ্পা সভ্যতা' বলিতে এখন এইসব ভারতীয় কেন্দ্রসমূহকে বুঝায়। পশ্চিম ও মধ্যভারত এই সভ্যতা-ক্ষেত্র। তথাপি কোনো নাম স্থির না হওয়া পর্যন্ত ইহাকে 'হরপ্পা সভ্যতা' বলা চলিতেছে।

'হরপ্পা'র প্রধান কেন্দ্রগুলির সম্বন্ধে দুই একটি তথ্য না জানিলে চলে না।

পশ্চিম পাঞ্জাবের মণ্টেগোমারি জেলায় হরপ্পা অবস্থিত। সেখান হইতে মণ্টেগোমারি শহর ষোল মাইল; গ্রামটির দক্ষিণ পশ্চিমে ভগ্নস্তূপ। দুইটি মোট প্রায় সাড়ে তিন মাইল চক্ররেখার মধ্যে এই ধ্বংসক্ষেত্র। উত্তরে মাইল ছয় দূরে রাবি নদী; এক কালে উহার দুইটি শাখার সঙ্গমস্থল নগরের পার্শ্বে ছিল—হয়ত সেই বন্যার ভয়েই নগরের বাঁধ বা প্রাকারও বর্তমানের প্রধান ধ্বংসস্তূপের (এ, বি) চারিদিকে প্রথম নির্মিত হইয়াছিল—পরে তাহার উপর রচিত হয় পুরপ্রাচীর। উনবিংশ শতকের পুরাতাত্ত্বিকেরা (ক্যানিংহাম) এইরূপ প্রাচীরের অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ তখন এতই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, আর তাহা হইতে নিকটের পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য বহুকাল ধরিয়া এত ইট বহিয়া লইয়া গিয়াছে, এমনকি, নিকটস্থ লাহোর-মুলতানের একশত মাইল দীর্ঘ রেলপথ নির্মাণের কালেও এখান হইতে পাথরের টুকরা এত বেশি পরিমাণে গৃহীত হয়, যে, হরপ্পার এই প্রাচীর-প্রাকার (এ, বি চিহ্নিত) বা মূল নগরের রূপ চিনিবার উপায় আর সহজ রহে নাই। সে তুলনায় মোহেন-জো-দড়ো রক্ষা পাইয়াছে বেশি—যদিও সিন্ধুর বন্যায় পুরাকালেও দুই নগরই বারেবারে বিনষ্ট হইত। পুরাতাত্ত্বিকেরা হাত দিতেই (১৯২২-৪৪) মোহন-জো-দড়োর অভাবনীয় রূপ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। হরপ্পায় দয়ারাম সাহনির (১৯২১-এর জানুয়ারীতে খনন আরম্ভ করেন) পরে হরপ্পার বিশদ পরিচয় প্রথম উদ্ঘাটন করেন (১৯২৬-৩৪) এম্-এস্-ভাট; আর উহা এখন আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে মার্টিমার হুইলার (*Ancient India*, No. 3. 'Harappa 1946' by R. E. M. Wheeler) প্রভৃতির সেই স্তূপ খননে (Mound A,B) ও সমাধিক্ষেত্র (Cemetery R 37) খননে।

মোহেন্-জো-দড়ো ('মৃতের ঢিবি') হরপ্পা হইতে প্রায় ৪০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে সিন্ধু প্রদেশের লাড়কানা জেলায় অবস্থিত (রেল ষ্টেশন ডোকৃরি, ৮ মাইল দূরে)। অনেককাল হইতে এই ধ্বংসাবলী পড়িয়া আছে—এখনো তাহা প্রায় এক বর্গ মাইল বিস্তৃত। বিস্তৃত ধ্বংসক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হয় এক অদ্ভুত নগর, সেই মূল ধ্বংসমালার পশ্চিমে এখানেও ৭০ | ৮০ ফিট একটি বিচ্ছিন্ন ঢিবি দেখা যায় (নাম 'Stupa Mound')। তাহাতে কুশান আমলের একটি ইটের বৌদ্ধ স্তূপ আছে, উহার আভাস দেখিয়াই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০-২১এ) প্রথম আকৃষ্ট হন।—ঐক্ষেত্রেই খননের

পরে সুপ্রসিদ্ধ স্নানাগার, বিত্তালয়, স্তম্ভগৃহ প্রভৃতি শক্তিশালী শাসন-পদ্ধতির অনেক উপাদান প্রথম মিলে—হরপ্পার পশ্চিম স্তূপের উত্তর দিকেই যেমন পরে মিলে (শ্রীযুক্ত ভাটের খননে) মজদুর-বস্তি, শস্যাগার প্রভৃতি। অবশ্য সেই বৌদ্ধ-স্তূপের তলায় এখানে প্রাচীনতর বস্তু কী আছে তাহা না খুঁড়িতে মোহেন-জো-দড়োর পরিচয় সম্পূর্ণ হইবে না। এতদিন পর্যন্ত বলা হইত—মোহেন-জো-দড়োতে এমন অপূর্ব পৌর-জীবন-যাত্রার সমস্ত উপকরণ পাওয়া গেলেও কোনো একটা বড় প্রাসাদ, বড় মন্দির, অর্থাৎ সমসাময়িক সুমের-আক্কাদ বা মিশরের মত কোনো এক প্রবল ক্ষাত্রশক্তির বা ব্রাহ্মণ্যশক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই ; অস্ত্রশস্ত্রও বিশেষ পাওয়া যায় নাই। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে বরং বণিক-ব্যবসায়ী, শ্রমিক, কারিগর প্রভৃতিতে বিভক্ত একটা অধিকতর অগ্রসর পৌর সভ্যতার। অর্থাৎ এই সভ্যতা যেন এক শান্ত নিরুপদ্রব পুরাতন বণিকতন্ত্রের ('বুর্জোয়া ইকোনোমির') প্রমাণ, পুরাকালীন পুরাধিপতিদের শাসনের ('citadel rule' এর) প্রমাণ নয়! কিন্তু মোহেন-জো-দড়োর এই স্তূপস্থলের মতই হরপ্পারও পশ্চিম দিককার সেই ঢিবি (এ, বি)। মর্টিমার হুইলার তাহা খনন করিয়া (১৯৪৪-৪৬) প্রাকার-প্রাচীর-বেষ্টিত এক সুরক্ষিত পুরেরই প্রমাণ পাইয়াছেন। আর তাই তাঁহার বিশ্বাস মোহেন-জো-দড়োর এই স্তূপতলও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন—'ঢিবি' দুইটির মিল নিতান্ত তুচ্ছ নয়। মোহেন-জো-দড়োর মতই স্তূপের ঠিক পার্শ্বেই তেমনি ভাগ করা মজদুর ব্যারাক রহিয়াছে, তেমনি শস্যাগার ও ধান-ভাণ্ডার উচ্চ চাতাল পাওয়া গিয়াছে ;—এই সবে এক সুশৃংখল কেন্দ্রীয় পৌরাধিপত্যের (citadel rule) ইঙ্গিত এখনো যথেষ্টই মিলে (তুল. পৃঃ ১১২)।

ইহার পর আবার ১৯৪৭-এর পরে ভারতেও এই সভ্যতার ধারার কেন্দ্রসমূহ আবিষ্কৃত হইতেছে। এরূপ আবিষ্কার শেষ হয় নাই।

সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সভ্যতার ধারণাই এইভাবে এখন পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে। এই সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয় করেন প্রধানত পুরাতাত্ত্বিক গর্ডন চাইলড্। তাঁহার মতে সুমের-আক্কাদের 'এশিয়াটিক সামন্ত সমাজ ও সভ্যতার'ই সগোত্র এই পৌর-সভ্যতা। সম্ভবত তিনিই বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে ইহাদের জীবন-যাত্রার সম্বন্ধ প্রকাশ করেন। তখনো ইহার রাষ্ট্রশক্তির স্বরূপ জানা যায় নাই, মর্টিমার হুইলারের আবিষ্কারের ফলেও কোনরূপ পুরাধিষ্ঠিত পরাক্রান্ত শাসকশক্তির নিশ্চিত সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

হরপ্পার কৃষ্টি-পরিচয়

হরপ্পা সমস্ত সিন্ধু সভ্যতার পরিচয় বহন করে বলিয়া এখন গ্রাহ্য হইয়াছে। মোহেন-জো-দড়োর কথা পূর্বেও বহুল প্রচারিত হইয়াছে; তাহার দান গুরুত্বে ও পরিমাণে অতুলনীয়। হরপ্পার আবিষ্কারমালার যথাযথ বিবরণ পুরাতত্ত্ব বিভাগের কৃপায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে পরে, তাহার মূল্য এখনো সুস্পষ্ট হয় নাই (*Excavations of Harappa*—M. S. Vats; Archaeological Survey of India, 1940, 2 Vols.)। কিন্তু সেই দান যে কত গুরুতর তাহা পূর্বে শ্রীযুত ভাটের আবিষ্কৃত এই কয়টি তথ্য হইতেই অনুমিত হইয়াছিল। প্রথমত, মোহেন-জো-দড়োরও পূর্বে হরপ্পার জন্ম—এখন হইতে প্রায় ৫ হাজার বৎসর পূর্বে,—তাহার জীবনও হইয়াছিল দীর্ঘতর। অলংকৃত মৃৎপাত্র, পোড়া মাটির, পাথরের, পর্সিলেন জাতীয় সীল বা মুদ্রাই হরপ্পার প্রাচীনতম যুগের চিহ্ন; আর উহার সমাধিক্ষেত্রে (Cemetery H) আছে উহার সর্বশেষ যুগের নিদর্শন। দ্বিতীয়ত, হরপ্পার মুদ্রাগুলির আকার বহুবিধ, কিন্তু একমাত্র ঘড়িয়াল ছাড়া অন্য প্রাণীর চিত্র সেই মুদ্রাসমূহে নাই। অন্য দিকে সমাধিক্ষেত্রের (Cemetery H) পাত্রচয়ে হরিণ, ছাগ, বৃষ, ময়ূর, চিল, মাছ ছাড়াও গাছ, পাতা, এমন কি নক্ষত্র পর্যন্ত সুদক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। অথচ হরপ্পার গার্হস্থ্য জীবনের পাত্রাদিতে শুধুই সরল জ্যামিতিক রেখার অঙ্কনমালা দেখা যায়। শব-রক্ষার পাত্রের চিত্রগুলি তাই তাহাদের শব-সংকারের আচার ও ধর্ম-বিষয়ক ধারণার প্রমাণ। তৃতীয়ত, শবাবশেষ পরীক্ষা করিয়া জাতি-বৈজ্ঞানিকগণ দেখিতেছেন—ভারতবর্ষের বর্তমান প্রধান প্রধান জাতিদের সকলেরই পূর্বজদের দেহাবশেষ এখানে রহিয়াছে; কোনো একটি বিশেষ জাতি, অবিমিশ্র খাঁটি জাতি, এখানে বাস করিত, তাহা বলা চলে না। চতুর্থ কথা, সমাধিভবনের উপরিতলে পাওয়া যায় জালায় নিহিত শব, আর নীচেকার তলায় তাহার ব্যবহারার্থ তৈজসপত্র। পঞ্চম বৈশিষ্ট্য, এই কৃষি সভ্যতার পৌর-পর্বের পক্ষে যাহা উল্লেখযোগ্য—নগরের উত্তরে অবস্থিত প্রকাণ্ড ধর্মগোলা; উহা প্রকোষ্ঠে ও বারান্দায় বিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুবিশাল। উহার দক্ষিণে রহিয়াছে শস্য ভাঙার উচ্চ চাতাল—কাশ্মীরে, বাঙলায় এখনো

যাহার অনুরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়। ষষ্ঠ, অধিকতর বিস্ময়োৎপাদক: এই পৌর-কৃষি-সংস্কৃতি তাহার কারুশালার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে, মূল স্তূপের উত্তর-পশ্চিমে শস্যের চাতালের দক্ষিণে, সুবিন্যস্ত মজদুর বস্তি (workmen's quarters)-কথিত ১৪টি ক্ষুদ্র সুপরিকল্পিত গৃহে। সপ্তম,—ইহার তাম্ররথ এবং তাম্র জালায় আবিষ্কৃত ৭০টি অস্ত্র ও উপকরণও হরপ্পার এই স্তরের জীবনযাত্রার এক মূল ভিত্তির সন্ধান দেয়। অষ্টমও তাহাই—মাটি ও তামা গালাইবার উপযোগী ১৬টি চুল্লী। ইহা ছাড়াও হরপ্পায় শ্রীযুক্ত ভাট আবিষ্কার করেন ইহার সামাজিক-মানসিক অগ্রগতির পরিচায়ক সুদক্ষ কারুকর্ম নগ্ন মূর্তি, এবং সোনা, রূপা, নানা পাথর ও কড়ির নানা অলঙ্কার, বলয়, মালা প্রভৃতি।

হরপ্পার সেই আবিষ্কারমালা হইতে আমরা বেশ দেখতে পাই, অন্যান্য পৌর-সভ্যতার মত এই সভ্যতাও অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, কৃষি-সভ্যতার মধ্যে কারুশিল্পের উন্নতি ঘটিয়াছে। সামান্য উন্নতিও নয়, শ্রমবিভাগ, শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণী-বৈষম্য বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

শব-সৎকার-প্রথা হইতে মনে হয়, হয়ত পুরোহিত শ্রেণীর প্রভাব যথেষ্ট ছিল এবং প্রেতলোক ও পরলোকে বিশ্বাস বেশ প্রবল ও প্রচলিত ছিল। নানা বিলাসোপকরণ হইতে যেমন হরপ্পার অধিবাসীদের রুচির সন্ধান পাই, তেমনি নগ্নমূর্তি, শিল্প ও শবাধারের চিত্র হইতে তাহাদের ধর্মবিষয়ক ধারণা ও শিল্প-প্রয়াসেরও একটা পরিচয় লাভ করি। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কথা যে, অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়াতে মনে হয়—যুদ্ধ, আক্রমণ, আত্মরক্ষার কথাও ইহাদের বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইয়াছে, হয়ত আক্রমণেই এই নগর বিধ্বস্তও হইয়াছে। সুমের-আক্কাদ প্রভৃতি এশিয়াটিক পৌর-সভ্যতার মত মোহেন-জো-দড়ো বা হরপ্পার কোনো সামরিক শক্তির চিহ্ন উদ্ধত রাজপ্রসাদ বা বিরাট মন্দির তৎপূর্বে খুঁজিয়া না পাইয়া ইহাদিগকে শান্তিময় সমাজ ও রাষ্ট্র বলিয়া কল্পনা করা হইত (দ্রঃ পৃঃ ১১২)। সম্ভবত তত শান্তিপূর্ণ রাজ্য তাহা বরাবর ছিল না।

মোহেন-জো-দড়োর সভ্যতা-সম্পদ

মোহেন-জো-দড়োর আবিষ্কার-মালা অপ্রতুল। কিন্তু তাহার খুঁটিনাটির বিশেষ পরিচয় আর না লইয়া এখানে শুধু এই কয়টি জিনিস উল্লেখ করিলেই চলে: (*Mohen-jo-daro and the Indus Civilisation*,

Sir J. Marshall, ও *The Indus Civilasation*, Mackay, দ্রষ্টব্য)
—মোহেন-জো-দড়োতে আমরা পাইয়াছি নগর-বিন্যাসের স্বষ্ঠু চিহ্ন। সেখানকার পৌর-জীবনযাত্রার তাহা এক স্মরণীয় মাপকাঠি। যথা—নগরের স্বপরিকল্পিত ও স্ববিন্যস্ত রূপ, উহার পোড়া ইট ও কাদার গাঁথুনির বহুতল বাড়ি, উত্তর-দক্ষিণে সরলগামী রাজপথ, নগরের জলনিষ্কাশনের প্রণালী; গৃহস্থের ও সাধারণের স্নানাগার—যাহার চিহ্ন ভারতে পরবর্তী কালে আর পাওয়া যায় না। বাস্তুশিল্প ছাড়া অন্য শিল্পে দেখিতে পাই কার্পাস বয়ন, সেই পোড়ামাটির পাত্রাদি, পাথরের, সোনা, রূপা ও অন্যান্য ধাতব তৈজসপত্র, দ্রব্যাদি। ব্যবসায় যানবাহন নৌকা, আস্ত কাঠের গো-শকটের চক্র (এখনো সিন্ধু দেশে চলিতেছে), প্রভৃতি আছে। তাহা ছাড়া আছে আবার লিপি ও লেখা—আজও উহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। কিন্তু এই সভ্যতারও মূল বনিয়াদ—প্রধানত ধান্য নয়, গম ও যব,—তাহা মনে রাখা প্রয়োজন। তবে এই পৌরসভ্যতা সেই কৃষিসংস্কৃতিরই এতদঞ্চলে এক অদ্ভুত উন্নতির নিদর্শন। কৃষিগত উপকরণের মধ্যে মোহেন-জো-দড়োতে উল্লেখযোগ্য সেখানে প্রাপ্ত গম ও যব, আর সেখানকার মুদ্রায় আঁকা স্বস্পষ্ট ভারতীয় বৃষ। (এই বৃষই পরে শিবের নন্দীতে পরিণত হইবে)। ইহা ছাড়া সেখানকার আরশি, চিরুণী, পুঁতির মালা ও অন্যান্য অলঙ্কার আরও উন্নত জীবনধারার চিহ্ন বহন করিতেছে। আর মোহেন-জো-দড়োর মুদ্রায় ও পাত্রে খোদাই অসংখ্য উল্লেখযোগ্য প্রাণীচিত্র হরপ্পার (সমাধিশালার পাত্র ছাড়া) সাধারণ পাত্রের জ্যামিতিক শিল্পধারা হইতে উহার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতেছে এবং জানাইতেছে, মোহেন-জো-দড়োর অধিবাসীদের শিল্পে প্রকৃতি-পরিচয়, প্রকৃতি-অনুরাগ ও প্রকৃতি-অনুকৃতি। এইরূপ চিত্রাবলীর মধ্যেও আবার বিশেষ লক্ষণীয় বৃক্ষ (অশ্বত্থের ?)-চিত্র, যোগী-মূর্তি (যোগের প্রক্রিয়া তখনি কি চলিতেছে ?), আদি দেবীমূর্তি (Magnum Mater), লিঙ্গমূর্তি, ইত্যাদি।—অধিবাসীদের মানসরূপের আভাস এই সবে আমরা লাভ করি। এইসব অনেক নিদর্শনই আমরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের অন্যান্য প্রাগৈতিহাসিক কেন্দ্রেও পাই। তাই এই সব সামগ্রী মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন স্বমের সভ্যতা, এমন কি ভূমধ্যসাগর ও এশিয়ানিক (Asianic) সভ্যতার সহিত এই সিন্ধুসভ্যতার যোগাযোগ সূচিত করে। অথচ কুঠার, ছুরি, করাৎ, বর্শার ফলা হইতে ইহাও সুস্পষ্ট—তামার না টিনের সভ্যতা হইতে

ইহা স্বতন্ত্রও (*Ancient India*, Masson-Oursel, Grabowska & Stein, দ্রষ্টব্য)।

হরপ্পার রূপ-বিভাগ

ইহার পরে হরপ্পার এই জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমাদের নতুন তথ্য জোগাইলেন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ মর্টিমার হুইলার সাহেব। ১৯৪৬-এ তিনি হরপ্পার সেই পশ্চিমস্থ 'ঢিবি' (মাউণ্ড এ-বি) খনন করিয়া যাহা দেখিলেন তাহা সংক্ষেপে এই (দ্রষ্টব্য *Ancient India*, No 3, পৃঃ ৬৪) :—আবিষ্কৃত সর্বপ্রাচীন মৃৎপাত্রাদি ঠিক হরপ্পার পরিচিত রীতির নয়। তখনকার দিনে পুনঃ পুনঃ বন্যার প্রকোপও দেখা যায়। হরপ্পার নিজস্ব কৃষ্টি যখন পরিণত হইতেছে, বুঝা যায়, তখন এই স্থলটিও বাঁধ ও প্রাচীরের দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়। সেই রক্ষা-প্রাচীর মোটামুটি চতুষ্কোণ—দীর্ঘে প্রায় ৪০০ গজ, পরিধি ২০০ গজ। প্রাচীরের পশ্চিমে একটি প্রবেশদ্বার— উহার প্রবেশপথ ঘুরানো, সম্ভবত আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজনেই উহার ভিতরের দিকে বেদী থাক্-করা (terraces)। উত্তরের দ্বার কিন্তু তাহা নয়। সম্ভবত উহাই প্রধান প্রবেশদ্বার। এই প্রাচীর নির্মিত হইয়াছিল মাটির ও মাটির ইটের এক ১০।২০ ফিট উচ্চ বাঁধ বা প্রাকারের উপর। বন্যার জন্যই বাঁধ, তাহা বুঝা যায়। আর, কাজেই উহাতে মেসোপটোমিয়ার প্রাচীন উর নগরের অনুরূপ বাঁধের কথা মনে পড়িবে। বাঁধের উপরকার প্রাচীর নির্মিত হইয়াছিল মাটির ইট দিয়া। চতুষ্কোণ বুরুজ বা প্রহরীপ্রকোষ্ঠ প্রাচীরের বহির্গাত্রে ছিল। অভ্যন্তরের দিকে দেখা যায়—এই প্রাচীর নির্মাণের সময়ে মূল দুর্গাদির ভিত্তিতল হিসাবে প্রায় ৩৩ ফিট উচ্চ করিয়া মাটি ও মাটির ইটের মঞ্চ বাঁধানো হয়। সমগ্র রক্ষাব্যবস্থায় অন্তত তিনটি প্রধান যুগের আভাস রহিয়াছে—যেমন, উত্তর-পশ্চিম কোণ দেখিয়া মনে হয় প্রথম যুগের অনেককাল পরে যখন প্রাচীরের সংস্কার করা হইল তখন প্রাচীরের বেধ আরও চওড়া করা হয় আর প্রাচীর শক্ত করা হয় পুর্বের মত ইটের টুক্‌রা দিয়া নয়, আস্ত ইট দিয়া। এই মধ্য যুগই "হরপ্পা সভ্যতার" ঐশ্বর্যের যুগ। ইহার পরে দেখি—সেই উত্তর পশ্চিম দিকে আর একটি প্রহরী কোণ নির্মিত হইয়াছে, কিন্তু পশ্চিমের প্রবেশদ্বার প্রায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। বুঝি হরপ্পা আত্মরক্ষার চেষ্টাকল্পে উৎকণ্ঠিত। ইহার পরে হয়ত

ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে—পশ্চিমের বেদীর উপরে যে (চতুর্থ যুগের) নিকৃষ্ট ধরণের বাসগৃহের ধ্বংসাদি পাওয়া যায় উহা পরবর্তী যুগের, সমাধিশালা এচ্‌এর মৃৎপাত্রাদিতে যাহার সন্ধান পাওয়া যায়।

হরপ্পার প্রাচীন ও অর্বাচীন এই আবিষ্কৃত বস্তু মোহেন-জো-দড়োর আবিষ্কৃত তথ্যের সহিত মিলাইয়া মিঃ মার্টিমার হুইলার নিঃসংশয় হন যে, সুমের ও আক্কাদের সমসাময়িক সভ্যতার মত হরপ্পাও বণিকতন্ত্রের নয়, ক্ষাত্র শক্তিরই কেন্দ্র ছিল ; বল চালনায় ইহার রাষ্ট্র অভ্যস্ত, সবল হস্তেই তাহারা শাসন করিতেন। তবে এখনো এই কেন্দ্রে উর প্রভৃতির মত কোনো মন্দির আবিষ্কৃত হয় নাই। এই কেন্দ্রে পুরোহিত রাজের শাসন ছিল, এই কথা তাই বলা চলে না। হরপ্পার নানা প্রমাণ মিলাইয়া তিনি হরপ্পা সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি কালকে মনে করেন—মোটামুটি খ্রীঃ পুঃ ২৫০০ হইতে খ্রীঃ পুঃ ১৫০০ কাল পর্যন্ত। আর হরপ্পার ছয়টি বিভিন্ন নির্মাণপর্বের (মোহেন-জো-দড়োতে পাওয়া যায় দশটি পর্ব) বিকাশ-ধারা লক্ষ্য করিয়া মনে করেন—মোটামুটি সিন্ধু-সভ্যতার গতিবেগ তীব্র তো নহেই, বরং ধীর ভাবে পরিণতি লাভ করে, সুস্থির ভাবে চলে। আর, এই প্রমাণাবলীর আদি-অন্ত লক্ষ্য করিয়া তিনি মনে করেন—এই সভ্যতাস্রষ্টাদের পুর্বে যাহারা এই কেন্দ্রে বাস করিত তাহারা পল্লী বা ক্ষুদ্রনগরবাসী ছিল। তাহাদের পাত্রাদি হইতে এই পরিণত হরপ্পা সভ্যতার তুলনায় তাহাদিগকে ভিন্ন জাতির বা ভিন্ন গোত্রের বলিয়া মনে হয়। আর, হরপ্পার 'এচ' সমাধিস্থলী ও 'আর-৩৭' সমাধিস্থলীতে প্রাপ্ত পাত্রাদি ও পশ্চিমস্থ পুরবেদীর উপরকার নিকৃষ্ট ধরণের গৃহাদি হইতে বুঝা যায়—ইহাও সেই হরপ্পার পরিণত সভ্যতার অধিকারীদের নহে—কোনো আগন্তুক গোষ্ঠীর। এই আগন্তুকরা "আর্য আক্রমণকারীও হইতে পারে"—গর্ডন চাইল্ড ১৯৩৪ সালেই এই অনুমান করিয়াছিলেন।—মোহেন-জো-দড়োর ধ্বংসস্তুপ (বিশেষত মৃতদেহের অবস্থা) হইতেও সেইরূপ আকস্মিক আক্রমণ ও বিপর্যয়ের আভাস পাওয়া যায়।

গত ২০ বৎসরে (১৯২৭-এর পরে) গুজরাতে রাজপুতনায়ও এই ধারার প্রাগৈতিহাসিক পৌরকেন্দ্র আরও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কথা বলা তথাপি দুঃসাধ্য—এই সকল শহর কি একটি বিরাট সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, না, প্রতি বৃহৎ কেন্দ্রে ছিল এক একটি শক্তিশালী দুর্গাধিষ্ঠিত রাষ্ট্র। ইহার মধ্যেও মোহেন-জো-দড়োই ধ্বংসলীলায় কম ক্ষতিগ্রস্ত।

আনুমানিক সমাজ-রূপ

নৃতত্ত্বের বিবেচনায় হরপ্পার সভ্যতা কোনো একটি বিশেষ 'জাতির' সৃষ্টি বলিয়া স্থির হয় নাই। নানা জাতির সংমিশ্রণ পূর্বেই ঘটিয়া থাকিবে ; আর সেই মিশ্রিত জাতিরই এই সভ্যতা। সমাধিশালার মৃতদেহের পরীক্ষায় ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাদের সহিত প্রাচীন দ্রাবিড়-ভাষী জাতিদের সংস্কৃতিতে সভ্যতায় যোগাযোগ থাকিবার কথা ; নর্মদাতীরে, সরস্বতীতীরে পর্যন্ত কেন্দ্র আবিষ্কৃত হওয়ায় ইহা সম্ভব মনে হয়। প্রাচীন দ্রাবিড়েরা উচ্চ সভ্যতার অধিকারী ছিল, পৌর-সভ্যতারও স্তরে পৌঁছিয়াছিল। জলপথে পশ্চিম উপকূল দিয়া বহুদূর পর্যন্ত নানা কেন্দ্রে এক সময়ে তাহাদের বিস্তার ছিল। বর্তমান-কালেও বালুচিস্তানের সেই দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাভাষী মুসলমানধর্মাবলম্বী ব্রাহুই জাতি রহিয়া গিয়াছে। ইহাদের অস্তিত্ব এই দ্রাবিড়-ব্যাপ্তি এবং 'হরপ্পা সভ্যতা'র সহিত দ্রাবিড়-ভাষীদের নৈকট্যের আরও প্রমাণ। কিন্তু জাতি হিসাবে কিংবা সভ্যতা হিসাবে তাই বলিয়া সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা ও দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় সভ্যতা অভিন্ন, এমন প্রমাণও নাই। বরং হরপ্পা সভ্যতার সহিত পশ্চিমের সুমের-আক্কাদ সভ্যতার যোগাযোগের প্রমাণ বেশি সুস্পষ্ট।

হরপ্পা-সভ্যতার লিপিমালা পঠিত না হইতে ভারতবর্ষের এই প্রাচীনতম সভ্যতার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য আমাদের জানিবার উপায় নাই। আবিষ্কারাবলী হইতে তবু আমরা যাহা জানিয়াছি তাহাও ভারতবর্ষের সংস্কৃতির পক্ষে যুগান্তকারী। আমাদের সে জ্ঞান পুরাতাত্ত্বিকদের চেষ্টায় ক্রমে আরও স্থিরতর হইয়াছে ; আমরা হরপ্পা-সভ্যতার মোটামুটি সামাজিক রূপও এখন অনুমান করিতে পারি (দ্রষ্টব্য গর্ডন চাইল্ড্, *What Happened in History*, Pelican, P 111 ff ; M. Wheeler, *Ancient India* ; ও Piggott, *Some Ancient Cities of India*)। যেমন, হরপ্পা-সভ্যতার শাসকেরা কোনো পুরোহিত-রাজা ছিলেন কিনা তাহা এখনো বলা যায় না। কিন্তু তাহারা যে সুমের-আক্কাদ প্রভৃতি এশিয়াটিক সামন্তশক্তির মত সামরিক শক্তির অধিকারী পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন, দুর্গ নির্মাণ করিয়া তাহাতে ক্ষমতা কেন্দ্রিত করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট। (হুইলার ও পিগট্)। এই রাষ্ট্রশক্তির আশ্রয়েই অবশ্য বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণীও মোটামুটি সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে ; তাই বলিয়া "বণিকতন্ত্র" প্রচলিত হইয়াছে (পূর্বে তাহাই অনুমিত হইত), এরূপ বলা

চলে না। তখন তাম্র ও ব্রোঞ্জের (টিন ও তাম্র মিশ্রিত দস্তা) যুগ। ত..
আসিত রাজপুতানা ও বালুচিস্থান হইতে ; টিন ও নানা মূল্যবান প্রস্তর আসিত ভারতের বাহির হইতে ; শিল্পের জন্য দেবদারু কাঠ আসিত হিমালয় প্রদেশ হইতে। বাণিজ্যের সুপ্রচলন না হইলে এইসব সংগ্রহ সম্ভব হইত না ; আক্কাদ-সুমেরের প্রাচীন ধ্বংসাবলীর মধ্যেও হরপ্পার উপকরণ লাভ করা যাইত না। এমন কি, আরব সমুদ্র হইতে মোহেন-জো-দড়োতে মৎস্য চালানও আসিত (গর্ডন চাইল্ড)। বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্যও যে উৎপাদন বাড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু বিনিময়ের মাধ্যম কী, সোনা, রূপা, তাম্রমুদ্রা, না অন্য কিছু, তাহা জানা যায় না। অনেক গৃহের সঙ্গেই শস্যাগার রহিয়াছে ; বুঝিতে পারি গৃহস্বামী বণিক। ইহাদের সংখ্যার ও সম্পদের তুলনায় সাধারণ ঘরগুলি এবং 'মজুরপাড়ার' মাটির ইটের দো-খুপরীর ঘরগুলি অধিকারীদের দুরবস্থার পরিচায়ক (গর্ডন চাইল্ড)। সমাজে আয়-বৈষম্যের ও শ্রেণীভেদেরও উহা পরিচায়ক (চাইল্ড, হুইলার, পিগট)। মেসোপটোমিয়ার মন্দির-সংলগ্ন কারিগরদের বস্তির কথা উহা মনে করাইয়া দেয়। জানিবার উপায় নাই—ইহারা ক্রীতদাস ছিল, না, অর্থদাস কারিগর ছিল। এই কথা বলা যায়—সমাজে ক্রীতদাস নিশ্চয়ই ছিল ; কিন্তু ক্রীতদাস প্রথাই উৎপাদনের প্রধান অবলম্বন, এমন কোনো প্রমাণ এই সভ্যতায় নাই। এ সভ্যতাকে 'এশিয়াটিক সামন্ত সমাজেরই' সগোত্র বা অন্তভু ক্ত ভাবা বোধ হয় পূর্বোক্ত এই সব কারণে অযৌক্তিক নয়। পথঘাট, জলপ্রণালী দেখিয়া বুঝিতে পারি পৌরকর্তৃত্বও অপরিণত নয় ; কর্মক্ষম ও শাসনক্ষম। যে চিত্রাক্ষর এখনো পড়া যায় নাই তাহা সমস্ত সিন্ধু উপত্যকায় তখন সুপ্রচলিত, ইহাও কম সমাজ-সংহতির কথা নয়। পাত্রাদির গায়ে স্বস্থির জ্যামিতিক অঙ্কনরীতি শুধু শিল্পবোধের সাক্ষ্য নয়, হয়ত জ্যামিতিক জ্ঞান ও সুমের-আক্কাদের সমতুল্য বিজ্ঞান-চর্চারও প্রমাণ। টোটেম ও ফলন-কামী যাদুর (fertility magic) ঐতিহ্য-প্রভাবে যে ক্রমশ লিঙ্গাদি দেবপুজার বস্তু হইয়াছে, তাহাও দেখি। এইরূপ কুম্ভকারের চাকা, গো-শকটের চাকা, শস্য-ভাণ্ডার উপকরণ, বৃষ, যোগী, বৃক্ষাদি ও মোহেন-জো-দড়োর দোকানের বাঁধা সারি হইতে ভারতবর্ষের এখনকার জীবনযাত্রার কথাই অনিবার্যরূপে মনে পড়ে ; "সিন্ধু উপত্যকার শহরের সেই বসন পরিধানরীতি এখনো এই (পাঞ্জাব) অঞ্চলে অচল নয়। প্রাগৈতিহাসিক শিল্পের এই সব চিত্রিত অনুষ্ঠানে বর্তমান হিন্দু দেবদেবীর মূল রহিয়াছে। হিন্দু বিজ্ঞানের ও তাহার মারফত পাশ্চাত্য

বিজ্ঞানেরও অপ্রত্যাশিত ঋণ রহিয়াছে ইহার নিকট। ভারতের ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা একেবারে লুপ্ত হয় নাই।—আমাদের না জানা থাকিলেও তাহার কাজ চলিয়াছে এখনো।" (চাইল্ড)।

কালান্তরের কালান্তক

হরপ্পার সভ্যতা তাই সত্যই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম বা আদি রূপ—নানা রূপান্তরেও যাহার উদ্দেশ আমরা এখনো পাই। কারণ, একেবারে সার্বিক রূপান্তরও ভারতীয় সংস্কৃতির এতদিন পর্যন্ত ঘটে নাই। কি করিয়া সেই সভ্যতা ধ্বংস হইল তাহা অবশ্য এখন বলা যায়—হরপ্পার দুর্গাধিষ্ঠিত শক্তি যে আক্রান্ত হইয়াছিল, মোহেন-জো-দড়োর কোন কোন মৃতদেহ যে আক্রান্ত ও অকস্মাৎ নিহত নরনারীর মৃতদেহ, এই অনুমান সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কে এই আক্রমণকারী? পূর্বে আমরা গর্ডন চাইল্ডের অনুমানের উল্লেখ করিয়াছি। মনে হয় হরপ্পার দুর্গাদি আবিষ্কারে তাহার পরিপোষক প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। (দ্রষ্টব্য *Ancient India* No 3, Mortimer Wheeler-এর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ৮২)। ঋক্‌বেদের সুক্তাদি হইতে দেখা যায়,—"সপ্তসিন্ধু" প্রদেশে (পাঞ্জাব) আর্যরা প্রাচীর-বেষ্টিত শত্রু-নগরীর বিরুদ্ধে আক্রমণ করিতেছে। ঋক্‌বেদ এই নগরকেন্দ্রকেই বলিত 'পুর'। কখনো সেই পুরপ্রাচীর 'অশ্মময়ী'; কখনো তাহা বহু বেষ্টিত বা 'শতভূজি'; আবার কখনো 'আমা' অর্থাৎ কাঁচা মাটির। এই পুরধ্বংসকারী বলিয়াই ইন্দ্রের নাম 'পুরন্দর', তিনি দিবোদাসের জন্য নব্বুইটি 'পুর' চূর্ণ করেন। শত্রু শম্বরের নিরানব্বুই বা একশতটি দুর্গ তিনি বিধ্বস্ত করিয়াছেন।

সপ্তসিন্ধু দেশে এইরূপ সুরক্ষিত পুর কাহাদের ছিল? হরপ্পার পুরকেন্দ্র খনিত হওয়ার পরে আর সন্দেহ থাকে না যে—ইহা সিন্ধু উপত্যকার সেই রাষ্ট্রশাসিত পৌরসভ্যতারই ধ্বংসের কাহিনী। হাজার খানেক বৎসরের জীবনযাত্রার পরে খ্রীঃ পূঃ ১,৫০০-এর দিকে এই সভ্যতার ধারায় আসে কালান্তর! আর্যরাই সেই সভ্যতার কালান্তক।

একটা প্রশ্ন তবু রহিল—এই সিন্ধু সভ্যতার সহিত দ্রাবিড়দের তবে কিরূপ সম্পর্ক ছিল? মোহেন-জো-দড়ো আবিষ্কারের পরেই যে পণ্ডিতগণ দ্রাবিড় ও ও সুমের সভ্যতার সহিত ইহার সগোত্রতা দেখিয়াছিলেন (অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের মধ্যে একজন) তাঁহাদের অনুমান

একেবারে মিথ্যা হয় নাই। সুমের সভ্যতার সহিত, এমনকি, সেই এশিয়াটিক সামন্ত সমাজের সহিত তাহার সম্পর্ক প্রায় এখন সর্বস্বীকৃত; অবশ্য হরপ্পা সভ্যতার স্বাতন্ত্র্যও সুপ্রতিষ্ঠিত। দ্রাবিড়দের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক গঠনের সমসাময়িক রূপ কী ছিল, তাহা এখনো বিচার সাপেক্ষ। তবে বালুচিস্থানে এখনো দ্রাবিড়ভাষী (মুসলমান ধর্মাবলম্বী) ব্রাহুই জাতির অস্তিত্ব রহিয়াছে, গুজরাতে, রাজস্থানেও হরপ্পাধারার সভ্যতার কেন্দ্র পাওয়া যাইতেছে; সন্দেহ নাই একদিন সমস্ত পশ্চিম উপকূলেই দ্রাবিড়-ভাষীদের সভ্যতাকেন্দ্র ছিল। অভিন্ন না হোক—দ্রাবিড় সভ্যতার সঙ্গে তাই হরপ্পা সভ্যতারও যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল।

ভারতের যে প্রাগার্য ও প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এইরূপে তাহার প্রাচীনতম চিহ্নগুলির হিসাব লইলে দেখিব—পান, সুপারী, ধান, কলা ও নারিকেল, আর মোটামুটি পল্লীপ্রাণ অস্ট্রিক-জাতির সে জীবন-যাত্রার বস্তু আজও আমাদের পূর্বাঞ্চলের ভারতবাসীর উৎসবে, ক্রিয়াকলাপে অপরিহার্য। আর, আমাদের দেবদেবী, পূজা-পার্বণ, অধ্যাত্ম-সাধনার মধ্যে রহিয়াছে ভারতের অন্য অধিবাসীদের দান;—মোহেন-জো-দড়ো-হরপ্পার (আদি-দ্রাবিড়ভাষী? বা ভূমধ্য জাতীয়?) অধিবাসীদের ধর্মগোলা, যব ও বৃষ এবং শিব-উমা, অশ্বত্থ ও যোগ-প্রক্রিয়া প্রভৃতি তো ভারত-সভ্যতার একেবারে মূল বনিয়াদ। ভারতীয় সভ্যতার আদিরূপ ইহাই। ইহারই মানসিক রূপ পরবর্তী ঐতিহাসিক কালে নূতন রঙ ও নূতনতর বস্তু গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। ভারতের কৃষি-সভ্যতার অস্ট্রিক পল্লীরূপ বিশেষ করিয়া দেখা যায় পূর্বাঞ্চলে; এবং পৌর-সভ্যতার (দ্রাবিড়? ভূমধ্যজাতীয়?) বিশেষ রূপ দেখা যায় মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলে। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়াও দুই-ই এতদিন টিঁকিয়া রহিয়াছে; পরিবর্তী কালের নানা তরঙ্গে সেই কৃষি-সভ্যতাই নূতনতর ও সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের গতিনিয়মে উহার অভ্যন্তরস্থ শক্তির দ্বন্দ্বে এই কৃষি-সভ্যতারই নব নব স্তর বিকাশ লাভ করিয়াছে—তাই চার-পাঁচ হাজার বৎসরের রূপান্তরের মধ্যেও সেই প্রাচীনতম রূপকে এখনো চিনিয়া ফেলা অসম্ভব হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী

Prehistoric India—Stuart Piggott, Pelican.
Cambridge History of India—Vol. 1.
An Outline of Racial Ethnology in India—B. S. Guha.
Racial Elements in the Population—B. S. Guha.
Languages and the Linguistic Problem—S. K. Chatterji.
The Indus Civilisation—Mackay.
Ancient India—No 3, 1947, (Arch. Survey of India.)
What Happened in History—Gordon Childe.
Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India—Sylvan Levi & Bagchi.

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা : প্রাচীন ও মধ্যরূপ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রাগৈতিহাসিক কাল কাটিয়া গিয়া কালান্তরের সূচনা হয় বৈদিক আর্যদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে। মোটামুটি তখন হইতে আমরা ভারতীয় সমাজের ও জীবনযাত্রার একটা ধারাবাহিক পরিচয় লাভ করিতে পারি। এই সমাজ ও জীবনযাত্রা সেই সময় (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ প্রায় ১,৫০০ অব্দ) হইতে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া মুসলমান রাজত্বের শেষ পর্যন্ত (খ্রীঃ ১৭৬৪) প্রায় একই খাতে বহিয়া আসিয়াছে। ইহার মধ্যেই পড়ে 'প্রাচীন ভারত' (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১,৫০০ হইতে খ্রীঃ ৬০০ পর্যন্ত) ও 'হিন্দু শাসনকাল' (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১,০০০ হইতে খ্রীষ্টীয় ১,২০৩ পর্যন্ত দুই হাজার আড়াই হাজার বৎসর), এবং 'মধ্যযুগের ভারত' (আনুমানিক খ্রীঃ ৬০০ হইতে খ্রীঃ ১,৮০০ পর্যন্ত) ও 'মুসলমান শাসনকাল' (খ্রীঃ ১,২০৩ হইতে মোটামুটি খ্রীঃ ১,৭৬৪ পর্যন্ত মোট পাঁচ শ'-সাড়ে পাঁচশ' বৎসরের ইতিহাস)। কিন্তু এই দুই যুগের মধ্যে যতই ব্যবধান থাকুক, মূলত ভারতীয় জীবনধারা ইহার মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে খাত বদলায় নাই, রাজা বদলাইয়াছে, রাজ্য বদলাইয়াছে; ভিতরের ও বাহিরের আঘাতে আলোড়নে ধর্মের ও আচার-নিয়মের বহু ওলট-পালট ঘটিয়াছে; সমাজ-বিকাশের স্বাভাবিক নিয়মেই অনেক পরিবর্তনও জীবনে, সমাজে ও ভাবনায়ও আসিয়াছে ;— কিন্তু কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই। তাই এত বড় সুদীর্ঘ কাল জীবনের মূলত একই রূপ অব্যাহত রহিয়াছে। সমগ্রভাবে ইহাকেই বলিতে পারি—ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যরূপ।

ভারতীয় সংস্কৃতির এই মধ্যরূপের মোট পরিচয় গ্রহণ করিবার পূর্বে একটা জানা সত্য আর একবার স্মরণ করা প্রয়োজন। তাহা এই : 'প্রাচীন ভারত' ও হিন্দু রাজত্বের ভারতের ইতিহাস এখনো অনেকাংশেই অনিশ্চিত। প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণ সেই ইতিহাস পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই একশত বৎসরের সমবেত গবেষণার ফলে এখন বলা চলে—প্রাচীন ভারতের একটা কালানুক্রমিক পীঠিকা বা chrono-

logy মোটের উপর স্থির হইয়াছে; এবং প্রধান প্রধান রাজবংশগুলির (তাহাও প্রধানত উত্তর ভারতের) উত্থান-পতনের কাল ও কথা অনেকাংশে জানা গিয়াছে। সেই পারিপ্রেক্ষিতে মিলাইয়াই ভারতীয় জীবনযাত্রার ও ভাবনাধারার,—বিশেষত শিল্প ও দর্শনের কিছু কিছু বিচার-আলোচনা করা হয়। বলা বাহুল্য, এই আলোচনা ঐতিহাসিক নামে চলিলেও "ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে", বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক বিচার-নিয়মে বা ইতিহাসের আর্থিক-বিচার অনুযায়ী চলে না।[১] কারণ, বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক পদ্ধতি তো দূরের কথা, প্রচলিত (বুর্জোয়া) ঐতিহাসিক পদ্ধতিতেও ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস অনেকদিন পর্যন্ত রচিত হয় নাই।[২] সাধারণভাবে যাহা স্থির হইয়াছে তাহাতে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের একটা মোটামুটি রাজনৈতিক কাঠামো লাভ করা গিয়াছে। প্রায় ৬।৭টি পর্বে এই ইতিহাসকে ভাগ করা চলে।[৩] যেমন, (১) বৈদিক যুগ (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১,৫০০ অব্দ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১,০০০, কিম্বা ৭০০ অব্দ পর্যন্ত)। (২) প্রথম ভারতীয় সংগঠনের যুগ (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৭০০ অব্দ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১৮৫তে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত)। ইহা বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠার যুগ। দক্ষিণে তখন অন্ধ্র সম্রাটদের রাজত্ব। (৩) আদি হিন্দু সংগঠনের যুগ (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৮৫তে পুষ্যমিত্রের অভ্যুদয় হইতে আরম্ভ: যবন, শক প্রভৃতির রাজত্ব ও ভারতে অধিষ্ঠান এই কালের মধ্যে; খ্রীষ্টীয় ৭৮ বা ১২০ অব্দে কনিষ্কের অভ্যুদয় পর্যন্ত বিস্তৃত)। (৪) বৌদ্ধ প্রাধান্যের (দ্বিতীয়) যুগ (খ্রীষ্টীয় ৭৮ বা ১২০তে কুশান রাজত্ব হইতে আরম্ভ; এবং ১৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাসুদেবের মৃত্যুকাল হইতে প্রায় খ্রীঃ ৩০০ অব্দে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এক অনালোকিত যুগ ইহার মধ্যে পড়ে।) (৫) হিন্দু অভ্যুদয়ের যুগ বা ভারতীয় সংগঠনের মধ্য কাল (খ্রীষ্টীয় ৩২০ অব্দে গুপ্তসম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব হইতে খ্রীষ্টীয় ৬৪৭-এ হর্ষের মৃত্যু পর্যন্ত। ইহা বাকাটক

১ এই দিকে প্রথম পথ প্রদর্শন করিয়াছেন ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন।

২ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ ও স্যার যদুনাথ সরকারের পরিকল্পনানুযায়ী (১৯৩৭) এইরূপ "ভারতের জাতীয় ইতিহাস" এবং ভারতীয় বিদ্যাভবন হইতে 'ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস' রচনা আরম্ভ হইয়াছে।

৩ ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ-এর অনুমোদিত; এবং ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি', প্রথম ভাগ পৃঃ ৯৮। ইহাতে অনেক মতভেদ আছে, তাহা স্মরণীয়।

সাম্রাজ্যেরও কাল। খ্রীঃ ৪৫০ হইতে ৬০০ এর মধ্যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংস; হূন, পারসিক, গুর্জর প্রভৃতি জাতিদের রাজ্যপ্রতিষ্ঠা, ভারতবর্ষ ভগ্ন, খণ্ডিত; সামন্ততন্ত্রের স্থচনা, শ্রীহর্ষ ও দ্বিতীয় পুলকেশীর সঙ্গে এই শেষ সংগঠন প্রয়াস শেষ হয়)। (৬) ভারতীয় মাৎস্য ন্যায়ের যুগ (খ্রীষ্টীয় ৬৪৭ হইতে খ্রীঃ ১,২০৩এ মুসলমান বিজয় পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল। ইহার মধ্যেই পড়ে বাংলার পাল সাম্রাজ্য ও সেন রাজ্যের কাল, গুজরাতে গুর্জর সম্রাট ভোজের রাজ্যকাল, ভিন্নমালে ও কনৌজে গুর্জর প্রতিহারদের কাল, বুন্দেলখণ্ডের চাণ্ডেল ও বুন্দেল, দক্ষিণের রাষ্ট্রকুট, রাজপুতানার রাঠোর, চৌহান, প্রমার, সোলাঙ্ক, চালুক্য—এক কথায় রাজপুত জাতির রাজত্ব)।

লক্ষ্য না করিয়া উপায় নাই যে, ইহার মধ্যে এক বারের মত অন্ধ্রদের উল্লেখ থাকিলেও দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের প্রায় কোনো উল্লেখই ইহাতে নাই। নর্মদা ও কৃষ্ণ-তুঙ্গভদ্রার মধ্যস্থিত দক্ষিণো-পত্যকার ('ডেকান প্লেটোর') কন্নডের ব্রাহ্মণ কদম্ব রাজগণ (৩—৬ শতাব্দ), জৈনদের পৃষ্টপোষক গাঙ্গরাজগণ (২য় হইতে ১০ম শতাব্দ পর্যন্ত—শ্রাবণ বেলগোলার গোমত মূর্তির নির্মাতা) বা 'মহারাষ্ট্র' দেশের বাদামির (বিজাপুর জিলা) চালুক্য (৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে হর্ষের কাল পর্যন্ত, তামিল পল্লবগণ ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী) সম্রাটগণ, রাষ্ট্রকুটবংশ (খ্রীঃ ৭৬০-এর সময়ে—ইলোরার কৈলাশ মন্দির ইহারা নির্মাণ করেন; ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগে জৈনদের সমর্থক সম্রাট অমোঘবর্ষের সময়ে আরব ভ্রমণকারীরা ইহাদের প্রধান রাজশক্তি বলিয়া জানিত), কল্যাণীর চালুক্য বংশ (চোলদের ইহারা প্রতিদ্বন্দ্বী; মহারাজ বিক্রমাংকের সময়ে স্মৃতিকার বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার 'মিতাক্ষরা' রচনা করেন। খ্রীষ্টীয় ৯৭৩ হইতে ১১৯০ পর্যন্ত ইহাদের কাল), মৈশুরের হৈসলরাজগণ (খ্রীঃ ১২শ ও ১৩শ শতাব্দীতে হালেবিদ্ ও অন্যখানকার হৈসল ভাস্কর্য ও স্থাপত্য তাঁহাদের কীর্তি; রামানুজাচার্য ইঁহাদেরই আশ্রয়ে 'শ্রীভাষ্য' লেখেন), দেবগিরির (ঔরঙ্গবাদ) যাদব রাজগণ (১৩০৯তে মালিক কাফুর ইঁহাদের নিঃশেষ করেন), এমন কি, বিজয়নগরের সম্রাটগণ (মুসলমান আমলে ১৩৩৬-১৫৬৫ পর্যন্ত, সায়ন ইঁহাদের কালে বেদের ভাষ্য লেখেন)—এই দক্ষিণ-মধ্য-ভূখণ্ডের সম্রাটদের কথা কি আমরা বিশেষ শুনিতে পাই? ইহা ছাড়া দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণস্থ তামিল জাতির প্রাচীনতম রাষ্ট্রত্রয় চের,

চোল, পাণ্ড্য রাজ্যের উল্লেখও এখানে নাই। চোল রাজ্যের মাদুরাতে খ্রীঃ ৩য় শতাব্দীতেই প্রাচীন তামিল সাহিত্য উন্নতিলাভ করে। কাঞ্চীর অদ্ভুতকর্মা পল্লব সম্রাটগণ (৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত উহাদের গৌরবকাল—চালুক্যদের হাতে খ্রীঃ ৭৪০এর পরাজয়ে তাঁহাদের গৌরবাবসান আরম্ভ হয়। ইহারা কেহ শৈব, কেহ বৈষ্ণব; কাঞ্চী ও মহাবলীপুরম্ ইঁহাদেরই ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে অতুলনীয়); রাজরাজ ও রাজেন্দ্র চোল প্রভৃতি চোল সম্রাটগণ (খ্রীঃ ৯০৭ হইতে ১০৭৪ পর্যন্ত ইঁহাদের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল, চোল শাসন-ব্যবস্থার বিবরণ কুর্রম্—পল্লী-মণ্ডল—ও 'সভার' উপর গঠিত; রাজেন্দ্র চোলের রাজ্য ছুঁইয়াছিল গঙ্গা নদী পর্যন্ত; ইঁহাদের সময়ে যবদ্বীপে, সুবর্ণদ্বীপে ঔপনিবেশ ও বাণিজ্যিক প্রসার অব্যাহত রহে; তাঞ্জুর, গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরুম্, চিদাম্বরম্-এ চোল শিল্পের অজস্র প্রকাশ চলিত থাকে);—ইঁহাদের কথাও ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের এই কাঠামোর বাহিরেই প্রায় থাকিয়া যায়। অথচ বুঝিবার মত কথা এই—ভারতীয় সংস্কৃতির অনেক প্রাচীন কীর্তিই—দর্শন, স্মৃতি, কাব্য, শিল্পকর্ম—দক্ষিণাপথের এই সব রাজ্যের সৃষ্টি। অন্ততঃ এই সব দক্ষিণী কল্যেই পুথিপত্র, শিল্পনিদর্শন প্রভৃতি রক্ষার সুযোগ হিন্দুরা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাসে দক্ষিণাপথের স্থান গৌণ। এই কথা সহজেই বুঝিতে পারি—যে স্মৃতিকার বা দর্শনকার চালুক্য বা রাষ্ট্রকূট রাজ্যে বসিয়া বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিবেন, তাঁহার চিন্তায়, ব্যবস্থায় সেই রাষ্ট্রের ও নিজ কালের কথাই বেশি মিলিবে—বাঙলা বা কান্যকুব্জের প্রথা বা নিয়মের সন্ধান হয়ত পাওয়া যাইবে না। অর্থাৎ সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া কোনো একটি রাষ্ট্রীয় বা আর্থিক নিয়ম সর্বত্র প্রচলিত থাকিবার মত অবস্থা (মৌর্য বা গুপ্ত যুগ ছাড়া) ছিল না; কোনো একটি রাষ্ট্রে ও একই সামাজিক বা আর্থিক ব্যবস্থা সর্বকালে অপরিবর্তিত থাকে নাই। আবার ইহাও সত্য, রাষ্ট্রীয় ঐক্য না থাকিলেও মৌর্য যুগের পর হইতে ভারতবর্ষে মোটামুটি একটি সাংস্কৃতিক ভাবধারার ঐক্য ও আচার-বিচারের ধারণা প্রচলিত ছিল; পরে গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্ব পৌরাণিক ধর্মকে আশ্রয় করিয়া উহা বিস্তৃত করিতে থাকে। তাই, ভাবনার ও বিচারের জগতে আংশিকভাবে রাষ্ট্রীয় ও কালগত প্রভাব কাটাইয়া ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবুকেরা কাশী বা কাঞ্চীতে চিন্তা ও বিচার করিতে পারিতেন—যে-ই হোক যখন রাজা তাহাতে দার্শনিকদের

ঐতিহ্য, বিচার, খণ্ডন, মণ্ডন বিশেষ বাধা পাইবে কেন? কিন্তু চিন্তা-ভাবনা সংস্কৃতির একটা অংশ মাত্র; আর ভাব-জগতও একেবারে সমাজ-নিরপেক্ষ হইতে পারে না, আর্থিক নিয়মকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারে না।

প্রাচীন ভারতের এই আর্থিক বিবর্তনের ইতিহাস আজও লেখা হয় নাই। সত্য বটে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদের নিকট হইতে বেদের নির্ঘণ্ট (ম্যাক-ডোনাল্‌ড ও কীথের বেদিক ইনডেক্‌স্‌) ও অন্যান্য বহু গ্রন্থের অনুবাদ ও বিচার বিশ্লেষণ লাভ করায় এবং দেশীয় বিদেশীয় পণ্ডিতদের নিকট হইতে জাতকের অনুবাদ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের উদ্ধার ও অনুবাদ প্রভৃতি প্রাপ্ত হওয়ায় এখন প্রাচীন ভারতের কোনো কোনো পর্বের আর্থিক বিবরণ রচনা করা গবেষকদের পক্ষে সম্ভব হইতেছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের বহু পর্ব এখনো অনালোকিত। আর, আর্থিক বিবরণকেও সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বুঝিবার চেষ্টা এখনো সুপরিণত নয়। তাহা না হইতে প্রাচীন ভারতীয় আর্থিক জীবন, তাহার রাষ্ট্রীয় রূপ, তাহার সামাজিক কীর্তি,—বনিয়াদ হইতে শিখরচূড়া কোনো কিছুকে সত্যরূপে বুঝাও সম্ভব নয়। অবশ্য এইদিকে বাধা অসামান্য;—ভারতীয় প্রাচীন জীবনযাত্রার বাস্তব প্রমাণ বিশেষ নাই, সামাজিক অবস্থার বিবরণ আরও জটিল। উহার অভাবে উল্টা পথে চেষ্টা করিতে হয়—সাংস্কৃতিক উপাদান হইতে সমাজ ও আর্থিক উপযোগ অনুমান করা। এই পথে যথেষ্ট ফাঁক এবং ভুলেরও যথেষ্ট অবকাশ থাকে।

মোটামুটি তবু সামাজিক পদ্ধতির দিক হইতে এই ভারতীয় ইতিহাসকে বিচার করিতে গেলে তাহাতে পৃথিবীর পরিচিত ইতিহাসের অনুরূপ প্রত্যাশা করিব—নব্য প্রস্তর যুগের শেষদিকে (১) 'জন' যুগের সমাজ বা ট্রাইব্‌ল সমাজ, ও মাতৃ-প্রাধান্য হইতে পিতৃ-প্রাধান্যের উদ্ভব। পরে ক্রমোদ্ভাবিত (২) দাসতা প্রথার সমাজ; (৩) এশিয়াটিক (প্রাচীন) সামন্ত সমাজ, উহারই সমগোত্রীয় (৪) মধ্যযুগের সামন্ত (ফিউডাল) সমাজ; এবং ক্রমে (৫) ধনিকতন্ত্রী সমাজ ও (৬) সমাজতন্ত্রী সমাজ। কিন্তু প্রত্যাশা যাহাই করি, সব দেশে এই যুগগুলি এমন ধরা-বাঁধা নিয়মে আসে না, যেমন আধা-ফিউডাল সমাজ হইতেই ধনিকতন্ত্রী (১৮৬১খ্রীঃ—১৯১৭) ব্যবস্থাকে (১৯০৫-১৯১৭এর মধ্যে) পাকা হইতে না দিয়া সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় সমুত্তীর্ণ হইল (১৯১৭-১৯৩৪এর মধ্যে) সোভিয়েট ভূমি, বিশেষত তাহার মধ্য এশিয়ার জাতি সমূহ। আবার, অনেকখানেই যুগগুলি বিমিশ্র হইয়া আসে, এত পরিষ্কার সুচিহ্নিত

কাটাছাঁটা রূপে দেখা দেয় না। এই কথা মনে রাখিয়া হরপ্পা-মোহেন্-জো-দড়ো হইতে (ইংরেজ অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত) ভারতের সামাজিক ইতিহাসকে কিভাবে বিভাগ করা সমুচিত ? সম্ভবত এই কয়টি যুগে তাহা ভাগ করা চলে :

(১) এশিয়াটিক সামন্ত সমাজ (হরপ্পা সভ্যতা ইহার এতদ্দেশীয় নিদর্শন)।

(২) 'জন'যুগের আর্য-সমাজ। বৈদিক যুগের আর্যদের প্রথম দিককার সমাজ এইরূপই ছিল—পিতৃ-প্রধান, পশু-পালক ও কৃষি-'জন' বা ট্রাইব-এ নিবদ্ধ; সম্পত্তি ট্রাইব-গত নয়, ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত; শ্রমবিভাগ শুরু হইয়াছে। এই 'জনযুগে'র আর্যেরা তুলনায় 'হরপ্পা' সভ্যতার মত উচ্চতর ও অগ্রসর সভ্যতার অধিকারী ছিল না। অবশ্য বৈদিক যুগ শেষ হইতে না হইতেই সেই আদি সভ্যতার অনেক উপকরণ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান আর্যসমাজ আত্মসাৎ করিয়া লয়। ফলে 'জনযুগের' পরিসমাপ্তি অচিরেই ঘটে—'বৈদিকযুগ' সম্পূর্ণ শেষ (৭০০ খ্রীঃ) না হইতেই। অবশ্য 'জনপদ' বা ট্রাইব ও টাইবল্ রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ আমরা উহার পরেও বহুদিন পর্যন্ত পাই। এমন কি, এখনো ভারতে টাইবল্ বা 'জন'-সমূহ টিকিয়া আছে। কিন্তু টিকিয়া আছে তাহারাই যাহারা সভ্যতার প্রবাহ হইতে দূরে ছিল; বর্তমান ভারতীয় সমাজের তাহা মুখ্য বৈশিষ্ট্য নয়।

(৩) 'সামন্ত যুগ' বা 'ক্ষুদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র বণিকের সমাজ'। এইরূপ ক্ষুদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র বণিকের আধিক্য (মার্কস, ক্যাপিটেল, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৩) সামন্ততন্ত্রের মৌলিক আর্থিক ব্যবস্থা বলিয়া গণনা করা হয়। সেই বৈশিষ্ট্যই ভারতের সামন্ততন্ত্রের সর্বস্বীকৃত বৈশিষ্ট্য। ইহা দেখা দেয় বৈদিক যুগ শেষ না হইতেই—যোদ্ধৃশাসক ও পুরোহিত শ্রেণীর পার্শ্বে তখন হইতেই দেখি বণিকশ্রেণীকে, ভূমিজ ও অন্ত্যজদের। একটু একটু করিয়া যেমন তাহা প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি নানা স্তরের মধ্য দিয়া এই সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিতে থাকে, বিশেষতঃ ইংরেজ (বুর্জোয়া) সাম্রাজ্যের পত্তনে। আবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই এদেশে বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেয় নাই, আধা-সামন্ত তন্ত্রকে টিকাইয়া রাখে। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট ইহারই শেষ বিঘোষিত হইয়াছে। বিদেশী বুর্জোয়ার মুখ্য অংশীদাররূপে দেশী বুর্জোয়া যুগের সূচনা হয়; স্বাধীন ভারতে তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রথমেই যাহা তাই লক্ষণীয় তাহা এই—গ্রীস-রোমের মত দাস-উৎপাদন-ব্যবস্থা ও 'দাসতার যুগ' আমরা ভারতীয় সমাজের ইতিহাসে পাই না; গৃহদাস, দাসকৃষিক নিশ্চয়ই ছিল। দ্বিতীয়ত, সামন্ত যুগেরও নানা রকমফের এই দেশে

দেখা যায়—যেমন, মৌর্যদের কেন্দ্রিত রাষ্ট্র; শুঙ্গদের ব্রাহ্মণানুশাসিত শাসন হইতে ক্রমে গুপ্ত ও বাকাটকদের সময়ে সামন্তদের উদ্ভব, রাজপুত আমলে সামন্ততন্ত্রের ব্যাপ্তি; তুর্ক-পাঠানদের জায়গীরদারী; আকবরের আমলের জায়গীরদারী প্রথা বিলোপের লক্ষণ; ব্রিটিশ আমলের 'দেশীয়রাজ্য' ও জমিদারপোষণ ইত্যাদি। তৃতীয়ত, বণিক শ্রেণীর আবির্ভাব যতই প্রাচীন হউক (বুদ্ধদেবের সমকালীন), তাহারা বিনিময় ক্ষেত্র ছাড়াইয়া উৎপাদন ক্ষেত্রে শক্তি বৃদ্ধি করিতে অগ্রসর হয় নাই—এদেশে সত্যকার উৎপাদন-বিপ্লব ঘটে নাই।

এই সুদীর্ঘ সামন্ত যুগ হুবহু অন্য কোনো দেশের সামন্ততন্ত্রের মত নয়, ইউরোপীয় ফিউডালিজম্ হইতে ইহা বহুদিকে পৃথক। এমন কি, 'এশিয়াটিক সামন্ত তন্ত্র' হইতেও স্বতন্ত্র। কিন্তু মূলত সামন্ততন্ত্রের প্রধান গুণসমূহ উহাতে দেখা যায়। এই কারণে, 'ভারতীয় সামন্ততন্ত্র' বলিয়াও ইহার পরিচয় দেওয়া চলে। ইহার প্রধানতম লক্ষণ বা কাঠামো কি? প্রথমত, এই সমাজের আর্থিক বনিয়াদ ছিল কৃষি এবং কৃষি-সম্পর্কিত শিল্প। দ্বিতীয়ত, নগর থাকিলেও ভারতবর্ষের এই কৃষিসভ্যতা মূলতঃ পল্লীভিত্তিক, উহা পৌরসভ্যতা হয় নাই। সামুদ্রিক বন্দর (ভারকুচ্ছ, তাম্রলিপ্ত, প্রভৃতি) ছাড়া শহরগুলি প্রধানত ছিল রাজধানী বা তীর্থক্ষেত্র। তৃতীয়ত, ভারতীয় সমাজের আসল শাসন-কাঠামো স্বয়ংনির্ভর পল্লী-পঞ্চায়েৎ বা 'ভিলেজ কমিউনিটি'। পল্লীর জীবনযাত্রা তাহাই পূর্বাপর সাধারণ ভাবে নিবাহ করিত। রাজা-রাজ্যের পরিবর্তনে এই পল্লীসমাজ ভাঙে নাই। এইরূপ পল্লী-কেন্দ্রিত কৃষি-সমাজ হয়ত প্রাচীন যুগে এশিয়ার অন্য দেশেও দেখা দিয়াছিল। অন্তত চীনের ব্যবস্থা ইহার সহিত তুলনীয়। অবশ্য চীনা পল্লী-জীবনের প্রধান কথা পিতৃ-চালিত পরিবার। ভারতবর্ষের জীবনের প্রধান একটি কথা তাহা বটে; কিন্তু আবার পল্লী-পঞ্চায়েৎও বটে। আর ক্রমে এখানে প্রধান হইয়া উঠে উহার সহিত জাত-পঞ্চায়েৎ। 'ফ্যামিলি', 'ভিলেজ কমিউনিটি' ও 'কাষ্ট' এই ত্রিপাদের উপর ভারতীয় সমাজ প্রায় পূর্বাপর নির্ভর করিয়াছে। কোন আর্থিক বিপ্লবে উৎপাদন-শক্তির বিপুল বৃদ্ধি, উৎপাদন-সম্পর্ক বা সামাজিক ব্যবস্থার এমন অচল অবস্থা হয় নাই যাহাতে সামাজিক বিপ্লব ঘটে—পরিবার, পল্লীসমাজ বা 'জাতি'ভেদও উড়িয়া যায়।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের যে আর্থিক বনিয়াদ প্রধানত কৃষি ও কৃষি-সমাজের কুটির-শিল্প কেন তাহার কোনো বিপ্লবী বিপর্যয় ঘটে নাই, কী রূপে সেই

উৎপাদন-শক্তির প্রসার বাস্তব ব্যবস্থা দ্বারা ও ভাবগত ধারণা-ভাবনার দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ করা সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখিব। এখানে স্মরণীয় এই—এই কৃষি সমাজের প্রসার এই দীর্ঘকালে যে একেবারে ঘটে নাই তাহা নহে। ভিতরের ও বাহিরের তাড়নায় নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে; তাহাতে সমাজের আভ্যন্তরীণ শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইতে চাহিয়াছে; শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের দ্বন্দ্বও নানা ধর্ম-সংঘাতে (দেবদেবীর নামের আড়ালে), রাষ্ট্র-সংঘাতে, বর্ণ-সংঘাতে—নানা স্মৃতি ও শাস্ত্রের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়া—ফাটিয়া বাহির হইয়াছে; হয়ত আপনার অজ্ঞাতেই নানা সৃষ্টিতে, ভাবনায়, দর্শনেও আপনার ছাপ রাখিয়াছে;—ইহাও জানিবার মত, বুঝিবার মত সত্য।

বনিয়াদের বিস্তার

ইহার একটি বিশেষ ধারা আছে। সমাজ-বিকাশের যে নব যুগে আমাদের পৌছাইয়া দিয়া মোহেন-জো-দড়োর অধিবাসীরা বিদায় লয়, তাহার পরবর্তী ইতিহাস উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া সেই ধারায় প্রায় এই সাড়ে তিন হাজার বৎসর চলিয়া আসিয়াছে।

এই সাড়ে তিন হাজার বৎসরের ইতিহাস তাই বলিয়া কেবল সেই প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নয়। বরং বলিতে পারি উহার স্বাভাবিক বিকাশ—নানা স্তরের ক্রমপরিণতি, নানা বৈচিত্র্যের ক্রমোদ্ভব। মূলত তবু সেই একটি প্রধান যুগেরই তাহা কাহিনী যে-যুগে মানুষ কৃষিকেই জীবনযাত্রার অবলম্বন করিয়া লইয়াছে, মূলত যে সমাজ পল্লীকেন্দ্রিক, রাষ্ট্রীয় শক্তির নানা উত্থান-পতনের মধ্যেও যাহার পল্লীপ্রাণ কৃষিসমাজ মোটামুটি টিকিয়া রহিয়াছে। আমরা জানি, ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক কালও এই কৃষি-সমাজের বিচিত্র এবং বিপুল বিকাশের সাক্ষ্যই বহন করে। হরপ্পা, মোহেন-জো-দড়োর পরেই দেখি—সমাজে শাসক ও শাসিতভেদ ও বাণিজ্য প্রচলন যথেষ্ট দৃঢ়; পল্লীগত সেই কৃষিসমাজ নগরপত্তনও করিতে সুরু করিয়াছে; আর তাহাদের পৌর-জীবন গৃহশিল্পে, দ্রব্য বণ্টনে ও বিনিময় পদ্ধতিতে যথেষ্ট অগ্রসর ও উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরে ভারতবর্ষে নূতন নূতন জাতি আসিয়াছে, কিন্তু পূর্ববর্তী প্রাচীন জাতিদের জীবিকার পন্থাকে তাহারা মুছিয়া ফেলে নাই। আবার গ্রীস বা রোমের মত পৌরসভ্যতার বিকাশ এখানে আর সম্ভব হয় নাই। নগর, বন্দর ছিল; কিন্তু জীবন ছিল প্রধানতঃ

পল্লীতে বিস্তৃত। কৃষিসভ্যতার সেই সুদীর্ঘ যুগই চলিয়াছে। ভারতীয় সমাজ "এশিয়াটিক সমাজের" একটি বিশিষ্ট বিকাশ রূপে এক তৃপ্ত মন্থর গতিতে যেন এই ভূমিগত বনিয়াদের উপর বিবর্তিত হইতে লাগিল,—শ্রেণীবিপ্লবের দ্বারা রূপান্তরিত হইল না; শ্রেণীবিদ্রোহের ফলে মাঝে মাঝে শুধু আপোস রফা করিয়া টিকিয়া রহিল।

সেই বুনিয়াদ আঁকড়াইয়া ভারতবর্ষের সামাজিক বিকাশ তথাপি থামিয়া থাকে নাই; তাহার সংস্কৃতির ইতিহাসও নিশ্চল হয় নাই। বরং যাহাকে আমরা সচরাচর ভারতীয় সংস্কৃতি বলি—আমাদের কাব্য, সাহিত্য, দর্শন ও নানা ধর্মচিন্তা, ধর্মানুষ্ঠান, লৌকিক ক্রিয়াকলাপ, লৌকিক ধর্ম ও আচার-বিচার—এই সবই এই সময়ের মধ্যে উদ্ভূত ও নানা ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। জীবন-যাত্রার বাস্তব বনিয়াদরূপে রহিয়াছে কৃষি ও কৃষিগত সমাজের ক্ষুদ্রশিল্প, এবং তাহারই বিনিময় ও বণ্টন পদ্ধতি। লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের বনিয়াদও কতকটা সেই প্রথমকার যুগের জন্মকালীন ক্রিয়াকলাপ, শব-সৎকার পদ্ধতি, সেই প্রকৃতির বিবিধ শক্তি ও উপকরণের উপাসনা, সেই পত্র-পুষ্প, ফল-জল প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তু দিয়াই আবার দেবতার পুজা;—আর লৌকিক মনও এখনো পর্যন্ত ইহাদের প্রভাবেই পরিচালিত। কিন্তু জীবিকার স্বাভাবিক তাগিদেই এই প্রাগৈতিহাসিক বনিয়াদ ঐতিহাসিক কালে আরো প্রসারিত, আরো প্রবল আকার ধারণ করে। এবং শ্রেণীভেদের স্বাভাবিক নিয়মেই শ্রেণী দ্বন্দ্ব, শ্রেণী-সংঘর্ষও বাধে; নানা ভাবে শাসকশ্রেণী তাহা দাবাইয়া দেয় বা মানাইয়া লয়; সেই প্রয়োজনে স্মৃতি প্রণয়ন করে, আচার-নিয়ম, দর্শন, ধর্মকর্ম উদ্ভাবনও করে।

প্রসারের ধারা

ভারতীয় সমাজের এই ক্রমবিকাশ ও ক্রমপ্রসারের নিয়মগুলি বারে-বারে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তথাপি সেইগুলি স্মরণে রাখিলে ভারতীয় সংস্কৃতির নানাদিকের বৈচিত্র্যে বা আপাতবিরোধিতায় চমকিত হইতে হয় না। ভারতীয় ইতিহাস ও তাহার ক্রমবিকাশের ধারাও আমরা যুক্তিযুক্তভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। পশুচারিক সমাজ অপেক্ষা কৃষিসমাজ বেশি স্থায়ী সমাজ, কৃষি ও পশু উৎপাদন এইযুগে বাড়িয়া যায়; তাই তাহাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উৎপন্নের পরিমাণ ও লোকসংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই ভা[illegible]

প্রসারেরও কতকটা বন্দোবস্ত করিতে পারিত। দেশ বিরাট, স্বভাবতই নূতন বনভূমিতে আবাদ বাড়ে; সঙ্গে সঙ্গে নূতন গ্রামের পত্তন হয়; দেহের জীব-কোষের বৃদ্ধির মত আরও একটির পর একটি নূতন গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। সঙ্গে সঙ্গে বণ্টনের ও বিনিময়ের নূতন তাগিদ আসে; গতায়াতের জন্য পথঘাট, যানবাহন দেখা দেয়। বংশ বা কুল (clan) ছড়াইয়া জীবন-যাত্রার কেন্দ্র হইয়া উঠে এক এক 'জন' বা কৌম (tribe), আর তাহাদের আশ্রয়ও এক এক পল্লীকেন্দ্র (village) ছাড়াইয়া হয় এক এক অঞ্চল (zone)।

মানুষের সভ্যতার গোড়ায় তার উৎপাদন শক্তি। কিন্তু ক্রমে সভ্যতার উপর উৎপাদনের মত প্রবল প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে এই বিচ্ছিন্ন মনুষ্য গোষ্ঠীর পরস্পরেব সান্নিধ্য স্থাপনের চেষ্টা, অর্থাৎ বণ্টন ও বিনিময়। অবস্থা বিশেষে উহা প্রবলতর হইয়াও উঠিতে পারে। এ ব্যাপারটি আজ এমনি সত্য যে, কেহ কেহ বলিয়া বসেন সভ্যতাব মূল তথ্য ইহাই: "diastole and systole of population" এবং "scope, pace and precision of human intercommunication"—অর্থাৎ লোকপ্রবাহ ও মানব-গোষ্ঠীর পরস্পর পরিচয়ের সুযোগ, ঘনিষ্ঠতা, ও সুনিশ্চয়তা। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ, সভ্যতা অগ্রসর হয় লোক-বৃদ্ধিতে এবং সেই লোকসমাজের পরস্পরের পরিচয়সূত্রে। কিন্তু সভ্যতার প্রারম্ভ জীবিকার প্রয়াসে, জীবিকা-উৎপাদন চেষ্টায়। উৎপাদনের বণ্টন ও বিনিময় সেই জীবিকা-প্রয়াসেরই একটা আনুষঙ্গিক দিক, এই উৎপাদন-প্রথারই একটা বিশিষ্ট বিকাশ। সমাজ একটু অগ্রসর হইলে বিনিময় ও বণ্টনের কথা ওঠে। লোক-বৃদ্ধিরও গোড়ায় চাই আহার্য-বৃদ্ধি, না হইলে লোকসমাজে বংশবৃদ্ধি কাজের হয় না। আর আহার্য-বৃদ্ধির অর্থই আবার জীবিকার উৎপাদন-শক্তির উৎকর্ষ। তাই সকলের মূল উৎপাদন, তাহার পর আসে বণ্টন ও বিনিময়। মানুষের নানা গোষ্ঠীর পরিচয়ের সূত্রও ইহাদেরই অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে,—এই তিন লইয়া আর্থিক জীবনের বনিয়াদ। তাই সামাজিক অনুধাবনে নানা জাতির পরিচয়ের উপর তত জোর দেওয়া মূলত ঠিক নয়—সমাজের আভ্যন্তরীণ শক্তিপুঞ্জের দ্বন্দ্বই সমাজের বিকাশের কারণ, এমন কি নূতন জাতির সহিত সংস্পর্শে আসিবারও কারণ সেই আর্থিক বিকাশ।

নূতন শক্তির সহিত সংস্পর্শও দুই রকমের হইতে পারে—মিত্রতার কিংবা বিরোধের। জীবিকার তাগিদে যে গোষ্ঠী ছড়াইয়া পড়িয়া নূতন নূতন

কেন্দ্র গড়ে তাহারা আবার পার্শ্ববর্তী গোষ্ঠীর সহিত সেই জীবিকা লইয়াই কলহে ব্যাপৃত হয়। সে কলহ পশুচারী সমাজে পশু লইয়া বা পশুচারণ ভূমি লইয়া বাধে; কৃষিসমাজে তদুপরি বাধে ক্ষেত্র লইয়া, গোধন লইয়া আর গৃহের সঞ্চিত উপকরণ লইয়া। এই গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে দ্বন্দ্বের ফলেই সমাজে যোদ্ধ-শ্রেণীর প্রয়োজন হয় সর্বাধিক; তাহাতেই ক্ষত্রিয় বর্ণের প্রভুত্ব স্থায়ী হইতে থাকে, আর নারী জাতির প্রভাব ক্রমশ গৌণ হইয়া উঠে। এই বিরোধ দুই দশ বৎসরে শেষ হয় না, চলে পুরুষের পর পুরুষ। তারপর একদিন এইরূপ বিরোধেরও একটা সমাধান হয়। ততদিনে আবার পরস্পরের জীবনযাত্রা, আচার-বিচার, চিন্তা-ভাবনা পরস্পরের জানা হইয়া যায়; এবং জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে তাহার প্রভাবও খানিকটা পরস্পরের মধ্যে সুদৃঢ় হইয়া উঠে। এইরূপেই জাতিতে জাতিতে পরিচয়ের সূত্রে মানুষের সভ্যতায় নূতন ভঙ্গিমা, নূতন রঙ, নূতন রস জোগাইয়া দেয়। শুধু উৎপাদনের পদ্ধতি দিয়া আক্ষরিকরূপে হিসাব করিলে হয়ত ইহার সঠিক কারণ সব সময়ে বুঝিয়া উঠা যায় না। তবু সংস্কৃতির সেই নূতন নূতন ভঙ্গিমার কারণ নূতন আর্থিক ভঙ্গিমা। অর্থাৎ, ভঙ্গিমার কারণ থাকে উৎপাদন প্রথায়, উপকরণে, এংব উৎপাদনের বণ্টনে বিনিময়ে। কিংবা একেবারে নূতন মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয়ে, মিলনে-বিরোধে—এই শেষ কারণেও সংস্কৃতির আর্থিক বনিয়াদ বদ্‌লাইয়া যাইতে পারে। যেমন, ইংরেজের আমলে আমাদের আর্থিক জীবন পরিবর্তিত হইয়াছে, আর তাই সংস্কৃতি রূপান্তরিত হইতে চাহিয়াছে। কিন্তু নতুন জাতির সহিত পরিচয়ে সব সময়ে আথিক জীবনের অত মূলগত পরিবর্তন নাও ঘটিতে পারে, শুধু একটা নূতন স্তর বা নূতন ভঙ্গিমার বিকাশ সম্ভবত হইতে পারে, প্রচলিত সংস্কৃতিতে কিছু বৈচিত্র্য জুটিতে পারে,—তুর্ক, মুঘল প্রভৃতি মুসলমান জাতিদের আগমনে ভারতবর্ষে মধ্যযুগে তাহাই ঘটিয়াছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির দিকে তাকালেই এই সত্যটির আরও বিশেষ প্রমাণ মিলে:—অন্যান্য দেশের কৃষিসংস্কৃতির সঙ্গে ভারত সংস্কৃতির ভঙ্গীর ও রঙের পার্থক্য কতকাংশে অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু সে পার্থক্যের কারণ (১) কতকটা ভৌগোলিক: যেমন, এই নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সুবিধা, এই নদীমাতৃক দেশের সুবিধা; (২) মূলত এই সুযোগের জন্য উৎপাদন প্রথার বিশেষ বিস্তার ও সামাজিক বিন্যাস ও সঙ্গে সঙ্গে সহজায়ত্ত জীবিকার জন্য কতকটা উদ্যমহীনতা, বিকাশের মন্থরতা; (৩) কতকটা আবার পৌরাণিক ও

লৌকিক কারণ : নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় আর্য ভাষীদের মধ্যে উদ্ভাবিত আদিম আচার-বিচার, চিন্তা-কল্পনা ; (৪) খানিকটা আর্য, ঈরানী, যুনানী প্রভৃতি নূতন নূতন জাতির আনীত তেমনি আচার-বিচার, প্রথা-পদ্ধতি, শিল্প-বিজ্ঞান ; (৫) এই সব নানা প্রভাবের দ্বন্দ্ব ও সম্মিশ্রণ ও বিচিত্র বিকাশে ভারত-সংস্কৃতি গঠিত।

ঐতিহাসিক কালেও তাই ভারতবর্ষের ইতিহাস শুধু তাহার প্রাগৈতিহাসিক কৃষি-সভ্যতাকে বনিয়াদ করিয়া একই রূপ রহিয়া গিয়াছে, এই কথা আক্ষরিক হিসাবে পুরা সত্য নয়। এই তিন হাজার বৎসরে ভারতবর্ষ প্রথমত সেই বনিয়াদের বিস্তার সাধন করিয়াছে—তাহার উৎপাদন-শক্তিকে বৃদ্ধি করিয়া, তাহার গৃহ-শিল্পকে ক্রমবিকশিত করিয়া, তাহার বণ্টন-বিনিময়ের পদ্ধতিকেও ক্রমপরিণত করিয়া। দ্বিতীয়ত, আবার সেই নূতন ও পুরাতন বনিয়াদেরও উপর একদিকে পুরাতন আচার অনুষ্ঠানকে টিকিয়া থাকিতে দিয়াছে, অন্যদিকে পুরাতনকেও আবার নবায়িত করিয়া লইয়াছে—কোথাও নূতনের প্রলেপে, কোথাও নূতন মাল-মসলায়—নূতনের সহিত পুরাতনের সমন্বয় করিয়া, কিংবা কোথাও নূতনে-পুরাতনে শুধুমাত্র বিমিশ্র করিয়া। তৃতীয়ত, ইহা ছাড়া আবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন বনিয়াদের উপর নূতন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান গড়িতেও ত্রুটী করে নাই—কোথাও সেই অনুষ্ঠান সেই কৃষি-জীবনের স্বাভাবিক নূতন পরিণতি, কোথাও হয়ত তাহা অন্য মানব-গোষ্ঠীর সহিত পরিচয় সূত্রে আহরিত, এবং হয়ত বা তাহাও কতকাংশে আবার ভারতীয় সমাজের উপযোগী করিয়া ঢালিয়া-সাজা। চতুর্থত, ভারতবাসীর মানস-জীবনেও ঠিক এই প্রকারই পরিণতি যুগে যুগে ঘটিল, ভাবনা ইহারই প্রতিলিপি বহন করিল। চিন্তায় সেই আদিম ভূত-ভীতি ও পূজা, সেই আচার-বিচার সেই 'টোটেম-তাবু'র সংস্কার, যোগ-প্রক্রিয়া, সেই ভাব-প্রাবল্য প্রভৃতি রহিয়া গেল, স্বাভাবিক বিকাশধর্মেই তাহা কিছুটা নূতনও হইল। অন্যদিকে নূতন অনুষ্ঠান, নূতন জাতি ও তাহাদের নূতন চিন্তা আসিয়া জুটিল, এবং তাহার খানিকটা গৃহীত, খানিকটা পরিবর্জিত হইল। ক্রমে এই নূতন পুরাতনের বিবিধ সংমিশ্রণে এই বিরাট দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে ভারতীয় অনুষ্ঠান ও আচার অকল্পিত নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য লাভ করিল। সেই নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য মনে হয় আজ এমনি মৌলিক যে এখন আমরা তাহার মূলকেও খুঁজিয়া দেখি না। ভুলিয়া যাই সেই মূল কৃষি-সভ্যতা আর তাহার বৈশিষ্ট্যের কারণ এই ভৌগোলিক পরিবেশ। তাহার

বৈচিত্র্যের গোড়া—এই দেশের বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ ও এদেশে মানুষের সচ্ছন্দ স্বতন্ত্র আর্থিক জীবনযাত্রা; এই দুইএর মোটামুটি সম্মিশ্রণ; আর সেই জীবন-প্রথার সহিত দ্বন্দ্বে-সমন্বয়ে সংযুক্ত নব নব জাতিদের জীবন ও চিন্তাধারা।—এইরূপ বহু বিচিত্র শক্তি, বহু বিমিশ্র অনুষ্ঠান ও মানসসম্পদ লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভারতবর্ষের সংস্কৃতি।

ভারতীয় সংস্কৃতির সেই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করিয়া সংক্ষেপে তাহার পর্বগুলিকে একবার বুঝিয়া লইলেও দেখিব—এই বৈচিত্র্য কিরূপ, উহার কারণই বা কী। মোটের উপর এই দিকে আমাদের উপাদানও আছে, তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাস। এই ইতিহাসে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীপতি কুলপতি হইল, গ্রামণী রাজন্য হইল; বৃত্তির তাগিদে শ্রমভেদ ও শ্রেণীভেদ জাতিভেদ রূপে দেখা দিল। (দ্রষ্টব্য— ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস' শীর্ষক ধারাবাহিক আলোচনা।) প্রায় দুই হাজার বৎসর চলিয়া আসিয়া যন্ত্রযুগের সম্মুখে সেই কৃষি-সংস্কৃতি শেষে ভাঙিতে শুরু করিয়াছিল। এখন স্বাধীনতা লাভের পরে তাহা নূতন হইয়া উঠিতেছে। ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য দুর্লভ—তবু মোট বিভাগগুলি দুর্লক্ষ্য নয়।

আর্য-বিস্তার

ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহাসিক কাল শুরু হয় আর্যভাষী গোষ্ঠীদের আগমনে ও আর্যদের দানে। কালটাকে মোটামুটি এখন খ্রীষ্টপূর্ব ১,৫০০ অব্দ বলা হয়, তাহা আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি। আজও ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতির লৌকিক পরিচয়—যদিও তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়, আর বৈজ্ঞানিক পরিচয়ও ইহা নয়। ভুলিলে চলিবে না—প্রথম কথা, নবাগত আর্যসভ্যতাও শুধু আর্যেরই নিজস্ব সম্পদ নয়। আসিবার পথে সেই আর্যভাষী গোষ্ঠীগুলি মেসোপোতামিয়া ও আসুরীয় জাতিদের সহিত সংস্পর্শে আসিয়াছিল। প্রাচীন ঈরানীয়দের সহিতও জ্ঞাতিত্ব-বন্ধনে ও জ্ঞাতি-শত্রুতায় ভারতীয় আর্যরা সম্পর্কিত ছিল। ভারতের পথে তাই ইহারা কুড়াইয়া আনিয়াছিল সেই প্রাচীনতর জাতিদের অনুষ্ঠান ও চিন্তা, প্রাক্‌ও আদি বৈদিকধর্মও দেবতাবাদ, —বৈদিকমন্ত্রের মধ্যে উহার চিহ্ন হয়ত সামান্য আছে, কিন্তু আর্যদের লৌকিক জীবন-প্রণালীতে উহার চিহ্ন ছিল তখনো হয়ত ব্যাপক। আর পরবর্তী

কালের পরিবর্তনের মধ্যেও হয়ত তাহার পূর্বরূপ পরিবর্তিত হইয়াও কিছু না কিছু রহিয়া গিয়াছিল—হয়ত এখন আর তাহা চিনিয়া উঠাও সুসাধ্য নয়। যেমন, অথর্ববেদের মন্ত্র তন্ত্র একদিকে পূর্বকালীন ঈরানী অবৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের স্মারক এবং অন্যদিকে দেশীয় অবৈদিক ঝাড়-ফুঁকের বাহক।

আর্যের 'নিজস্বতার' স্বরূপটি অবশ্য এইরূপ—অর্থাৎ প্রত্যেক জাতিরই নিজস্বতা বহুলাংশে এমনি পরস্ব। দ্বিতীয় কথা, আর্যরাও সকলে এক গোষ্ঠীর নয়, আর সবাই সভ্যতার সমস্তরেও ছিল না। তাহাদের মধ্যে জীবিকার উপাদান রূপে হয়ত তখনও সকলে কৃষি গ্রহণ করে নাই। কেহ কেহ ছিল পশুচারী; অধিকাংশই কৃষি ও পশুচারণা দুইই অবলম্বন করিয়াছে। মোটের উপর যাযাবর-বৃত্তি তাহারা কাটাইয়া উঠিয়াছে, তাহা ঠিক। তবে সকলেই এক ধর্ম ও সংস্কৃতি মানিত। 'আর্য' কথার অর্থ সম্ভবত ইহাই—"স্বজন"। তৃতীয় কথা, যেমন আর্যরা সকলে সমস্তরে ছিল না, তেমনি সকলে এককালেও আসে নাই—আসিয়াছিল বহু শতাব্দী জুড়িয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গে। হয়ত তাহার প্রারম্ভ খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের পূর্বে আর তাহার অবসান খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০,—৭০০ অব্দের দিকে। চতুর্থ কথা, ততদিনে আর্যদের যাহা নিজস্ব রূপ তাহারা বহিয়া আনিতেছিল—বেদমন্ত্রে যাহার হয়ত অনেকটা অবিকৃত প্রমাণ রহিয়াছে—তাহা ভারতের অনার্যদের, অর্থাৎ সেই মিশ্র ও অমিশ্র কোল-সাঁওতাল, অস্ট্রিকদের এবং দ্রাবিড়ভাষীদের দানকেও স্বীকার করিয়া নূতন ও বিস্তারিত বনিয়াদ গড়িয়া ফেলিতেছিল—ভারতীয় 'হিন্দুসভ্যতার' বনিয়াদ সৃষ্টি করিতেছিল। ইহার অর্থ পরিষ্কার—হিন্দুসভ্যতা নিছক আর্য সভ্যতা নয়; তাহা দ্রাবিড়, কোল মুণ্ডা প্রভৃতির সকলের দান মিশাইয়া যেই আর্য সংস্কৃতির নবজন্ম। পঞ্চম কথা, কিন্তু যতই আর্যধর্ম ও আর্যভাষার প্রলেপে এবং আর্যের বিপুল শক্তির নিকট এই ভূমির ঐ সব প্রাচীন ধর্ম ও ভাষা পরাজিত হউক, ইহাও স্বীকার্য যে, নবাগত আর্যদল এইখানকার অধিবাসীদের, যেমন হরপ্পা-কৃষ্টির অধিকারীদের, কাহার কাহারও তুলনায় ছিল সভ্যতার হিসাবে অসভ্য ও বর্বর। (হরপ্পার লোকদের urn burial হইতে অ-বৈদিক আর্য ভাবিবার কারণ নাই; কারণ তাহাদের সহিত সুমেরের সম্পর্ক পরিষ্কার)।

মোহেন-জো-দড়োর সভ্য জীবনকে এই বিজেতারা ভাঙিতে পারিল। অর্ধ-সভ্যের হাতে গৃহস্থের অনেক সময়ে এমনি পরাজয় ঘটে। ইহার দুইটি বাস্তব কারণও সম্ভবত ছিল: প্রথমত আর্যেরা সেই যুগের ব্লিৎজ-ক্রিগের

আবিষ্কর্তা। তাহাদের নূতন যুদ্ধযন্ত্র অবশ্য ট্যাঙ্ক নয়, তাহার নাম অশ্ব। যদিও বেদে 'অশ্বের' উল্লেখ পরিষ্কার নাই, কিন্তু ভারতের বাহিরেই এই জীবটির সহিত আর্যদের পরিচয় ঘটিয়াছিল। এই পৌরসভ্যতা ধ্বংস করিয়াই ইন্দ্র 'পুরন্দর' হন্—অর্থাৎ শতাধিক 'পুর' তিনি ধ্বংস করেন। তুরগবাহী আর্যের দলগত বিন্যাসও ছিল দুর্ধর্ষ; ইহাই তাহাদের জয়লাভের দ্বিতীয় কারণ। বিশেষত একালের বিত্তহীনদের মতো সেদিনকার আর্যদলেরও had nothing to lose. তাই, সেই গৃহস্থ সমাজকেও পরাজিত করিয়া যখন বলিষ্ঠ বর্বরের দল তাহাদের জীবন-যাত্রার উপকরণ অধিকার করিয়া বসিল তখন প্রাচীন সমাজেও এক প্রবলতর, নূতনতর প্রেরণাই আর্যরা দান করিতে পারিল। কৃষি-সংস্কৃতি স্বভাবত ঐক্য-বিধায়িনী নয়, খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত জীবনযাত্রায় তাহা অভ্যস্ত। কিন্তু এই বিজেতার দল শত্রুর সহিত সংঘর্ষের ও দ্বন্দ্বের প্রয়োজনে এই সমাজকে খানিকটা কেন্দ্রাভিমুখী না করিয়া পারে নাই। মনে হয়—সেই সংগঠন শক্তিও তাহাদের ছিল: "সম্ভবতঃ তাহারা (আর্যরা) ছিল প্রচণ্ড শক্তিশালী, একান্তরূপে কর্মী, অপূর্ব কল্পনাশীল, disciplined বা শৃঙ্খলাসম্পন্ন, সুদৃঢ়রূপে সঙ্ঘবদ্ধ, গুণগ্রাহী কিন্তু আত্মসমাহিত।" (জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য—শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়; পৃষ্ঠা ১৯)। বলা বাহুল্য বিভিন্ন দেশে প্রাচীন আর্যভাষীদের কর্মক্ষমতা লক্ষ্য করিয়াই তাহাদের এইরূপ ভাবা চলে। 'রক্তের গুণ' যদি সত্যই থাকে তাহা হইলেও রক্ত বহিয়া গুণগ্রাম বিশুদ্ধ আসে না, আসিলেও তাহা বহু রক্তে মিশিয়া এখন আর ভারতীয় রক্তে তেমন প্রবল নাই। আজ ভারতীয় জীবনযাত্রার মধ্যে ঐসব আর্য-মানসিকগুণের কতটুকু অবশিষ্ট আছে? বরং এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে পারি তৎপরিবর্তে টিকিয়া আছে (সুনীতিবাবুর উল্লেখিত) তথাকথিত 'দ্রাবিড়-ভাষীদের ভাব-প্রাবল্য' এবং 'অস্ট্রিক জাতীয় অলস নমনীয়তা'। অবশ্য এইরূপ সামান্যোক্তি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অচল; জাতিগত ও রক্তগত ভাবে কোনো ভাব-প্রবাহ বহিয়া চলে, বিজ্ঞান ইহা মানে না। যাহাই হউক, মনে হয় সংঘর্ষের উপযোগী মনোভাব ও শক্তি ভারতভূমির অপর্যাপ্ত দাক্ষিণ্যে সমাগত আর্য কৃষি-সমাজ হারাইয়া ফেলিতে দেরী করে নাই। তেমনি ভাবে য়ুনানী, শক, হুন প্রভৃতি অন্যান্য পরবর্তী আগন্তুকরাও তাহা অচিরেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। ভারতের গৃহস্থ কৃষি-সভ্যতাকে তথাপি তাহারাও সকলেই নানাভাবে প্রসারিত ও উন্নত করিয়া গিয়াছে।

বৈদিক সমাজ

বৈদিক আর্যদের সমাজের কথাই বেদে ও প্রথমদিককার বৈদিক সাহিত্যে আমরা লাভ করিতে পারি—অ-বৈদিক অন্-আর্যদের কথা বা অ-বৈদিক আর্যদের কথা তাহাতে পরোক্ষে থাকিতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষসূত্রে নাই। যাহা জানি তাহা এই[১] :—'আর্য'রা তখনো বিভিন্ন 'জন' বা 'কুলে' বিভক্ত। 'জনে'র অধিনেতা 'রাজন্'। তখন যুদ্ধ ও বিজয়ের যুগ। 'আর্য' জনগুলি পরস্পরেরও ভূমি, গোধন প্রভৃতি লুণ্ঠন করে, আবার বিভিন্ন আর্যগণ একত্রিত হইয়া 'পরে'র বিরুদ্ধে সংগ্রামও করে। যাহারা 'আর্য' নয় তাহারাই 'পর', শত্রু, অর্থাৎ শত্রুরা বৈদিক দেবদেবী, যাগযজ্ঞ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি মানে না। সচরাচর তাহাদেরই নাম 'দাস', 'দস্যু', অর্থাৎ শত্রু। হয়ত 'দাস' মূলতঃ কোন শত্রুগোষ্ঠীরও নাম হইতে পারে। আর্য 'জনের' সংগঠনটা এইরূপ—কতকগুলি 'বিশ' লইয়া একটি 'জন' বা ট্রাইব, কতকগুলি 'গ্রাম' লইয়া আবার এক একটি 'বিশ', আর কতকগুলি পরিবার লইয়া এক একটি 'গ্রাম'; সকলের নীচে 'গ্রাম', উপরে 'জন'। যোদ্ধপ্রাধান্য এই সব 'জনের' মধ্যে বেশি, মন্ত্রকার ও যাগ-যজ্ঞাভিজ্ঞ যাজকশ্রেণীরও প্রাধান্য তত নয়—অবশ্য মনে রাখিতে পারি, হয়ত পুরোহিত-রাজের (উর, লাগাশের, হরপ্পারও ?) যুগ পশ্চিম এশিয়ায় তখনো একেবারে শেষ হয় নাই। নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে বৈদিক:সামাজিক শ্রমবিভাগের ফলে ঈরানের আর্যদের মত তিনটি শ্রেণী ভারতীয় আর্যদের মধ্যেও দেখা দিতেছে—যোদ্ধশ্রেণী (ক্ষত্রিয়), পুরোহিতশ্রেণী (ব্রাহ্মণ), সাধারণ জনগণ (বিশ-বৈশ্য)। স্বাধীন নানা বৃত্তিধারী ও কৃষিজীবী পরিবার বিশ বা বৈশ্যের অন্তর্গত। এই তিন শ্রেণীর বাহিরে হয়ত ছিল 'উপাস্তি' বা প্রায় গোলামের (স্লেভ-এর) তুল্য আশ্রিতশ্রেণী; এবং-ঋণ-দাস ও যুদ্ধ-দাস, ক্রীত-দাস, প্রভৃতি গৃহদাস। ইহারাই (স্লেভস্) গোলাম শ্রেণী। 'বিশ' সকলের খাদ্যবস্ত্রাদির ভার গ্রহণ করে—অবশ্য প্রথমে ইহা কার্যবিভাগ মাত্র, শ্রেণীভেদ, 'জাতিভেদ' নয়। কিন্তু ক্রমশই যোদ্ধ-শ্রেণী রক্ষাকর্তা হইয়া উঠে। 'বিশই' প্রথম যোদ্ধনেতাকে হয়ত 'রাজন্', নির্বাচন করিত কিন্তু অনেক জনেই পদটি উত্তরাধিকার সূত্রে রাজ বংশধরের প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। রাজকরও রাজনের ক্রমশ প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে। বৈদিক

[১] এই আলোচনা প্রধানত ডাঃ দত্ত ও পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের গ্রন্থাদি অবলম্বনে লিখিত।

আর্যসমাজে 'রাজন্' ট্রাইবল্ চিফ্, কিন্তু 'বিশপতি', 'গ্রামানি'ও আছে। গ্রামের 'সভা'য় তখনো কিন্তু গ্রামের পঞ্চায়েৎ বসে। আর জনের সাধারণ সম্মেলন 'সমিতি'ও সর্বমান্য। কিন্তু রাজন্ ও 'রাজন্য' (রাজগোষ্ঠী) ক্রমশ শাসনভার কাড়িয়া লয়—যদিও তখনো এই 'রাজন্'গণ স্পষ্টত দাবী করিত না যে, তাহারা শুধু 'নৃপতি' নয়, 'ভূপতি'ও, ভূমির মালিক। (রাজার এই দাবী পরবর্তী কালেও সকল স্মৃতিকার স্বীকার করেন নাই)।

পিতৃপ্রাধান্য তখন স্বীকৃত; পুরুষ প্রাধান্য সুস্পষ্ট; দেবতারাও অধিকাংশই পুরুষ। কিন্তু গৃহপতির যজ্ঞসঙ্গিনী 'গৃহপত্নী'ও সম্মানিত। পশুপালক সমাজে 'দুহিতার' তখনো প্রয়োজন আছে; কিন্তু সেই যোদ্ধসমাজেও পুত্রের সঙ্গে সে তুলনীয় নয়, বলাই বাহুল্য। 'সতীদাহ' অপেক্ষাও বিধবার 'দেবর' বিবাহই হয়ত সুপ্রচলিত ছিল,—বংশবৃদ্ধির জন্যও বটে, পারিবারিক সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্যও বটে। বাস্তব উপকরণে তখনো তাম্রপ্রস্তরযুগ। পশুপালনই কৃষির অপেক্ষাও জীবিকার প্রশস্ততর উপায়। প্রধান সম্পত্তিও তখন গোধন; প্রধান খাদ্য দুগ্ধ, পায়স, ; গরু, মেষ, ছাগল, ভেড়া, গাধা, ঘোড়া, কুকুর তখন গৃহপালিত জীব। আহারে যজ্ঞে, উৎসবে গোহত্যা যথেষ্ট প্রশস্ত। দ্বিতীয় সম্পত্তি—কৃষি। লাঙ্গলের দ্বারা চাষ হয়। গম, যব প্রভৃতি চাষ হইত, প্রথম চাউলের সঙ্গে পরিচয় হয় নাই। চাউল হয়ত ঐ অষ্ট্রিকদেরই প্রথম উৎপন্ন শস্য। দেবতাদেরও প্রধান খাদ্য ঐ সব শস্যের পুরোডাশ, আর প্রধানতম পানীয় সোম (আধুনিক সিদ্ধি?)। ইহার পর বৃত্তিধারীরা—ইহারা সূত্রধর, রথকার, কর্মকার, চর্ম পরিষ্কারক প্রভৃতি। তখনো লৌহ সম্ভবত অপ্রচলিত; কাঠের তৈজসপত্র, তাম্র, পিত্তলের ও মৃত্তিকার 'স্থালী' প্রভৃতি। রঙীন ও কাজকরা 'বাস' ব্যবহৃত হয়, চর্মপরিচ্ছদও আছে।—এইসব জীবন-যাত্রার অবলম্বন। উৎসব প্রধানত সভায় 'দ্যূতক্রীড়া', রথের দৌড়, আর স্ত্রী-পুরুষের একযোগে 'নৃত্য'। সোমপান অবশ্য ধর্মের অঙ্গ। আর সেই ধর্মের অধিকাংশ তখন যাগ-যজ্ঞ নানা জটিল অনুষ্ঠান-পল্লবিত—নিশ্চয়ই যে বিশেষজ্ঞ শ্রেণী তাহা রক্ষা করেন তাঁহারা পুরোহিত যাদুকরেরই মত শক্তিধর বলিয়া সম্মানিত; আর দেবতারা কতকটা আদিকালের মত প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক, যেমন (উষা প্রভৃতি); কতকটা 'জন' বিভক্ত যোদ্ধসমাজের নেতা, যেমন ইন্দ্র কিম্বা বরুণ। দেবলোক এই মনুষ্যলোকেরই প্রতিচ্ছায়া।

প্রথম দিক্‌কার সপ্তসিন্ধু দেশের বৈদিক সমাজের ইহাই রাষ্ট্রীয়

ও আর্থিক রূপ। কুরু-পাঞ্চাল প্রদেশেও অবস্থা এইরূপ। যতই বৈদিক আর্যরা বিজয়ী রূপে দক্ষিণে গঙ্গা-যমুনা-রামগঙ্গা-প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিল, বিজয়ী রূপে 'আর্যাবর্তে' স্থির হইয়া বসিতে পারিল; ততই এই 'জন-সত্তাক' রূপ পরিবর্তিত হইয়া চলিল। 'ঋকবেদের'ও ১০ম মণ্ডল অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের রচনা বলিয়া স্বীকৃত। উহার পরম গৌরব উহার একেশ্বরবাদ। বেদের বহুদেববাদ যেমন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 'জনের' শাসকের প্রতিচ্ছায়া, তেমনি এই নবোদ্ভিন্ন একেশ্বরবাদ বৈদিক 'জন'-স্বাতন্ত্র্যের পরিবর্তে সম্রাট-শাসিত ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র-উদ্ভবের আভাস। অর্থাৎ তখন বৈদিক 'জনযুগ' শেষ হইয়াছে; বড় বড় 'রাষ্ট্র' গঠনের যুগ আসিয়াছে। নির্বাচিত নায়ক 'রাজন্' হইয়াছিল; 'রাজন্য'-শাসনও চলিতেছিল; এখন সে শাসক রাষ্ট্রের 'সার্বভৌম রাজা' হইয়া বসিয়াছেন। ইহাতে যোদ্ধ-শ্রেণীর ক্রমোন্নতির পরিচয় পাই। 'দশমমণ্ডলে' এমনি এক সুবিদিত সূক্ত 'পুরুষসূক্ত'—ব্রহ্মার দেহ হইতে চতুর্বর্ণের উদ্ভবের প্রসিদ্ধ কাহিনী। পুরোহিত শ্রেণী শুধু উদ্ভূত হয় নাই, ব্রাহ্মণ রূপে সমাজদেহের শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত বলিয়াই তাহারা ইহাতে দাবী করিতেছেন।—অর্থাৎ যোদ্ধ-সমাজের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা যুদ্ধ-বিজয়ের পরে আর বেদাভিজ্ঞ যাজক শ্রেণীকে মানিয়া লয় না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয়েই শাসকশ্রেণীর; বিশেষত বর্ণভেদ তখনো কর্মগত। রাজতন্ত্রে ও পুরোহিততন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপে তথাপি বৈদিক সমাজের অন্তর্বিরোধ ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে। বেদের 'সংহিতা' ও 'ব্রাহ্মণ' ভাগ ছাড়াইয়া 'আরণ্যকে'র রচনাকালে উপস্থিত হইতেই দেখি—যাগযজ্ঞ, অনুষ্ঠান বা কর্মকাণ্ড লইয়া পুরোহিত শ্রেণী যতই সামাজিক প্রতিষ্ঠার দাবী করুক, তত্ত্বজিজ্ঞাসায়, ব্রহ্মবিদ্যায়, রাজারাই বেশি উৎসাহী। অর্থাৎ প্রাচীনতর বৈদিক সমাজের জীবনযাত্রা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে; যুদ্ধজয়, শত্রুবিনাশ, শত্রুর ধনজনের লুণ্ঠনের জন্য দেবতার স্তবস্তুতির আর তেমন একান্ত প্রয়োজন নাই, চিরাচরিত আচার-অনুষ্ঠানেরও উপর আর যোদ্ধশ্রেণীর তেমন শ্রদ্ধা নাই। থাকিবে কিরূপে?—জীবন-যাত্রার বাস্তব সাক্ষ্য যে তাহারা দেখিতেছে অন্যরূপ। কারণ বাস্তব রাজশক্তি হিসাবে রাজাদের অধিকতর জীবননিষ্ঠ হইতে হয়; আর কর্মকাণ্ডের রক্ষক হিসাবে ব্রাহ্মণদের হইতে হয় অধিকতর আচারনিষ্ঠ। বৈদিক যুগে তখনো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে পারে, ক্ষত্রিয়ও ব্রাহ্মণ হইতে পারে; এমন কি, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র কেহই জন্মসূত্রে তাহা হয় না। তবু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের শ্রেণী আলাদা। আর ক্ষমতার

দ্বন্দ্ব যে এই শোষক চক্রের দুই শ্রেণীর মধ্যে বাধিয়া গিয়াছে তাহার আভাস বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ভার্গব, পরশুরাম, হৈহয়কার্তবীর্য, পুরুরবা, নহুষ প্রভৃতির বহুবিদিত আখ্যায়িকাগুলিতে ছাড়াও সংগ্রহ করা যায়। এই শ্রেণীবিরোধে ব্রাহ্মণের স্ত্রীহরণে বা গো-ভক্ষণে ক্ষত্রিয় রাজাদের দ্বিধা ছিল না। শক্তিতে কুলাইলে ব্রাহ্মণরাও তাহাদের ছাড়িত না (দ্রষ্টব্য ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি', ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭-১০৪)। ক্রমে এই দ্বন্দ্ব মোটামুটি একটা সুপরিচিত মীমাংসায় পৌছে—ব্রাহ্মণ ধর্মনেতৃত্ব ও মন্ত্রণানেতৃত্ব লাভ করিয়া ক্ষত্রিয়কে রাষ্ট্রনেতৃত্ব ছাড়িয়া দেয়, ক্ষত্রিয়ও রাষ্ট্রনেতৃত্বের পরিবর্তে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লয়। কিন্তু ইহা পরবর্তী কালের কথা, যখন (কণ্ব, সুঙ্গদের সময়ে ?) হিন্দু সমাজ ও রাজত্বের সংগঠন চলে, স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রণীত বা সংগৃহীত হইতে থাকে। ক্ষত্রিয়পুত্র গৌতম ও মহাবীরের অধ্যাত্ম্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই ক্ষত্রিয়পুত্র শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণকেও অবতার বলিয়া ব্রাহ্মণদের মানিয়া লইতে হয়। তবে সেই অবতারেরাও বেদ-ব্রাহ্মণের দাস, বশিষ্ঠের মন্ত্রণায় চালিত, ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে ধরিয়া কৃতার্থ, ইত্যাদি। এখানে বুঝিবার মত যাহা তাহা এই :—বৈদিক যুগেরই শেষ দিকে চতুর্বর্ণ হিসাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ছাড়াও 'শূদ্রের' উল্লেখ পাই। 'শূদ্র' অবশ্য বিজিত আদিম অধিবাসী নয়, আর্যদের হয়ত কোনো অধঃপতিত অংশ (দত্ত, ঐ, ১০৫); দেখি বৈশ্য (কৃষি ও বৃত্তিজীবী সাধারণ স্বাধীন মানুষ) ও শূদ্র এই দুই শ্রেণীই নিম্নশ্রেণী বলিয়া গণ্য হইতেছে। অর্থাৎ শ্রমবিভাগ ও 'শ্রেণীভেদ' জাতিভেদে পরিণত হইয়া দানা বাঁধিবার দিকে চলিয়াছে।

অবশ্য বহুদিন পর্যন্ত তবু শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারিত, ক্ষত্রিয় হইতে পারিত ; এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ও শূদ্র না হইত তাহা নয়। বিবাহে তো বাধা ছিলই না। কিন্তু কাহারা এই শূদ্রশ্রেণী ? নিঃসংশয় হইবার উপায় নাই ; পরবর্তীকালের সাক্ষ্য দেখিয়া মনে হয়, সম্ভবত আর্য সমাজেরই সেই শ্রেণী শূদ্র যাহাদের ভূ-সম্পত্তি নাই ; কেহ যাহারা ক্ষেত-মজুর, কেহ বা শিল্পী কারুজীবী। অবশ্য আরও পরবর্তীকালে ইহাদের এক অংশ আবার সেই ভূ-সম্পত্তির অধিকার লাভ করিয়া সৎ-শূদ্রে উন্নীত হয়, আর ভূমিহীনরা শূদ্র বা অসৎ-শূদ্র থাকিয়া যায়। কিন্তু সেই বৈদিক সমাজের বিষয়ে যাহা প্রথম এখানে জ্ঞাতব্য তাহা এই—নিজেদের এই অধোগতি বৈশ্য-শ্রেণী ও শূদ্রশ্রেণী বিনা দ্বন্দ্বেই কি

মানিয়া লইয়াছিল? ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সংঘর্ষে ক্ষত্রিয়ের পিছনে (কিংবা ব্রাহ্মণের পিছনে) কি ইহাদের শ্রেণীও সারি বাঁধিয়া দাঁড়ায় নাই? বৈদিক সাহিত্যে তাহার উল্লেখ না থাকুক, বৈদিক যুগের শেষেই বৌদ্ধজাতকে দেখিতে পাই—বণিক-শক্তির (শ্রেষ্ঠী বৈশ্যদের) আর্থিক প্রতিষ্ঠা তুচ্ছ নয়। এবং একটু পরেই দেখি মগধের সিংহাসনে আসিয়া বসিতেছে শূদ্র সম্রাটরা, নন্দরা ও মৌর্যরা; আর আরও শত পাঁচেক বৎসর পরে জাতি-ভেদ যখন পাকা হইতেছে তখন বৈশ্য জাতীয় গুপ্তরা ভারতের সার্বভৌম সম্রাট। তারপরও শত বাধার মধ্যেও এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের শক্তিতেই বারে বারে নানা অজ্ঞাত নিম্নজাতীয় রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে; আর নিজেরা শাসক শ্রেণীতে প্রমোশন লাভ করিয়া সেই রাজগণও সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়াছেন—বুঝিতেও পারেন নাই যে, শোষিতশ্রেণীর প্রতি তাঁহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন; বুঝিতে চাহেন নাই যে, বিরোধ নির্মূল হইল না; শুধু সাময়িক ভাবে চাপা পড়িল। অর্থাৎ শুধু শ্রেণীভেদ নয়, শ্রেণীদ্বন্দ্বের বীজ বৈদিক সমাজও বহন করিতেছিল; যদিও তখন পর্যন্ত দ্বন্দ্ব ছিল প্রধানত শোষক-চক্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাহাদের ধর্ম প্রাধান্যের বিরোধ। এই শ্রেণীর দ্বন্দ্বকে চাপা দিবার জন্য ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণী পরবর্তী কালে যে সব পদ্ধতি গ্রহণ করে পরে তাহা দেখিব, কিন্তু সে পদ্ধতিরও উদ্ভাবনা আরম্ভ হয় —এই বৈদিক যুগের শেষদিকে—মতাদর্শ বা ইডিয়লজির দিক হইতে পুনর্জন্ম ও কর্মবাদের আবিষ্কারে, আত্মতত্ত্বের অনুশীলনে; বাস্তব ব্যবস্থার দিক হইতে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজনীতিতে প্রয়োজন মত সংরক্ষণ-সংস্কারে, স্বীকারে, বর্জনে।

বৈদিক যুগেরই শেষ দিক হইতে ব্রাহ্মণ্যবাদ আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন করে। আর্যাবর্তের এই নূতন সামাজিক কড়াকড়ি, বিশুদ্ধিতা, পশ্চিমে সপ্তসিন্ধু প্রদেশের অধ্যুষিত আর্যদের ছিল না; আর প্রাচ্যের (মগধ বিদেহের?) আর্যদের নিকটও এইসব অগ্রাহ্য। এই দুই দলকে বৈদিক ব্রাহ্মণশ্রেণী সংস্কারহীন বলিয়া হেয় করিতে চায়। সপ্ত-সিন্ধুর আর্যরা এইসব নূতন ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার জানেও না, মানেও না; প্রাচ্যের আর্যরা বেদই মানে না, তাহারা 'ব্রাত্য'। অথচ লক্ষণীয় এই, এই প্রাচ্যমণ্ডলেই ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন বেশি; রাজারা আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন; এখানেই একটু পরে উদ্ভূত হন গৌতম বুদ্ধ ও জৈন মহাবীর। তাঁহারা ছাড়াও তাঁহাদের সমকালে এখানে তীর্থঙ্কর, আজীবক, অগ্নিউপাসক প্রভৃতি নানা অবৈদিক সম্প্রদায়ের অভাব ছিল না।

আসলে বৈদিক আর্যরা যতই বিস্তৃত হইয়াছে ততই অ-বৈদিক আর্যদের অস্তিত্ব ও প্রভাব তাহাদেরও মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। জীবনযাত্রায় কৃষিসমাজ স্থাপিত হইতেছে, বিনিময় ব্যবসা ও মহাজনী দেখা দিতেছে, রাষ্ট্রে, সমাজে পরিবর্তন ঘটিতেছে। তাই একদিকে যখন সংহিতা, ব্রাহ্মণ, ধর্মসূত্র, গৃহ্যসূত্র রচনা করিয়া সংরক্ষণশীল পুরোহিতরা বাড়াবাড়ি করিতেছে, অন্যদিকে তখনি 'আথর্বণ' দিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে; ব্রাত্যদেরও উদ্দেশে প্রশস্তি রচনা চলিতেছে, একেবারে দেশজদের সাপের মন্ত্র, ঝাড়ফুঁকও, গোঁড়া পুরোহিত শ্রেণীর না হোক, বৈদিক সমাজের অন্যদিগের, গ্রাহ্য হইয়া পড়িতেছে। আর এই নানা অন্-আর্য দেব-দেবী, যোগ-তন্ত্র, আচার-অনুষ্ঠান, চিন্তা-ভাবনাই কি শুধু আসিয়াছে?—সপ্তসিন্ধু দেশেও কি বিজিত 'হরপ্পা সভ্যতার' শেষ অধিকারীদের শিল্পকুশল, কৃষিকুশল ব্যবসায়ীরা সমাজে ঠাঁই পায় নাই? মল্ল, লিচ্ছবী, বৃজ্জি, শাক্য প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজন্য জানপাদগুলি সবই কি কেবল বৈদিক বা অ-বৈদিক আর্যদের পুরাতন ট্রাইবল্ জনরাষ্ট্র? না, ঐ সব রাষ্ট্রে আরও প্রাচীনতর অন্-আর্য জানপাদগুলি নবকলেবর লাভ করে?

বৈদিক যুগ সম্বন্ধে এই কয়টি সিদ্ধান্ত ও সমস্যাই তাই আমাদের স্মরণীয়: (১) বৈদিক আর্যসমাজেও পরিবর্তন আসিয়াছিল। (২) কৃষির সুপ্রসার ও বিনিময়-বাণিজ্যের উদ্ভবে উৎপাদন অনেক বাড়িয়া যায়; (৩) শ্রেণীভেদ স্পষ্ট হয়; শ্রেণী-বিরোধেরও সূচনা হয়। এমন কি, কৃষিজীবী ও কারুজীবীর দৈহিক শ্রমকে মস্তিষ্কজীবী শোষক শ্রেণী একটু একটু করিয়া হেয় জ্ঞান করিতেও শুরু করেন। (৪) জন-সত্তাক সংগঠন ভাঙিয়া ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র (রাজতন্ত্র ও অভিজাত গণতন্ত্র, দুইই) দেখা দেয়;—ক্ষত্রিয়ের নেতৃত্বে ভারতের সুদীর্ঘ সামন্ততন্ত্রী সমাজের বীজবপণ শুরু হয়। দেশজ নানা সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, ট্রাইব্‌কে আর্যীভূত করিবার তাগিদ বাড়ে; পুরোহিতদিগের উপরেই পড়ে তাহারও ভার। (৫) এই আলোড়নের মধ্যে খ্রীষ্টীয় ৭০০ অব্দের পূর্বেই পুরাতন বৈদিক দেবদেবী, যাগযজ্ঞ, অর্থাৎ বৈদিক আইডিয়োলজি বদলাইতে থাকে। যাজক পুরোহিতেরা শক্ত করিয়া যতই বেদের কর্মকাণ্ড বাঁধিতে লাগিল, ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা ততই তাহার গোড়া ধরিয়া টান দিল—'সত্য কি?' বৈদিক আর্যসমাজ সম্ভবত অনার্যদের পুনর্জন্মতত্ত্বকে কর্মবাদে বিকশিত করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা শুধু পরাবিদ্যাতেই ঝুঁকিয়া পড়ে নাই, সেই leisure class idealism ছাড়া লোকায়ত মতও ছিল—যাহারা পৃথিবী-

কেই স্বীকার করিত, আত্মা, স্বর্গ প্রভৃতি যাহারা মানিত না (দ্রষ্টব্য রাহুল সাংকৃত্যায়ন, দর্শন-দিগ্‌দর্শন, পৃঃ ৪৮৪) ; পরবর্তীকালে অবৈদিক বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন এবং ষড়দর্শনেরও সাংখ্যযোগ ও কণাদের মধ্যেও বৈদিক যাগ-যজ্ঞ-তত্ত্বের বা আস্তিক্যবাদের কতটুকু নিদর্শন আছে ?

এই সিদ্ধান্তগুলি ছাড়া মোটামুটি বৈদিক যুগ শেষ না হইতেই ভারতীয় কৃষিজীবী, গ্রাম্যসমাজ ও সমাজতন্ত্রের গোড়াপত্তন করিয়া ভারত ইতিহাসের ৩টি বৃহৎ জটিল সমস্যারও বীজ বপন করিয়া যায়ঃ (১) এই কৃষিসমাজে ভূমিস্বত্ব কিরূপ ছিল ? ইহা ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের একটা মূল প্রশ্ন। (২) ভারতীয় জাতিভেদের স্বরূপ ও ইতিহাস কি ? ভারতীয় সমাজতত্ত্বের একটা বড় প্রশ্ন। (৩) নানা শ্রেণী-বিরোধের মধ্যেও কেন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়া থাকিতে পারিল ? ইহা ভারতের ইতিহাসেরই সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন।

এই সমস্যাগুলি পরবর্তী সমস্ত ভারত ইতিহাসের মধ্য দিয়া নানাভাবে আবর্তিত হইয়া উঠিয়াছে ; আর ইহা বুঝিতে পারিলে ভারতের ইতিহাস ও ভারতের সংস্কৃতির রূপ অনেকাংশে স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই সমস্যাগুলির আলোচনা তাই সমস্ত ইতিহাসকে সম্মুখে রাখিয়াই করিতে হইবে। তৎপূর্বে ভারতের এই কৃষিসভ্যতা বৈদিক আর্যদের নিকট যে দান লাভ করিল, যুগে যুগে যাহাদের নিকট যে দানে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত হিসাব স্মরণ করিতে পারি (দ্রষ্টব্য : স্বর্গীয় যদুনাথ সরকারের *India Through the Ages*, 1939)।

আর্য-সংস্কৃতির রূপ

আর্য কৃষিজীবীর পক্ষে এই দেশে বাস্তব জীবনযাত্রা স্বচ্ছল, সুস্থির ও সহজলভ্য হইয়াছিল, এইটিই এই দেশীয় আর্য-সংস্কৃতির একটি গোড়ার কথা। কিন্তু আজও সেই বাস্তব জীবনযাত্রা একেবারে অতীত বলিয়া মনে হয় না। সেদিনকার কৃষিসমাজের সেই বাস্তব উপকরণ বা জীবিকাপ্রণালী বলিতে গেলে আজও প্রায় ভারতীয় পল্লী-সভ্যতায় অব্যাহত রহিয়াছে—সেই সামান্য কাঠের লাঙল বলদের ব্যবস্থা, কৃষির তুচ্ছতম উপাদান, সেই মাটি ও খড়ের ঘর-দুয়ার, সেই মাটি ও ধাতুর বাসন-কোসন, সেই বাঁশ ও কাঠের সামান্য তৈজস-পত্র। (দ্রষ্টব্য : পূর্বোক্ত 'বৈদিক সমাজ—জীবনযাত্রা' ও *Life in*

Ancient India in the Age of the Mantvas, P. T. Srinivasa Iyengar)। মূল উৎপাদন-শক্তিতে একটা বিপ্লব সাধিত হইয়াছে কি এই কৃষি-সভ্যতায় ? ঋক্‌বেদের প্রাচীন মন্ত্রাদিতে আমরা যে আর্যদের সাক্ষাৎ লাভ করি, মনে হয় তাহারা প্রবল ও দুর্ধর্ষ মানুষ ; যুদ্ধজয় ও শত্রুনাশ তাহাদের প্রধান সাধনা ; জীবনের সুখভোগে তাহাদের পরম আগ্রহ ; খাদ্য, পানীয়, নৃত্য, ক্রীড়া—এই সবেই তাহাদের উৎসাহ—চিন্তা, ধ্যান, বৈরাগ্য তাহাদের ধর্ম নয়। তবু বৈদিক সমাজে চতুরাশ্রমের মধ্য দিয়া সন্ন্যাস ও বানপ্রস্থকে অবলম্বন করিয়া শীঘ্রই এমন এক মানসিক প্রকর্ষের অবকাশ সৃষ্টি হইল—যাহার তুলনায় আজিকালিকার পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয় বা পরবর্তী যুগের আমাদেরই মঠ বিদ্যাপীঠও বড় বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ইহা সম্ভব হইল যে বিশেষ কারণে তাহা আবার স্মরণীয়—নদীমাতৃক ভারতীয় প্রকৃতি কৃষিজীবীর প্রতি অকুণ্ঠিত স্নেহ পোষণ করেন ; নাতিশীতোষ্ণ ভারতীয় মণ্ডলের অধিবাসীরা পরিধেয়াদি সম্পর্কেও তাহার অযাচিত অনুগ্রহ লাভ করে। অর্থাৎ এখানে জীবন-যুদ্ধে মানুষের সহজে জয় হয়। এই জয়ে তখন শাসক শ্রেণীর জুটিল বিশ্রাম, অবকাশ। উৎপাদন কর্ম হইতে, ক্রমে কায়িক শ্রম হইতেও দূরে থাকিয়া উচ্চ কোটির শাসক শ্রেণীর পক্ষে চিন্তায় ও কল্পনায় বাস্তবকে ছাড়াইয়া বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ জুটিল। তাই এই অবকাশের সামাজিক মানসিক ফলগুলিও লক্ষ্য করিবার বস্তু : দৈনন্দিন জীবনে বিশ্রামের সুযোগে তাহাদের আনুষ্ঠানিক জীবনযাত্রায় অল্পকালের মধ্যেই বাহুল্য ও শৃঙ্খলা দেখা দিল। যথা, যজ্ঞাদিতে একদিকে যেমন দেবতা হইলেন মেঘরাজ ইন্দ্রাদি কৃষকের রক্ষাকর্তারা, অন্য দিকে বেদের যুগ শেষ না হইতেই বেদের কর্মকাণ্ডও বহুবিস্তৃত ও বহুবিভাগে বিভক্ত হইল। সেই পরবর্তীকালে আর্য সমাজের শৃঙ্খলাবোধ যেন আর তাল সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই, লৌকিক ও দেশীয় চিন্তা ও অনুষ্ঠানকে যেমন ভাবে পারে স্বীকার করিয়া লইতেছে। শাসিত লোকশক্তিকে একেবারে অবজ্ঞা করা আর সম্ভব হয় নাই।

বাস্তব জীবনযাত্রার সুবিধা ও অবকাশ এবং আনুষ্ঠানিক ঐশ্বর্যের ফলে অবকাশ-ভোগী সমাজে দৈহিক শ্রমের ও বাস্তব চিন্তার অপেক্ষা বাস্তবাতীত এক মানসিক প্রক্রিয়া, ভাববাদিতার (subjectivity) প্রতি শ্রদ্ধা জাগে বেশি। 'ভাববাদিতা' অবসরভোগীর স্বাভাবিক ধর্ম। ইহাই হিন্দু 'আধ্যাত্মিকতায়'

পরিণত হয়। অবসরভোগীদের শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় পাওয়া যায় বিচার ও বিশ্লেষণ শক্তিতে। 'বর্ণভেদের' বাস্তবক্ষেত্রে পর্যন্ত ইহা প্রত্যক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালেও যাস্কের (খ্রীঃ পূঃ ৫০০ ?) নানাভাবে বেদ-বেদাঙ্গের ভাগ-বিভাগ, তাহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, পাণিনির (খ্রীঃ পূঃ ৪০০ ?) মত অপূর্ব ব্যাকরণ প্রণয়ণ, ইত্যাদি হইতে বুঝি চিন্তার ক্ষেত্রে আর্য মনীষীদের এই শৃঙ্খলা-বোধ অব্যাহত রহিয়াছে; আর্যদের কাব্য বা কল্পনার প্রকাশে অনেক দিন পর্যন্ত (গুপ্তযুগেরও শেষে) এমনি এক সুসঙ্গতি ও সু-সীমতা (symmetry and proportion)-বোধ অক্ষুণ্ণ ছিল (দ্রষ্টব্য *India Through The Ages*, J. N. Sarkar)।

এই দুইটি গুণই যতই দিন গিয়াছে ততই আর আর্য-সমাজের পক্ষে সংযতরূপে স্থির রাখা সম্ভব হয় নাই; অবকাশের প্রাচুর্যে, ভাবের উচ্ছ্বাসে, আনুষ্ঠানিক বাহুল্যে উহা সামঞ্জস্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। কায়িক শ্রম ক্রমেই ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে অপমানজনক হইয়া উঠিয়াছে, আর বস্তুবিমুখ চিন্তার প্রসার, ভাববাদ, একমাত্র সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু যতদিন বাস্তব জীবনযাত্রা জীবিকার প্রাচুর্যে ততটা গৌণ হইয়া উঠে নাই, ততদিন ভারতীয় সংস্কৃতিও তেমনভাবে তাল হারাইয়া ফেলে নাই—discipline বা শৃঙ্খলা-বোধ, organisation বা কর্মশক্তি, অকুণ্ঠ জীবন-পিপাসা আপনাকে ততদিন আবেগ (emotion) বা কল্পনার (imagination) প্রবাহে চিন্তাক্লিষ্ট অন্তর্মুখিতায়—subjectivity'র, মধ্যে—তলাইয়া দেয় নাই।

কিন্তু এই subjectivity'র, ভাবানুশীলনতার তরঙ্গ যে কূল ছাপাইয়া উঠিতেছে, মানসলোকের আকাশগঙ্গায় বহিয়া চলাই যে স্বাভাবিক হইয়া পড়িতেছে, বৈদিক যুগেই তাহাও বুঝিতে পারা যায়। উপনিষদের ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ তত্ত্বানুসন্ধানীরা তখন বৈদিক কর্মকাণ্ড ও প্রকৃতি-পূজা ছাড়িয়া আত্মচিন্তায় ডুবিয়া পড়িতেছেন। এই তত্ত্বজিজ্ঞাসা স্বদেশীয় অপেক্ষাও বিদেশীয় পণ্ডিতদের নিকট এক অপূর্ব মানসিক উৎকর্ষের পরিচায়ক বলিয়া গত শতাব্দীতে বহু প্রশংসা লাভ করিয়াছে। সত্যই তাহা মানসিক তৎপরতার প্রমাণ। কিন্তু তথাপি ভুলিবার নয়, ইহার মধ্যে ঋক্ বেদের অকুণ্ঠ জীবন-স্বীকৃতি নাই, আছে একটা একান্ত আত্মমুখিতা—সেই দুর্ধর্ষ মন যেন উপনিষদে অনেক স্থলে 'sicklied o'er with the pale cast of thought.' যাহা অমৃত নয় তাহাতে তাঁহাদের আর পিপাসা মিটিতেছে

না। কারণ যাহা অমৃত তাহাই সত্য। জীবনের বাস্তব পিপাসা যতক্ষণ তৃপ্ত না হয় ততক্ষণ মানুষ এই পরম পিপাসার কথা টের পায় না। ক্ষুধার্ত উদর বেদান্তের কথা ভাবিতে পারে না—স্বামী বিবেকানন্দও এই কথাটিই স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। অন্নব্রহ্মের কৃপা সহজলভ্য হইলে মানুষ প্রাণ ও মনোময় কোষ ছাড়াইয়া বিজ্ঞানময় কোষের দিকে মন দিতে পারে। অবশ্য ভাববাদীর সেই মানসিক ভাবনাও পূর্ববর্তী ও সমকালবর্তী বাস্তব অবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা ও মানসিক ধ্যান-ধারণার দ্বারা নিয়মিত ও অনুরঞ্জিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৈদিক যুগের শেষ দিকেই ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে বিরাট পুরুষ সম্বন্ধে মানুষ সচেতন হইল। হয়ত খণ্ড খণ্ড আর্য-অনার্য গোষ্ঠীগুলিও একীভূত হইতে তখন শুরু করিয়াছে—একই আর্য-শাসন জয়ী হইয়াছে। তাই বৈদিক বহু দেবতাবাদ ছাড়াইয়াও এক-দেবতার কল্পনা স্বাভাবিক হইয়াছে। তাই তখন মানবীয় দেহের রূপকে সমাজদেহকেও সাজাইয়া লইতে তাহারা চেষ্টা করিল। এই মানবীয় চিন্তা এক অর্ধসত্য লইয়া তখন হইতে ব্যাকুল হয়। তাহা এই : সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সমন্বিত প্রকৃতি ইহাদের চক্ষে মনে হইয়াছে স্থায়ী ও স্থির, চক্রাকারে চিরাবর্তিত। কিন্তু মানুষের আয়ু অল্প, সে মরণশীল, অমৃত নয়; তাহার জীবন-চক্র অস্থির, চঞ্চল, ক্ষণিক; অতএব নিত্য নয়, শাশ্বত নয়। আসলে জীবন কেন, প্রকৃতিও যে কত অস্থির ইহারা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই; আর মানুষও প্রকৃতিরই একটি প্রকাশ ইহাও তাহাদের মনে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। অমৃতের পিপাসা তাই তাহার পক্ষে আর কিছুই নয়—জীবমাত্রেরই জৈবধর্ম, সেই বাঁচিবারই সাধ। এবং শাসক শ্রেণীর পক্ষে বিশেষ করিয়া status quo অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়োজন। তাই তাহারা কেবলি অমৃতত্ব চাহিতেছিল, স্থিরতা খুঁজিতেছিল। ঘটনাপ্রবাহ ও গতিচঞ্চলতাই যে একমাত্র সত্য তাহারা তাহা বুঝিতেছিল না; ভাবিতেছিল, সত্য ইহার অতীত কিছু, যাহা স্থির, অচঞ্চল, স্থাণু। গতিময় বিশ্বের উপর স্থাণুত্ব আরোপ করিবার প্রয়াসেই দেখা দেয় আধ্যাত্মিকতাবোধ, মর মানুষে অমর আত্মার আরোপ, পরিবর্তমান প্রকৃতির কেন্দ্রে এক অপরিবর্তনীয় বিশ্বাত্মার কল্পনা, আর সমস্ত চঞ্চল রূপকে গৌণ, এমন কি অসত্য ও মায়া বলিয়া পাশে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা। আসলে এই "a static application of a dynamic truth" পূর্ববর্তী কালের

মন্ত্র-তন্ত্রেরও মূল, যজ্ঞাদি ক্রিয়ারও মূল, পরবর্তী তত্ত্বচিন্তারও মূল (*cf. A Short History of Culture*, Lindsay, p. 40)। কিন্তু উদরজ্বালা যেখানে উগ্র সেখানে বাস্তবজীবনকে এমন মায়া বলিবার অবকাশ জোটে না—জীবিকার প্রচণ্ড দাবী চিন্তাকেও শাসনে রাখে।

বৌদ্ধ সংস্কৃতির রূপ

এই জীবন-বিমুখতা বৈদিক যুগের পরে দেখি বুদ্ধদেবের চিন্তায়ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—তত্ত্বচিন্তায় তিনিও পাগল হইয়া বাহির হইলেন। যে মতবাদ 'নির্বাণকেই' জীবন-জ্বালার চরম অবসান বলিয়া স্থাপন করিতে অগ্রসর, তাহার পক্ষে জীবনের প্রতি মমতা না থাকাই স্বাভাবিক। নির্বাণবাদও যেন উপনিষদের ব্রহ্মবাদের আর এক ধারা; উহা বস্তুবাদ নয়, তাহা স্পষ্ট। কর্মবাদ ও জন্মজন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়া উহা শুধু দর্শনে নয়, সমাজেও বিপ্লব-বিমুখী ভাববাদের প্রশ্রয় দিয়াছে। অবশ্য পার্থক্যও সুস্পষ্ট। বুদ্ধদেব ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোনো উত্তর দিলেন না, আত্মার অস্তিত্বও মানিলেন না; বরং দেখিলেন সবই অনিত্য, সবই ক্ষণিক, অবিচ্ছিন্ন প্রবাহও কিছুই নাই, 'বিচ্ছিন্ন প্রবাহ'ই চলিয়াছে (দ্রষ্টব্য, 'দর্শন-দিগ্‌দর্শন', রাহুল সাংকৃত্যায়ন, পৃ ৫১২)—জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়া শুধু কর্মের জ্বলন্ত শিখা পুড়িতেছে—সমস্তই পুড়িয়া যায়, পুড়িয়া পুড়িয়া শেষ হইলেই হইল নির্বাণ। জীবনে তাই চাই শুধু এই সত্যকে অঙ্গীকার—ক্ষমা, মুদিতা, মৈত্রী, উপেক্ষার অনুশীলন।

এইরূপ চিন্তার উপরে আধুনিক বাস্তব-বোধ আরোপ করা অবশ্যই ভুল; কারণ তাহা হইলে ঐতিহাসিক নিয়মধারাকেই অস্বীকার করা হইবে। কর্মতত্ত্ব ও জন্মান্তর যেমন সেই প্রাচীনতর সামাজিক অবস্থার সম্ভাবনা ও ভাবনার পরিণতি, তেমনি বুদ্ধদেবের 'অনাত্মবাদ' ও 'ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরবতা' প্রাচীনতম ভারতীয় দর্শন 'সাংখ্যের' সহিত সংযুক্ত। বলা বাহুল্য, সাংখ্য খাঁটি বস্তুবাদ (Realism) নয়; ইহা পরিচিত ভাববাদও (Idealism) নয়। মানুষের মন প্রাচীনকালে যতটুকু বস্তুনিষ্ঠ হইতে বাধ্য হইত তাহারই এক পরিচয় বৈশেষিক দর্শনে (কণাদে) এবং অন্যতর পরিচয় সাংখ্যে দেখিতে পাই—কোনোটিই বস্তুবাদ নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। ভারতীয়

বস্তুবাদের দর্শন ছিল চার্বাক প্রভৃতির লোকায়ত দর্শন। তাহার সামান্যই টিকিয়া আছে। যাহা টিকিয়া আছে তাহা কিন্তু সবল ও সরস। আর ইহা যে 'লোকায়ত' তাহা হইতে বুঝা যায়, অলস শ্রেণী যতই ভাববাদে বুঁদ হইতে চান, জনসমাজ বাস্তবকে ভুলিতে পারে না, এবং সমাজের ও ধর্মের চিরাগত প্রথা-নিয়মের সহিত তাহারা জীবন-যাত্রার পার্থক্য জানিত। তথাপি সাংখ্যতত্ত্বের অপেক্ষাকৃত বাস্তবনিষ্ঠাই কপিল ও গৌতম বুদ্ধকেও একেবারে পথ হারাইতে দেয় নাই বরং এইরূপে তাঁহাকে কতকটা জীবননিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে।

অন্যদিকে বৌদ্ধ মতবাদ কার্যত এক অত্যন্ত স্বাভাবিক বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিল। সামাজিক জীবনের যাহা পরম প্রয়োজন, সহজ জীবনযাত্রার যাহা একমাত্র পাথেয় বৌদ্ধধর্মের পথ তাহাই—ক্ষমা, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা প্রভৃতি 'আর্য অষ্টমার্গ' এই পথ। বৌদ্ধ পথ 'মধ্যম পথ'—ইন্দ্রিয় লালসারও নয়, ইন্দ্রিয় সংহারেরও নয়, ইন্দ্রিয় সংযমের নিশ্চয়ই। এই পথ এক সমন্বয়-সন্ধানী বস্তুনিষ্ঠ চেতনার আবিষ্কার—যে চেতনা সমাজের দাবীকে সশ্রদ্ধচিত্তেই গ্রহণ করিয়াছে,—বুঝিতেছে, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে এইভাবে একটা সুসঙ্গতি রাখা যায়; আর চিন্তার ক্ষেত্রেও একেবারে উপনিষদের অধ্যাত্মবাদ ও লোকায়ত বস্তুবাদের মধ্যে সেইরূপ সমন্বয় খুঁজিতেছে।

বুদ্ধদেবের সমস্ত মতবাদকে এই দৃষ্টিতে যাচাই করিলে বুঝিতে দেরী হয় না যে, তখনকার সামাজিক পরিবেশে এই সংস্কারবাদী বৌদ্ধনীতির প্রয়োজন তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। "বেদহীন" "জাতিহীন" মতবাদের পিছনে শ্রেণী-বিরোধ ছিল—তাহা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধ। মনে রাখা প্রয়োজন, বুদ্ধদেব জন্মিয়াছিলেন এক ক্ষত্রিয় গণতন্ত্রের মধ্যে; মরিয়াছিলেনও এক ক্ষত্রিয় গণতন্ত্রের মধ্যে; তাঁহার ভক্তবৃন্দের মধ্যে সেকালের ধনাঢ্য বণিক এবং রাজা ও সম্রাটরাও অবশ্য ছিলেন। তিনি সমাজসাম্য চাহিবেন ইহা সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রেণী-বৈষম্যকেও পারিলে তিনি অস্বীকার করিতেন তাহাও স্পষ্ট—ইহা প্রমাণিত হয় তাঁহার বৌদ্ধসঙ্ঘের নিয়মাদি হইতে, গণতান্ত্রিক (অভিজাত) রাষ্ট্রগুলির প্রতি তাঁহার উদার উপদেশ হইতে (দ্রষ্টব্য দর্শন-দিগ্‌দর্শন, পৃ. ৫০৮)। তথাকথিত আর্য-অনার্য বা আসলে সেদিনকার নিম্নশ্রেণীর বিরোধের মুখপাত্র হইয়াছিলেন বোধ হয় সেদিনকার এই ক্ষত্রিয়রা। সেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজে বুদ্ধদেব (১) এক কেন্দ্রাভিমুখী

সংগঠন, (২) এক জনসমন্বয়ী ব্যবস্থা, এবং (৩) এক জীবননিষ্ঠ মানসিক নীতি বা বিনয় পরিপাটির (code of ethics) নির্দেশ দান করিলেন। এই কারণেই বৌদ্ধধর্ম এক সমাজরক্ষী ধর্মরূপে উদিত হয়। বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যের বিরুদ্ধে সমাজের জনগণের এক প্রতিষ্ঠান; কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে জীবননিষ্ঠ মানুষের এক প্রতিরোধ। ক্ষত্রিয় শক্তি স্বভাবতই ইহাকে সমর্থন করিল, ইহাই বৌদ্ধধর্মের সামাজিক সার্থকতা। এবং ইহার বৈপ্লবিক ব্যর্থতা এই যে, বুদ্ধদেব ধনিক বণিকের উন্নতির পথ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণের শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চাহেন নাই, আর শত সত্ত্বেও উহা সংস্কারবাদী।

প্রথম সামন্ত সাম্রাজ্য

জীবনের বাস্তব উপকরণে কতদূর পরিবর্তন তখন সাধিত হইয়াছে বলা কঠিন। কিন্তু 'জাতকের' কথাসমূহ এবং কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' যে স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারি যে, সেই কৃষিযুগে গৃহশিল্পের প্রসার কম হয় নাই; অনাথপিণ্ডদের মত বণিকেরা বেশ প্রবল। পণ্যবণ্টন ও বিনিময় সূত্রে স্বার্থবহদল দেশদেশান্তরে চলিয়াছে আর বণিকগণ সমুদ্র পারাপার করিতেছে। ব্যবসায়ী সংঘ ও শিল্পী কারিগরের গিল্‌ড্ (ইহারই নাম ছিল 'শ্রেণী') গঠিত হইয়াছে। ছোট ছোট রাজ্যসীমা ইহাদের উদ্যোগ বিস্তারের পক্ষে বাধা। রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহও লাগিয়া থাকে, বাণিজ্য ব্যাহত হয়; তাহা ছাড়া উদয়ন, প্রসেনজিৎ, প্রদ্যোত, বিম্বিসার প্রভৃতি রাজগণের মধ্যে চলিয়াছে সংগ্রাম। রাজ্য-বিস্তারে তাঁহাদেরও আগ্রহ। কিন্তু অভিজাততন্ত্র রাষ্ট্রও (শাক্য, লিচ্ছবি প্রভৃতি) রহিয়াছে, তাহাদের 'সংঘাগার'ও আছে। ইহারাও সংগ্রামে কুণ্ঠিত নয়। ইহারই মধ্যে একই কালে দুই পূর্বদেশীয় ক্ষত্রিয় রাজকুমার—সিদ্ধার্থ ও মহাবীর—বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিলেন। তাঁহাদের দুইটি বিষয়ে অপূর্ব মিল—বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি অবিশ্বাস তাহার একটি, অন্যটি তাঁহাদের প্রচারিত অহিংসাবাদ। ব্রাহ্মণ শাসনের বিরুদ্ধে সমাজের অন্যান্য স্তরের যে বিদ্রোহ ধোঁয়াইতেছিল, বুদ্ধি ও জ্ঞানের দৃষ্টিতে এই ক্ষত্রিয় মনস্বীরা ব্রাহ্মণদের যাগযজ্ঞের সেই আনুষ্ঠানিক ও তাত্ত্বিক ভিত্তি অসার প্রমাণিত করিয়া ফেলিলেন, এবং সেই ব্রাহ্মণের প্রভুত্বকে আরও

ম্রিয়মাণ করিলেন। এই বিদ্রোহের নেতা অবশ্যই অগ্রগামী ক্ষত্রিয়দল। অন্তত মগধ বিদেহের মত প্রাচ্য দেশে দেখি ক্ষত্রিয়রাই সমাজের শীর্ষস্থানীয়, ব্রাহ্মণরা নয়। তাঁহাদের একটি শক্তিকেন্দ্র ছিল অনাথপিণ্ডদের মত বণিকগণ আর তাহাদের সর্বশ্রেণীর অনুচরবৃন্দ। এই বৌদ্ধ অভ্যুত্থানের প্রথম ফলই এই :— (১) বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় শ্রেণীবিভক্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজের গণ্ডী অগ্রাহ্য করিয়া জনসমাজের দাবী সেই যুগের মত কতকাংশে স্বীকার করিল। তাই বৌদ্ধধর্মে বর্ণ বা শ্রেণী ভেদ নাই। উহার বিনয় পরিপাটি (নীতি ও ধর্ম) সকলেরই পালনীয়, এবং তাই সহজবোধ্য। বৌদ্ধসংঘে সকল শ্রেণীর প্রবেশের অধিকার রহিল। উহাতে একত্র হইয়া সামূহিক নির্ণয়ের নির্দেশ আছে। বৌদ্ধদের 'মহাসঙ্গীতি' শুধু এক বিপুল জনসমাবেশ নয়, এক বিশাল জনসভা। বৌদ্ধধর্মের প্রচারপদ্ধতিও তাই সরল হইল, সহজবোধ্য জনগণের ভাষায় সাধারণের কথাগল্পে রূপান্তরিত হইল (তুলনীয় খ্রীষ্টের পদ্ধতি)। (২) বৌদ্ধসংঘকে কেন্দ্র করিয়া এক কেন্দ্রাভিমুখী সমাজগঠনের আভাসও ইহার মধ্যে দেখা যায় (তুলনীয় রোমান্ ক্যাথলিক চার্চ)। খণ্ড কলহপরায়ণ রাজন্যবর্গ ও নানাজাতি লইয়া এক সাম্রাজ্য স্থাপনের যেই প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল ইহা যেন তাহারই অনুলিপি (দ্রষ্টব্য *India Through the Ages*, J. N. Sarcar)। মৌর্য সাম্রাজ্যের যে প্রাগ্-অশোকরূপ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও মেগেস্থানিসের ভারত-বিবরণে লিপিবদ্ধ আছে তাহাকে মৌর্য centralism বলিলেই ভালো হয়। ইহাতে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের প্রথম কেন্দ্রিত সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা দেখা যায়। তাহার শিল্পযূথে 'শ্রেণী'-প্রবর্তন বর্তমান Corporate State'র একটি প্রাথমিক সংস্করণ। শূদ্রাজাত (?) মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের পরে মৌর্য অশোকের সাম্রাজ্যে বৌদ্ধ সংগঠনীধারার এই দিকটি আরও পরিপুষ্টি লাভ করে। ইহা যেন Holy Roman Empire-এরই এক প্রথম ভারতীয় রূপ। শূদ্র সম্রাটগণ স্বভাবতই বৌদ্ধধর্মের সংস্কার-প্রয়াস ও বর্ণ-বিরোধী নীতিতে আকৃষ্ট হইবার কথা—ফলত বৌদ্ধধর্মের মত সেদিনকার শূদ্রস্থাপিত মৌর্য-সাম্রাজ্যও সেদিনকার সমাজ-দ্বন্দ্বের সূচক। পরবর্তী কালে সুঙ্গ সাম্রাজ্যের উত্থানে ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধে (Orthodox Counter-Revolution)-প্রতিক্রিয়ার সূচনা হয় (দ্রষ্টব্য *Manu and Yajuavaikya*, Jayaswal, p 40-48 এবং তৎসহ ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধাবলী)। আর, এই সময়েই সম্ভবত ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র ও রামায়ণ মহাভারতাদির প্রথম সংকলন আরম্ভ হয়;

ব্রাহ্মণ্যবাদের নূতন করিয়া আত্মসংস্কার ও সংগঠন চলে। নিছক সংরক্ষণশীল সামাজিক ও মানসিক প্রয়োগের বিচারে এই প্রয়াসকে তুচ্ছ করাও অসম্ভব।

কিন্তু আলেকজেণ্ডারের অভিযানকাল হইতেই হয়ত ভারতবর্ষ একরাষ্ট্রিক শাসনের প্রয়োজন বোধ করে। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের শাসনে আপনার একত্ব সম্বন্ধে সে ক্রমশ সচেতন হইয়া উঠিতে থাকে। এমন রাষ্ট্রীয় ঐক্য ভারতবর্ষের ভাগ্যে আর জোটে নাই। (পরে গুপ্তযুগে হিন্দু তীর্থযাত্রার ও ধর্ম-পালনের নিয়ম হয়ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় একত্ববোধটিকে দৃঢ় করিয়া দেয়)। কিন্তু বৌদ্ধ প্রেরণা ও এই বৌদ্ধ সংগঠনশক্তিই মৌর্যসাম্রাজ্যের সহায়তায় ভারতীয় ভৌগোলিক বন্ধনকে ছাড়াইয়া জলপথে ও স্থলপথে ভারতকে পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত করে, তাহার সংস্কৃতিকে দেশে দেশে প্রসারিত করিয়া দেয় (দ্রষ্টব্য *Indian and Indonesian Art*, A. Coomarswami)। বৌদ্ধধর্মের একটা আন্তর্জাতিক দৃষ্টি ছিল। এই ধর্ম-বিজয়ে সেদিনকার বণিকসমাজেরও যে বাণিজ্য প্রসারের দুয়ার খুলিয়া গেল, তাহা নিঃসন্দেহ; —অবলুপ্ত খোটানের পুঁথিপথে পর্যন্ত তাহার প্রমাণ রহিয়াছে।

বৌদ্ধ সংস্কৃতির কীর্তি

এই আভ্যন্তরীণ ঘটনা-প্রবাহে ও বাহিরের সম্পর্ক-সংঘর্ষে মিলিয়া ভারতীয় সমাজ যে নতুন ছাঁদে গড়িয়া উঠিতে লাগিল, তাহা বুদ্ধদেবেরও স্বপ্নাতীত ছিল। তাই কয়েক শত বৎসর পরে ভারতীয় সমাজ যখন পারশিক যবন, শকদের আগমনে জীবনে ও চিন্তায় জটিল হইয়া উঠিল, সেই জটিল বাস্তব পরিণতিতে বৌদ্ধ মতবাদেও কালক্রমে জটিলতা ও বৈচিত্র্য দেখা দিল। আলোড়িত সেই ভারতীয় সমাজের চিত্র ভারতীয় বৌদ্ধ সংস্কৃতির পরিবর্তমান রূপে লাভ করা যায়—বিদেশীয়দের ভারতীয়করণ বৌদ্ধধর্মের এক প্রধান কীর্তি। বুদ্ধদেব 'শাস্তা'র আসন হইতে ধীরে ধীরে মুক্তিদাতার আসনে উঠিয়া গেলেন—ইহাতে বেদোপনিষদের বিরাট পুরুষ বা বৌদ্ধ ধর্মের স্থির জ্ঞানমার্গের পরিবর্তে মানুষ জীবন্ত কিছু পাইল। জনসেবকের এই পরিণতি তখনকার দিনে স্বাভাবিক। জনশ্রেণীর আশাকে যিনি সঞ্জীবিত

করেন স্বভাবতই তিনি অপ্রাকৃত শক্তির অধিকারীরূপে কল্পিত হন, শীঘ্রই অবতারে পরিণত হন। বুদ্ধ-জারথুস্ত্র হইতে লেনিন পর্যন্ত Culture Hero-দের এইরূপ পরিণতি ঘটিয়াছে। কিন্তু এই নূতন মানবীয় আবেগ এক অভিনব পথে আবার প্রকাশিত হইতে লাগিল—তাহা বুদ্ধমূর্তি। ভারতীয় শিল্পের জন্ম হয় বৌদ্ধ অশোকের প্রেরণায়। সাঁচি, ভারহুত, অশোকস্তম্ভ আজ সুপরিচিত। আমাদের শিল্পের জাগরণ জাতকের কাহিনীতে চিত্রিত। দক্ষিণে অন্ধ্র রাজ্যের অমরাবতী ও নাগার্জুনকোণ্ডে ইহার সুরম্য দান একটু পরেই বিকশিত হইয়া উঠে। কয়েক শত বৎসর আবার তাহার বিকাশ উত্তরে গান্ধারে। ইহার কতটুকু প্রাচীনতর ধারার উদ্বোধন,—যে ধারা পূর্বেও নানা মূর্তি গড়িতেছিল পশ্চিম-উত্তরে, দক্ষিণে, তক্ষশিলায়, ভিড়-এ, লৌড়িয়া নন্দগড়ে মৃত পূর্বপুরুষের সমাধিস্তূপ সাজাইতেছিল,—এই মূর্তিপূজা কতটুকুই বা য়ুনানীদের সম্পর্কে প্রাপ্ত তাহা অনিশ্চিত। য়ুনানীরা তখন ঈরানে, গান্ধারে, কপিশায় অধ্যুষিত, ভারতেও নানাস্থানে পরাক্রান্ত। আর এদেশে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়া তাহারা য়ুনানী ছাঁদে বুদ্ধকাহিনী রচনা করিতেছে কিংবা হেলিওডোরসের মত বিষ্ণুভক্ত হইয়া গরুড়-স্তম্ভ নির্মাণ করিতেছে। গান্ধার শিল্পে তাহাদেরই প্রেরণা ও পদ্ধতি সবল। প্রথম দিকে এই উৎকীর্ণ কাহিনীর মধ্যে বুদ্ধের মূর্তি থাকিত না, শুধু প্রতীক স্বরূপ অঙ্কিত হইত তাঁহার পদদ্বয়। তাহার পরে আর সে দ্বিধা রহিল না, নানা আসনে নানা রূপে ভগবান তথাগত আবির্ভূত হইলেন। ইহাতে কুশান যুগ হইতে আবার ভারতশিল্পের নবজন্ম হইল। মন্দিরে, মঠে, বিহারে, চৈত্যে, পর্বতে, গুহায় বৌদ্ধধর্ম শিল্পের জোয়ার ডাকিয়া আনিল। হিন্দু ও জৈনধর্মও তাহার দুকূলপ্লাবনী ধারায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। (দ্রষ্টব্য *Civilisation in the East*, Vol II. Rene Grousset)। অন্য দিকে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রধান কীর্তি তাহার ন্যায়শাস্ত্র। যবন (গ্রীক) দর্শনের সঙ্গে তাহার মুকাবিলা করিতে হয়। নাগসেন, নাগার্জুন, বসুবন্ধু, ধর্মকীর্তি (৬০০ খ্রী)—ইঁহাদের আশ্রয় করিয়া এই ধারা বহিয়া যায়।

পৌরাণিক হিন্দু সংস্কৃতি

এই পরবর্তী বৌদ্ধধারাকে সহস্র গুণে প্রশস্ত করিয়া মহাযান বৌদ্ধধর্ম আবির্ভূত হইল—আর পরেকার (খ্রীঃ ২০০-১,০০০) সাত-আটশত বৎসরে

তাহা যেরূপ বহু ধারায় বিভক্ত হইয়া একটা বিষম ও বিশৃঙ্খল রূপ লাভ করিল তাহাতে তাহাকে আর বৌদ্ধ ধর্ম না বলিলেও চলে। তাহার ফলে পুরাতন হিন্দুধর্ম ও তাহার কঠিন জাতিবন্ধনই আবার মানুষের চেতনায় সমাজ-শৃঙ্খলার ও সমাজ-সংগঠনের একমাত্র পথ বলিয়া প্রতিভাত হইল। হিন্দুধর্মে আহারে-বিহারে, বিবাহে ক্রিয়াকর্ম শুচিতা প্রাধান্য পায়। খ্রীষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দেও শক ও তুরানী গোষ্ঠী রাজন্যশক্তিরূপে বিভিন্ন কেন্দ্রে বৈষ্ণব বা শৈব হিন্দুধর্ম ও হিন্দু-নীতির আশ্রয় লইতেছিল। কিন্তু সনাতন হিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল গুপ্তযুগে আসিয়া। তখনো বৌদ্ধ শিল্প বৌদ্ধ দর্শন কিছুমাত্র স্তিমিত হয় নাই। কিন্তু ইহার পরবর্তী অন্ধকারাচ্ছন্ন কালের শেষে হর্ষবর্ধন যতই বৌদ্ধ ধর্মের মহিমা প্রসারে উদ্যোগী হউন, বুঝা যায় বৌদ্ধ সম্প্রদায় পূর্ব কালের অধিকাংশ শক্তিই হারাইয়া ফেলিতেছে—নানা উদ্ভট শৃঙ্খলাহীন'বাদে' বৌদ্ধ চিন্তা ও জীবনযাত্রা তলাইয়া যাইতেছে। বৌদ্ধ-চিন্তার সেই ক্রমাবসান যে বাস্তব ও সামাজিক দুর্যোগের সূচক তাহার সম্পূর্ণ হিসাব নাই, কিন্তু পরবর্তী কারণগুলি হইতে তাহা অনুমান করা চলে। যেমন (১) বৌদ্ধ সংঘগুলির বিপুল প্রভাবে দেশের রাষ্ট্রশক্তি নির্জিত হইয়া পড়িতেছিল; আর দেশের জনশক্তিও সেই ভিক্ষু সম্প্রদায়ের নিকট অবজ্ঞেয় ও শোষণেরই বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ এই বৌদ্ধ সংঘের তখন কোনো সামাজিক দায়িত্ব নাই, এমন কি আত্মরক্ষারও শক্তি নাই। (২) গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষে তরঙ্গের পর তরঙ্গে যে হূন দল ভারতবর্ষের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল, বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহারা সেই ধর্মের মধ্যে নিজেদের জীবন-যাত্রা, ভাবনা-ধারা মিশাইয়া দিল, বৌদ্ধ সমাজেরও তেমনি শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্য ধ্বংস করিয়া ফেলিল। হয়ত বাস্তব জীবনযাত্রায়ও সেই যাযাবরেরা ছিল নিম্নস্তরের। ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি আর একবার বাহিরের আঘাতে পর্যুদস্ত হইল। (৩) বৌদ্ধ-সংঘে স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার থাকাতে নারীর প্রভাব স্বীকৃত হইয়াছিল। নূতন করিয়া তাই আবার নারী 'শক্তি'রূপে আবিষ্কৃতা হইলেন; মনে পড়িল নারীই মানুষের জীবধাত্রী প্রকৃতির প্রতীক। সমকালবর্তী হিন্দুরাও এই আবিষ্কারকে অঙ্গীভূত করিয়া লইতে দেরী করিল না। কিন্তু যেখানে জীবনযাত্রায় নারী গৌণ সেখানে এই মিথ্যা নারী-প্রাধান্য মিথ্যাচারেরই কারণ হইতে বাধ্য। বিশেষত মঠে ও সংঘে যেখানে এই ভিক্ষুক-ভিক্ষুণীদের দায়িত্ব রহিল না কিছুই, কিন্তু হাতে রহিল অগাধ ধনৈশ্বর্য, সেখানে বিকৃতি অনিবার্য হইয়া উঠিবারই কথা।

অবস্থাটা প্রায় 'হলিউডের'ই একটা পূর্বাভাস—আধুনিক পাশ্চাত্য ধনিকসমাজের একটা প্রাচীন সংস্করণ। (৪) অথচ এই বিস্তৃত কালের মধ্যে কৃষি-সমাজের স্বাভাবিক উন্নতি ঘটিয়াছে, জন-সংখ্যা বাড়িয়াছে, যানবাহনের প্রসার ঘটিতেছে; কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিশৃঙ্খলায় তথাপি তাহার পরিপুর্ণ স্ফূর্তি সম্ভব হইতেছে না। এমন কি, যে অখণ্ড একরাষ্ট্র মৌর্যরা গঠন করিতেছিল বাহিরের আক্রমণে তাহাতেও বাধা পড়িল। মিন্দোর, কনিষ্কের মত সম্রাটরা মধ্য এশিয়ার দিকে ভারতীয় বণিকের ও ধর্ম-প্রচারকের পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে ও সমুদ্রপথে বাণিজ্য প্রসারে কতটা সহায়ক হইতে পারিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। এক সময়ে জলপথে ও স্থলপথে এই বাণিজ্যগতির পক্ষে বৌদ্ধ যুগ সহায়ক হইয়াছিল। কিন্তু শেষ দিকে শ্রেষ্ঠী ও বণিকদের ধনৈশ্বর্য ভিক্ষুদের লুব্ধ মুষ্টি এড়াইবারই হয়ত পথ খুঁজিতেছিল (হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বেণের মেয়ে" গ্রন্থে বাংলা দেশের দ্বাদশ শতাব্দীর চিত্র দ্রষ্টব্য); হিন্দু সমাজের সংযত ব্রাহ্মণ-শাসন তখন বণিক আশ্রয়স্থল হইল। ব্রাহ্মণ্যবাদী এই বৈশ্য সম্রাটদের নিকটে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রাধান্য লাভ করিল, সমাজের এই বাস্তব ও জাগ্রত শক্তিচয় বাধা পাইল না; সেখানেই তাই ভারতীয় সমাজের চরম প্রকাশ ফুটিয়া উঠিল। এই পরিবেশ একটিবার মাত্র প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবনে ঘটিয়াছে; তখনো বৌদ্ধ মহাযান যুগেরই মধ্যাহ্নকাল। মনে হয় গুপ্ত সম্রাটেরা বৌদ্ধ ধর্মকেও প্রসারের ক্ষেত্র ছাড়িয়া দিতেন—বৌদ্ধ শিল্পকলা ভারতবর্ষে তাঁহাদেরই আমলে চরম সৃষ্টিতে সার্থক হয়। কিন্তু এই পরিবেশ সৃষ্টি করিল, সমাজে চিন্তায় এই শৃঙ্খলা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করিল, সাহিত্যকলায় তাহার সহস্রদল ছড়াইয়া দিল—কোনো পরম-সৌগত বৌদ্ধ সম্রাট নয়। মগধের পরম-ভাগবত গুপ্ত সম্রাটরা। ভারতবর্ষকে তাঁহারা আর একবার ঐক্যবদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন; প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির তখনি এক সুদীর্ঘ-উৎসব গিয়াছে। যতদিন সেই শান্তি, সেই শৃঙ্খলা, সেই সামঞ্জস্য ও সমন্বয় হূনদের আক্রমণে একেবারে ভাঙিয়া না পড়িল, ততদিন ভারতীয় কৃষি-সংস্কৃতির এক বিকাশ-বৈভবের যুগ ছিল।

গুপ্তসাম্রাজ্যের কীর্তি

গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রধান দান—হিন্দু সংস্কৃতি। তখনি নূতন করিয়া ভাষা ও সমাজ গঠিত হইতে লাগিল—পুরাণ গ্রথিত হইল, পৌরাণিক হিন্দু

সমাজের পত্তন হইল। শিল্প ও ভাস্কর্যের সে এক স্বর্ণযুগ। অজন্তার ১৬ ও ১৭নং গুহা, সারনাথ, দেওঘর, ভিতরগাঁও প্রভৃতির মূর্তি ভারতবর্ষের চিরন্তন গৌরব। কিন্তু সুলতানগঞ্জের বুদ্ধমূর্তি, নালন্দার তাম্রনির্মিত সুবৃহৎ (৮০ ফিটের) বুদ্ধমূর্তি, এবং সর্বোপরি দিল্লীর লৌহস্তম্ভ গুপ্তযুগের কারুশিল্পের যে বাস্তব প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে, তাহাও তেমনি বিস্ময়কর। পরবর্তীকালে এই লৌহ ঢালাই ও তাম্র ঢালাইর প্রক্রিয়া বিস্মৃত হইয়া পড়ে। মানুষের সেদিনকার সভ্যতা যে কত গণ্ডীবদ্ধ ও স্বল্পায়ু ছিল প্রসঙ্গত উহা তাহারও এক প্রমাণ। কিন্তু গুপ্তযুগ জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে কত অগ্রসর হইয়াছে, শুধু এই লৌহ স্তম্ভাদি হইতেই যে তাহা বুঝা যায় এমন নয়। আর্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্তাদি তখন গণিত ও জ্যোতিষের কঠিন তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতেছেন। মহাকবি কালিদাস কাব্য লিখিতেছেন; শকুন্তলা, মৃচ্ছকটিক অভিনীত হইতেছে। কাশ্মীরের যুবরাজ গুণবর্ধন যবদ্বীপকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়া নানকিং-এ দেহলীলা শেষ করিতেছেন। ফা-হিয়েন দেখিয়া গেলেন সুসমৃদ্ধ, শান্তিময়, সুসভ্য জাতির দেশ—যেখানে চৌর্য প্রায় নাই, মদ্যমাংস প্রায় বর্জিত হইয়াছে, বৌদ্ধ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ দুইই সমমর্যাদায় বাস করে—বৌদ্ধ বসুবন্ধু পরম-ভাগবত সমুদ্রগুপ্তেরও সুহৃদ।

গুপ্তযুগ শেষ হইল বাহিরের আঘাতে। বর্বর হুনের দল প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি ও তাহার শাসকশ্রেণীকে নিঃশেষ করিল, কিন্তু নূতন কিছুই স্থাপন করিতে পারিল না। সমাজ-শক্তি আর অখণ্ড রাষ্ট্রকেন্দ্র লাভ করিতে পারিল না—হর্ষবর্ধনের পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে নানা বিরোধী ধারার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে পরিবর্তিত হইয়া চলিল—পরিবর্ধিত হইতে পারিল না। (দ্রষ্টব্য ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধাবলী)। সাম্রাজ্যগঠনের চেষ্টা শেষ হইলে খণ্ড খণ্ড 'কৌমী রাজতন্ত্র' বা 'সামন্ততন্ত্রের' দিন আসিল। বারে বারে এই সাম্রাজ্য সংগঠনের ব্যর্থতার ফলেই ভারতবাসী এক রাষ্ট্রজাতি বা 'নেশন' হইবার সুবিধা পায় নাই, বহুজাতিক দেশ ও সমাজ হইয়া রহিয়াছে। 'অখণ্ড ভারত' চিরদিনই সাম্রাজ্যবাদীদের স্বপ্ন—অতীতে তাহা সফল হইলে এযুগে আমরা ভারতবাসী 'অখণ্ড ভারতীয় নেশন' হইয়া উঠিতে পারিতাম। তাহা হয় নাই, এখন যাহা সম্ভব তাহা এই—বহু-জাতিক রাষ্ট্র সংগঠন—বহু জাতি লইয়া মহাজাতি গড়া। সেই ক্রমক্ষয়িষ্ণুতার মধ্যে এখানে ওখানে জীবনের প্রয়াস না ছিল তাহা নয়—

যবদ্বীপে, চম্পায়, কম্বুজে ভারতীয়রা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল, তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার চলিল, চীনে কাশ্মীরের দূত গেল, বাঙলায় পাল-সাম্রাজ্য এক নূতন তেজে জ্বলিয়া উঠিল। সমস্ত উত্তরাপথে শকবংশীয় নরপতিরা রাজপুত ক্ষত্রিয় সমাজে উন্নীত হইলেন, নানা রাজবংশ নানা সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র পত্তন করিলেন, তাহাদের প্রসাদে সামন্ততন্ত্রের বিবিধ সৃষ্টি সেই সব রাষ্ট্রগণ্ডীর মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেও লাগিল। কিন্তু সেই জাতীয় সমাজ ও তাহার বহুখণ্ডিত রাজশক্তি আর বাহিরের একটি আক্রমণের সম্মুখে দাঁড়াইবার শক্তি পাইল না। হিন্দুযুগ শেষ হইল—সংস্কৃতির এক পর্বান্ত হইল।

"হিন্দু সংস্কৃতি" বলিতে যাহা আমরা বুঝি তাহার বিকাশ এই গুপ্ত-সম্রাটদের সময়ে—তাহার অবসান এখনো হয় নাই। কারণ শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতির যুগ পার হইয়া বিবেকানন্দ অরবিন্দের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তায়, এমন কি, নানা সাধক সম্প্রদায়ের প্রয়াসেও তাহার সেই নবায়মান প্রকৃতির নানা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতির সুপ্রভাত সেই গুপ্তযুগ—উহার সামাজিক মানসিক পরিবেশ এক নূতন অভ্যুদয়ের পরিচয় বহন করে। তাহারও পূর্ব হইতে আজ পর্যন্ত যে জীবনযাত্রা চলিয়াছিল তাহাও প্রধানত কৃষিমূলক ; শিল্পের ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের অভাব নাই ; মুদ্রারও প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু এত বড় দীর্ঘ যুগেও রোম সাম্রাজ্যের মত, 'money community' বা 'কাঞ্চনকৌলিন্য' ভারত-সংস্কৃতিতে কোনো কালেই স্থাপিত হয় নাই। শ্রেষ্ঠী অপেক্ষা গুপ্তরাজ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রভাব ছিল বেশী। অপর দিকে হয়ত এতদিনকার বৌদ্ধ প্রভাবে মদ্য মাংসাদি তখন হইতেই অশাস্ত্রীয় হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে প্রাকৃতের পরিবর্তে সংস্কৃত রাজাদের ভাষা হইয়াছে। পুরাণ ও শাস্ত্র নূতন করিয়া প্রাকৃতজনদের জীবনকে সুসংস্কৃত করিতেছে। মোটের উপর গুপ্তযুগ যেন এক সদাচারের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা, অভিজাত শ্রেণীর পুনর্জাগরণ। এই বিষয়েই এই যুগের হিন্দু সংস্কৃতির সহিত বৌদ্ধ বা তৎপরবর্তী অন্যান্য ভারতীয় প্রয়াস ও চিন্তার পার্থক্য মনে পড়ে—যেমন, নাথ সম্প্রদায়ের, সহজিয়াদের, চৈতন্য, নানক, কবীর প্রভৃতির। সাধারণ মানুষও অভিজাতদের নানা সহজ সংস্কার ও প্রথাকে স্বীকার করিয়া লয়, পৌরাণিক হিন্দু সংস্কৃতি শৃঙ্খলা, সংযম প্রভৃতি অভিজাত গুণাবলীকে বড় করিয়া দেখে। এই সংস্কৃতির আদর্শে এক আভিজাত্য আছে। এই আভিজাত্য সূচিত হয় কয়টি মানসিক দানে,—প্রথমত

আত্মসংযমে, দ্বিতীয়ত অহিংসায়, তৃতীয়ত পরমতসহিষ্ণুতায়, চতুর্থত সত্যানুসন্ধিৎসায়। সমগ্র হিন্দু-সংস্কৃতির মেরুদণ্ড এই আভিজাত্যচেতনা; উহা বর্ণাশ্রম ধর্মেরও ভিত্তি। বারে বারে ভারতবর্ষের পক্ষে অতি বৃহৎ বর্বর আক্রমণের ও বিশৃঙ্খলার শেষে এই আত্মসংযত, নিয়মনিষ্ঠ জীবনযাত্রার ও চিন্তাধারার বড় প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই আক্রমণে ও মাৎস্যন্যায়ে সমাজের নিম্নশ্রেণীর দুর্ভাগ্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বণিক শ্রেণীর ধন ও ব্যবসা বিনষ্ট হইয়াছে। তাই নিম্নশ্রেণীও এই ব্রাহ্মণ্যবাদী আভিজাত্য শাসন তখন প্রায় স্বচ্ছন্দে মানিয়া লইয়াছে—মনে মনে বুঝিয়াছে, এই শৃঙ্খলা স্বীকারেই তাহার আপন সার্থকতা। মোটের উপর এই অভিজাত ব্যবস্থাই ব্রাহ্মণ্যধর্ম—'ব্রাহ্মণিক কাল্‌চার।' গুপ্ত সম্রাটদের সময় হইতে ইহাই এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতিরূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল।

মনে রাখা দরকার, পূর্বাপর হিন্দু-সংস্কৃতির বনিয়াদ শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ। শ্রেণীভেদ সেই বৈদিক সমাজেরও চিন্তায় ভাবনায় তাহার দুস্তর ছাপ রাখিয়া যাইতেছিল, আমরা তাহা দেখিয়াছি। 'জন্মান্তরবাদ' ও 'কর্মবাদ' এই পৃথিবীর বঞ্চিতদের প্রবোধ দিবার ও সান্ত্বনা পাইবার মত এক অদ্ভুত মতবাদ। 'পরলোক', 'তত্ত্বমসি'ও সেদিকে বেশ কার্যকরী হয়। পরবর্তী হিন্দু-সংস্কৃতি এই শ্রেণী-বৈষম্যের বনিয়াদকে পাকা করিয়া লইয়াছে 'অধিকারভেদ' নামক নীতি সুপ্রচলিত করিয়া—বঞ্চিতের পক্ষে আত্মহত্যার এমন নীতি আর নাই। হিন্দুর সমস্ত দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তা এই বৈষম্যবাদের দ্বারা জর্জরিত। দেখিতে পাই এই হিন্দু-সংস্কৃতির চক্ষে সমাজের উৎপাদকশ্রেণীর স্থান কত নিম্নে। তাহারা রহিল শূদ্র ও অন্ত্যজ হইয়া; মানুষের অধিকার হইতে তাহারা সর্বভাবেই বঞ্চিত হইয়া রহিল। প্রায় তেমনি বঞ্চিত রহিল স্ত্রীজাতি। হিন্দুসমাজের পরমতসহিষ্ণুতার অর্থ তাহা হইলে এই—এই সমাজের জনগণের অর্থাৎ অধিকাংশের মন ও মতের একেবারে ধ্বংস-সাধন। তাহার অহিংসার অর্থ—গো-ব্রাহ্মণেরই রক্ষা। এবং তাহার সত্যানুসন্ধিৎসা, এক অসাধারণ মানসক্রিয়া—পৃথিবীর রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধকে উহার বলে সে তত্ত্ব হিসাবে উড়াইয়া দেয়, অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার তিলার্ধও তাই বলিয়া ত্যাগ করিতে চায় কত জন? আর হিন্দুর সংযমনিরত সাত্ত্বিক জীবনযাত্রার অর্থ দাঁড়ায় শুধু অসংখ্য স্মৃতির অনুশাসন, শেষ পর্যন্ত পঞ্জিকা ও বিধি-নিষেধ। এই কথা মনে করিবারও কোনো কারণ নাই যে, ইহা শুধু আজিকার (বা

মুসলমান আমলের) 'পতনে'র জন্যই ঘটিয়াছে—পূর্বাপর হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সমাজ যে বনিয়াদকে অটুট রাখিতে চাহিয়াছে তাহাতেই এই পতন অবশ্যম্ভাবী হইতে বাধ্য। আজ শুধু আমরা সেই অধ্যায় সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছি।

তবে মানিতে হইবে, সেই হিসাবে গুপ্তরা একান্তভাবে প্রতিক্রিয়ার ধ্বজাধারী ছিলেন না। তখনকার মত গুপ্ত সম্রাটদের ভূমিকা ছিল সাময়িক প্রগতি বাহকের—প্রকৃতিপুঞ্জের আদর্শ-স্থানীয়, বণিক ও শিল্পীর প্রিয়, রাষ্ট্র ও সমাজে একটা শান্তি ও সুস্থিরতার প্রতিষ্ঠাতা—সমগ্র ভারতব্যাপী সাংস্কৃতিক ঐক্য-স্থাপয়িতা। তাই না গুপ্তযুগে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, জৈন সকলের সৃষ্টি এমন উৎসারিত হইয়া উঠে, এবং অব্যাহতভাবে বহির্ভারতেও ভারতীয় সংস্কৃতির অপূর্ব বিকাশ দেখি। গুপ্তযুগের প্রতিক্রিয়ার দিকটি তখনো ভারতের সমাজ-জীবনে প্রকট হয় নাই। পরে তাহা ক্রমেই প্রকট হইল। এই প্রতিক্রিয়ার মূল নিহিত ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বর্ণাশ্রমের বজ্রবন্ধন রচনায়, বর্তমান পৌরাণিক হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠায় (পুরাণগুলি তখন শেষবারের মত গ্রথিত হয়)—সমুদ্রযাত্রা নিষেধে, জাতিভেদ ও আচার, স্পর্শদোষ প্রভৃতি হাজার ব্যবস্থায়।

গুপ্তরা নিজেদের জাতির কথা উল্লেখ করেন নাই—সম্ভবত তাঁহারা ছিলেন বৈশ্য। কিংবা আরো নীচেকার, শূদ্র। লিচ্ছবী দুহিতাকে বিবাহ করায় হয়ত তাঁহারা শক্তিলাভ করেন; পুনর্গঠিত ব্রাহ্মণ্যবাদের মহিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াই তাঁহারা ব্রাহ্মণশাসিত ভারতীয় সমাজের নিকট গ্রাহ্য হইতে পারিলেন। পূর্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য রাজ্য ও রাজাদের অত্যাচার হইতে বণিক ও সাধারণ শিল্পীদের মুক্তি দিয়া তাঁহারা হয়ত (সিজার অগষ্টাসের মত, কিংবা ইংলণ্ডের টিউডর রাজাদের মত ?) সত্যই সেকালের 'শ্রেণী'-সমৃদ্ধ বণিক্ ও শিল্পীদের পরম পূজ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন ('রঘুবংশ' যদি গুপ্তবংশের প্রতিলিপি বহন করে তাহা হইলে ইহাই মনে হয় সত্য)।

পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাচীন সংস্কৃতির মতোই এই হিন্দু-সংস্কৃতিও শুধু মুষ্টিমেয় মানুষের মানসিক উৎকর্ষের ও অগণিত জনগণের দেহ-মন-প্রাণের সুদীর্ঘ দাসত্বের পরিচায়ক।[১] অবশ্য সেই জনসমাজ, শূদ্র ও চণ্ডালের দল, এই

[১] "We must not forget that these idyllic village communities, inoffensive though they may appear, had always been the solid foundation of Oriental despotism, that they restrained the human mind within the smallest possible compass, making it the unresisting tool of superstition,

জীবনই মাথা পাতিয়া লইয়াছেন,—এখনো লয়, যতদিন পর্যন্ত সেই মূল কৃষি সমাজের পরিবর্তন না হইবে, গণতান্ত্রিক বিপ্লব কার্যকরী না হইবে, ততদিন লইবেও।

কিন্তু বর্ণ-আভিজাত্য যেখানে একালের সাম্রাজ্যবাদী শোষণে ধ্বংস হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে যেখানে নূতন ধনাভিজাত্য চাপিয়া বসিতে লাগিল, সেখানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের ও ক্ষাত্রধর্মের পালনীয় আত্মসংযম ও আত্মোৎসর্গের চিহ্নও আর নাই। শুধু ধনাভিজাত্যের স্বার্থপরতা ও বিলাসবাহুল্যই উৎকট হইয়া উঠিয়াছে, শোষিত শ্রেণীর মধ্যেও তাই বিদ্রোহের সূচনা হইতেছে, অথচ এতদিনকার বাধ্যতার অভ্যাসে হিন্দু নিম্নবর্গের শোষিতদের সে বিদ্রোহ আজও উগ্র হয় নাই। মূল কারণ বিনষ্ট না করিয়া তাহা আম্বেদকারী নির্দেশে 'বৌদ্ধ' নাম লইয়া সমাজবিপ্লব হইতে দূরে সরিয়া থাকিতেছে।

প্রাচীন ভারতের আর্থিক বনিয়াদ

আড়াই হাজার দুই হাজার বৎসরে (আনুমানিক ১,০০০-৫০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে খ্রীষ্টীয় ১,২০৩-এ মুসলিম বিজয় পর্যন্ত) প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রা একটি বিশেষ আর্থিক বনিয়াদেরই উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কথা আবার মনে করা নিষ্প্রয়োজন যে, এই বিরাট দেশে সর্বত্র রাষ্ট্রীয় কেন,

enslaving it beneath traditional rules, depriving it of all grandeur and historical energies. We must not forget the barbarian egotism which, concentrating on some miserable patch of land, had quietly witnessed the ruin of empires, the perpetration of unspeakable cruelties, the massacre of the population of large towns with no other consideration bestowed upon them than on natural events, itself the helpless prey of any aggressor who deigned to notice it at all. We must not forget that this undignified, stagnatory, and vegetative life, that this passive sort of existence evoked on the other part, in contradistinction, wild, aimless, unbounded forces of destruction and rendered murder itself a religious rite in Hindustan. We must not forget that these little communities were contaminated by distinctions of caste and by slavery, that they subjugated man to external circumstances, that they transformed a self-developing social state into never changing natural destiny, and thus brought about a brutalising worship of nature, exhibiting its degradation in the fact that man, the sovereign of nature, fell down on his knees in adoration of Hanuman, the monkey, and Sabbata the cow." New York Daily Tribune, June 25. 1853. —KARL MARX.

ভৌগোলিক পরিবেশও একরূপ নয়, এবং সর্বকালেও একই অবস্থা কোথাও অব্যাহত থাকে নাই। জীবনযাত্রা একই বনিয়াদে গড়িয়া উঠিলেও দেশে ও কালে মিলিয়া ইহারও মধ্যে তাহার অনেক রকমফের দেখা দিয়াছে; ঐক্য সত্ত্বেও তাহাতে অসামান্য বৈচিত্র্য ফুটিয়াছে। এই বৈচিত্র্যের জন্য এবং স্থায়ী রাষ্ট্রীয় বন্ধনের অভাবে প্রাচীন ভারত রাজনৈতিক "এক-জাতীয়তার" দিকে তখনো অগ্রসর হইতে পারে নাই, তবে ভবিষ্যতের "বহুজাতিক মহাজাতির" উপযোগী উপাদান রচনা করিয়া গিয়াছে। কারণ, এই দুই হাজার আড়াই হাজার বৎসরে তাহার সর্বকেন্দ্রের জীবনযাত্রায় একটা মূলগত মিল ছিল, তাহার সংস্কৃতিরও একটা মূলগত ঐক্য রহিয়া গিয়াছে—পরবর্তী কালেও তাহা অটুট রহিয়াছে। তাহাই ভারতীয় মহাজাতির প্রাচীনতম ভিত্তি।

জীবন-যাত্রার এই সাদৃশ্যের কারণ, ভারতীয় সমাজ পূর্বাপর কৃষিকর্মকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল প্রাচীন সভ্য সমাজেরই প্রধান আশ্রয় থাকে কৃষি। কৃষি-সম্পর্কিত শিল্পেরও সেই অবস্থায় জন্ম হয়—কিন্তু শিল্পীর স্থান সেখানে গৌণ। কিন্তু ভারতীয় সমাজে এই কৃষি-সভ্যতারও একটা বিশিষ্ট রূপ বিকশিত হয়, তাহাই বুঝিবার মত। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক বা রাষ্ট্রীয় নানা প্রভাব ছাড়াও যে-দুইটি বিশিষ্ট পদ্ধতিতে কৃষি-সমাজের বিকাশ এখানে প্রভাবিত হয় তাহার একটি ভারতীয় ভূমি-ব্যবস্থা, অন্যটি ভারতীয় "জাতি"-ব্যবস্থা। দুইটিই পরস্পর সম্পর্কিত; দুইটিই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের দুই জটিল প্রশ্ন; এবং কোনটিরই বিষয়ে আজও ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতগণ সকল প্রশ্নে একমত নন, তাহা মনে রাখা প্রয়োজন। অথচ, ভারতবর্ষের কৃষি-সভ্যতার বা ভারতের সামন্ততন্ত্রের বিশেষ রূপটি এই আর্থিক বিন্যাস ও সামাজিক বিধি-নিষেধের দ্বারা সর্বাধিক প্রভাবিত হইয়াছে।

ভূমি-ব্যবস্থা

কৃষি-সমাজের প্রধান কথা হইল ভূমি-ব্যবস্থা—যাহারা প্রকৃত কৃষক, মূল উৎপাদক (primary producer), জমিতে তাহাদের স্বত্ব কি ধরণের, অন্যান্যরাই বা জমিতে কি স্বত্ব ভোগ করে ?[১]

---

১ 'ভূমি-ব্যবস্থা' 'জাতিভেদ' প্রভৃতি বিষয়ে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের **Studies in Indian Social Polity, 1944, Calcutta,** দ্রষ্টব্য। যথাসম্ভব ঐ গ্রন্থ ও রাহুল সাংকৃত্যায়নের গ্রন্থাদিতে মূল শাস্ত্র, পুরালিপি প্রভৃতির বিচার আছে, এখানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বিভিন্ন সময়ে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রে নিশ্চয়ই এই ভূমি-স্বত্ব ও ভূমি-সম্পর্কের রদ-বদল হইয়াছে। কিন্তু মোটামুটি কয়েকটি সাধারণ রূপ ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়া যায়। যথা, (১) গ্রামের জমি প্রথমত গ্রামের দশজনেই (সভা, পঞ্চায়েত, পল্লীসমাজ) বিলি ব্যবস্থা করিত। (২) জমির বণ্টন হইত পরিবার ('কুল' বা 'গৃহ') হিসাবে। পরিবারই সমগ্রভাবে তাহাদের জমি চাষ করিত, নিজেদের হালবলদ, বীজধান তাহাদের ছিল,—সমগ্রভাবে পরিবার হইত তাহাদের উৎপন্ন শস্যের অধিকারী। অবশ্য গ্রামের কিছু কিছু সাধারণ জমি, সাধারণ গোচারণ ভূমি প্রভৃতিও থাকিত। কিন্তু মোটের উপর জমি পরিবার বা ব্যক্তির সম্পত্তি। (৩) উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ 'রাজস্ব' হিসাবে প্রজার বা কৃষকের রাজাকে দিতে হইত। মুদ্রায় নয়, 'রাজস্ব' দিতে হইত দ্রব্যজাতে। রাজস্ব না দিলে অবশ্য ভূমি হারাইতে হইত। এইখানেই প্রশ্ন—রাজস্ব কি অধিকারে রাজা আদায় করিত? প্রজাপালক ও রাজ্যরক্ষক বলিয়া? না, সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিক বলিয়া? অর্থাৎ ইহা কি ট্যাক্স্, না, রেণ্ট? জমির উপর কৃষকের অধিকারই বা কি? এই প্রশ্নে ভারতীয় পণ্ডিতদের মতভেদের অন্ত নাই।

মেন্ প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিতদের অনুসরণ করিয়া আমাদের দেশীয় গবেষকগণ অধিকাংশেই পল্লী-সমাজ (ভিলেজ কমিউনিটিকে) গ্রামের জমির মূল মালিক ও কৃষককে বা (কৃষক পরিবারকে) জমিতে স্বত্বাধিকারী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতে চাহেন। তাঁহাদের মতে—ভারতীয় কৃষক এই স্বত্বস্বামিত্ব হারায় বিদেশীয় বিজেতাদের আমলে—অর্থাৎ মুসলমানদের সময়ে, বিশেষত ইংরেজ রাজত্বে। ইহার সমর্থক প্রমাণপত্র তুচ্ছ নয়। সত্যই মনু (খ্রীঃ পূঃ ২০০এর দিকে), জৈমিনি (খ্রীঃ ২০০এর দিকে) ও সায়নাচার্য (খ্রীষ্টীয় ১৩০০'র দিকে, বিজয়নগর সাম্রাজ্যে) প্রজাকেই ভূমির মালিক বলিয়াছেন। ফ্লাউড কমিশনের নিকটে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এই সব প্রমাণ বিশদ ভাবেই উপস্থিত করেন। ইহাও ঠিক, মুসলমান রাজগণ বিজেতা হিসাবে সমস্ত দেশের মালিক বলিয়া নিজেদের গণ্য করিতেন, ঈরানের নিয়ম ও ধারণানুযায়ী ঐরূপ ব্যবস্থাও প্রচলন করিতে থাকেন, এ দেশে প্রজার অধিকার ক্রমশ তাহাতে খর্ব হয়। ইহাও ঠিক, ইংরেজ পণ্ডিতেরা (ফ্লাউড কমিশন পর্যন্ত) ভারতবর্ষে বরাবরই 'রাজা জমির মালিক' এই মত প্রচার করিতেন। কিন্তু বিদেশী ইংরেজ রাজের বিরুদ্ধে দেশী সাধারণ কৃষকের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত

করিবার জন্যও আমাদের জাতীয় স্বার্থবাদী গবেষণার যে একটা ঝোঁক আছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। এই 'জাতীয়তাবাদী' পণ্ডিতগণ কংগ্রেসী রাজের আমলে কৃষককে জমিতে অধিকার না দিয়া জমিদারী প্রথা বিলোপের নামে নূতন করিয়া 'রাষ্ট্রাধিকৃত জমিদারী প্রথার' পুনর্গঠনের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজাই যে প্রাচীনকালে জমির মালিক ছিল মেগেস্থানিস প্রমুখ গ্রীক ও কৌটিল্য প্রমুখদের কথা এই বিষয়ে প্রামাণ্য। এই দিকেও এরূপ যথেষ্ট প্রমাণ এই মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ উপস্থিত করেন। ভারতবর্ষে প্রজাদের ভূ-সম্পত্তিতে কোনো স্বামিত্ব বা মালিকানা (প্রাইভেট রাইট্স্ ইন্ ল্যাণ্ড) ছিল না, ইহা মার্কস্‌এর অভিমত। মার্কস্ ভালো করিয়াই জানিতেন, "প্রাচ্য" বা 'এশিয়াটিক সমাজে' পল্লী-সমাজ বা ভিলেজ কমিউনিটির আয়ু কম ছিল না। ঐতিহাসিকরা আরও দেখেন, সর্বকালে সর্বত্র প্রজা ভূমি দান-বিক্রয়ও করিতেছে। তাই মনে হইতে পারে, প্রজাই জমির মালিক। অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গবেষকদের যে সব প্রমাণপত্র মার্কসের হস্তগত হইয়াছে তাহা হইতেই তাঁহাকে প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে মত গঠন করিতে হয়। তাই এই সব অপর্যাপ্ত তথ্যের জন্য প্রশ্নে তাঁহার ভুল ঘটা অসম্ভব নয়। তথাপি ভুল মার্কসের ঘটে নাই, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মৌর্য যুগ হইতে বিজয়নগর সম্রাটদের কাল পর্যন্ত বহু শিলালিপি ও তাম্রলিপি বিচার করিয়া এই সুস্থির সিদ্ধান্তেই পৌঁছেন (দ্রষ্টব্য *Studies in Indian Social Polity*, Chapter xv)। মার্কসের কথা ভালো করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেই তাঁহার বক্তব্য পরিষ্কার হইয়া উঠে। (এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : *The Modern Quarterly*, Summer, 1948-এ জন মরিস্ লিখিত *Slaves and Serfs* নামক প্রবন্ধ)।

মার্কস্ এশিয়ায় সাধারণ ভাবে দেখিতে পান—"কর-গ্রাহী রাষ্ট্র" ("tribute state"), অর্থাৎ "রাষ্ট্র প্রধানতম ভূস্বামী" ("State as the supreme landlord")। কখনো কোনো যাযাবর 'জন' বা কোনো পল্লী-সমাজের কিংবা উহারও উপরকার কোনো বড় সংগঠিত রাষ্ট্র এক একটা সামূহিক (collective) সত্তারূপে গণ্য হইত। (কাশী, কোশল, মগধ এবং পরে মৌর্য সাম্রাজ্য এমনি একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়, শাক্য-লিচ্ছবী, সংবজ্জদের ট্রাইব্‌ল রাষ্ট্রও ছিল, তাহা আমরা জানি। বৈদিক যুগের 'প্রাচ্য সমাজ' এইরূপ রাষ্ট্রের বিকাশে অবশ্য লোপ পায় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য)। এইরূপ সামূহিক সত্তার যে শাসক, হোক সে রাজা কিংবা সম্রাট, কিংবা তা অভিজাততন্ত্র, সমগ্রভাবে সত্তার

ক্ষমতার সে-ই জীবন্ত প্রতীক ; সমগ্র ভূ-সম্পত্তিতে তাহারই স্বামিত্ব থাকিত। কাজেই "জমিতে কাহারও নিজস্ব স্বত্ব নাই ; অবশ্য জমিতে দখল ও ভোগের সম্পূর্ণ নিজস্ব অধিকার আছে।" ("there is no private ownership of land, although there is complete private possession and use of land." *Capital*, III, p 918 হইতে উদ্ধৃত ; দ্রষ্টব্য *The Modern Quarterly*, Summer, p. 948, p 44)। এই উক্তি হয়তো ভারতবর্ষ ও মিশর সম্বন্ধে সত্য ; কিন্তু প্রাচীন মেসোপোটেমিয়া সম্বন্ধে সত্য নয় বলিয়া ষ্ট্রুবে প্রভৃতি রুশ ঐতিহাসিক কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু 'স্বামিত্ব' ও 'দখল ও ভোগের অধিকার' এই দুই-এর পার্থক্য মনে রাখিলে এইরূপ আপত্তির কারণ ভারতবর্ষ বা মেসোপোটেমিয়া কোনো ক্ষেত্রেই থাকে না। ভারতবর্ষের প্রজা-সাধারণ এক একটি পরিবার ("কুল" বা "গৃহ") অনুযায়ী গ্রামের অন্তর্ভুক্ত হইত। সেই 'গ্রাম্য সমাজ' ক্রমে অন্তর্ভুক্ত হইল এক একটি রাষ্ট্রে, কখনো-কখনো বা সাম্রাজ্যেও। কখনো সে রাষ্ট্র হইত রাজতন্ত্র, কখনো রাজন্যতন্ত্র (অভিজাততন্ত্র)। প্রজাকুলের উৎপাদনের একাংশ (এক-ষষ্ঠাংশ) শাসকরা ভূস্বামীরূপে পাইতেন। রাজশক্তির ইহাই ছিল আয়ের প্রধান পথ। অবশ্য এই মূল আদায়ের সঙ্গে শ্রমের উপরও দাবী ('বেগার'), এবং আরও অন্যান্য নানা রাজকীয় সামন্ততান্ত্রিক আদায়-উশুল (আবওয়াব) প্রভৃতির দাবী, যথা, 'কর' বা ট্যাক্স্ (পুষ্প, দুগ্ধ, দধি, প্রভৃতির উপর) কিংবা 'শুল্ক' প্রভৃতি বাড়িতে বা কমিতে পারে ; এবং রাজা ও কৃষকের মধ্যে রাজা কাহাকেও নিজের রাজস্ব দান করিয়া ভূমির সামন্তরূপে স্থাপন করিতে পারেন। কিন্তু মোটামুটি রাজাই যে ভূমির মালিক, ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং প্রমাণাবলী হইতে দেখা যায়—(ক) প্রজারও অধিকার কিছু ছিল, সেই অধিকার জমি দখলের ও ভোগের। রাজা খাজনা অনাদায়ে ছাড়া সাধারণত তাহা বিলুপ্ত করিতে পারিতেন না। (খ) অন্যকে রাজা দিতেন তাঁহার নিজ অধিকারটুকু—প্রদত্ত ভূসম্পত্তির দ্রব্যজাতের যেটুকু রাজার প্রাপ্য তাহাই রাজা দান করিতে পারিতেন —সেই দেয় অংশ প্রজা দিলে তাহার স্বত্ব পূর্ববৎ অক্ষুন্ন থাকিত। (গ) এই ভোগ-দখলের অধিকার প্রজা-পরিবার হস্তান্তর করিতে পারিত। কিন্তু হস্তান্তর করিতে হইলে ভূমির নিকটস্থ দশজনকে অধিকারীর সাক্ষ্য রাখিয়া করিতে পারিত—অর্থাৎ পল্লীপ্রধানদের উহাতে অনুমোদন প্রয়োজন হইত। তাহা হইলে

চাষীর ভূসম্পত্তিতে স্বত্ব কতটুকু ছিল? দখলীস্বত্ব—রাজস্ব না দিলে সে উচ্ছেদ হইত। হস্তান্তরেও কিছু বাধা ছিল। ধর্মকর্মে ছাড়া—দেব-ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে ছাড়া—প্রজাদের সত্য সত্যই একে অন্যে ক্রয়-বিক্রয়ের স্বাধীন অধিকার (প্রাইভেট রাইট ইন্ প্রোপার্টি) কতটুকু ছিল বলা সুসাধ্য নয়।

মোটের উপর এই পরস্পর-বিরোধী প্রমাণাবলী হইতে যে ঐতিহাসিক সহজ সত্য বুঝা যায় তাহা এই:—বৈদিক সমাজেই রাজা যোদ্ধনায়ক হইতে রাজমহিমা আয়ত্ত করিতে লাগিয়াছিলেন। তখনো তিনি নিজ প্রাপ্য পাইতেন উপহাররূপে, সে প্রাপ্যের প্রথম নাম ছিল 'বলি' (সশ্রদ্ধ উপহার)। কিন্তু ক্রমে উহাতে তাহার 'অধিকার' জন্মিল; তখন উহার নাম হইল 'ভাগ'। হয়ত স্পষ্ট করিয়া উহাকে 'খাজনা' বলিয়া ঘোষণা করিতে সময় লাগিয়াছে। পতিত জমি, বন, খনি প্রভৃতির উপর রাজার স্বামিত্ব স্থির হইয়া গিয়াছে। অবস্থাটা নির্ভর করিয়াছে রাজার ও জন-সমিতির পরস্পরের শক্তির উপর। শক্তি থাকিলে ক্রমেই রাজারা এই দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতেন—'নৃপতি' তখন অবশ্য 'ভূপতি' হইয়া উঠিতেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের ঠাট দেখিয়াই বুঝা যায়—রাজার শক্তি সেখানে অপরিমিত, কৌটিল্য বা গ্রীক সাক্ষীরা রাজাকে ভূমির মালিক বলিলে সত্য কথাই বলিয়াছেন। তখন হইতে অবশ্য ছোট-বড সকল রাজাই এইরূপ দাবী করিত, তাহাতে ভুল নাই; এবং ক্রমশই প্রজাদের তুলনায় রাজার দাবী বাড়িয়া যায়, তাহাও নিঃসন্দেহ। বারে বারে বিদেশীয় আক্রমণে বিদেশীয় রাজশক্তি নিজেদের ক্ষমতা বাড়ান; অষ্টবসুর শক্তি ভগবানের প্রতিনিধি বলিয়াও ক্রমশ রাজারা অলৌকিক মহিমা আয়ত্ত করিতে থাকেন। তথাপি এই বিরাট দেশে সকল স্থানে রাজার এই দাবী গ্রাহ্য হয় নাই; সর্বকালেও স্বীকৃত হয় নাই। মনু-জৈমিনি প্রভৃতি হয়ত এমনি আদর্শের কথা মনে রাখিয়াই রাজার স্বামিত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন। সায়ন ও মাধবাচার্য প্রভৃতির কথা অন্তত বিজয়নগরের রাজশক্তির সম্বন্ধে মোটেই খাটিত না—প্রজারা সেখানে জমির মালিক ছিল না। তথাপি মনে করা চলে, ভারতবর্ষে যখন যেখানে রাজশক্তি দুর্বল হইয়াছে, সেখানেই তাহাদের সেই সার্বভৌম অধিকারের দাবীও টিকে নাই; অন্তত মনু, জৈমিনির মত গোঁড়া ব্রাহ্মণরাও রাজার এই দাবীকে স্বীকার করিতে বা শাশ্বত বলিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

ভূমিস্বত্বের রূপ

প্রজার অধিকার যে ক্রমশই খর্ব হইতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজা ও প্রজার মধ্যে রাজা নানা মধ্যস্বত্ব গড়িয়া তুলিতে থাকেন। কত রকমের ভূমিস্বত্ব যে সৃষ্টি হইতে থাকে তাহারও উল্লেখ পুরালিপি হইতে পাওয়া যায়—যথা, (ক) 'নিবি-ধর্ম' ও 'অক্ষয় নিবি', হয়ত দুইটি কথা মোটামুটি একই স্বত্বকে বুঝাইত—মূল দ্রব্যের ('শিবর') ক্ষয় না করিবার শর্তে বরাবর ভোগ করিবার অধিকার (ইউরোপের ফিয়েফ্‌ এর মতই ?); 'অপ্রদ',—যাহা আর দান করা চলিবে না,—তাহাও এই স্বত্বই বুঝাইত। (খ) কিন্তু 'নিবিধর্ম-ক্ষয়' রূপ স্বত্বে গ্রহীতা বা ক্রেতা দান ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি সমস্ত স্বত্ব লাভ করিত। 'অপ্রদ ক্ষয়ও' এইরূপই অধিকার। (গ) 'ভূমি ছিদ্রের' ('ভূচ্ছিদ্র') কথাই বেশি পাওয়া যায়—ইহার অর্থ আজকালকার ভাষায় 'খাজনা লাগিত না'। স্বভাবতই অনেক দান এই পর্যায়ে পড়িবে। (ঘ) 'দান' বা 'নিষ্কর' জমি, দেবত্র, ব্রহ্মত্র প্রভৃতি সর্বরকম কর, শুল্ক, শ্রম-শুল্ক (বেগার) হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইত—(ইউরোপীয় 'বেনিফিস্'-এর অনুরূপ ?)। (ঙ) 'স্থল বৃত্তি'তে কর, খাজনা প্রভৃতি দ্রব্যজাত দ্বারা দেওয়া হইত।

এই সব নানা স্বত্বের উদ্ভবের মধ্য দিয়া স্বভাবতই বুঝি রাজা ভূস্বামী রূপে স্বীকৃত; তিনি নানা স্বত্বের মধ্যবিত্ত সৃষ্টি করিতে পারেন; প্রজা-সাধারণের অধিকার সীমাবদ্ধ। কিন্তু সকল প্রজাই যে জমি চাষ করে তাহা নয়; 'ভাগচাষী' বা 'বর্গাদার'এর মত চাষীও আছে। কোথাও তাহারা পায় ফসলের 'আধি', কোথাও তাহারা পায় 'তেভাগার' মাত্র এক ভাগ। অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক একটা ভূমিব্যবস্থার ও সমাজব্যবস্থার পরিষ্কার সাক্ষ্য ইহাতে দেখি।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের স্বরূপ বুঝিবার পূর্বে অবশ্য এর জাতিভেদ প্রথার প্রশ্ন সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। আর বর্তমান প্রসঙ্গে এই অধিকারহীন 'ভূমিদাস' 'দাসদের' কথা একবার বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন।

ভারতীয় দাসপ্রথা

কি কৃষিকর্মে, কি শিল্পকর্মে, কোনো দিকে দাস-পরিশ্রমে (slave labour-এ) উৎপাদন কি প্রাচীন ভারতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল ? তাহা মনে হয় না। গ্রীসের মত 'খনি' বা 'কারখানায়' এখানে দাস-শ্রমিক প্রযুক্ত

হইবে, কিংবা কার্থেজ বা রোমের মত ক্ষেতে বাগিচায় (প্লান্‌টেশনে) পণ্যশস্য উৎপন্ন হইবে দাস-পরিশ্রমে, এমন অবস্থাও হয় নাই। উহার প্রমাণও ভারতবর্ষে কোথাও নাই। যেইরূপ দেখি ইউরোপের ফিউডাল সমাজের 'সার্ফ' বা 'ভূমিদাস'ও ভারতবর্ষে ছিল না—কৃষক এদেশে জমির সঙ্গে বাঁধা নয়, প্রজা বা কৃষক জমি হস্তান্তর করিতে পারিত। অবশ্য 'দাস' বা 'স্লেভ্' বরাবর ছিল (একেবারে আদিতে বৈদিক সমাজে 'দাস' প্রথার যাহাই অর্থ থাকুক, 'দাস' আমরা এখানে 'স্লেভ্' অর্থে ব্যবহার করিতেছি)। বৈদিক সাহিত্যেও দাসদের অনেক উল্লেখ আছে,—ক্রীতদাস ছিল, ঋণদাস ছিল, যুদ্ধদাসও ছিল; বিচারে অধিকার হারাইলে দাস হইত দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া (সবংশে) চিরকালের মত বা নির্ধারিতকালের জন্যও কেহ কেহ দাস হইত। প্রভুর পরিবারে দাসেরা থাকিত, অর্থাৎ গৃহদাস হইত। ভৃত্যরূপে শিল্পে বাণিজ্য-ব্যবসায়েও নিযুক্ত হইত; অনেকে রাজভৃত্য রূপে বহু উচ্চপদে আরোহণ করিতে পারিত। এই সব বিষয়ে তাহাদের অবস্থা গ্রীক দাসদের অপেক্ষা হয়ত ভালোই ছিল। কিন্তু কোনো সময় ভারতীয় সমাজে দাসেরা সংখ্যায়ও তত অধিক হয় নাই, আর উৎপাদন ক্রিয়ায়ও প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠে নাই। তাহার প্রধান একটি কারণ এই যে, ভারতীয় সমাজে এমন নিম্ন-শ্রেণী ছিল, যাহাদের দ্বারাই উৎপাদন করা চলুক, দাসতা প্রথার প্রয়োজন হয় নাই। অর্থাৎ ঠিক দাস না থাকিলেও 'দাসতুল্য' শ্রেণী সমাজের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল, আর তাহারাই ক্ষেতে, গৃহশিল্পে, গৃহকর্মে উৎপাদনের একটা বড় অংশ জোগাইত। এইরূপে 'সার্ফ' না থাকিলেও এমন স্বত্বহীন উৎপাদক শ্রেণী তৈয়ারী হইয়াছিল যাহারা 'সার্ফ-তুল্য'—নিজের ইচ্ছামত শ্রমোৎপাদনের কোনো অধিকারই পাইত না। 'জাতিভেদ' প্রথার ইহাই এক অসাধারণ কীর্তি—আইনত দাস না করিয়া কার্যত দাসশ্রেণীর সৃষ্টি করা—চিরস্থায়ী দাস প্রথার প্রচলন করা।

ভারতের 'জাতিভেদ'

'জাতিভেদের' বা 'বর্ণাশ্রম ধর্মের' যাহা প্রধান বিশেষত্ব তাহা মোটের উপর তিনটি—বংশানুগত বৃত্তি গ্রহণের নির্দেশ, ভিন্ন জাতিতে বিবাহের নিষেধ এবং ভিন্ন জাতির সহিত আহারের নিষেধ। অবশ্য ইহা ছাড়া

ছোটখাটো কত রকমের বিশেষ বিশেষ নিয়ম ও আচার, খাদ্যাখাদ্য বিচার, এবং স্পর্শ-দোষ, কৌলিন্যের নানা ধাপ প্রভৃতি ধারণা যে প্রচলিত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহা ছাড়া সগোত্র, সপিণ্ড প্রভৃতি কতকগুলি কৌলিক ধারণাও আছে, আর মূলত আছে পরিবারগত ঐক্য। কিন্তু বৃত্তি, বিবাহ, আহার্যসম্পর্কিত এই তিনটি মূল ব্যাপার সকল প্রাচীনপন্থী হিন্দুই মানে; হিন্দু ছাড়া ভারতের অন্য সম্প্রদায়ের উপরও ইহার প্রভাব যথেষ্ট পড়িয়াছে। এবং আজ আবার সমস্ত ভারতবর্ষেরই আধুনিক যন্ত্রশিল্পের প্রচলনে শহরে ও খানিকটা পল্লীঅঞ্চলেও শিক্ষিত সমাজে জাতিভেদের কঠিন বিধিনিষেধ শিথিল হইয়া পড়িতেছে, তাহাও স্মরণীয়।

বৈদিক সমাজে আমরা দেখিয়াছিলাম 'বর্ণভেদের' উৎপত্তি; শ্রমবিভাগ ও শ্রেণীভেদকে কেন্দ্র করিয়া তাহার আবির্ভাব হয়। প্রাচীন সমাজে অন্যত্রও এই ধরণের 'বর্ণভেদের' অস্তিত্ব যথেষ্ট দেখা যায়—বংশানুগতভাবে বৃত্তিবিভাগ ও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের নিষেধ, 'এশিয়াটিক সামন্ত সমাজ' কেন, প্রাচীন গ্রীসে রোমেও ছিল; সামন্ত ইউরোপেও ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। (দ্রষ্টব্য ডাঃ দত্তের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৭ম অধ্যায়)। সুতরাং এইরূপ অবস্থার উৎপত্তি একমাত্র ভারতীয় বৈশিষ্ট্য নয়। অন্যান্য দেশের সেই সব ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয় ব্যবস্থার তফাৎ তবু গুণগত এবং অসামান্য। পৃথিবীর আর কোনো সভ্য সমাজে ঠিক এইরূপ ভাবে এই ব্যবস্থা এমন রূপে গড়িয়া উঠিয়া এমন জটিল, এমন পাকা, এমন অচ্ছেদ্য বিভাগে পরিণত হইতে পারে নাই।

বেদের প্রথম দিক্‌কার তিন বর্ণের পরে বৈদিক যুগেই (যজুর্বেদে) চতুর্থ বর্ণ শূদ্রদের কথা জানিতে পারি। 'বর্ণ' সত্যই কি বুঝায় এবং কাহারা এই 'শূদ্র'—এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইবার উপায় নাই। কিন্তু যাহা সত্য মনে হয় তাহা এই: বিজিত অন্‌-আর্য জাতির অনেকেই শূদ্রে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা কৃষ্ণকায় ছিল, আর্যরা শ্বেতকায়, আমাদের বহুপঠিত এই সব ধারণা খুব সম্ভব মিথ্যা। সমস্ত 'বর্ণভেদের' গোড়ায় ছিল শ্রমবিভাগ ও শ্রেণীভেদের বনিয়াদ। সাধারণ 'বিশ' ভাঙিয়া যোদ্ধারা শাসক শ্রেণীতে উঠিয়া যায়, সম্ভবত (অন্যান্য দেশের মতই) ইহাদেরই একাংশ আবার পুরোহিত বা যাজকরূপে ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে পরিণত হয়। সাধারণ লোক স্বাধীন কৃষক ও কারুজীবীরা রহিল 'বিশে'। এই 'বিশের' বা কৃষক ও বৃত্তিজীবীদের বৃহৎ অংশই অধিকারচ্যুত হইয়া দাসত্ব প্রাপ্ত হয় ও 'শূদ্রে' পরিণত হয়। অবশ্য বাকীবাদ অংশ ব্যবসাবাণিজ্য

করিয়া স্বাধীন থাকে, 'বৈশ্য' জাতি হয়, শ্রেণী হিসাবে হয় 'শ্রেষ্ঠী' বণিক। সেই অধিকারচ্যুত 'শূদ্রের' মধ্যে প্রাক্-আর্য সমাজের শ্রমিক শ্রেণী (যথা, হরপ্পা সভ্যতার বস্তিবাসী শ্রমিক শ্রেণী) যেমন ঠাঁই পাইয়াছিল, তেমনি বৈশ্যের শ্রেণীর মধ্যেও ঠাঁই পাইয়া থাকিবে সেই প্রাক্-আর্য সমাজের সম্পন্ন বণিক শ্রেণী। ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও হয়ত ঠাঁই পাইয়াছে 'অসুর', 'রাক্ষস' প্রভৃতি অন্-আর্য (এবং সম্ভবত সুসভ্য) ক্ষমতাবান্ শাসকশ্রেণীর লোক—ইহা অনুমান করা যায়। অন্তত বর্ণভেদের মূল কারণ রঙের পার্থক্য (বা কলার ডিফারেনস্) নয়, জেতা-বিজেতার রেসিয়াল্ সমস্যাও নয়—আসল কারণ এই শ্রম-বিভাগ ও শ্রেণীভেদ, উহাই ক্রমে 'জাতিভেদে' রূপ লাভ করে,—এই কথা বহু পণ্ডিতেরই মত। সমাজের বিকাশের সঙ্গে নূতন নূতন শিল্প দেখা দেয়। তন্তুবায়, কুম্ভকার, তাম্রকার, (লৌহকার, কাংস্যকার), সূত্রধর রথকার, চর্মণী ছাড়াও আরও নূতন শিল্পী দেখা দেয়—তৈলকার, নাপিত, ধোপা ইত্যাদি। নূতন নূতন কারিগর ও নূতন বৃত্তিজীবী এইভাবে বাড়িতে থাকে শিল্পকৌশলের ক্রমবিকাশের সহিত। সমস্ত শিল্পী শ্রেণীই প্রায় শূদ্রদের মধ্যে পরিগণিত হয়, শুধু চার বর্ণে তাই আর কুলাইল না। সন্দেহ নাই যে শারীরিক শ্রম ঘৃণ্য বিবেচিত হওয়াতে শ্রেণীভেদ ক্রমশ বংশগত হইতে লাগিল। বিবাহ, আহারাদির নিষেধ ইহার মধ্যে জুটিতে লাগিল। এইরূপে বর্ণভেদ হইতে 'জাতিভেদ'-রূপে মূলের শ্রেণীভেদ এমন আকার গ্রহণ করিল যে মূল সত্যও প্রায় চিনিবার উপায় রহিল না। 'জাতিই' একটা প্রবল ও ব্যাপক ধারণা ও ব্যবস্থা হিসাবে উক্ত যুগের সময় হইতে গ্রাহ্য হয় এবং সমাজের নানা ভাঙা-গড়ায় এক এক অঞ্চলে নূতন জাতিরও এইভাবে আবির্ভাব হয় (যেমন, প্রাচ্য ভারতের লেখক-বৃত্তিধারী 'করণ', কায়স্থ, ও মহারাষ্ট্রদেশের 'প্রভু')। অনেক পুরাতন জাতি লোপ পায় (যেমন, হিন্দুস্থান ও রাজপুতানার বাহিরে ক্ষত্রিয় প্রায় বিলুপ্ত)। অনেকের আবার অধোগতিও হয় (যেমন, বৌদ্ধ পালদের পরে সুবর্ণ বণিকদের বাংলায় দুর্দশা ঘটে। অনেক বৌদ্ধ মুসলমান হয় ; অন্যেরা পরে বৈষ্ণব সমাজে স্থান পায়)। বিভিন্ন অঞ্চলের জাতির মধ্যেও ব্যবধান বাড়ে (যেমন, 'রাঢ়ী', 'বারেন্দ্র' ব্রাহ্মণের তফাৎ), এবং হয়ত পুরাতন ট্রাইব হইতেও নূতন জাতি গড়িয়া উঠিতে থাকে (বাঙলার বাগ্‌দী, বাউড়ি, প্রভৃতি জাতি)।

বর্ণভেদ হইতে জাতিভেদও একটা সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস—তাহা

ভারতীয় সামাজিক বিবর্তনের ও সাংস্কৃতিক জীবনের একটা প্রধান সত্য। এই বিবর্তন-ধারা তাই লক্ষণীয়। বৈদিক যুগেই বর্ণভেদের যখন সূচনা হয় তখনো ভেদ বংশগত নয়, বর্ণান্তর বিবাহে বাধারও উল্লেখ নাই, আহারাদির সম্পর্কেও নিষেধ দেখা যায় না। অনেক রাজা ও মন্ত্রী শূদ্র ছিল, শূদ্রত্ব অনেকে প্রাপ্তও হইত, আবার অনেক শূদ্রও শাসক বর্গে উঠিয়া যাইত। কিন্তু শূদ্র তখনি হেয়, সম্ভবত দাসমাত্র; প্রভু তাহাকে মারিয়া ফেলিতেও পারে—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এই কথা বলিতে আরম্ভ করে। ইহার পরে বৈদিক যুগের পরে বুদ্ধজন্মকালে ব্রাহ্মণ্যবাদও জন্মিতেছে। আপস্তম্ভ, গৌতম ও বোধায়নের ধর্মসূত্রে (আনুমানিক কাল খ্রীঃ পূঃ ৬০০-খ্রীঃ পূঃ ৩০০ পর্যন্ত) দেখিতে পাই—ব্রাহ্মণ সুবিধাভোগী (প্রিভিলেজড্) শ্রেণী হইয়া উঠিয়াছে। তবু অনুলোম-প্রতিলোম বিবাহও চলে, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রার বিবাহও অসিদ্ধ নয়, ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার পুত্র ব্রাহ্মণই থাকে,—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদ ও জাতিগত হেয়তার গোড়াপত্তন হইয়াছে, তবে তাহা তত কঠিন হইয়া উঠে নাই। সমসাময়িক বৌদ্ধ প্রমাণে দেখি ক্ষত্রিয়ই শ্রেষ্ঠ বর্ণ, বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধী, যদিও তথনো ব্রাহ্মণ সম্মানিত; কিন্তু পেশা হিসাবে ব্রাহ্মণও চাষী, ব্যবসায়ী, শিকারী, সূত্রধর, সৈনিক, কশাইর কাজ করে। এই মর্মের তথ্য রামায়ণ মহাভারতেও মিলিবে—হয়ত ঐসব পুরাণ-ইতিহাসে তাহা সংগৃহীত রহিয়াছে। বৌদ্ধজাতকে দেখি এক ক্ষত্রিয় কুমারও রাঁধুনি, মালাকার ও বেতওয়ালা হিসাব কাজ করিতেছে। তবে কারিগর ও শিল্পীরা 'গিল্‌ডে' সুসংগঠিত, বৈশ্য ব্যবসায়ীরাও শ্রেষ্ঠীরূপে গিল্‌ড বা 'শ্রেণী' রক্ষা করিতেছে। তথাপি সন্দেহ নাই যে, কাজ এই সময়ে বংশগত হইয়া গিয়াছে।

অন্য দিকে এই বিষয়েও সন্দেহ নাই যে, বুদ্ধ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জিজ্ঞাসুরা, ও নানা অ-বৈদিক সম্প্রদায় এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মত অ-বৈদিক ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্য অনেকাংশে খর্ব করিয়া দেয়। মানুষের মূল্য নির্ণয়ে বুদ্ধদেব মানুষের গুণের উপর জোর দিয়াছেন—জন্মের উপর নয়, শ্রেণীর উপরও নয়। ইহার পরে—তৃতীয় পর্বে—মৌর্য যুগ যখন আসিল তাহার পূর্বেই মগধের সিংহাসনে শূদ্র মহাপদ্ম নন্দ অধিষ্ঠিত হইয়াছে, মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত শূদ্র ছিলেন ('বৃষল' অন্তত ক্ষত্রিয় নয়), তাহাই সাধারণ বিশ্বাস। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' তাই ব্রাহ্মণ্যবাদের ঔদ্ধত্য পাই না, শূদ্রদের বিরুদ্ধেও তেমন উগ্রতা দেখি না; এমন কি শূদ্রদেরও আর্য

পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইল, বলিয়া মনে হয়। জয়সোয়ালের মতে এই অর্থশাস্ত্র "Imperial Code of the law of the Mauryas"। অশোকের শিলালিপিতে যে ধর্ম, নীতি, অহিংসার আভাস, 'ধর্ম-মহামাত্যের' নিয়োগ, 'দণ্ড-সমতা' ও 'ব্যবহার সমতার' নির্দেশ দেখি তাহাতে বুঝি ব্রাহ্মণ্যবাদ রীতিমত প্রতিহত হইল। অপর পক্ষে পুরাণাদির (বিষ্ণুপুরাণের) কথা হইতেও বুঝি নন্দদের পর হইতে ক্ষত্রিয়রা আর রাজশক্তি একচ্ছত্র অধিকারে রাখিতে পারে নাই; শূদ্র শ্রেণী হইতে রাজার উদ্ভব হইল, বৌদ্ধ ও জৈনমতাবলম্বী রাজারাও বহু স্থলে রাজত্ব করিতেন। এই পর্বেরই পরে (চতুর্থ পর্বে) আসিল কণ্ব ও সুঙ্গদের ব্রাহ্মণ-রাজত্ব, অশ্বমেধ, ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রথম রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা, "Orthodox Counter-Revolution" (জয়সোয়ালের ভাষায়)। আর, এই সময়েই সম্ভবত মনুসংহিতা রচিত হয়। ব্রাহ্মণ্যশক্তির হিটলারী দাপট, 'ব্লাড থিওরি' হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর শাসক-শ্রেণীর যাবতীয় উৎকট-অধিকারের দাবী এবং শূদ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ, ঘৃণা, অবজ্ঞা—মনু মহারাজের পাতায় পাতায়। ইহাই First Code of Law of Fascism.

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে গ্রীক-বংশোদ্ভূত বাহ্লীকের যবন রাজারা, শকেরা, বিশেষত কুশান্ সম্রাট্‌রা অধিষ্ঠিত হইতেছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদ গ্রীকদের মিশ্র বর্ণ (ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত) বলিয়া বলিল, শকদের বলিল শূদ্র, ম্লেচ্ছ। আসলে এই নবাগতরা বৌদ্ধধর্ম স্বীকার করে, ব্রাহ্মণ্যশক্তি ও ব্রাহ্মণ্য শাসন-চক্র চূর্ণ করা তাহাদের প্রয়োজন, নিজেদের শাসন-চক্র প্রচলন করাও চাই। ইহাই শ্রীযুক্ত জয়সোয়ালের অভিমত। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে অন্ধ্র শাতকর্ণী বা শাতবাহন (খ্রীঃ পূঃ ২০০ হইতে খ্রীঃ ২৩০ পর্যন্ত) একদিকে এই বিদেশীদের রাষ্ট্রক্ষমতা ঠেকাইয়া রাখেন, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদকেও সুদৃঢ় আশ্রয় দেন। এমনি সময়ে (পঞ্চমপর্বে) মধ্য দেশে—হয়ত ম্লেচ্ছ রাজারই রাজত্বে—যাজ্ঞবল্ক্য (খ্রীঃ ২০০ ?) তাঁহার স্মৃতি রচনা করেন—মনুর মত উগ্রতা তাহাতে নাই। শূদ্র, স্ত্রীলোক প্রভৃতির সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ, কড়াকড়ি একটু কম। এই স্মৃতিই সম্ভবত পরবর্তী গুপ্ত রাজত্বে পশ্চিম ভারতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু গুপ্তদের পূর্বে ভারতবর্ষে আর একটা ভাঙা-গড়ার কাল গেল। ষষ্ঠপর্বে ব্রাহ্মণ্যবাদের তাই পুনর্গঠন শুরু হইল। বৈদিক কর্মকাণ্ড আর চলে না, নূতন দেবতাদের পূজা প্রচলিত হইতেছে—

ভারশিব বাকাটক রাজারা তখন মধ্যভারতে রাজত্ব করেন। নাগরাজ ভারশিব ছিল সম্ভবত দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত, কিন্তু তাহারা শৈব, ব্রাহ্মণ্য সমর্থক, —পূর্বাধিষ্ঠিত বৌদ্ধ রাজা ও বৌদ্ধধর্মের সহিত তাহাদের দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক। ভারশিবরা ক্ষত্রিয় আখ্যা পাইলেন ব্রাহ্মণদের কৃপায়। (তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন, না, ছিলেন বৈশ্য?)। 'বিন্ধ্যশক্তি' বাকাটকগণ (খ্রীঃ ২৮৪-৩৪৮) কিন্তু নিজেরাও ব্রাহ্মণ; তবু ভারশিব-কন্যাকে তাহার রাজপুত্রের বিবাহ করিতে বাধে নাই। বাকাটকরাও শৈব ছিলেন। বৈদিক যজ্ঞাদিও করেন। এদিকে আরও দক্ষিণে পল্লবরা (ব্রাহ্মণ?) কেহ শৈব, কেহ বৈষ্ণব; কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-বাদের তাঁহারাও পরিপোষক। বর্ণাশ্রম ধর্ম এই স্তরে সুদৃঢ় হইল।

এই ষষ্ঠপর্বের পুনর্গঠিত ব্রাহ্মণ্যবাদের যাহা কিছু শক্তি ও কীর্তি তাহা কিন্তু প্রকটিত হয় গুপ্ত যুগে; আর তাহাকে চিরস্থায়ী করার যাহা কিছু প্রতিক্রিয়া-মূলক ·প্রচেষ্টা তাহাও তখনি শাণিত ও সুনিশ্চিত হইয়া উঠিল। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বা সনাতন হিন্দুধর্ম তখন উদ্ভূত হইল বেদের পরিবর্তে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলিকে অবলম্বন করিয়া (বৌদ্ধ জাতকের সহিত তুলনা করিলে দেখি ইহাতে সাধারণ জীবন যাত্রার কথা নাই)। বর্ণাশ্রম ধর্ম বা জাতিভেদ প্রথা তাহার ভিত্তিরূপে নির্দিষ্ট হইল—মানুষের (নিম্ন বর্ণের, বৌদ্ধ শ্রমণের) দর্শনে, স্পর্শে পাপ; আচার-বিচারের অবধি নাই। অথচ তখনো বিধবা বিবাহের বিধানও কোনো কোনো স্মৃতিতে আছে। শূদ্র ও বৈশ্যদের প্রতিও এক-আধটুকু কৃপার দৃষ্টি আছে (সম্ভবত গুপ্তরা বৈশ্য না হইলে আরও নিম্নজাত ছিলেন)। ব্রাহ্মণ তখন "ভূদেব" হইয়াছেন; স্বভাবতই অন্যদিকে বাস্তববিমুখ ভাবনাদিতে বেদান্ত-দর্শন প্রভৃতি বিকাশ লাভ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাসুদেব-ভক্ত পরম ভাগবত সম্রাটদের যুগে বৈষ্ণব ধর্মও (মহাযান বৌদ্ধ ধর্মকে আত্মসাৎ করিবার জন্যই যেন) একটু করুণামিশ্রিত ভক্তিবাদকে সমাজে প্রচলিত করিতেছে। গীতায় "গুণকর্মবিভাগশই" ভগবান চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, (বুদ্ধদেবের অনুকরণে?) এমন কথাও স্বয়ং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন। তবু মোটামুটি ব্রাহ্মণ্যবাদের সার্বভৌম শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান গুপ্ত সম্রাটরা। তাঁহাদের পরে জন্মগত জাতি, রক্তের বিশুদ্ধিতা, বিবাহে আহারে বিধি-নিষেধ, জাতিধর্ম, ক্ষাত্র-ধর্ম (সামন্ততন্ত্র, দাস-ও-ভূমিস্বত্বের বিকাশের সহিত), রাজার ঐশ্বরিক বিভূতি প্রভৃতি ধারণা সাধারণের মনে গাঁথিয়া যায়। সমুদ্রগুপ্তের সময় হইতে উত্তরাপথ

দক্ষিণাপথের এই দিকে সাংস্কৃতিক ব্যবধানও মুছিয়া যায়—সাতবাহনদের মতই চের ও পাণ্ড্য রাজারা ('ক্ষত্রিয়' বলিয়া দাবী করিতেন) ব্রাহ্মণ্যবাদের পরিপোষক হন। পল্লবরাও (হয়ত উত্তরাপথের ব্রাহ্মণ বংশীয় তাঁহারা) ব্রাহ্মণ্যবাদকে পরিপুষ্ট করেন। শকরা, যবনরা (হোলিয়োডোরস্‌ও) ব্রাহ্মণ্যধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন—ব্রাহ্মণ্যধর্মের বুদ্ধির ও গ্রহণশক্তিরও তাহা চিহ্ন।

গুপ্তযুগের পরে একটা অন্ধকার—সেই অন্ধকারে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বজ্রবন্ধনই টিকিয়া রহিল। তাই সপ্তম পর্বে হর্ষবর্ধন যখন আসিলেন (খ্রীঃ ৬০৬-খ্রীঃ ৬৪৮) তাহার পুর্বে গৌড়ের ব্রাহ্মণ রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম উৎপাটিত করিয়া হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। হর্ষবর্ধন বৈশ্যবংশোদ্ভব, সম্ভবত শ্রেষ্ঠীরা অনেকেই তখন বৌদ্ধও। গুপ্তদের সময় হইতেই শ্রেষ্ঠী বণিকদেরও সম্পদের ও সুযোগের পথ প্রশস্ততর হইয়াছিল; বণিকশক্তির সঙ্গে ব্রাহ্মণশক্তির তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলিতেছিল (ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় করিয়া)। হর্ষবর্ধনের জয়লাভে সমসাময়িক বৈশ্যদের ও বৌদ্ধদের প্রতিপত্তি রক্ষিত হইল —বৈশ্যরা তখন হইতে বাণিজ্যই সার করে, কৃষিকর্মও শূদ্রের কর্ম হইয়া পড়ে। বৈশ্য অবশ্য তখন রাজার জাতি; তাহাদের 'শ্রেণী' বা গিল্‌ড প্রবল, সম্পদও যথেষ্ট। তাই পরবর্তী বহু দুর্যোগের মধ্যেও উত্তর ভারতে বৈশ্যরা এক সম্মানিত জাতি রহিয়া গেল। সেই দুর্যোগের মধ্যে (অষ্টম পর্বে) বাঙলায় পাল সম্রাটরা প্রকৃতিপুঞ্জের দ্বারা নির্বাচিত হইয়া 'মাৎস্যন্যায়' শেষ করেন। তাঁহারা ছিলেন সম্ভবত শূদ্র (দাসজীবিন), অন্তত (তান্ত্রিক সিদ্ধচার্য ও নাথগুরুদেব) বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিপোষক আর সামন্ত অত্যাচার ও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধী বলিয়া তাঁহারা পরিগণিত। নিশ্চয়ই শূদ্র সামান্ত ও শাসক-চক্র তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল হয়, আর বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মত বৌদ্ধ বণিকেরাও তাঁহাদের আশ্রয়ে পৃষ্ঠপোষকতায় দেশ-বিদেশে গৌড়ীয় বৌদ্ধ-সংস্কৃতির মহিমা প্রচার করেন—আর তাই সেন যুগের সময় হইতে বাঙলার অনেক প্রতিষ্ঠাবান্‌ জাতি (বৌদ্ধ? সুবর্ণবণিক, সাহা, প্রভৃতি) অনাচরণীয় হন।

কিন্তু ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদ আর একটি শাসন-চাতুর্যের উদ্ভাবনা করিয়া বসিয়াছে—যে কোন জাতির নূতন রাজশক্তিকে তাহারা কোনোরূপে একটা ক্ষত্রিয় আখ্যা দিয়া নিজেদের ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারে—সূর্যবংশ-চন্দ্রবংশের বংশ-পীঠিকায়ও প্রয়োজন মত তাঁহাদের স্থান করিয়া দেয়। বলা

বাহুল্য, এই ভাবে প্রমোশন পাইয়া প্রত্যেক নবাগত রাজবংশও ব্রাহ্মণ্যবাদের বড় পরিপোষক হইয়া দাঁড়াইবে এবং অন্য ছোট জাতিকে দৃঢ় হস্তে দমন করিবে, তাহাতে বিস্ময় নাই। তাই এখন হইতে (এই নবম পর্বে) আবার নূতন ক্ষত্রিয় বংশের সৃষ্টি হইল। গুর্জর প্রতিহাররা 'ক্ষত্রিয়', চালুক্যরা সূর্যবংশীয়, রাষ্ট্রকূটরা চন্দ্রবংশীয়, সেনরা কর্ণাটের 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়'। অবশ্য এই সব ক্ষত্রিয়দের বিবাহাদিও ভিন্ন জাতিতে হয়,—আর তাই ইহাদের পরে (দশম পর্বে) যদি হিন্দু যুগের শেষ দিকে দেখি নানা সামন্ত শাসক সকলেই 'রাজপুত' এই নামে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে (উত্তর ভারত তখন রাজপুত রাজবংশ-গুলিরই কবলিত) তাহা হইলে বুঝিব জাতিভেদ প্রয়োজন মত 'উদার হইয়া তাহার নিগড়কে দীর্ঘস্থায়ী করিয়া ফেলিয়াছে। দুইটি চতুর নীতির ফোঁড়ন এ জন্য প্রথম হইতেই ইহার দরকার হয়—'চাতুবর্ণ্যের' বাহিরের বর্ণকে 'মিশ্র জাতি' বলিয়া ব্যাখ্যার চেষ্টা, আর পরে রাজবংশ (ও তাহার স্বজন) মাত্রকেই ক্ষত্রিয়ত্বে প্রমোশন দান। মুসলমান বিজয়ের পর হইতে অবশ্য এই 'বর্ণাশ্রম ধর্ম' আত্মরক্ষার প্রয়োজনে অনেক বেশি সংকীর্ণতার ও বর্জননীতি গ্রহণ করে—এবং কতকাংশে হয়ত এই 'কমঠ ব্রতের' জন্যই ইসলামের সর্ববিজয়ী প্লাবনের মধ্যেও হিন্দুরা টিকিয়া থাকিতে পারে, ব্রাহ্মণ্যবাদের স্বপক্ষে ইহাও বলা চলে। এই সময়ের মধ্যে এক-একটি গিল্ডের[১] অন্তর্ভুক্ত বৃত্তিজীবি যুথ ক্রমে স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়—মিশ্র জাতিগুলি অনেকাংশেই এই গিল্ড-জাতি। তাই গিল্ডের বিবর্তনও এই দিক হইতে স্মরণীয়। বৈদিক যুগের পর হইতে বৃত্তি বংশগত হইতে থাকায় কারিগরদের গিল্ড বা 'শ্রেণী' গঠন সহজ ও স্বাভাবিক হইতে থাকে।' শিল্পীদেরই তাহা কারুসংস্থা। মৌর্য যুগের পূর্বেই গিল্ড বা শ্রেণী-গুলির সুস্পষ্ট অস্তিত্ব দেখা যায়। কিন্তু শ্রেণীগুলি তখনো গণ্ডীবদ্ধ হয় নাই; দুয়ার রুদ্ধ করিয়া বসে নাই, 'জাতি' হইয়া উঠে নাই। এই মৌর্যদের সময় (খ্রীঃ পূঃ ৩২১) বা তৎপূর্বেই বর্ণাশ্রমের তৃতীয় স্তরের সূচনা—ক্ষত্রিয়ের শক্তি খর্বিত, শূদ্ররা রাজা। ওদিকে 'অর্থশাস্ত্রে' দেখি তখন ব্যবসায়ী শ্রেণীগুলিও সুবিকশিত। কোনো কোনো বিষয়ে রাজা তাহাদের আত্মশাসনের সুবিধাও দিয়াছে। (কৌটিল্য শূদ্রকেও 'আর্য'—স্বাধীন নাগরিক, যে দাস নয়—পর্যায়ে গণ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মৌর্য সম্রাটদের বংশটা উচ্চ নয় বলিয়াই কি ?)

[১] প্রাচীন ভারতে 'গিল্ড্'কে বলিত শ্রেণী। এখানে বাঙলায় আমরা 'ক্লাস' অর্থে শ্রেণী শব্দ সুপ্রচলিত হওয়ায়, গিল্ড অর্থে 'শ্রেণী' (উর্ধ্ব কমার মধ্যে) প্রয়োগ করিলাম।

এক একটি কারুবৃত্তি এক একটি 'শ্রেণী' সৃষ্টি করে, এক একটি কারুবৃত্তিধারী 'শ্রেণী' নিজেদের মধ্যেই বৃত্তি ও কলাকৌশল, বিবাহ ও সামাজিক বন্ধন সীমাবদ্ধ রাখিতে থাকে—জাতি হইয়া উঠিতে চাহে। খ্রীষ্টীয় শতাব্দ আরম্ভ না হইতেই (কণ্ব ও সুঙ্গদের ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়ার সহায়ে মনু তখন শূদ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইলেন) মোটামুটি এই শ্রেণীগুলি গণ্ডীবদ্ধ হইয়া যায়—জাত্যান্তরে বিবাহ ও আহার নিষিদ্ধ হয়। গুপ্তযুগে তাহারা নিজেদের বিচার ও ব্যবস্থা সম্পর্কে অধিকতর সুবিধা উপভোগ করে (দ্রষ্টব্য *New History of Indian People*, Ed. Altekar & Majumder, p 333 ff)। করিবার কথা, কারণ গুপ্ত সম্রাটরা সম্ভবত বৈশ্য (?) ছিলেন; শ্রেষ্ঠীদের এক একটা 'শ্রেণী' তখন এক-একটা 'কর্পোরেশনের' মত হইয়া উঠিয়াছে। বহু শহরে উহাদের শাখা, উহা আবার অনেকটা 'চেম্বার অব কমার্সের'ও মত। সমৃদ্ধিও তাহাদের যথেষ্ট। মন্দির নির্মাণ, গুহা নির্মাণে তাহারা উৎসাহী। আবার কারিগরদের শ্রেণীগুলিও সমৃদ্ধ—যথা তন্তুবায়, তৈলকার, প্রস্তর ভাস্করদের শ্রেণী। মহাজনীও আছে। ক্রমে কারিগরেব 'শ্রেণী' বৃহৎ হইলে ভাগ হইয়া একটা নূতন 'শ্রেণী' সৃষ্টি করে—অর্থাৎ নূতন জাতি আরও বাড়িল (তুলর হেলে ও জেলে কৈর্বত, কলু ও তিলি)। নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যেও এই শ্রেণীগুলি সামন্ত যুগে লোপ পায় নাই—পাঠানরা চেষ্টা করিয়াও ইহাদের দমন করিতে পারে নাই। উহাই অনেকখানে 'জাতি-পঞ্চায়েৎ' এ পরিণত হয়। তথাপি ব্যবসায়ীদের গিলড্ (পঞ্চায়েৎ-শাসিত) এখনো দক্ষিণে ও উত্তর ভারতে টিকিয়া আছে।

এই বহুস্তরের নানা বিপর্যয়ের মধ্য ভারতীয় বর্ণভেদ-জাতিভেদের যে বিবর্তন ঘটে তাহাতে তাই মোটামুটি দেখা যায়:

(১) বৈদিক যুগেই ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ শাসক বর্গরূপে জনসাধারণের ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়াছে। রাজাই জমির চরম মালিক ছিল; সে সামন্ত বা মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করিত।

(২) 'বিশ' প্রথমত ছিল জনসাধারণ, পরে 'বৈশ্য' অর্থ হইল কৃষক, ব্যবসায়ী, শিল্পী। তাহারা বণিক হিসাবে যথেষ্ট সম্পদ ও মর্যাদা গুপ্তযুগে লাভ করিয়াছিল। হর্ষবর্ধনও বৈশ্যকুলসম্ভূত। তখন হইতে বৈশ্যরা ব্যবসায়ী। আর তখন হইতে এখন পর্যন্ত বৈশ্যরা উত্তরে সম্মানিত জাতি রহিয়াছে। অন্যত্র তাহারা প্রায় লুপ্ত—হয়ত বৌদ্ধ বণিক সম্প্রদায় ক্রমে শূদ্র জাতিতে নিমজ্জিত হয়।

(৩) বিশেষতঃ সাধারণ শিল্পীরা (যাহারা কায়িক পরিশ্রম করিত) তাহারা চাষী, কারিগর হিসাবে ক্রমশ 'শূদ্র' গণ্য হইল। (ক) শূদ্ররা সাধারণত ছিল অধিকারহীন,—ভূসম্পত্তি তাহারা গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু সকলে স্লেভ্ নয়, অনেকে ভাগচাষী কিংবা ক্ষেতমজুর। (খ) শিল্পী কারিগর হিসাবে অবশ্য তাহারা হইত সমস্ত গ্রাম্যের প্রতিপাল্য—গ্রামের চাহিদা জোগাইয়া যদি কিছু থাকিত তাহা শ্রেষ্ঠীরা হয়ত নগরের পণ্যরূপে গ্রহণ করিত। (গ) অধিকারহীন শূদ্রদের মধ্যেই ছিল ক্রীতদাস, ঋণদাস, এবং অন্য জাতির পতিতরা, এবং বিজিত দেশের শ্রমজীবীরা। (ঘ) শূদ্রদেরও বাহিরে ছিল ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ। মৌর্য যুগে শূদ্রদের যেটুকু প্রতিষ্ঠা ছিল মনুস্মৃতি তাহা হরণ করে। মোটামুটি শূদ্রের অর্থ হইয়া দাঁড়ায়—ভারতের অধিকারহীন দাস-তুল্য শ্রমজীবিশ্রেণী। (ঙ) পরে ইহাদের মধ্যে যাহারা একটু সুবিধা করিতে পারে, বাংলাদেশে তাহারা একটু প্রোমোশন পাইয়া সৎশূদ্র হয়, অন্যেরা অনাচরণীয় হয়, অন্ত্যজ হয়, পঞ্চম হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতীয় সমাজের উৎপাদক শ্রেণী মুখ্যতঃ এই শূদ্র ও অন্ত্যজ জাতিরাই—ইহারাই ছিল ক্ষেতমজুর, বর্গাদার, সামান্য কারিগর শিল্পী, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহারাই কৃষকও। মোটামুটি শূদ্র অর্থ দাঁড়ায় এই—দাসতুল্য, অধিকারহীন শ্রমজীবীকুল।

(৪) প্রধানত ব্রাহ্মণরাই এই শ্রেণীবিন্যাসে নিজের মহিমা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য শ্রেণীর মধ্যেও এই উচ্চ-নীচ-পর্যায় বাড়াইতে থাকে। বৃত্তি বংশগত হইয়া উঠিতে থাকিলে বৃত্তিজীবীরা কলাগত-জীবিকা নিজেদের বংশগত করিয়া রাখিবার জন্য তাহা মানিয়া লয়।—তাহাদের এইরূপ গিল্ড্ বা 'শ্রেণী'গুলিই ক্রমে নানা জাতিতে পরিণত হয়, এই বংশগত বৃত্তির সুবিধার জন্যই বিবাহ ও আহারের বিধিনিষেধ গ্রাহ্য হয়। তখন গিল্ড্ 'জাত পঞ্চায়েতের' জাতি হয়।

(৫) এই ভেদ-রেখা ধরিয়া ক্রমে টোটেম (বা গোষ্ঠীপিতা বিষয়ক) তাবু (বা ভক্ষাভক্ষ্য ও অন্যান্য নিষেধাত্মক) সম্পর্ক ও 'মেনা' (বা শুদ্ধাশুদ্ধ, পাপপুণ্য) মূলক আদিম সংস্কারগুলি নূতন করিয়া প্রভাব বিস্তার করিল। তাহার ফলে উচ্চ শ্রেণীর জাতির পক্ষে নিম্ন শ্রেণীর জাতির শুধু ভোজ্যপেয় বা পরস্পরের বৈবাহিক সম্পর্ক নয়, স্পর্শ, দর্শন পর্যন্ত অমঙ্গলসূচক হইয়া উঠিল। শুদ্ধাশুদ্ধের ধারণা ও বিচার শুধু অসম্ভব রূপ পল্লবিত হইল না, এই ভেদরেখা

অনুসরণ করিয়া তাহা অসম্ভব রকমের সুদৃঢ়ও হইল। এবং প্রত্যেকটি জাতিকে তাহারই শ্রেণীর অন্যান্য জাতি হইতেও দূর করিয়া রাখিল, শ্রেণীর মধ্যেও অসংখ্য ও অলঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া দিল। যে 'জাতি' আসলে আর্থিক মাপকাঠিতে যত নিম্ন, স্বভাবতই সে হইল অশুদ্ধ, অস্পৃশ্য। কিন্তু তাহার পক্ষে এই ধারণা মানিয়া চলাই হইল তাহার জাতি-নিয়ম, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি সংস্কারের অনুশাসন। এই ভাবে একটা আর্থিক-সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস অন্যান্য সংস্কারের দ্বারা একেবারে আচ্ছাদিত হইয়া আরও দুর্বোধ্য ও রহস্যাবৃত হইয়া পড়ে। এই রহস্যময় বিধিবিধান সমন্বিত জাতিভেদ-প্রথা সামন্ত সমাজ-ব্যবস্থাকেও একটা রহস্যময় ঐশ্বরিক মহিমাও দান করে আর ভারতীয় সামন্ত-তন্ত্রের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গও হইয়া উঠে।

তাই জাতিভেদের প্রধান যাহা উদ্দেশ্য তাহা যে অনেকাংশে সিদ্ধ না হইয়াছে তাহা নয়। আর্থিক শ্রেণীভেদকে প্রথম হইতেই ধর্মশাস্ত্রের বলে অপার্থিব বিধান বলিয়া প্রচার করা হয়। শুধু সমাজ নয়, শাসিত শ্রেণীও খণ্ড খণ্ড জাতিতে ভাগ হইয়া গেল—না রহিল জাতীয় অখণ্ডতা, না রহিল শ্রেণীগত অখণ্ডতা। ইহার ফলে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় কলানৈপুণ্য জোটে, কিন্তু মোট উৎপাদনশক্তি ক্রমেই রুদ্ধগতি-হইয়া পড়ে। অর্থাৎ নূতন যন্ত্র উদ্ভাবনা, বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ রহিল না। উৎপাদক শ্রেণীর মনে উদ্যোগের কারণ নাই। শাসক বা ধনিক শ্রেণীর লাভ ও প্রাপ্য এতই সুনিশ্চিত যে, শিল্পোদ্যোগের প্রয়োজন তাহারা বোধ করে না। গ্রীস সভ্যতাও পুরানো সভ্যতা, তাহা দাসতার ফাঁসে এইরূপে মরে; ভারতীয় সভ্যতা জাতিভেদের বন্ধন ধীরে ধীরে slow death গ্রহণ করে। এই বর্ণভেদের ও ব্রাহ্মণ্যবাদের সহায়তায় ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের পক্ষে টিকিয়া থাকিবার মত একটা স্থাণু ব্যবস্থা হইল, এবং শ্রেণী-সংঘাতও প্রতিহত করিবার মত বাস্তব উপায় শাসক শ্রেণীর হাতে আসিল। সমাজ-বিকাশ রুদ্ধ করা গেল— উৎপাদনশক্তি এইরূপে দুর্বল করিয়া। উৎপাদক শ্রেণীকে এইভাবে ধর্মের নামে, শাস্ত্রের নামে এবং বাস্তব রাষ্ট্রীয় বিধানের জোরে পোষ মানাইয়া রাখিয়া সামন্ততন্ত্রকে টিকাইয়া রাখিবার পক্ষে জাতিভেদ প্রথার মত এমন নিগড় আর কি হইতে পারে?

ভারতীয় সামন্ততন্ত্র

ভারতীয় ভূমি-ব্যবস্থা ও শিল্প উৎপাদন যেমন ভারতীয় 'বর্ণাশ্রমের' সহিত জড়িত, তেমনি সেই ভূমি-ব্যবস্থা ও 'জাতিভেদ প্রথা' মিলিয়া আবার ভারতীয় সামন্ততন্ত্রকে বিশিষ্ট রূপ ও বিশিষ্ট স্থায়িত্ব দান করিয়াছে। এই জন্যই এই ভারতীয় সামন্ততন্ত্রকে ইউরোপীয় বা অন্যান্য ফিউডাল ব্যবস্থার তুলনায় পৃথক জিনিস বলিয়া মেন্ প্রভৃতির মনে হইয়াছে। কিন্তু কয়েকটি মোটা লক্ষণের কথা সম্মুখে রাখিলে বুঝিতে কষ্ট হইবে না যে এই ভারতের সামন্ত-ব্যবস্থা কি আকারের।

প্রথমত, কৃষিই যখন প্রধান উৎপাদন-পন্থা, ভূমি-ব্যবস্থাতেই তখন সমাজের মূল জট নিহিত থাকিবে। সেই ভূমি-ব্যবস্থার দিক হইতে দেখি—সর্বোপরি রাজা আছেন ভূস্বামী; তাঁহার নীচে তাঁহার সৃষ্ট দেব-ব্রাহ্মণ হইতে নানা মধ্যস্বত্ত্ববান্‌রা আছে; এবং তলাকার দিকে আছে দখলী স্বত্ত্ববান্ কৃষক গৃহস্থ (পূর্বে এ কাজ করিত বৈশ্যরা; পরে শুধু বৈশ্য ধনিকেরাই বৈশ্য থাকে, এই কৃষকেরা শূদ্র হইয়া যায়), তাহাদের নীচে আছে বর্গাদার, নানা পর্যায়ের দাস ও অন্ত্যজ ক্ষেতমজুর। ঠিক 'ক্রীতদাস' বা 'ভূমিদাস' না হইলেও ইহাদের অনেকের অবস্থা দাসদের মতই। মুদ্রার বেতন বা মুদ্রার প্রচলন মোটেই বাড়ে নাই। কাজেই শস্যে বা বস্তুতেই বেতন দেওয়া হইত।

জন বা ট্রাইব্ ভাঙিয়া যখন বৈদিক সমাজ গঠিত হইতেছে তখনও এই স্তর-বিন্যাস (হেয়ারারকি) ছিল না, অবশ্য রাজারা তখনো ভূমিদান করিতেন; সম্পন্ন (মহাকুল, মঘবন্) সম্মানিত গোষ্ঠী তখনো ছিল। মৌর্যযুগেও সামন্তদের যথার্থ সাক্ষাৎ পাই না; বিরাট্ মৌর্যসাম্রাজ্যের শাসন রাজ-কর্মচারীদের (মহামাত্র) সহায়ে চলিত। এত বিরাট দেশে রাজশক্তি কেন্দ্রিত হইলেও অঞ্চলের আত্ম-শাসনও স্বীকৃত ছিল। সুঙ্গদের সময়ে সামন্তদের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায়। হয়ত মহামাত্রদের পূর্বাধিকার এইভাবে স্বীকার না করিয়া এই দুর্বল রাজারা পারিত না। কিন্তু ভারশিব-বাকাটক ও গুপ্তযুগে আসিতে আসিতে সামন্ততন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। সমস্ত হিন্দুযুগে উত্তরে ও দক্ষিণে সামন্ত-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে (মুসলমান যুগে তাহা আরও নূতন ও সুদৃঢ় হয়)।

এই বিভিন্ন স্তরের সামন্তদের স্তরবিভাগ সুপরিচ্ছন্ন না হইলেও

কৌতূহলোদ্দীপক। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত পুরালিপি হইতে তাহা উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। যথা : (১) উপরে মহারাজাধিরাজ, পরে একে একে (২) মহাসামন্ত, মহাসামন্তাধিপতি, মহামাণ্ডলিক, (৩) সামন্ত মাণ্ডলিক, মণ্ডলেশ্বর ইত্যাদি, (৪) ভুক্তিপতি, ভোগপতি, ভুগিক ইত্যাদি, (৫) বিষয়পতি, গ্রামপতি, (৬) ষষ্ঠাধিকৃত (রাজস্বের এক ষষ্ঠের অধিকারী,) (৭) ভোজক (সম্ভবত গ্রামের অধিকারী), (৮) কুটুম্বি, ক্ষেত্রকার, কর্তৃক, ইত্যাদি (কৃষক, ক্ষেতকার) (৯) পরের ভূমিতে কর্ষণ করিয়া শস্যের একাংশ পায় (ভাগচাষী, বর্গাদার) ও (১০) যাহারা একেবারেই ক্ষেতমজুর (তাহারা সম্ভবত এই 'কর্ষক' নামেই পরিচিত হইত, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ইহাই অনুমান)।

এই নামগুলি রাজকর্মচারীদের উপাধি নয়। বরং সামন্তরাই নিজ নিজ এলাকায় শাসন-বিচারেরও অধিকারী। রাজকর্মচারীরাও যেমন সামন্ত অধিকার লাভ করিত, সামন্তরাও তেমন রাজকর্মচারী হইত, ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। দ্বিতীয়ত, ভূমিস্বত্বের দিক হইতে নিবি-ধর্ম (ফিউডাল ফিয়েফ্, মুসলমান আমলের জায়গীরের সমতুল্য), পরিহার (ইমিউনিটি), ভূমিছিদ্র, দান (ফিউডাল 'বেনিফিস্'এর সমতুল্য) প্রভৃতি ব্যবস্থা সামন্ততন্ত্রের সুপরিচিত ব্যবস্থা, তাহা দেখিয়াছি। ইহার সহিত পরবর্তী কালের 'নিষ্কর', 'চাকরান্' প্রভৃতির কথা স্মরণীয়—প্রভু গোষ্ঠীর পূজা-যাজন, এবং দেবী-প্রতিমা, হাড়িকুড়ি ক্ষৌরকর্ম বস্ত্র ধোলাই প্রভৃতির প্রয়োজন মিটাইবার শর্তে ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মোত্র), ও কুম্ভকার, নাপিত, ধোপা প্রভৃতি নানা শিল্পীরা, এমন কি ভৃত্যরা পর্যন্ত, এইরূপ নিষ্কর ভূমি লাভ করিত। ইহা ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের অনুরূপ ব্যবস্থা। তবে ভারতে এই ব্যবস্থা মুসলমান আমলেই এতটা বিকাশ লাভ করিয়া থাকিবে। শেষ কথা : ভাবাদর্শের দিক হইতে ক্ষাত্রধর্মের যে আদর্শ ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়—রাজপুতদের কেন, মুসলমানদের মধ্যেও দেখি—তাহা ইউরোপীয় নাইট্‌স্‌দের আদর্শের অপেক্ষাও অনেকাংশে উচ্চতর।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্র অবশ্য যোদ্ধৃশ্রেণীর (ক্ষত্রিয়দের) সৃষ্ট নয়; ভারতের সামাজিক অবস্থা হইতে তাহা উদ্ভূত হয়। এই ব্যবস্থার মধ্যে যাহা স্মরণীয় তাহা এই : 'চাকরানা' বা ইউরোপীয় ধরণের মেনোরিয়েল প্রথা এখানকার বৈশিষ্ট্য নয়; বরং এখানকার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, শিল্পী কারিগররা গ্রামের প্রয়োজন জোগাইত, গ্রামই তাহাদের পোষণ করিত। একমাত্র শহরে বন্দরে

হয়ত রাজশিল্পীরা রাজা বা সামন্তর ভৃত্য ছিল—কেহ একটু সম্মানিত, কিন্তু অধিকাংশেই গণণাযোগ্য নয়।

সাধারণভাবে শিল্পীরাই শিল্পকর্মের ও জীবিকার উপযোগী নিজেদের যন্ত্রপাতির অধিকারী ছিলেন, এবং কৃষকেরা নিজেদের লাঙল গোরু প্রভৃতি দ্বারা জমি চাষ করিতেন। ইহাই এদেশের ফিউডাল 'সার্ফে'র' অবস্থা—'ভূমিদাস' বলিলেও আসলে ইহারা জমি ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিত। কারণ, সামন্ত প্রথার মূল কথা হইল এই—উৎপাদকের (কৃষক বা কারিগর যাহাকেই ধরি) সহিত তাহার উর্ব্বতন অধিকারীর বা মালিকের সম্পর্ক; কি কি সামাজিক আর্থিক সত্যের উপর এই পারস্পরিক আদান প্রদানের সম্পর্ক স্থাপিত তাহাই আসল কথা।[১]

বলা বাহুল্য, সাধারণ কৃষক বা কারিগরের অবস্থাটা ইহাতে স্লেভ্ বা দাসের মতও নয়, আবার নির্বিত্ত বন্ধনমুক্ত প্রোলিটেরিয়েটের মতও নয়। কতটা শাসক-শক্তি কোন্ শ্রেণীর—যোদ্ধৃ শ্রেণীর অস্ত্র, না পুরোহিত রাজাদের, না কোনো চিরাগত প্রথা ও বিধি-বিধান সেই শক্তির উৎস,—এই কথা গুরুতর হইলেও গৌণ, আসল কথা উৎপাদনের অবস্থা। এই বিচারে দেখিব যে, ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের কাঠামো ক্ষাত্রশক্তি জোগায় নাই, ব্রাহ্মণশক্তি জোগাইয়াছে,—তাহাদের বর্ণাশ্রমের বাস্তব মতাদর্শ ও ব্যবস্থা দ্বারা। উহার মেরুদণ্ড স্তরবিভক্ত ভূমি-ব্যবস্থা বটে, কিন্তু এই মেরুদণ্ড 'ক্ষুদ্র কৃষক (ও কারিগর) ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী'র আর্থিক নীতি; এবং উহার ভিত্তিভূমি ভারতের চিরদিনকার বিচ্ছিন্ন স্বয়ং-নির্ভর পল্লীসমাজ, উহার কৃষি ও কৃষিশিল্প।'

সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে এই ভারতীয় পল্লী-সমাজের পরিবর্তন কতটা

[১] "The emphasis...will lie · ···in the relation between tha direct producer (whether he be artisan in some workshop or peasant clutivator on the land) and his immediate superior or overlord and in the socio-economic contents of the obligation which connects them." (Maurice Dobb, *Studies in the Development of Capitalism*).

"The direct producer is here (i.e. in Feudalism) in possession of his means of production, of the material labour conditions required for the realization of his labour and the production of his means of subsistence. He carries on his agriculture and the rural house industries with it as an independent producer; at the sametime, the property relation must assert itself as a direct relation between rulers & servants that the direct producer is not free." (ঐ গ্রন্থে Capital, III হইতে উদ্ধৃত)।

হইয়াছে? এই কথা সত্য, ভূমি কোনো দিন গ্রাম্য-সমাজের সাধারণ সম্পত্তি ছিল না। উহা ছিল পরিবারগত সম্পত্তি; পরে গ্রামপতিরও উদ্দেশ মিলে। পল্লীর স্বায়ত্ত শাসন-ক্ষমতাও অনেকাংশেই ক্রমশ বিনষ্ট হইয়া যায়। বেদের গ্রাম্য-সভার কথা মৌর্য যুগেই আর শুনি না; অবশ্য শহরের শ্রেণী বা করপোরেশন তখন প্রভাবশালী। গুপ্তযুগে আসিতে আসিতে দেখি, 'নগর শ্রেষ্ঠী', 'প্রথম সার্থবহ' (বণিক গিল্‌ডের নায়ক). 'প্রথম কুলিক' (শিল্পী গিল্‌ডের নেতা), 'প্রথম কায়স্থ' (লেখ্যকারদের নেতা) প্রভৃতি লইয়া নগরের 'নিগম-সভা' চলে। গ্রামে ভূমির ক্রয়-বিক্রয়ে দানে 'গ্রামকূট', 'মহামাত্র' (মাতব্বর), 'গ্রামিক' (প্রধান) 'কুটিম্বী'দের (গৃহস্থ কৃষকদের মতামত ও উপস্থিতি প্রয়োজন; —প্রত্যেক গ্রামের জীবন অনেকটা স্ব-নির্ভর। উত্তরে ও দক্ষিণাপথে (বাংলায়ও) গ্রাম্য-সভা বা গ্রাম্য-সমিতির এইটুকু ক্ষমতা অনেকদিন স্বীকৃত ছিল, অবশ্য গ্রাম্য ও নগর সভায় অবস্থাপন্নরাই আসন লাভ করিত,—'নির্বাচিত' হইত না। কিন্তু মুসলমান বিজেতারা এই ক্ষমতা আর স্বীকার করেন নাই। তাহার পর হইতে গ্রাম্যসভা নয়, 'জাত পঞ্চায়েত'ই প্রবল হয়। তখনও কিন্তু তাই বলিয়া গ্রাম্য অর্থনীতির বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় নাই,—বাহিরের বাজারে যায় বিলাসপণ্য, এবং কৃষক, পল্লীর শিল্পী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী গ্রামে পরস্পরের প্রয়োজন মিটায়। যানবাহন নাই, মুদ্রার প্রচলন সামান্য, গ্রামের উপজ তাই গ্রামেই রহে। তাই ক্ষুদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর এই আর্থিক শক্তি লইয়া আত্মসন্তুষ্ট গ্রাম্য-সমাজ মোটামুটি শত পরিবর্তনের মধ্যে একই অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের এই স্বরূপ বুঝিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না—কেন এত সুদীর্ঘকাল ইহা স্থায়ী হইতে পারিল। পুনরুক্তি হইলেও তাহা আর একবার স্মরণীয়: প্রথমত, স্বাভাবিক কারণ ছিল (ক) নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে ভারতবাসীর জীবনমান সরল ছিল; (খ) উর্বর ভূমির জন্য কৃষি-সমাজের জীবনযুদ্ধ সহজ হইয়াছিল; (গ) বিরাট দেশের তুলনায় সেদিনে জন-সংখ্যা ছিল অল্প; দ্বন্দ্ব বাধিলে নূতন গ্রাম স্থাপনেও বাধা হয় নাই। দ্বিতীয়ত ভারতীয় সমাজে শ্রেণীভেদ বর্ণভেদ ও জাতিভেদে পরিণত হইয়া শোষিত শ্রেণীকে বিভক্ত ও উদ্যোগহীন করিয়া রাখিতে পারে। তৃতীয়ত, ভারতের এই চিরাগত ভাবাদর্শ, ধর্ম, দর্শন, এমন কি সাহিত্য, শিল্পনীতি সামাজিক বা সাংস্কৃতিক উদ্যোগ-আয়োজন জাতির দিকে বিশেষতাড়না দেয় নাই। চতুর্থত, 'কর্মফলের' ধারণা

ও 'অধিকার-ভেদের' ধারণা প্রায় অবিসংবাদিত সত্যরূপে গ্রাহ্য হওয়ায় মানুষ যে-কোন দু:খ দৈন্যকে মানিয়া লওয়াই শ্রেয় বলিয়া বুঝিয়াছে। আর শেষ কারণ, এইসব বাস্তব ও মানসিক কারণে এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে **উৎপাদন-শক্তি এত বৃদ্ধি পায় নাই যে সমাজ-বিপ্লব অনিবার্য হইয়া পড়ে।** নতুন গ্রাম গঠন করিয়া কিংবা ব্রাহ্মণের সুচতুর শম-দম-দণ্ড-ভেদ নীতি, শ্রেণীদ্বন্দ্ব চাপা দিবার অদ্ভুত কৌশল প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিয়া উৎপাদনশক্তি ফাটিয়া বাহির হইবে কৃষিব্যবস্থার বা শিল্পব্যবস্থার **এমন কোনো উপকরণগত পরিবর্তন হয় নাই**—সেই পুরানো সামান্য লাঙল-গরু রহিল সম্বল, সেই পুরানো চাকা কুমারের সর্বস্ব, সেই হাতুড়ীই কামারের উপায়—এবং বন্দরের বণিক, সমৃদ্ধ বণিক শ্রেণী, উপনিবেশের বহির্বাণিজ্য ও আন্তর্বাণিজ্য সত্ত্বেও শিল্পোৎপাদনে অগ্রসর হয় নাই, কারখানা বসায় নাই, (হয়ত দাদন দিয়া) শিল্পীদের পণ্যজাত লইয়া ক্রয়-বিক্রয় করিয়াছে মাত্র, ব্যবসা ও সাউকারী করিয়াছে, শিল্পোদ্যোগে হাত দেয় নাই। মুদ্রাযুগ প্রায় আসে নাই, যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা সামান্য, পল্লী-প্রধান সমাজ নিশ্চল রহিয়াছে।

শ্রেণী-সংঘাতের সাক্ষ্য

ইহা দেখিয়া কি বলা যাইতে পারে, ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা শ্রেণীবিরোধের মীমাংসা করিয়াছিল ('জাতিভেদের' ও 'কর্মফলের' ব্যবস্থা দ্বারা ?) ? উল্টাইয়া কেহ বা বলিবেন—শ্রেণীবিরোধই যে ইতিহাসের মূল সূত্র ভারতের ইতিহাসে তাহার প্রমাণ নাই। প্রমাণ অবশ্য উপরেই রহিয়াছে—কোনো একটা বিরোধকে দমন বা প্রশমন করিতে পারিলে অবশ্য সেই বিরোধের অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না, অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়। ইহাও সত্য বটে, ভারতবর্ষের ইতিহাসেব স্পষ্ট প্রমাণপত্র এত কম যে, উহাতে শ্রেণীদ্বন্দ্বের কথা না পাইলে মোটেই বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু বিস্ময়ের কারণ এই যে, যত ভাবেই শ্রেণীদ্বন্দ্ব চাপা দেওয়া হউক, তাহার সংবাদ তবু এক আধটুকু খুঁজিয়া পাওয়া যায় (দ্রষ্টব্য রাহুল সাংকৃত্যায়ন, মানব সমাজ, ৫ম অধ্যায় ও ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত *Studies in Indian Social Polity*, Class Struggle in Ancient India, p 9 pf)। আমরা দেখিয়াছি বৈদিক যুগেই ক্ষত্রিয় ও যাজক শ্রেণী অন্তদের ক্ষমতা কাড়িয়া নিজেদের শক্তিশালী করিতে থাকে। কিন্তু মল্ল লিচ্ছবী

শাক্য প্রভৃতি অভিজাততন্ত্র তবু রাজা বা ব্রাহ্মণকে বিশেষ প্রতিষ্ঠা দেয় নাই, যৌধেয় মালব প্রভৃতি গণতন্ত্র অনেকদিন টিকিয়াছিল। এদিকে বৈদিক যুগ শেষ না হইতেই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ এই শাসক শ্রেণীর অন্তর্বিরোধ আরম্ভ হইয়াছিল। বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ক্ষত্রিয় কুমাররা যে নতুন ধর্ম প্রবর্তন করিলেন, তাহা কোন্ সামাজিক আর্থিক তাড়নায়? অবশ্য অনেকাংশে তাহা সেই শ্রেণীদ্বন্দ্বের একটা আপোষ মীমাংসা। প্রাচীন ও মধ্য যুগের যে-কোনো সামাজিক দ্বন্দ্বই যে ধর্মের দ্বন্দ্ব বা দেবতার দ্বন্দ্বরূপে স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশিত হয় তাহা তো জানা কথা। ইহাই মুসলমান আমলের ধর্ম প্রবর্তকদের ও সংস্কারকদেরও সম্বন্ধে সত্য। নন্দদের পর হইতে ক্ষত্রিয় রাজাদের পরিবর্তে শূদ্র রাজাদের অভ্যুত্থান ঘটিল কি করিয়া—যদি সেই বিশেষ রাজবংশ ও তার অনুচরগণ বর্ণাশ্রমের নিয়মে উচ্চবর্ণের সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিত? আর কোন্ সূত্রে আসিল সুঙ্গ কণ্বদের ব্রাহ্মণ রাজত্ব, ব্রাহ্মণ প্রতিক্রিয়া? কিংবা পরবর্তী কালের নিম্নজাতীয় সম্রাটদের অভ্যুদয়? গুপ্তদের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ছায়ায় বণিক ও শিল্পী জাতীয় শ্রেণীর সমৃদ্ধিই কি অর্থহীন? (অন্ত্যজের 'দেবী' মনসার পূজা প্রচলিত হইবে চাঁদবেণের পূজায়—ব্রাহ্মণের নয়, ক্ষত্রিয়ের নয়, একজন বণিক নেতার? একি পাল রাজত্বের বাঙালী সমাজে বণিক প্রতিপত্তির স্মৃতিচিহ্ন?)। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের আপেক্ষিক উদারতা ও শান্তির প্রয়াসকে অবলম্বন করিয়া যে শ্রেষ্ঠী বণিকেরা প্রথম অবধিই আপনাদের ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তার করিতে চাহিয়াছে, সমাজের নিম্নশ্রেণীরা আপনাদের দুর্ভাগ্যের বোঝা লাঘব করিতে চাহিয়াছে, তাহারও আভাস যথেষ্ট আছে। বৌদ্ধধর্মের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব শ্রেণীর ভারতীয় বর্ণাশ্রমের মধ্যে শূদ্র শ্রেণীতে স্থান হইল, তাহারও প্রমাণ মিলে। অবশ্য এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের সব চেয়ে ভালো প্রমাণ এই যে, নানা অশ্রুতনামা গোষ্ঠী রাজশক্তিতে পরিণত হইলেই 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া গণ্য হয়, তাহাদের স্বজনগণও সম্ভবত সেই মর্যাদা লাভ করিত। কিন্তু এই সুযোগ লাভে তাহারাই আবার শোষিত ও বঞ্চিত শ্রেণীকে বর্জন করে। শ্রেণীদ্বন্দ্বের ইহাতে সমাধান হয় না; হয় কোনো নিম্নশ্রেণীর রাজগোষ্ঠির উন্নতি; সমগ্রভাবে শ্রেণীবিদ্রোহে একটা সাময়িক ব্যর্থতা আসে।

এই কথা নিশ্চয়ই সত্য যে, এই দীর্ঘকালে সমাজবিপ্লব সাধিত হয় নাই। তাহার কারণ আমরা পূর্বেই বুঝিয়াছি, উৎপানশক্তির তত বিকাশ ঘটে নাই। শুধু বিলাস-পণ্যের বাণিজ্য-সূত্রে পল্লী-প্রধান সমাজ পরিবর্তিত হয় না।

এমন কি, মুদ্রা বিনিময় ও টেক্‌নোলোজিক্যাল উন্নতি যথেষ্ট না হইলে 'বণিকপুঁজি'ও প্রভাবশালী হয় না। আর নির্বিত্ত বা প্রোলিটেরিয়ানের (ভূমিহীন শ্রমসর্বস্ব শ্রমিকের) সৃষ্টি না হইলে আসলে বণিকতন্ত্রও ধনিকতন্ত্রে উন্নীত হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রেণীদ্বন্দ্ব ঘটে না তাহা নয়,—শ্রেণীবিরোধ, শ্রেণীবিদ্রোহ এই সামন্ততন্ত্রের মধ্যে প্রাচীন ভারতে ও মধ্যযুগের ভারতেও নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই শ্রেণীসংঘাতের ছাপ তাই রাষ্ট্রে সমাজে কেন সাহিত্যে দর্শনেও লাভ করা যায়—তবে লাভ করা যায় অনেক খুঁটিয়া খুঁটিয়া বিচার করিলে।

মুসলমান বিজয়

মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যযুগের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হইল। প্রথমপর্ব জুড়িয়া ছিল হিন্দু-সংস্কৃতি—তাহা অবশ্য শেষ হইল না; আসিল দ্বিতীয় পর্ব—এক নূতন শক্তি।

মনে রাখিবার মত কথা এই যে, এই দুই পর্বের মধ্যে জীবনযাত্রার দিক হইতে মৌলিক তফাৎ সামান্য। দুইই একটি প্রধান যুগের রূপভেদ মাত্র, জীবিকা ও জীবিকার উপাদান প্রায় সম্পূর্ণ একই রহিয়াছে; তাহা সেই কৃষি যুগের পরিচিত বস্তু-সম্ভার। উহাতে যাহা কিছু তফাৎ দেখা যাইবে তাহা সামান্য। কতকাংশে তাহা এখানকার কৃষি-সমাজের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ফল, কতকাংশে তাহা নবাগত তুর্ক তাজিক ঈরানী মুঘল প্রভৃতি জাতিদের বিষয় সম্পত্তি বিষয়ক নিজস্ব নিয়মকানুন ও ধারণা, কতকাংশে বা তাহাদেরই গৃহীত মুসলমান ধর্মের ব্যক্তিগত ও সম্পত্তিগত আইন কানুন, ক্রিয়া কলাপ, আচার পদ্ধতি—তাহাও আবার অধিকাংশই আরবীয়, খানিকটা ঈরানী। কিন্তু জীবনযাত্রার বাস্তবভিত্তি তখন পরিবর্তিত হয় নাই—এইটুকু ভুলিবার নয়। পরবর্তীকালে যে সামন্ততন্ত্র সমস্ত মুসলমান আমলের প্রধান লক্ষণ লইয়া রহিল, তাহার সাক্ষাৎ গুপ্তযুগেই পাওয়া যায়। হর্ষবর্ধনের পর হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগের যে সূচনা হয়—তাহাতে ক্রমে রাজপুত জাতির রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থায় এইরূপ সামন্ততন্ত্র প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল।

তুর্ক বিজয়ের সঙ্গে দিল্লীর মুসলমান সুলতানেরা স্বভাবতই তুর্ক ও ঈরানী আফগান সেনাপতি ও প্রাদেশিক কর্তাদের বড় বড় জায়গীর দিয়া এক নূতন

ধরনের সামন্ততন্ত্রের পত্তন করিয়াছিলেন। অবশ্য পুরাতন হিন্দু রাজারাও অনেক ক্ষেত্রে বশ্যতা স্বীকার করিয়া সামন্তপদে অধিষ্ঠিত থাকিত, অনেক ক্ষেত্রে মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিয়া শাসক শ্রেণীতে নিজেদের স্থান সুদৃঢ় করিত। তথাপি রাজ্যের প্রধান সামন্ত, পাত্রমিত্র, সেনাপতি প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই যে তুর্ক কিংবা আফগান জাতীয় ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। এই নূতন সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিভেদ বা পুরাতন হিন্দু শ্রেণী-ভেদের মূল ভিত্তিই ধ্বসিয়া গেল। মুসলমান সম্রাটদের শাসনকালে ভারতে সামন্ততন্ত্রের অবসান হইল না, ভারতীয় সামন্ততন্ত্রে একটা নূতন পর্বের সূচনা হইল। তুর্ক তাজিক প্রভৃতি জাতিরা ভারতবর্ষের বাহির হইতে যে সামন্তপদ্ধতি বহিয়া আনিল তাহা সুপরিচিত সামন্ত-প্রথার অনুরূপ, বরং সামন্ততন্ত্রের আরও প্রবল ও আরও সুদৃঢ় রূপমাত্র। ইহারই জন্য এই বিপুল দেশে দিল্লীর সুলতানদের একটু মাত্র কড়া দৃষ্টির অভাব ঘটিলে তাঁহাদের এই সামন্তরা বিদ্রোহী হইত, নিজেদের স্বতন্ত্র রাজ্যে নিজেরা স্বাধীন হইয়া বসিত। আলাউদ্দীন খিলিজী (১২৯৪—১৩১৬) অবশ্য জায়গীরের পরিবর্তে সেনাপতি ও শাসনকর্তাদের বেতন দিবার প্রথা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বেশি দিন কার্যকরী হয় নাই। বলা বাহুল্য, আলাউদ্দীন হিন্দু ধনিকবণিক কাহাকেও নিস্তার দিবার কথা নয়, দেনও নাই। নিশ্চয়ই মুসলমান ধর্মের অনুশাসন ছিল তাঁহার প্রধান যুক্তি এবং তুর্কদের ধর্মান্ধতার অপেক্ষাও তাহা ক্রুর নিষ্ঠুর প্রবল ছিল—কিন্তু যুক্তিটা আসলে শোষণ মাত্র। তখন জমির নতুন করিয়া মাপজোক হয়, রাজার পাওনা হিন্দু আমলে ছিল সাধারণত একষষ্ঠাংশ, এখন আলাউদ্দীন আদায় করিলেন অর্ধাংশ। "কাহারও ঘরে সোনা রূপা বহিল না ··কোনো জিনিসই উদ্বৃত্ত দেখা যায় না।" ইহাতেই বিদ্রোহের মূল কারণ নাকি দূর হয়। অবশ্য খাজনা আদায়ের জন্য তুরুক ঠোকা, কারাদণ্ড হইতে শৃঙ্খলবন্ধন, কিছুই আলাউদ্দীন বাদ দিতেন না—অল বরনী তাহাও জানাইয়াছেন।

আলাউদ্দীন শীরীর (তৎকালীন শহর) নির্মাতা, নূতন সৌধ-হর্ম্যও নির্মাণ করেন। তাঁহার সভাতেই কবি ছিলেন প্রসিদ্ধ আমীর খসরু (যদিও খসরুর হিন্দী পদ হয়ত তাঁহার রচনা নয়, কিংবা কালে কালে অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে)। এই ঐশ্বর্য ও সংস্কৃতি অনুরাগের সহিত দেশের জনসাধারণের সম্পর্ক থাকার কথা নয়—উহা এক সামন্ত সম্রাটের কঠিন দর্প ও দুর্ধর্ষ

স্বেচ্ছাচারিতারই সাক্ষ্য বহন করে। এই কথা সত্য যে, এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যাহারা করিত তাহারাও সামন্তশ্রেণীরই প্রধান, তাহাদের সেই বিদ্রোহের শক্তি জোগাইত সাধারণ মানুষের ধূমায়িত অসন্তোষ। মহম্মদ তোগলকের (১৩২৫-১৩৪৭) সময়েই দিল্লীর এই সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়ে (আনুমানিক ১৩৪৯) ;—বাঙলায়, গুজরাটে (পাঠান শিল্প ও স্থাপত্যের বহু কীর্তিই এই সব স্বতন্ত্র রাজ্যের রাজাদের), সিন্ধুতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। দক্ষিণে বিজয়নগরের হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত (১৩৩৬-১৬৪৬) হয়, কুলবর্গায় বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (১৩৪৬-১৪৭৪ ও ১৬৭৩) করে হাসান গঙ্গু বাহমনী। অল বররনী বলেন "জনসাধারণও বিদ্রোহ করিতে ক্ষান্ত হন নাই, সুলতানও তাহাদের শাস্তি দিতে ক্ষান্ত হন নাই।" হয়ত ইহার মধ্য দিয়াই পুরাতন জমিদার প্রথা পুনঃপ্রবর্তিত হইতেছিল। অন্তত ফিরোজশাহ তোগলোক (১৩৫১-১৩৭১) জায়গীরদারী প্রথাই পুনঃ প্রবর্তন করেন। তুর্ক-পাঠানের রাজত্বশেষে মুঘলরা (১৫২৬ হইতে) রাজা হইয়া বসিলেও এই জায়গীরদারী পদ্ধতি অব্যাহত চলে। (ইহারই মধ্যে অশোকের কাল হইতে পূর্বাপর আমরা যাহা জানি তাহাই দেখি শের সাহের (১৫৪০-১৫৪৫) সময়ে আরও সুনিশ্চিত রূপে)। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র বিরাট দেশের পথঘাট নির্মাণ করে, কূপ খনন করে, সরাই স্থাপন করে, কৃষকের সেচের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে স্বেচ্ছাচারী শাসকদেরও মুখাপেক্ষী করিয়া রাখে—বলা বাহুল্য এই পালন-মূলক মূল কাজ সাধারণ গ্রাম্যসমাজের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নয়। ক্ষুদ্র সামন্তের পক্ষেও কূপ ও পুষ্করিণী খনন মাত্র সম্ভব,— এই কৃষি সমাজের পক্ষে এই দুর্ধর্ষ এবং শোষণধর্মী কেন্দ্রিত রাজ্যগুলিও ছিল তাই বাঞ্ছনীয়। এইখানেই ছিল সাধারণভাবে তাহাদের সার্থকতা। কদাচিৎ যদি অশোক, শেরশাহ, আকবরের মত মহৎ রাজা এই রাজ্যের নিয়ন্তা হন, তখন প্রজাসাধারণের পক্ষে তাহা একটা অভাবনীয় সৌভাগ্য—আসলে তাহা প্রায় নিয়মের ব্যতিক্রম (কি হিন্দু, কি মুসলমান যুগে, কিংবা কি বিজয়নগর সাম্রাজ্যে, কি বাহমনী সাম্রাজ্যে প্রজারা শোষণের পেষণ হইতে নিশ্বাস ফেলিবারও অবকাশ পাইত কদাচিৎ)

ভারতবর্ষে এই সামন্তপ্রথার অবসান আরম্ভ হয় সম্রাট আকবরের আমলে (১৫৫৫-১৬০৫) টোডরমল্লের নূতন জরিপ ও বন্দোবস্তে। আকবর এক কেন্দ্রিত ও সংগঠিত সাম্রাজ্য গঠন করিতে সক্ষম হন। জায়গীরদারী প্রথা তিনি বাতিল করিয়া সেনাপতিদের (মনসবদার) ও শাসনকর্তাদের (সিপাহিসালার)

বেতন দিতে লাগিলেন। তাহাদের পক্ষে শর্তমত সৈন্য সরবরাহ করা অনেক ক্ষেত্রে আর প্রয়োজন হইল না—সৈন্যবাহিনী সরাসরি রাষ্ট্রের হাতে আসিল। রাজস্ব যাহারা আদায় করিত তাহারাও জায়গীর হিসাবে উহা রাখিতে পারিত না; আদায় উশুলের ভারই মাত্র তাহাদের উপর ছিল, জমির মালিকানা নয়, কোনো স্বত্ব নয়। কৃষকের সঙ্গে ব্যবস্থা হইত রাজার—আধুনিক রায়তোয়ারী প্রথার মত। আকবর ফসলের একতৃতীয়াংশ আদায় করিতেন—মুদ্রায় আদায়ও চলিত। কিন্তু স্মরণীয় এই যে, এই ভূমিব্যবস্থা যথার্থভাবে বাঙলায় তখনো প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই। আসলে বাঙলাদেশের ভূমিব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটান মুর্শিদ কুলি খাঁ—বাঙলার পুরাতন জমিদার বংশগুলি (নাটোর, দীঘাপতিয়া, মুক্তাগাছা, প্রভৃতি) তখনকার নবাবী আমলা ও প্রধানদের এই রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ হইতে উদ্ভূত হয়। ইহা রায়তোয়ারী ব্যবস্থা নয়, বরং অনেকটা জমিদারী ব্যবস্থার প্রথম সংস্করণ (দ্রষ্টব্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত *History of Bengal*, Vol. II)।

কিন্তু তৎপুর্বেই পাশ্চাত্য দেশে বিরাট উদ্যোগ দেখা দিয়াছে। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিকেরা ভারতবর্ষে আসন স্থাপন করিতেছে, ইংরেজ ফরাসির অভ্যুদয়ের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইতেছে। ইহার মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ সামন্ত যুগের জীবনে একটা নূতন স্রোত আসিয়া লাগিয়াছিল সন্দেহ নাই। প্রথমত, ভারতবর্ষের বাণিজ্য এইবার সত্য সত্যই সিংহল, মালয়, লঙ্কা ও ইরাণের উপকূল ছাড়াইয়া বিশাল পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল—শোড়া, সুতা, বিশেষত বস্ত্রশিল্পের প্রকাণ্ড চাহিদা এই প্রথম দেশের উৎপাদক শ্রেণীর পক্ষে গোচর হইবার কথা। এতদিন পর্যন্ত শত সত্বেও উৎপাদনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় প্রয়োজন মিটানো, বড় জোর সম্ভ্রান্ত আমীর-ওম্‌রাহ, বাদশা-বেগমের জন্য বিলাসোপকরণ তৈয়ারী করা (ফিরোজ শাহ হাজার কুড়ি ক্রীতদাস কিনিয়া নানা শিল্পকর্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন প্রধানত হয়ত রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন মিটাইতে)। কিন্তু এই বিদেশী বণিকদের বাণিজ্য-প্রসারে পণ্যউৎপাদন—'বাজারের জন্য' উৎপাদনও—আরম্ভ হয়, (বেশি হইত দাদনে)। ইহাদের কুঠিতে ফ্যাক্টরির অনুরূপ উৎপাদন পদ্ধতিও গৃহীত হয়। মজুর খাটাইয়া কারখানা চলিত, তাহার প্রমাণ আছে। দ্বিতীয়ত, প্রতি বৎসর বহুলক্ষ টাকার সোনা ও রূপা বিদেশ হইতে এই পণ্য ক্রয়ের জন্য ভারতবর্ষে আসে,—তাহার একটা বৃহৎ অংশই হয়ত অলঙ্কারে পরিণত হইত।

কিন্তু মুদ্রা-চালিত বিনিময়ের (মানি ইকোনমির) যে সূত্রপাত হয় তাহাও স্বীকার্য (দ্রষ্টব্য *History of Bengal,* ঐ)। অর্থাৎ বিদেশের বণিকপুঁজি ক্রমেই সামন্ততন্ত্রের অভ্যন্তরে পরিবর্তনের শক্তিসঞ্চার করিতেছিল।

মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইহাই অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ—উহার প্রথম পর্বেও যেমন, দ্বিতীয় পর্বেও তেমনি সামন্ততন্ত্র প্রবল ছিল। ভারতীয় জীবনযাত্রায় সামন্ততন্ত্রের ভিতরকার অসামঞ্জস্য ইংরেজ অভ্যুদয়ের পূর্বে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে নাই। জীবনযাত্রার বাস্তব ভিত্তি তখনো সুদৃঢ় ও বিস্তৃত; ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ জীবিকা-পদ্ধতিতে তখনো উহার প্রসারের ক্ষেত্র রহিয়াছে। যেমন করিয়া শক, হূন প্রভৃতি পূর্ব পূর্ব জাতিরা বাহির হইতে আসিয়াছিল, তেমনি করিয়া প্রায় সেই মধ্য এশিয়ার উষর প্রান্তর হইতেই তাহাদের বংশধরগণ তুর্ক, পাঠান, মুঘল এবারও আসিল, আর ভারতবর্ষে তাহারাও স্থান করিয়া লইল। অষ্টাদশ শতকে তাহার ভাঙন দেখা যায়।

ভারতবর্ষের দিক হইতে দেখিলে পরাজয়টা নূতন নয়, শুধু তাহার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতারও ফল নয়, তাহার জীবিকাবলম্বনের ত্রুটি মাত্র নয়। তখন পর্যন্ত পৃথিবীতে কৃষির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবিকা-উপায় মানুষের জানা ছিল না—ক্নুসুস্, টায়ার, সিডোন প্রভৃতির বাণিজ্যপুষ্ট প্রাচীন সভ্যতাকে অবহেলা না করিয়াও ইহা বলা যায়। সেই কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের জীবনে তখনো প্রসারের ক্ষেত্র ছিল—তাহারও দেশবিদেশে বাণিজ্য বাড়িতেছিল; ভরকুচ্ছ, তাম্রলিপ্ত ও চোলমণ্ডলের বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি উহারই পরিপোষকরূপে বিকাশলাভ করিয়াছিল; আর লোকসংখ্যা বাড়িলে নূতন জাতির আবির্ভাবেও সেই জীবনযাত্রায় স্থানাভাব হইত না। বরং ভারতবর্ষের এই সুজলতা ও সুফলতাই ছিল বাহিরের জাতিদের ভারত-আগমনের ও ভারত-আক্রমণের প্রধান কারণ।

এই আক্রমণের হেতু হয়ত আরও আছে। মধ্য এশিয়ার বা দূর দূরান্তেরের এই জাতিগুলি প্রায়ই ছিল যাযাবর—যাযাবরের হাতে গৃহস্থ-সভ্যতা অনেক সময়ে মার খায় ও মারা পড়ে, ইহা নূতন কথা নয়। কিন্তু এই যাযাবরের দলও যে কারণে নিজেদের পরিচিত ভূভাগ ছাড়িয়া দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়ে সেই কারণ অনেক সময়ে বংশবৃদ্ধি; অনেক সময়ে মধ্য এশিয়ার ঐরূপ অন্যান্য দেশের এক-একবার সাময়িকভাবে ভৌগলিক পরিবর্তন। এক-একবার নদী মরিয়া যায়, মরুভূমির তলে গ্রাম নগর চাপা

পড়ে, আর পশুচারণের তৃণভূমি শুকাইয়া উঠে। অমনি যাযাবরদল সেই ভূভাগ পরিত্যাগ করে, নিকটবর্তী ভূভাগে চড়াও হয়। এমনি করিয়াই শুরু হয় তাহাদের অভিযান,—যেমন ভারতবর্ষে শুধু নয়, ইয়োরোপ-এশিয়ায় আর্যদের সময় হইতেই তাহা হইয়াছে। শক-হুন-তুর্ক-তাতারের আক্রমণে ভারতবর্ষের মতো পূর্ব-ইয়োরোপও বারবার বিধ্বস্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষে মুসলমান বিজেতাদের আবির্ভাব সেই বৃহত্তর ইতিহাসের একটি পরিচ্ছেদ, তাহা মনে রাখা দরকার। উহার পিছনকার ঐতিহাসিক তাগিদটা ভারতের নয়, ভারতের অভ্যন্তরে উৎপাদন-প্রথার সংকটে বা কোনোরূপ অর্থনৈতিক অচল অবস্থার জন্য তাহা জন্মে নাই। জন্মিয়াছিল বরাবরকার মত ভারতের বাহিরে সেই মধ্য এশিয়ায় আর্থিক কারণে, রাষ্ট্রীয় কারণে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্মগত কারণেও।

তখনকার তুর্ক বিজেতাদের আবির্ভাবে এই এক নূতনত্ব ছিল—সে নূতনত্ব এই যে তাহাদের এই অভিযানের সঙ্গে মিশিয়াছিল তাহাদের নূতন গৃহীত ধর্মের প্রেরণা। মুসলমান ধর্ম অন্যান্য সেমিটিক ধর্মের মতোই স্বমতসর্ব্বস্ব এবং পরমতে অবিশ্বাসী। সেমিটিক জাতিদের ইতিহাসে ইহার কারণ পাওয়া যায়। তাহারা ভিন্ন মতের জাতি ও রাজাদের হাতে কম নিপীড়ন সহ্য করে নাই। সেমিটিক গোষ্ঠীর মধ্যে উদ্ভূত মুসলমান ধর্মের প্রেরণাও তাই উগ্র। সেই প্রেরণা যে কত প্রবল তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শতখানেক বৎসরের মধ্যে মুসলমানগণ আরব, পারস্য, সিরিয়া, আর্মানীয়া জয় করিয়া মিশর ও উত্তর আফ্রিকার উপর দিয়া স্পেন পর্যন্ত অধিকার করিয়া ফেলিল। পূর্বে অক্ষুনদীর পরপারে বর্তমান তুর্কীস্থান জয় করিয়া উহা চীনের সীমান্তে আসিয়া ঠেকিল, সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া সিন্ধুদেশে পদার্পণ করিল। মরুভূমির এই ঝড়ের সম্মুখে পূর্বযুগের মিশর ঈরান তো মুহম্মদের মৃত্যুর পরে পঁচিশ বৎসরও টিঁকিয়া রহিল না। এই বিপুল প্রেরণা অবশ্য ইতিহাসে আরব জাতির অভ্যুদয়রূপেও পরিচিত। তাহার সামাজিক ঐতিহাসিক কারণসমূহ সেই সময়কার সেই ভূখণ্ডের জীবনযাত্রার দিক হইতেও পর্যালোচনা করা চলে। তারপর পূর্ব পশ্চিমের

১। আরব জগতে বণিক ও বাণিজ্যের যে প্রাধান্য ছিল তাহা এইক্ষেত্রে কম কাজ দেয় নাই। আরব সভ্যতার বাস্তব কারণের ও বস্তুমুখিতার কথাও *এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। দ্রষ্টব্য Cambridge* **Mediaeval History—Voll.**

বিবিধ সংস্কৃতির সার্থবহ হিসাবে, বণিক হিসাবে, আরব জাতি সমস্ত মধ্যযুগ জুড়িয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোচনায় ইতিহাসের পথকে আলোকিত করিয়া রাখিল,—তাহারও বিচার-বিশ্লেষণ করা শিক্ষাপ্রদ। কিন্তু যাহাদের সম্মুখে পৃথিবী দাঁড়াইতে পারে নাই, তাহারাও সেদিন ভারতবর্ষে সিন্ধু জয়ের পরে আর অনেককাল অগ্রসর হইতে পারিল না। মুসলমান ধর্মের আঘাতে একশত বৎসরে মিশর স্পেন পর্যন্ত ভাঙিয়া পড়িল—অথচ পাঁচশত বৎসরেও ভারতবর্ষে (প্রায় ১৩শ শতাব্দীর পুর্বে) তাহা প্রবেশ-পথ পায় নাই। যাঁহারা মনে করেন ভারতীয় হিন্দুদের অধঃপতনে মুসলমানেরা এদেশে বিজয়ী হন তাঁহাদের এই কথাটি স্মরণীয়: ইস্‌লাম ঈরান তুরানে প্রবেশ করিল, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ জাতিদের উহা স্বধর্ম হয় নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা ভারতবর্ষ বিজয়ের পথ পায় নাই। সিন্ধুদেশে প্রবেশ করিয়াও সেখানেই ঠেকিয়া গিয়াছিল। মধ্য এশিয়ায় যখন সুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম ও যুনানী খ্রীষ্টধর্ম নিশ্চিহ্ন করিয়া তুর্ক, তাতার, মুঘল জাতিদের উহা নিজ পক্ষে টানিয়া লইল, তখন ভারতবর্ষেও ইস্‌লামের প্রবেশ ঠেকানো দুঃসাধ্য হইল। কারণ, এই মধ্য এশিয়ার জাতিরা বরাবরই ভারতবর্ষের দুয়ার ভাঙিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের প্রতিরোধ করা যায় নাই। প্রবেশের পরে বারবার তাহার জীবনযাত্রার ও সংস্কৃতির মধ্যে অনায়াসে তাহাদের স্থান হইয়া গিয়াছে। স্থান এবারও হইল, কিন্তু এবার তাহারা মিলাইয়া গেল না। কারণ, এবার তাহারা এক নূতন গর্বে গরীয়ান হইয়া উঠিয়াছিল। পৃথিবীতে এমন উগ্র গর্ব আর নাই,—তাহার নাম ধর্মপ্রাণতা বা ধর্মান্ধতা।

একদিক হইতে বলিতে পারা যায় ভারতীয় জীবনধারার ও সংস্কৃতি-ধারার এই প্রথম পরাজয় ঘটিল। এই পরাজয় রাষ্ট্রশক্তির কাছে নয়, ইস্‌লামের আত্ম-সচেতনতার নিকটে। ভারতবাসীর পক্ষে রাষ্ট্রীয় পরাজয় নূতন নয়—সে তো বহুবার ঘটিয়াছে। কারণ ভারতবর্ষের সমাজ রাষ্ট্রের মধ্যে তাহার নিজ শক্তিকে কেন্দ্রিত করিয়া তুলিত না—কৃষিসমাজের পক্ষে তাহা করা সহজও নয়। সেখানকার জীবন পল্লীগত, শক্তি সেখানে সংহত নয়, বিসর্পিত; যুদ্ধাদি প্রয়োজনে ছাড়া রাষ্ট্রে কেন্দ্রিত হইত না, কেন্দ্রিত হইলেও বেশিক্ষণ টিঁকিত না। ইহার কতকগুলি কারণ ঐতিহাসিক, কতকগুলি ভৌগোলিক। যেমন, যেখানে বহুজাতি আসিয়াছে, মিশিয়াছে, বহু ভেদ রহিয়াছে, বিভাগ চলিতেছে, সেখানে বৈচিত্র্যই স্বাভাবিক, সেখানে

'ঐক্যের' শক্তি দুর্বল, । "এক জাতি, এক দেশ, এক রাষ্ট্র"—এইরূপ কথা উঠিতেই সেখানে পারে না ; তাই, হিন্দু ভারতেও তাহা উঠে নাই। অবশ্য রাজারা একরাট্ হইতে চাহিয়াছেন, সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, রাজচক্রবর্তী হইবার চেষ্টা করিয়াছেন ;—আর এত বড় দেশে বারেবারেই সেই অখণ্ড ভারতরাষ্ট্র গড়িবার চেষ্টা ভাঙিয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া যেখানে দেশ এত প্রকাণ্ড—রুশিয়াশূন্য ইয়োরোপের প্রায় সমতুল্য—সেখানে এই 'এক দেশ', 'এক জাতি' কথাটা শত চেষ্টা সত্ত্বেও বাস্তব হয় না। ইউরোপে 'হোলি রোমান এম্পায়ার'ও এক রাষ্ট্রে এমনি বড় এক ভূখণ্ডকে আনিতে পারে নাই,—ভারতবর্ষেও গুপ্ত বা মৌর্য-সম্রাটরাও চেষ্টা করিয়া পারেন নাই। পরে মুঘল সম্রাটদের চেষ্টাও সফল হইল না। ভারতবর্ষের সেই রাষ্ট্রীয় খণ্ডতা তখন স্বাভাবিকই ছিল ; তাহার ঐক্য ছিল সামাজিক ও জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে। কিন্তু যানবাহনের বর্তমান সুযোগ তখন ছিল না ; তাই বিস্তৃত দেশে এই ঐক্যবোধ গভীরতর হইয়া সুদৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহা সহজ কথা—ইহাতে বিজেতার সুবিধা হইয়াছিল। আর এই বিজেতারা দুর্ধর্ষ ও যুদ্ধবিদ্যায়ও সত্যই কৌশলী ছিল। কিন্তু পূর্বাপর দেখিলে, সমসাময়িক কালের পটভূমিকায় দেখিলে, ইহাকে "ভারতবর্ষের পতনের যুগ" বলা চলে না। কারণ সামরিক ও রাষ্ট্রীয় পরাজয়ে ভারত-সমাজ পরাজিত হইত না, সে সমাজ আহত হইত। দুইদিনেই সে ক্ষত শুকাইত—সমাজ নূতন রাষ্ট্রশক্তিকে অঙ্গীভূত করিয়া লইত। ক্ষতি দুই দিনেই পূরণ হইয়া যাইত ; ভারতীয়দের আত্মসাৎ করিবার শক্তি ছিল।

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির এই দিকেই পরাজয় ঘটিল এইবার। তাহার বাস্তব জীবিকাপ্রণালী ও সামাজিক জীবনধারা পূর্বে যথেষ্ট নমনীয় ছিল, উদার প্রশস্ত ছিল। মুসলমানগণ নূতন জীবিকা-উপকরণ দাবী করিল না,—কিন্তু তাহারা এক উগ্র মানসিক ঔদ্ধত্য ও রাষ্ট্রীয় শক্তি লইয়া উহার উপরে বিরাজ করিতে লাগিল। এবার আর বিজেতারা ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে মিলাইয়া গেল না। ভারতীয় সমাজই ক্রমশঃ আপনাকে গুটাইয়া লইল।

ইস্‌লামের স্বাতন্ত্র্য

ভারতীয় সংস্কৃতি মুসলমান বিজেতাদের আত্মসাৎ করিতে পারিল না ; তাহার কারণ মুসলমান ধর্ম সেই প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিল। ইস্‌লামের

একেশ্বরবাদ 'তত্ত্বের' বেশি পরোয়া করে না, কোনো বিচার বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা সহ্য করে না! ইস্‌লাম সেমেটিক্‌ গোষ্ঠীর ধর্ম,—তাহার হিসাবপত্রও সেই গোষ্ঠীর মতোই একেবারে পরিষ্কার। হিন্দুধর্ম বলিতে পারে—'একমেবাদ্বিতীয়ং', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'; আর ইহার পরে ব্যাখ্যা দ্বারা শুধু দ্বিতীয় কেন—গাছ, পাথর, পশু, মানুষ যে কোন জিনিসকেই দৈবশক্তির আধার বলিয়া পূজা করিতে হিন্দুদের বাধে না। ইস্‌লামে এইরূপ তত্ত্বকথার ও গোঁজামিলের স্থান নাই। কোনো তর্কেই ইস্‌লাম মূর্তি-উপাসনা সহ্য করিবে না। অথচ হিন্দুর জীবনে অনেকখানি জুড়িয়াই সেই মূর্তি, বিগ্রহ, মন্দির। তাহা ছাড়া, ইস্‌লামে এমন পুরোহিত-তন্ত্রের ও জাতিভেদের স্থানও নাই। কিন্তু হিন্দু মুখে বলিবে 'তত্ত্বমসি' এবং কার্যক্ষেত্রে সকলকেই অধিকারভেদে পৃথক কোঠায় চিরকালের মতো পুরিয়া রাখিবে। তাই এই দুই ধর্মাবলম্বীদের সম্মেলন পূর্বাপরই দুর্ঘট রহিয়াছে। সেই দুর্ঘটত্ব আরও দুস্তর হইয়া রহিল আনুষঙ্গিক কারণে। প্রত্যেক ধর্মেরই জন্ম হয় অনেকাংশে পারিপার্শ্বিকের তাগিদে; অন্তত সেই পরিবেশের ছাপ তাহার নিজস্ব হইয়া যায়। স্থান ও কাল পরিবর্তিত হইলেও সেইগুলি সে সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারে না। হিন্দুধর্মের পরিবেশ ভারতবর্ষ। তাহা এই ধর্মকে সত্যই "ভারতধর্ম"ও বলা চলে—এই দেশের নদ-নদী, গিরি-পর্বত আহার্য পানীয় এবং ইহার ইতিহাসের উপলব্ধিই হইল সেই হিন্দুধর্মের দেহ ও প্রাণ। ইস্‌লাম দেশগত বা জাতিগত ধর্ম নয়, তাহা সকল মানুষের একমাত্র ধর্ম হইবার স্পর্ধা রাখে। তবু ইস্‌লামের জন্ম আরবে; সে যুগের সে দেশের ছাপ সে অস্বীকার করিবে কিরূপে? সেমিটিক প্রতিবেশীদের প্রভাবও সে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু ভারতীয় পরিবেশের ছাপ, সেই দৃষ্টিভঙ্গী ও রূপ সে গ্রহণ করে না। কতকটা এই কারণে মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা ভারতে থাকিয়াও 'ইণ্ডিয়ান ফার্ষ্ট' হইতে পারিলেন না—ভারতের বাহিরে তাঁহাদের 'পবিত্র ভূমি'। দিনে পাঁচবার তাঁহারা পশ্চিমে মুখ করিয়া নিজেদের সেই স্বপ্নের 'স্বদেশের' কথা স্মরণ করেন; মক্কা তাঁহাদের প্রাণভূমি, আরব তাঁহাদের ধর্মের জন্মভূমি, তাঁহাদের মূল উত্তরাধিকার সেখানকার আরব্য সমাজের; ধর্মভাষাও তাঁহাদের আরবী; মূল ধর্মনেতৃবর্গ আরব-সন্তান ফকির দরবেশ; সাহিত্য, শিল্প, দার্শনিক চিন্তা পর্যন্ত প্রধানতঃ আরব, পারস্য, মিশর, সিরিয়ার—ভারতের নয়। তাই ভারতবর্ষে শতাব্দীর পর শতাব্দীতেও

ইস্‌লাম নিমজ্জিত হইয়া গেল না। প্রথম দুই এক শতাব্দীতে তাহার গায়ে ভারতের দাগও যেন পড়িল না। (বাঙলা দেশে এই দুই শতাব্দীতে কোনো শিল্প-সাহিত্যের চিহ্নও দেখা যায় না। তারপর পঞ্চদশ শতক হইতে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য জন্মগ্রহণ করিল। তাহাতে পরাজিত হিন্দুর সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের ও সামাজিক পুনর্গঠনের চিহ্ন দেখা যায়। দ্রষ্টব্য—লেখকের 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা', ১ম খণ্ড)

জেতা ও বিজেতার সংযোগ

সাধারণ ভাবে ইস্‌লাম শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে প্রাচীর এইভাবে রচনা করিয়াছিল তাহাতে মধ্যযুগের এই দ্বিতীয় পর্বে হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ ও মিশ্রণের সুযোগ দেয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া জীবনক্ষেত্রে ততদিন পর্যন্ত শাসক ও শাসিত তত স্বতন্ত্রও থাকিতে পারে নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। কারণ, ইসলাম কোনো জাতির ধর্ম নয়, প্রচারশীল ধর্ম। উহা অন্যকে জয় করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, কোলে টানিয়া লয়। তাই ইস্‌লামের বিজাতীয় ও বিজেতা প্রচারকের দল ভারতের জনগণকে বিন্দুমাত্রও অবজ্ঞা করিল না। হিন্দু সংস্কৃতি রাজা, সামন্ত, রাজসভা হারাইল; শুব্ধ ক্ষুব্ধ অভিমানে 'ম্লেচ্ছকে' বর্জন করিয়া উহার কাণ্ডারীরা স্বয়ং-সম্পূর্ণ আত্মস্বাতন্ত্র্যের চর্চা করিতে লাগিল। বিজেতার সংস্কৃতিও দর্পভরে তাহাকে আঘাত করিতেছিল, তথাপি চূর্ণ করিতে পারিল না। হিন্দুর নির্বিরোধ অসহযোগিতা বা 'কমঠ-বৃত্তি' হিন্দু-সংস্কৃতিকে রক্ষা করিল—অন্য কোনো দেশে ইস্‌লাম রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে বিজয়ী হইয়া সমাজে ধর্মে এমনভাবে প্রতিহত হয় নাই। এই বিরোধ কিন্তু চলিতেছিল সামন্ততন্ত্রের দুই শাসকদলের সংস্কৃতিতে—একদল শাসন-দণ্ড হারাইয়া ক্ষুব্ধ; আর একদল শাসনদণ্ড লাভ করিয়া দর্পিত। কিন্তু দেশের জনসমাজ দুই সংস্কৃতির শাসকদলের নিকটেই প্রায় সমান অপাংক্তেয় —তাহাদের পল্লী-জীবনে মুসলমান-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাই মুসলমান শাসকদের প্রভাবে বড় কোনো সমাজগত পরিবর্তনের তরঙ্গও দেখা দিল না।

ইহার কারণ আমরা জানি, সেই কৃষি-সমাজের জীবন রাষ্ট্রে কেন্দ্রিত নয়; পল্লীতে পল্লীতে সমাজের নানা সম্পর্কে তাহা বিধৃত ছিল। তাই, মোটামুটি পল্লী-জীবনযাত্রা অব্যাহত চলিল—জিজীয়ার ভারে, বিশেষ কোনো

জায়গীরদারদের অত্যাচারে মাঝে মাঝে তাহা শুধু প্রপীড়িত হইত। তেমনি আবার বাঙলার মত কোনো কোনো অঞ্চলে সমাজের সেই নিম্নশ্রেণীর কাছে মুসলমান ধর্ম একটা উদ্ধারের পথ হইয়া দাঁড়াইল। বৌদ্ধ সম্প্রদায়তো হিন্দুর উপর রাগ করিয়া তাহা বরণ করিলই ("শেখ শুভোদয়া" ও "নিরঞ্জনের রুষ্মা" দ্রষ্টব্য), ফিরোজ শাহ্-এর মতো সম্রাটদের চেষ্টায় হিন্দুরাও অনেকে রজতমূল্যে নিশ্চয়ই ইস্‌লাম কবুল করিয়াছিল। অবশ্য সূফী-সাধক ও ইস্‌লাম প্রচারকের দল জনগণকে একবারও অবহেলা করে নাই। তাই বলিয়া যে ভারতবর্ষের এই নূতন মুসলমানেরা খাঁটি ইস্‌লামকেই গ্রহণ করিল তাহা নয়। নামে মাত্রই তাহারা অনেকে মুসলমান হইল। কিন্তু এইভাবেই একটা সংযোগ স্বদেশী ও বিদেশী সংস্কৃতির মধ্যে স্থাপিত হইল। যতই বিজেতা মুসলমান দিল্লী বা জৌনপুর ছাড়াইয়া অগ্রসর হইল ততই এই জনসমাজ, এই পল্লী-জীবন ও এই জনসংস্কৃতির সঙ্গে তাহাদের সংযোগ বাড়িতে লাগিল। এমন কি, উত্তর বাঙলার মত কিংবা চট্টগ্রাম আরাকানের মত সীমান্তক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান শাসকশ্রেণীর মধ্যে একতরফা বৈবাহিক সম্পর্কও চলিল—শাসক-শ্রেণী হিসাবে উভয়ই নিজেদের সমশ্রেণীর বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে। আবার যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই এই যোগ ব্যাপকতর হইতে লাগিল। এবং আকবরের সমকালে পৌছিয়া অবশেষে মুসলমান যুগ সত্য সত্যই ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল।

যোগাযোগের ফল

এই যোগাযোগের ফলে মুসলমান শাসকসম্প্রদায় ভারত-সভ্যতায় আবার কয়েকটি নূতন জিনিস দান করিল। সাড়ে পাঁচশত বৎসরে মুসলমান যুগের মধ্যে আমরা মুঘল যুগের দানই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিয়াছি। নানা রকমের সম্পদ প্রথম হইতেই সৃষ্টি হইতেছিল। পরবর্তী সময়ে তাহাও নানা ঘটনায় আবার পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহার সেই পরবর্তী রূপই হয়ত আমরা পাইয়াছি। যেমন, প্রথমত ফারসী ও দেশীয় ভাষার মিশ্রণে রেখ্‌তা বা দেশী কথার উদ্ভব হইল, ইহাই উর্দুর'ও আদিরূপ। হিন্দু রাজাদের রাজকার্যেও ইহার প্রাধান্য বরাবর রহিল। দ্বিতীয়ত, সুদূরান্তের বিজেতার দল দেশীয় কথায় দেশীয় কাহিনী ও দেশীয়

কাব্যগান শুনিতেন—সেখানে রেখ্‌তা কিংবা ফারসী জবান কে বুঝিবে? ইহাদের আসরে তাই দেশীয় ভাষাগুলির আদর বাড়িল। তাই সাধারণ লোকের সাহিত্য এইবার রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল; ভারতবাসীর সাহিত্য-সৃষ্টি আর প্রধানত 'দেবভাষায়' আবদ্ধ রহিল না। এইভাবে বাঙলা, হিন্দী প্রভৃতি বর্তমান ভারতীয় ভাষাগুলি এই সময়েই প্রথম পুষ্টিলাভ করিল। বাঙলায় ইহার প্রমাণ লস্কর পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁর মহাভারত লেখানো। বস্তুত হুসেনশাহের সভাতে বাংলা কাব্যের পুষ্টি; বাংলার আমলা মুনসি প্রভৃতি ফারসী জানা কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ভদ্রলোক মধ্যবিত্তদের তাহা জন্মক্ষণ। তাহার পর আসে আকবরের পরবর্তী মুঘল যুগ, এবং চৈতন্য যুগ ও বৈষ্ণব-যুগ। এদিকে পাঠান যুগেই হিন্দীতে আমরা পাই মালিক মহম্মদ জৈসীর "পদুমাবৎ", কবীরের দোহাবলী, আর তুলসীদাসের রামচরিতমানস। মুঘলযুগের প্রশস্ত অবকাশে এই সকল ভাষা ক্রমে ক্রমে প্রকৃত সাহিত্যিকরূপ লাভ করিয়াছে। তৃতীয়ত, হিন্দু ও মুসলমান সংযোগের প্রধান বাধা যেমন ছিল ধর্ম, তেমনি ধর্মের দিক হইতেও সেই বাধা যেভাবে অপসারিত হইতেছিল তাহাও এক প্রধান উল্লেখযোগ্য জিনিস। বিজয়ীর ধর্মের স্বভাবতই প্রাধান্য থাকে। নানাভাবে ইস্‌লামও সাধারণ জনগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। আর ইহাও আমরা জানি যে, এই নূতন ইস্‌লামকেও জনসাধারণ স্বভাবতই তাহাদের পূর্ব পরিচিত জিনিসের আধারে ঢালিয়া সাজাইতেছিল—নিরঞ্জন হইতেছিলেন আল্লা, বৌদ্ধ দেবতারা হইতেছিলেন মুসলমান পীর, স্তূপ হইতেছিল দরগা, পুরাতন দেবলীলার কাহিনী নূতন পীরের কেচ্ছায় পরিণত হইতেছিল; এসব আমরা বুঝিয়াছি। ইহাই ছিল ভারতীয় ইস্‌লামের একটা জনগ্রাহ্যরূপ (popular form)। কিন্তু ইস্‌লামের বলিষ্ঠ ও সরল একেশ্বরবাদ এবং জাতিভেদহীন সাম্যদৃষ্টি আর এক নূতন রূপও পরিগ্রহ করিল। তাহাই রামানন্দ, কবীর, নানক প্রভৃতির মধ্য দিয়া এক ভারতীয় রূপ ও বেশ লাভ করিল, এবং ভারতীয় সংস্কৃতির উচ্চস্তরের চিন্তার সহিত এইভাবে আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া ফেলিল। মোল্লা ও ব্রাহ্মণ, দুই এরই বিরুদ্ধে ইহা এক বিদ্রোহ। মধ্যযুগের খ্রীষ্টান সমাজে, পারস্যে, এমন কি তুরস্কে এক অধ্যাত্ম প্রেমভক্তিবাদের বান ডাকে। হয়ত সেযুগের কৃষিসমাজ ও সেই সংঘাতক্লিষ্ট সামন্ততন্ত্রের মধ্যে মানব-প্রয়াস, মানব-মনীষা ও মানব-আবেগ বাস্তবক্ষেত্রে কোনোরূপ

প্রকাশের সহজ পথ পাইতেছিল না। তাই তাহা এক অর্ধবাস্তব ও অতীন্দ্রিয় 'অধ্যাত্ম' রসে ও অধ্যাত্ম সাধনায় আপনার পরিতৃপ্তি খুঁজিতেছিল। ইউরোপেও সে যুগে খ্রীষ্টান মিষ্টিকের অভাব ছিল না; ঈরানের সুফীবাদ গোঁড়া ইস্‌লামের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়া রূপে রসে ফুটিয়া উঠিতেছিল। ভারতবর্ষেও হিন্দু মুসলমান দুই ধর্মের মধ্যে তেমনি এক 'অধ্যাত্ম' সাধনা দেখা দিয়াছিল। বহু ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ঈরানের সুফীবাদ তাহাকেও পুষ্ট ও প্রভাবিত করিয়াছে। ভারতীয় সাধকদের প্রধান দুইটি লক্ষণ উল্লেখযোগ্য: একদিকে প্রবল অধ্যাত্ম-বোধ, অন্যদিকে তেমনি প্রবল মানব সাম্যের ধরণা। হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম ও জাতির সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ মনস্বীরা মানুষের মৌলিক একত্বের সন্ধান পাইতেছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতেছিলেন "সেই এক"-কে, বাস্তব-ক্ষেত্রের এই বিভিন্নতা যাঁহার অখণ্ডতাকে স্পর্শও করিতে পারে না। ইহার লৌকিক বাহন একদিকে ছিলেন কবীর, দাদু, নানক ও চৈতন্যের অনুবর্তী সাধকগণ; অন্যদিকে সমাজ-ছাড়া-আউল বাউলের দল, ফকির দরবেশের সমাজহীন সম্প্রদায়; আর একেবারে উপরে, সুফী ও অনুরূপ মতাবলম্বী সাধক-সুধীগণ, যাঁহাদের মধ্যে সম্রাট আকবর ও হতভাগ্য রাজকুমার দারা শুকোরও নাম করিতে হয়।

ইহা ছাড়াও লৌকিক সংস্কৃতিতে মুসলমান যুগের দান কত ভাবে জমা হইতেছিল, তাহার ঠিকানা নাই। যেমন, হিন্দুরাজ্য ও রাজকর্ম-চারীর শাসন বিচার সবই ধীরে ধীরে মুসলমানীরূপ গ্রহণ করিল। কৃষি-সমাজের পরিবর্তন হইল না বটে, কিন্তু তাহার সামন্ততন্ত্র জায়গীরদারীরূপে ক্রমপরিস্ফুট হইল। প্রথম দিকে অবশ্য জমিজমার বন্দোবস্ত, খাজনার হিসাবপত্র সবই অনেকটা পুরাতন ধারায় চলিত, কিন্তু ক্রমে তাহা চলিল মুসলমান কায়দায় ও ফারসী ভাষায়। বলাবাহুল্য—ভারতীয় মুস্‌লিম সংস্কৃতির রূপ এই ভূমি-ব্যবস্থাতেই স্পষ্ট হয়। তাহা কার্যগত মৌলিক কোনো পরিবর্তন সেদিকে সাধন করে নাই। অথচ জীবনযাত্রায় তাই বলিয়া কি মুস্‌লিম সংস্কৃতির দান কম? শহরে বাজারে ও সওদাগরী দোকানপত্রে মুস্‌লিম দান বাড়িয়া উঠিল। কাগজ এদেশে তাহারাই আনয়ন করে, তাহার পর কেতাবের কদর বাড়িল। খানাপিনায় নূতন বিলাসিতা দেখা দিল; মুস্‌লিম হকিম ও মুসাফিরেরা সমাদৃত হইল। সাড়ে পাঁচশত বৎসরের মুসলমান যুগে—

মধ্যযুগের এই দ্বিতীয়ার্ধে—এইসব লৌকিক পরিবর্তন ছাড়াও ভারতীয় জীবনে রাষ্ট্রীয় চেতনাও পরোক্ষভাবে জন্মাইতেছিল।

ঐক্য চেতনা

সংক্ষেপে মনে রাখিতে পারি:—প্রথমত, এই বাহিরের ধর্ম ও বাহিরের শাসকদলের চেষ্টায় ভারতের সঙ্গে এই সময়ে বৃহত্তর জগতের আদানপ্রদান পুনঃস্থাপিত হইল (*Mughal Administration*, J. N. Sarkar, দ্রষ্টব্য)। পূর্বযুগের মত ইহার দ্বারপথ পূর্ব উপকূলে নয়। ইহার দ্বারপথ ছিল প্রধানত উত্তর পশ্চিমে, ও পশ্চিম, এবং পশ্চিম সিন্ধুর উপকূলে। তাহা ছাড়া, এই বিজেতাদের দল অন্তত উত্তর ভারতে বিস্তৃত অংশ জুড়িয়া কতক পরিমাণে শান্তিও স্থাপন করেন। দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী যুগের রাষ্ট্র-কেন্দ্র-হীন ভারতীয় সমাজের উপর ইহারা স্থাপিত করেন নিজেদের এক শাসনব্যবস্থা। মুস্‌লিম রাজ্যের উজীর, কাজী, মুন্সী প্রভৃতি আমাদের নাম ও পদবী, এবং রাজকার্যে ব্যবহৃত ফারসী ভাষাই ক্রমে দেশীয় শাসনের ধারা হইয়া উঠে,—হিন্দু রাজ্যেও তাহা গৃহীত হয়। ঠিক ঐরূপে রাজপুরুষদের ও অভিজাতদের আদব-কায়দা, খেতাব-খেলাৎ, উর্দি-কুর্তা প্রভৃতিও মুসলমানদের নিকট হইতে ভারতবাসী সকলেই লাভ করিল—উহা আজও ভারতে হিন্দু মুসলমান সকলকার দরবারী পোষাক এবং কায়দা-কানুন। এই দুই দিকেই ইহারা ভারতীয় ঐক্যের রূপকে তাই পুষ্ট করিয়া তোলেন। আর ইহাদের তৃতীয় দান—যুদ্ধবিদ্যায় নূতন কৌশল ও নূতন পরিকল্পনা,—যুদ্ধবিদ্যার এই জ্ঞানের অভাবেও ভারতীয়গণ এই বিদেশীয়দের নিকট বারবার পরাজিত হইত।

এই কৃষি-সমাজে মুসলমানগণের দান ছিল প্রধানত কারু-শিল্পে ও সওদাগরী কাজের উন্নতিতে। একদিকে শাল, কিংখাব, কার্পেট, মস্‌লিন প্রভৃতি, অন্যদিকে নানারূপ অলঙ্কার, মিনার কাজ, বিদ্‌রির কাজ প্রভৃতিও তখন মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অনেক সময়েই মুসলমান কারু-শিল্পীর হাতে গড়িয়া উঠে। (দ্রষ্টব্য *India through the Ages*, J. N. Sarker) মধ্যযুগের কারুকলার চরম নিদর্শন হিসাবে সেযুগের পৃথিবীতে এইসব কাজের তুলনা মিলে না। ইহাতে অবশ্যই জীবনযাত্রার মৌলিক ভিত্তি পরিবর্তিত হয় নাই, কিন্তু জীবনযাত্রার উর্ধ্ব শ্রেণীতে, শাসক শ্রেণীতে, যে আহার-বিহার ও

সাজ সজ্জায় একটা রুচিবিকাশ ঘটিতেছে, তাহা বুঝা যায়। তেমনিতর রুচির উন্নতি তখনকার ভেনিসের, কিংবা লণ্ডনের, কিংবা ওলন্দাজ ধনী ব্যবসায়ী ও নাগরিকদলও দাবী করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

অবশ্য এই উন্নতি অনেকাংশেই জনগণের জীবনযাত্রা বা রুচির সহিত সম্পর্ক রাখিত না। প্রথম দিককার ভাষা, শিল্পকলা, সবই ছিল ঈরানী ও তুরানী, মধ্য এশিয়ার ও অল্পাংশ আরবীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত।[1] পরবর্তীকালে ক্রমশই ভারতীয় জীবনের ও শিল্পধারার সহিত মুসলমানী জীবনযাত্রার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আকবরের সময়েই এই ধারা প্রবল হইয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় মধ্যযুগের চরম সৃষ্টি ফুটিয়া উঠে নানা সৌধে, শিল্পে, চিত্রকলায়। এমন কি তানসেনের প্রেরণার ফলে সঙ্গীতে পর্যন্ত মঞ্জরীত হইয়া উঠিল। বিপুল মুঘল স্থাপত্যের বিস্ময়কর ইতিহাস এখনো মুছিয়া যায় নাই, ভারতীয় সঙ্গীতের সেই ধারাও লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন এই শিল্পকলা আবার দরবারেই সীমাবদ্ধ হইতে চলিল, তখন উহার সেই প্রশস্ততা ও সজীবতা নষ্ট হইয়া গেল। তখনকার মুঘলশিল্পে সূক্ষ্ম রূপবিলাস (baroque) বাড়িয়া চলিল। সেই সূক্ষ্ম নিপুণতা, অলঙ্করণ, রঙের ও রেখার সুচিক্কণ নমনীয়তা তবু অপরূপ রূপদান করিয়াছে মুঘল ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি (miniature) গুলিকে। আর সেই মুঘল শিল্পেরই অন্যদিকে একটা শেষ পরিণতি দেখি লক্ষ্ণৌর স্থাপত্যে ও সঙ্গীতে খেয়ালে ঠুংরিতে।

কিন্তু এইসব শিল্পনিদর্শন হইতেই একদিকে যেমন উহার সূক্ষ্মতা সুস্পষ্ট তেমনি অন্যদিকে সুস্পষ্ট এই কথা যে, ভারতীয় জনগণের জীবনযাত্রা হইতে ইহার রসজ্ঞ সমাজ আবার অনেক অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন, জীবনের উন্মুক্ত প্রান্তরে তাঁহারা আর বিচরণ করিতে পারিতেছেন না।

শ্রেণী বিরোধ

এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে শোষিতের সহিত শোষক শ্রেণীর সংঘর্ষ যে বহু বহু বার ঘটিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই সহজবোধ্য। এই সংঘর্ষ সাধারণভাবে পুর্বাপর রূপ গ্রহণ করিয়াছে—প্রথমত কোনো হিন্দু রাজার (যেমন শিবাজী)

১ ভারতীয় মুসলমানের ধর্মজীবনে ছাড়া আরবীর প্রভাব যাহা আসিয়াছে, প্রধানত তাহা আসিয়াছে ঈরানের মারফৎ। আরব নাবিক মালাবার উপকূলে, যবদ্বীপে, মালয়ে সর্বত্র রাজ্য

নেতৃত্বে শোষিত (হিন্দু) সাধারণের বিদ্রোহরূপে। দ্বিতীয়ত, নিশ্চয়ই বহুক্ষেত্রে মুইলমান সামন্তও এই জনতার নেতৃত্ব বা মুখপাত্র হিসাবেই স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতে অগ্রসর হইত। মধ্যযুগের অধিকাংশ সংঘাতই ধর্মের আবরণ গ্রহণ করিবে, তাহা আবার বলা নিষ্প্রয়োজন। মধ্যযুগের বহু সামন্ত-বিদ্রোহের শক্তি জোগাইত এক মূক জনতা—যাহারা তখনো নিজেব সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হয় নাই। বিশেষত, বণিকশক্তি তখনো মোটেই আত্মসচেতন নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রাণের আসল বিদ্রোহ রূপ লাভ করিয়াছে তখনকার অধ্যাত্ম-বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে—কবীরের, নানাকের চৈতন্যের এবং শত শত মরমীয়া সাধকের সংঘ ও গোষ্ঠী গঠনে। ইহাদের সাধনায় ও সংঘে ব্যক্তি-মন স্বাধীনতা পাইয়াছে। সেই অওতায় দুর্বলও পৃথিবীতে এক-আধটুকু স্বস্তি না পাইয়াছে তাহা নয়। সেদিনের গণকর্মীদের পক্ষে ইহার বেশি কিছু করা ছিল স্বপ্নাতীত। মুঘল রাজত্বের শেষদিকে অবশ্য মারাঠা, রাজপুত, শিখ, সতনামী প্রভৃতি প্রধান বিদ্রোহীরা নিজেরাই রাজশক্তিরূপে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং অত্যাচারও তাহারা অপরের উপর করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু ইহাদের অভ্যুত্থানের পশ্চাতে যে সামন্ততন্ত্রেরই অভ্যন্তরে নিষ্পেষিত জন-সমাজের বিদ্রোহই শক্তি জোগাইয়াছে তাহা বিস্মৃত হইবার কারণ

যুগান্ত

এই শাসকশ্রেণীর হাত হইতেও যখন রাজদণ্ড খসিয়া পড়িল জনগণ তাহাতে চমকিত হইল না, ভারতবর্ষও তাই আর একবার বিজেতার নিকটে লুটাইয়া পড়িল।

কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই, সে বিজয়ী আর রাজা নয়, একটা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়; আর রাজ্যও সে হস্তগত করিল তাহার বাণিজ্যের প্রয়োজনে।

ও ব্যবসা ফাঁদিতেছিল। চট্টগ্রামেও কিছু কিছু আসিয়া থাকিবে। কিন্তু ভারতবর্ষের উপকূলে—চট্টগ্রামের দিকেও—তাহাদের তেমন অধিক সংখ্যায় আগমনের বা ব্যবসাপত্র চালাইবার সঠিক প্রমাণ কতটা পাওয়া যায়? বাঙালী মুসলমানের জীবনযাত্রার যে 'আরবীয়' প্রভাব দেখা যায় তাহা ধর্মসূত্রেই প্রাপ্ত আর বিশেষ করিয়া পরবর্তী কালে প্রাপ্ত; উহা জাতিসূত্রে অর্থাৎ আরবীয়দের সঙ্গে পরিচয়ে প্রাপ্ত বলিয়া মনে হয় না।

সমাগত ব্রিটিশ রাজত্বের এই প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্যই স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিল —ইহার পূর্বে ভারতবর্ষে যেসব আগন্তুক শাসকদল আসিয়াছে তাহাদের সহিত এইখানে এই নবাগতদের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে; পৃথিবীতে বণিগ্‌রাজের দিন আসিয়াছে, সামন্তযুগ শেষ হইয়াছে। এই সঙ্গেই স্মরণীয় এই কথা—ইহার পূর্বেও মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত হইতে সম্রাট আকবর বা আওরংজীব পর্যন্ত অনেকেই একচ্ছত্র সাম্রাজ্য গড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন। নানা কারণে তাঁহাদের চেষ্টা বারে বারে নিষ্ফল হইয়াছে। কিন্তু ব্রিটেন ভারতবর্ষে একটা একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলির সঙ্গে এই সাম্রাজ্যের একটা গুণগত পার্থক্যও আছে। তাহারাও শাসন করিত, জনসমাজকে শোষণ করিত; ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীও তাহা করে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তী যুগের সাম্রাজ্যের বনিয়াদ ছিল সামন্ততন্ত্র, এখনকার 'সাম্রাজ্যবাদ' বণিকতন্ত্রের উগ্ররূপ। এই কারণেই তখনকার সাম্রাজ্য 'দেশীয়' হইয়া উঠিত, 'নেশন' গড়িবার পথেও সহায়ক হইত; এখনকার সাম্রাজ্যবাদ এদেশকে 'উপনিবেশ' মনে করিত, নিজের শোষণের দায়েই এখানে 'নেশন' গড়িতে দেয় নাই, ঐক্যের চেষ্টা ব্যাহত করিয়াছে।

সমাগত বণিগ্‌যুগের তরঙ্গাঘাতে ভারতের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ক্ষয় হইয়া গেল। কিন্তু ক্ষয়ের জন্য নিজেব অভ্যন্তরেই ভারতের সমাজও ততদিন প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছিল। রাষ্ট্র যে মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণীর হাতে ছিল তাঁহাদের হাত তখন কাঁপিতেছে। পঙ্গুর হাত হইতে সেই রাজ্য টুক্‌রা টুকরা হইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। সুবায় সুবায় ক্ষুদ্র শাসকের দল তাহারই টুকরা লইয়া নবাবী নিজামতের খেলা খেলিতেছে। মারাঠা শক্তি লুণ্ঠনে দস্যুতায় আপনার রাষ্ট্রীয় সুযোগ বিনষ্ট করিতেছে।—আর জনগণ এই দুর্যোগের দিনে "সিং গর্দী, শাহ্ গর্দী, ভাউ গর্দীর" দৌরাত্ম্যে বারে বারে ত্রস্ত বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহার মধ্যে কোথায় ছিল দেশীয় বণিক জগৎশেঠ উমিচাঁদের স্বস্তি? কোথায় ছিল দেশীয় অভিজাত রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতির নিশ্চিন্ততা? কোথায়ই বা ছিল এই রাজা-উজীর ও শেঠ প্রভৃতি রাষ্ট্র-শাসকগণের সততা বা আত্মপ্রত্যয় বা শ্রেণীগত স্বার্থবোধ?

মুঘল রাজত্বও জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, মারাঠা রাজত্বও জনগণের দিকে ফিরিয়া তাকায় নাই। উভয়েরই ভরসা ছিল এই আমীর ওমরাহ ও সুবাদার জায়গীরদারের দল, তাহাদের আদায়ী খাজনা, তাহাদের পোষিত

ফৌজ। যখন দেখি, এই শাসকের দল যে কোনো উপায়ে নিজ নিজ লাভ লইয়া ব্যস্ত, যে কোনো কর্মচারী ঘুষের বশ, ফৌজের বেতন রহে বাকী, আর সকলের বিশৃঙ্খলার চাপ গিয়া পড়ে অসহায় রায়তের উপরে, নিরুপায় কারিগরের উপরে, তখন বুঝি এই রাষ্ট্রের আর কোনো আশাই নাই (*India through the Ages, J. N. Sarker*.)

সপ্তদশ শতাব্দের শেষ দিক হইতে সমস্ত অষ্টাদশ শতাব্দ ব্যাপিয়া ভারতবর্ষের সমাজের এইরূপ অবস্থা ছিল। শাসকশ্রেণীর এই অধোগতি পূর্বেও ঘটিয়াছে, নূতন শাসকের অভ্যুদয় হইয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ বণিকের মতো তাহারা কোনো শ্রেণীবিপ্লবের ফল নয়, মূলত কোনো নূতন ব্যবস্থাও তাহারা প্রবর্তন করে নাই। ভারতের কৃষি-সভ্যতা, তাহার পল্লী-রূপ, তাহার গৃহশিল্প প্রভৃতি পূর্বে অটুট ছিল; সহজভাবেই এই কৃষি-সমাজ বরাবর প্রসারিত হইতে পারিয়াছে। কিন্তু এবার তাহার আয়ু ফুরাইয়া আসিল:

"All the civil wars, revolutions, conquest, faminess, strangely complex, rapid and destructive as the successive action in Hindustan may appear, did not go deeper than surface. England has broken down the entire framework of Indian society, without any symptoms of reconstruttion yet (1853) appearing. This loss of his old world, with no gain of a new one, imparts a particular kind of melancholy to the present misery of the Hindu and separates Hindustan ruled by Britain, from all its ancient traditions, and from the whole of its past history." (Marx in *N. Y. Daily Tribune*, June 25, 1538).

মধ্যযুগের সেই যুগান্ত সূচিত হইল—প্রথমত, ভূমি-সম্পর্কের পরিবর্তনে, জমিদারী ও রায়তোয়ারী প্রথার প্রবর্তনে। ইহাতে পুরানো সামান্তশ্রেণী লোপ পাইল, নূতন এক জমিদার তালুকদারের দল সৃষ্টি হইল। দ্বিতীয়ত শাসনকার্য হইতে গোড়ার দিকে দেশীয় শাসকশ্রেণীকে বর্জন করা হয় তৃতীয়ত, বৃটিশ বাণিজ্যের অবাধ প্রসারের জন্য আবার ভারতীয় গৃহশিল্পের ধ্বংস সাধিত হয়। ফলে সূতাকাটা, তাঁতবোনা লোপ পাইল, এতদিনকার পল্লীসমাজ যেরূপ সুস্থ, সম্পন্ন ও আত্মনির্ভরশীল ছিল, উহা আর সেইরূপ রহিল না। পুরাতন সামন্তগণ নাই; পুরাতন পল্লীসমাজ ভাঙিয়া যাইতেছে;

পুরাতন আর্থিক কাঠামো টুকরা টুকরা হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য তখন আপনারই অজ্ঞাতে নূতন শক্তিও সেই সমাজে সঞ্চারিত হইল—রাজকার্যের প্রয়োজনে ভারতবাসী ইংরেজী শিক্ষার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল; বিলাতের মালে বাজার ভরিয়া উঠিল; আর শেষে রেল, টেলিগ্রাফ, ষ্টীম শিপ প্রভৃতির যোগে ভারতবর্ষের এই আধুনিক যুগ আসিয়া গেল। বিলাতি মালের প্রয়োজনে চাই যানবাহন, যানবাহনের প্রয়োজনে চাই কয়লা, কয়লার পরেই লোহা। তখন আবার দেখা দিল কল-কারখানা,—আর বিদেশীয় পুঁজির মালিকানা।

এইরূপে ভারতের সুদীর্ঘ মধ্যযুগ এবার যুগান্তের মুখে আসিয়া ঠেকিল। এই যুগান্তের সন্ধ্যা বাঙলা দেশেই প্রথম ঘনাইয়া উঠে। বাঙলা দেশের মধ্য দিয়াই তাহার স্বরূপ ক্রমশ প্রকাশলাভ করে, আর 'বাঙালার কাল্‌চার'ই, সেই বণিগ্‌রাজের যুগের বাস্তব ও ভাবগত প্রেরণার প্রধান প্রমাণ, নিদর্শন ভারতীয় সংস্কৃতির আধুনিক আত্মপ্রকাশের—তাহার রূপান্তরের ও [illegible]।

গ্রন্থপঞ্জী

বৌদ্ধজাতক, অর্থশাস্ত্র (Tr. Ed. R. Shama Sastry).

অশোক অনুশাসন।

হিউএন্ সং (য়ুয়ান চাং) এর ভ্রমণকাহিনী (Ed. Watters).

অল বেরুণীর ভারত বৃত্তান্ত প্রকৃতি।

A History of Indian Literature, M. Winternitz.

A Short Cultural History of India, H. G. Rawlinson.

Indian Social Polity, Bhupendra Nath Dutt ; (ঐ ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি)

The Economic History, of Ancient India, S. K. Das.

History of Mediaeval India, C. V. Vaidya.

History of Bengal, Vol. I & Vol. II Ed. R. C. Majumder. Sir J. N. Sark

History of Aurangzib, J. N. Sarker.

Influences of Islam on Indian Culture, Tarachand.

Cambridge History of India

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা : অর্ধ-আধুনিক রূপ

ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির যুগ ও বাঙলার কাল্‌চার

"বাঙলার কাল্‌চার" কি? সাহিত্যের একজন রসজ্ঞ অধ্যাপক বলিয়াছিলেন: "বাঙলার কাল্‌চার? একটা কড়া পাকের সন্দেশ ও একটা ভালো পাকের পেড়া দাও দিকিনি কোনো তামিলকে; তিনি খেয়ে বল্‌লেন, 'বোথা আর ইকুয়েলি সুইট্টা,' দুইই সমান মিষ্টি। ঠিক কথাই,—অনেক কালের কাল্‌চার থাকলে বোঝা যায় সব মিষ্টিই এক নয়।" রসজ্ঞ অধ্যাপক মহাশয়ের মতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশও সায় দিবে,—বাঙলার কাল্‌চারের সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিনিধি আর কিছুই নয়—রসগোল্লা ও সন্দেশ।

পৃথিবীতে মিষ্টান্ন পরিবেশন করিয়া নাম রাখিতে পারা কম কথা নয়, ইতরজনেরা অনেক দিন পর্যন্ত মনে রাখে—এমন কি দেখা যাইতেছে অধ্যাপকরাও কেহ কেহ তৃপ্ত হন। কিন্তু নানা অধ্যাপকের নানা মত। শিল্পকলার অধ্যাপক শাহিদ সুরহাবর্দি বিলাতে নাকি তাঁহার বন্ধুদের বলিয়াছিলেন: "বাঙলার বৈশিষ্ট্য? পৃথিবীতে যা আর কারুর নেই—তার নাম আড্ডা।" —মনে হয় এমন সত্য কথা আর কখনো বলা হয় নাই। ক্লাব, পার্টি, সভা-সমিতি, ব্যবসাপত্র—সবই আমাদের ঢিলে-ঢালা—আড্ডা না হইলে চলে না। কিন্তু জানি, অধ্যাপকরাও একমত নহেন। নাম করিতে সাহস করি না, আর একজন অধ্যাপক বলিয়াছেন: "বাঙলার বাইরে 'ভদ্রলোক' নেই —এ্যারিষ্টোক্র্যাসি আছে, আর আছে 'কিসান'; কিন্তু এমন 'ভদ্রলোকের সমাজ' দেখেছ মেড়ো পাঞ্জাবীর দেশে?"

তিনি একবারে মুঘল যুগের পূর্ব হইতে প্রমাণ লইয়া উপস্থিত হইবেন; দেখাইবেন,—'সদ্‌-বৌদ্ধ-করণ-কায়স্থ-ঠকুর' মহাশয়েরা কেমন করিয়া মানসিংহ, তোডরমল, মুর্শিদ কুলি খাঁ প্রভৃতিদের যুদ্ধে হিম-সিম খাওয়াইয়াছেন, জমাবন্দির হিসাবপত্রে সকলকে সর্ষে ফুল দেখাইয়াছেন, অবশেষে ক্লাইভ-

হেষ্টিংস্-এর দিনে রাজ্যে-বাণিজ্যেও আপনাদের আসন পাকা করিয়া লইয়াছেন।

এই দাবীতে অবশ্য ইতিহাস কতটা সায় দিবে তাহা জানি না। তবে আমরা সবাই স্বীকার করিতাম যে,—ইংরেজ আমলে বাঙলা দেশের বাহিরে 'ভদ্রলোক' নাই। তখনকার 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' বারে বারে, অবাঙালীদের না পারিলেও, আমাদের মনে করাইয়া দিত—আমরাই অবাঙালীর দেশে শিক্ষার মশাল জ্বালিয়াছি, আর আমাদের সাহিত্য আছে।

এই সত্যটা কিন্তু কাহারও উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। দেশী অধ্যাপকেরা যা'ন, একজন ইংরেজ অধ্যাপকও বলিয়াছেন: "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ইংরেজী ছাড়া আর একটিমাত্র ভাষায় এপর্যন্ত সাহিত্যসৃষ্টি হইয়াছে, সে ভাষা বাঙলা।" সাম্রাজ্যের নূতন সংস্করণ কমনওয়েল্থ্ সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। উপনিবেশের পরিবেশেও বাঙলা সাহিত্য বিকশিত হইতে পারিয়াছে।

ভাষা ও সাহিত্য অবশ্যই মানস-সংস্কৃতির প্রধান বাহন। কিন্তু সাহিত্য কাল্চারের এক বা অদ্বিতীয় মানদণ্ড নয়। এবং সকল জাতির মানস-সম্পদের প্রকাশও সাহিত্যে হয় না। কাহারও বা সে জীবন রূপ লাভ করে কাব্যে-সাহিত্যে, কাহারও বা সঙ্গীতে-গানে, কাহারও শিল্পে-চারু-কলায়, আবার কাহারও বা অপূর্ব কারু-নৈপুণ্যে। মোটামুটি ভাবে তবু কথাটা গ্রহণ করা যায় যে, যে জাতির সত্যই একটা সাহিত্য আছে তাহার কাল্চার অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে অথবা ভারতবর্ষে স্বাধীন বাঙালীর যদি এই দাবী থাকে, তবে সেই দাবী সে তুলিবে না কেন?

একটা তর্ক উঠিতে পারে—'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে'র কথাটা আর না পাড়িলেই বা ক্ষতি কি? আর সেই সাম্রাজ্যের মধ্যে কি বাঙলা ভাষাতেই সাহিত্য রচিত হইয়াছে? অন্য ভাষায় হয় নাই? হিন্দীর সাহিত্য-সংসার সুবিশাল; উর্দুর জগৎ সুমার্জিত ও সুসংস্কৃত; মারাঠীর সাহিত্য সুদৃঢ় ও সবল; গুজরাতীর সাহিত্যও সচেতন। ইহাদের প্রত্যেকেরই পিছনে পাঁচশত হইতে হাজার বৎসরের ইতিহাস। শুধু বাঙলার কথা বলিয়া লাভ কি?

কিন্তু যে হিসেবে কথাটা বলা হইয়াছে সে হিসাবে তাহা মিথ্যা নয়। সত্যই আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের সহিত ঐ সব সাহিত্যের তুলনা হয় না। এই হিসাবে ছাড়াও আধুনিক কালের ভারতীয় জীবন ও ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে বাঙলার সাহিত্যকে মোটের উপর মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা

যায়। সেই মানদণ্ডে ভারতীয় সংস্কৃতির আধুনিক রূপটিও নিরূপণ করা চলে। তাঁহাতে দেখিতে পাই—ব্রিটিশ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির কি রূপান্তর ঘটিল; সাম্রাজ্যবাদের পরিবেশে অর্ধ-সামন্তের যুগে—পরাধীন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে—ভারতীয় সংস্কৃতি কোন্ পরিণতি লাভ করিয়াছে; বিংশ শতকের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে দুনিয়াব্যাপী গণ-বিপ্লবের পরিবেশে ঔপনিবেশিক কালচারের গতি কোন্ মুখে? তাহার পরে বুঝিব স্বাধীনতার যুগের বর্তমান ভারতীয় সংস্কৃতির হিসাব।

ঔপনিবেশিক ভারতীয় জীবনের হিসাবেই বাঙলার কাল্‌চার একবার বুঝিয়া দেখিবার মতো—সন্দেশ রসগোল্লা হইতে একেবারে কলিকাতার চায়ের দোকানের 'ডবল ডিমের মাম্‌লেট' পর্যন্ত সব কিছুই এই কাল্‌চারের পরিচয় দিত, এখনো দেয়। কারণ, বাঙলায় শুধু সেই ঔপনিবেশিক যুগে সাহিত্যই জন্মে নাই, আরও অন্যান্য জিনিসেরও উদ্ভব হইয়াছে। আর তাহার অনেক উত্তরাধিকার স্বাধীনতার যুগেও গৌরবের। কারণ তাহা শুধু ঔপনিবেশিক নয়, আধুনিকতার তপস্যাও।

যেমন দেখি—সেই যুগেও বাঙালী একটা নূতন চিত্রকলা আবিষ্কার করিয়াছে, নূতন নৃত্যকলার উদ্বোধন করিয়াছে, এক নূতন সঙ্গীত-শৈলী রচনা করিয়াছে। বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, প্রত্নতত্ত্বে তাহার তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বাঙলার সে নবজাগরণ রূপ লাভ করিয়াছে ধর্মান্দোলনে, সমাজসংস্কারে; আর শেষে বাঙালীর সেই আবেগময় প্রেরণা জন্ম দিয়াছে প্রবলতম বিপ্লবী প্রয়াসকে। ঔপনিবেশিক কাল্‌চারের সর্বাপেক্ষা মহৎ সৃষ্টি মানসক্ষেত্রে—সাহিত্য; কর্মক্ষেত্রে—রাজনীতিতে বিপ্লবী আন্দোলন। জীবনে এত ঐশ্বর্য আর ভারতবর্ষের অন্য কোনো জাতি সেই পর্বে দাবী করিতে পারে না। তাহার মধ্যেও যে আধুনিকতার তপস্যা চলিতেছে, তাহাও তাই সত্য। আর যাহা বাঙলার ক্ষেত্রে প্রকট, ভারতের অন্যত্রও তাহারই ছিল প্রবর্তনা, আরও একটু প্রচ্ছন্ন বা

১।

'ভারতীয় সংস্কৃতির ঔপনিবেশিক রূপ" দেখিতে পাওয়া যায় তখনকার বাঙালার সংস্কৃতিতে। ঔপনিবেশিক অসঙ্গতির জন্যই আমরা ইহাকে একটু পরিহাসের দৃষ্টিতে দেখিয়া নাম দিয়াছি 'বাঙলার কাল্‌চার'।

বাঙলার সংস্কৃতি ঃ পূর্বকথা

বাঙালার এই 'কাল্‌চার' অবশ্য আধুনিক কালের জিনিস—এত অভিনব যে ইহাকে "বাঙলার সংস্কৃতি" বলিতে যেন বাধে। "বাঙলার কৃষ্টি" বলিয়াও ইহার অনুবাদ করিতে পারি না। কারণ ভারতীয় সংস্কৃতির যে ধারা বাঙলা দেশেও বহিয়া আসিতেছিল—এখনও মৃতপ্রায় বহিতেছে, একেবারে থামিয়া যায় নাই—বাঙলার কাল্‌চার যেন এই আধুনিক কালে (ইংরেজ আমলে) তাহার সহিত যোগসূত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে, আর তাহা খুঁজিয়াও পায় না। অন্যদিকে 'কৃষ্টি' বলিতে আমরা যদি উহার মূলগত কৃষ্‌ধাতু ও কৃষির উপর জোর দিই, তাহা হইলে বলিতে পারি—'বাঙলার কাল্‌চার' কৃষি বা কৃষকের সহিত সম্পর্ক প্রায় রাখে না—ইহা বাবুদের জিনিস, "বাবু কাল্‌চার"। এই জন্যই আমরা 'বাঙলার কাল্‌চার' বলিলেই বুঝাই ভদ্রলোকের জিনিস; এই কথা মনে মনে বুঝি বলিয়াই বলি, অন্য প্রদেশে 'ভদ্রলোক' নাই।

"বাঙলার কাল্‌চার" নূতন জিনিস, "বাঙলার সংস্কৃতি" কিন্তু বহুদিনের। আমাদের যে সাহিত্য, সঙ্গীত, যে নৃত্যকলা ও শিল্পকলা লইয়া আমাদের এই ঔপনিবেশিক যুগের গর্ব—এমন কি যে "ভদ্রলোক" শ্রেণী লইয়া আমাদের সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক সমস্যা—তাহার জন্ম বেশি দিন হয় নাই। সে জন্মিয়াছে ইংরেজের বাঙলা জয়ের পর, সাম্রাজ্যবাদের আওতায়, প্রায় ইংরেজের তৈয়ারী কলিকাতা শহরে। কিন্তু "বাঙলার সংস্কৃতি"—বাঙলার মাটি, বাঙলার জল ও বাঙলার জনজীবনের সঙ্গে জড়াইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল হাজার বৎসর হইতে, ভারতীয় সংস্কৃতির কোলে (দ্রষ্টব্য *History of Bengal*, Vol I, Dacca Universty)।

প্রায় হাজার বৎসর আগে "পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাঙালী সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হইল, ইহার মূল সুর বাঁধা হইল।" তাহার পূর্বেকার ও পরেকার মধ্যযুগের কাহিনী আমাদের জানাই আছে—কিন্তু তাহা ভারতীয় ইতিহাসের বড় জোর একটি গর্ভাঙ্ক মাত্র। সপ্তম শতাব্দী হইতে ভারতীয় শিষ্ট-সংস্কৃতির সহিত সমসাময়িক বাঙলা শিষ্ট-সংস্কৃতির যোগাযোগ দেখা যায় (দ্রঃ *Early Culture of Bengal 1962*)। তারপর পাল যুগে বাঙলী নিজের একটা বিশিষ্ট স্থান

সেই সংস্কৃতির ইতিহাসে করিয়া ফেলিয়াছিল। তখন সংস্কৃতে তাহার "গৌড়ী রীতি" গৃহীত হইল; তাহার ধীমন ও বীতপাল নূতন মূর্তি-শিল্পের প্রচলন করিল; বৌদ্ধগুরুদের হাতে মহাযান নূতন রূপ পাইল এবং সিদ্ধাচার্যরা দেশীয় ভাষায় গান রচনা করিয়া গেলেন (চর্যাপদ)। এইরূপে প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে বাঙলা ভাষার জন্ম হইল। সঙ্গে সঙ্গে জন্মিল বাঙালী জাতি। তারপর মধ্যযুগে তুর্কীবিজয় ও মুসলমান আধিপত্যের দিনে বাঙলার সংস্কৃতি ক্রমেই বাঙলা ভাষার ভিত্তিতে আপনার রূপ আবিষ্কার করিতে লাগিল। বাঙলার সংস্কৃতির সেই মধ্যরূপও মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অনুচ্ছেদমাত্র—তখনও কৃষি সমাজের সুদীর্ঘ মধ্যাহ্ন। তাই বাঙলায়ও তখন দেখা যায় তেমনি সুযোগও সমন্বয়—সেই আউলিয়া, বাউল, সুফী, দরবেশ ও নানা সম্প্রদায়ের সহজিয়া দল, সেই মুসলমান শাসক, ব্রাহ্মণদের পৌরাণিক ধর্মপ্রচার. বৈষ্ণব মহাজনদের চেষ্টায় বাঙলা সাহিত্যের বিকাশ, আর তেমনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের আত্মরক্ষার দায়ে লৌকিক রচনা। বৈষ্ণব প্রেরণায় সেই সংস্কৃতিতে ষোড়শ-শতব্দীতে একটা প্রবল স্রোত বহিয়া যায়—বাঙলা সাহিত্য ও বাঙলা জীবনযাত্রা একটা নিজস্বতা লাভ করে।

গৌড় ও নবদ্বীপে শিষ্ট চর্চার কেন্দ্র থাকিলেও বাঙলার সংস্কৃতির প্রধানত কেন্দ্র ছিল পল্লী। "বাঙলার সংস্কৃতি মুখ্যত গ্রাম্যজীবনকে অবলম্বন করিয়াই পুষ্টিলাভ করিয়াছিল"। প্রাচীন ভারতে নগর ও নাগরিক রীতি ও জীবনযাত্রার উল্লেখ কম পাই না—বিশেষত বাৎস্যায়নে বা মৃচ্ছকটিকাদির মত সাহিত্যে। কিন্তু ভারতীয় সমাজ যে মুখ্যত ছিল পল্লীসমাজ, এই কথা সত্য। বাঙালী সমাজের সম্বন্ধে এই কথা আরও অধিকতর সত্য—এই দেশে নগর বা রাজধানী বলিয়া যাহা সচরাচর উল্লেখিত হইয়াছে আসলে তাহা গ্রামেরই চিহ্নিত (হয়ত বা কল্পিত) সংস্করণ। ভারতীয় প্রধান প্রধান জীবনকেন্দ্র হইতে দূরে পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত বলিয়া এই গ্রাম্যসভ্যতা নিজ নিজ গ্রামের মধ্যে আরও বেশি নিজের ধারায় নিজের নিয়মে নিজ নিজ বিচিত্র ও বহুবিস্তৃত আচার-বিচার চিন্তা ধারণা লইয়া চলিতে পারিয়াছে—তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য "মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় হিন্দুযুগের অবসানের পরে বাঙালী গ্রামীণ সভ্যতার গণ্ডী প্রথমে কাটাইয়া নিখিল ভারতীয় সভ্যতার অংশ গ্রহণের একটা বড় সুযোগ পাইল।" কিন্তু তখনো একদিকে ঢাকা মুর্শিদাবাদের মুসলমান দরবার, অন্য দিকে বিষ্ণুপুরের রাজসভা—ইহার বাহিরে মধ্যযুগের সেই মার্জিত সংস্কৃতির

অনুশীলনের নিদর্শনই বা বেশি আমরা পাই কোথাও? (দ্রষ্টব্য *History of Bengal*, Vol II, Dacca University)।

প্রায় এক হাজার বৎসর হইল বাঙলা ভাষা জন্মগ্রহণ করিয়াছে—অল্পাধিক ঐরূপ সময়েই ভারতীয় অন্যান্য প্রধান প্রধান ভাষাও জন্মগ্রহণ করিতে থাকে। তাই ভারতীয় এই সব জাতিদের সংস্কৃতির (হিন্দী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতির) নিজস্ব জীবনও প্রায় হাজার বৎসরের, তাহার পুর্বে তাহারাও ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির জঠরে, অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া। কাজেই জন্মিল যখন তখন বাঙালী সংস্কৃতি, মহারাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি জন্মিল এতদিনকার (প্রাক্-মুসলিম্) ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার লইয়া। বাঙালী সংস্কৃতি উহার মগধ-মণ্ডলের রূপ ও ঐতিহ্যের বিশেষভাবে অংশীদার হয়। তাহার সঙ্গে অন্য বড় অংশীদার অবশ্য ছিল মৈথিল, আর প্রায় সেই সময়েই (খ্রীঃ ১০০০,—১২০০ শতকের) পৃথক হইয়া অংশীদার হইয়া উঠিল ওড়িয়া, এবং একটু পরেই (চতুর্দশ শতাব্দী হইতেই) অসমীয়া প্রভৃতি বাঙলা ভাষার নিকট জ্ঞাতি-গোষ্ঠী কাজেই বাঙালী সংস্কৃতির আদিযুগে (আনুমানিক খ্রীঃ ১,০০০-১,২০০ শতক) ও মধ্যযুগে (সাধারণ ভাবে মুসলমান আমলে) মোটামুটি এই সংস্কৃতির যে ভিত্তি ও যে গঠন ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনা সূত্রেই আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি—শুধু পুর্বপ্রত্যন্তবাসী বলিয়া বাঙলার অধিবাসীরা ছিল উত্তর ভারতের বা পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের প্রধান প্রধান সংস্কৃতিকেন্দ্র হইতে আরও বিচ্ছিন্ন, ঐ সব সংস্কৃতি দ্বারা ক্রমপ্রভাবিত এবং ঐ সব উন্নাসিক শাসক ও শাস্ত্রকারদের চক্ষে (বেদ ও আরণ্যকের যুগ হইতেই) একটু অবজ্ঞাত; আচার-বিচারে শিথিল, ধ্যান-ধারণায় 'পাষণ্ডী' (heretic); ভাষায় সৃষ্টিতেও হয়ত অনিয়ন্ত্রিত, রাষ্ট্র সংগঠনেও কেন্দ্রানুগ নয়,—বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, রাঢ়, গৌড়, বরেন্দ্র প্রভৃতি বিবিধ অঞ্চলে অঞ্চলে অনেকাংশে স্বতন্ত্র। আবার উহারই মধ্যে আদিম বা অতি প্রাচীন উপজাতির (tribal) কৌম-বন্ধন ও রাষ্ট্র-বন্ধনের অথবা ভারতীয় সমাজের বর্ণভেদ জাতিভেদ, শ্রেণীভেদের মধ্যে এই বাঙালী একেবারে তলাইয়া যায় নাই। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থের সমাজ এখানে চাপিয়া বসিয়াছে। ক্ষত্রিয়েরা (যেমন কর্ণাটাগত সেনেরা) উহার মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে। কৈবর্ত, বাগদী, ডোম, ও ব্যাধ নিষাদ জাতিরা বিশিষ্ট জাতি হিসাবে তথাপি তুচ্ছ নয়। বাঙলার কাল্‌চারকে

বুঝিবার জন্য তাই বাঙলারও আদি ও মধ্য যুগের বাঙালী সংস্কৃতির কয়েকটি প্রধান বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

প্রথমত, মোটামুটি উৎপাদন-শক্তির ও উৎপাদন-পদ্ধতির কোনো বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই; তাই উৎপাদন-সম্পর্কেরও পরিবর্তন প্রয়োজন হয় নাই। অর্থাৎ সমাজ-বিপ্লব ঘটে নাই; ঘটিয়াছে রাজা-রাজ্যের পতন-অভ্যুত্থান, শাসক-শ্রেণীর কোনো এক বংশের পতন ও তাহার পরিবর্তে অন্য এক বংশের উত্থান। সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া এখানে তাই নানা পরিবর্তনের মধ্যে অব্যাহত রহিয়াছে "ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারা।"—উহার প্রাচীন হিন্দু পদ্ধতিই মুসলমান আমলে আরও সুদৃঢ় হয়। আকবরের পরে (জাহাঙ্গীরের সময়ে) সেই জায়গীরদারী প্রথা বিলোপের চেষ্টা হয়, তাহা দুর্বল হইয়া পড়ে। অন্যদিকে ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যবিস্তারে ক্রমে দেশে বাণিজ্য বৃদ্ধি ও মুদ্রামূলক বিনিময়ের (money economy) প্রসার ঘটিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে বণিগ্‌যুগের প্রথম সূচনা হয়। সিরাজদ্দৌলার সিংহাসনচ্যুতির পিছনে ছিল একদিকে তাহার সামন্ত, অন্যদিকে বণিক-ব্যাঙ্কারদের (ক্লাইভ, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ) চক্রান্ত।

দ্বিতীয়ত, দীর্ঘকাল এখানে যে সামন্ততন্ত্র চলে তাহার রূপ কি? ভারতের অন্য প্রদেশের অপেক্ষাও বাঙলাতে অধিক ছিল বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্যজীবন, তাহার স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থিক জীবন, সেই ভারতীয় কৃষিপ্রধান সমাজ; গ্রামের কারিগর, বৃত্তিধারীদের গ্রামের শস্যে জীবনযাপন; গ্রামের তন্তুবায়, কুম্ভকার, রজত, নাপিতের কাজে গ্রামের অভাব পূরণ; কৃষি-সমাজে ভূমির অধিকার ও উহার তারতম্য দিয়া সামন্তকালীন পীঠিকা-(status) নির্ণয়,—ভূমিহীন কারিগর, ক্ষেতমজুর প্রভৃতির শূদ্র অনাচরণীয় জাতিতে (caste) পরিণতি; দখলী স্বত্ববান্ কৃষদের 'আচরণীয়' (তুলনীয় হেলে কৈবর্ত ও জেলে কৈবর্ত; ধোবা ও চাষা ধোবা) নবশাখ জাতিতে স্থানলাভ, উচ্চবর্ণের জাতিদের সামন্ত ভৌমিকত্ব ভোগ; আর ভূমির সর্ব স্বামিত্বে রাজার একচেটিয়া অধিকার। মূলত ইহার পরিবর্তন ঘটে নাই; কিন্তু ইহার মধ্যে প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নভাবে জাগিয়াছে বিরোধ তাই বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে।

তৃতীয়ত, এই দীর্ঘসময়ের মধ্যে শ্রেণী-বিপ্লব না ঘটিলেও শ্রেণীসংঘাত ছিল, তাহার ঘাত-প্রতিঘাতে সমাজ পরিবর্তিত হইয়াছে আপোষের মধ্য দিয়া, সংস্কারের মধ্য দিয়া। সেই শ্রেণীবিরোধের প্রমাণ

রহিয়াছে কোথাও অর্ধপ্রকাশিত, কোথাও প্রচ্ছন্ন। প্রধানত সেই শ্রেণী-বিরোধ (ক) মধ্যযুগের সাধারণ নিয়মে রূপ লইত ধর্ম বা সম্প্রদায়গত প্রতিদ্বন্দ্বিতার বা বিরোধের আড়ালে ধর্ম আন্দোলন রূপে। (বৌদ্ধ ও হিন্দু, কিংবা বৈষ্ণব ও শাক্ত, মুসলমান ও হিন্দু প্রভৃতির বিরোধ মিলনের মধ্যে এই মূলসূত্র লক্ষ্য করা যায়)। (খ) ধর্মমত ও দেবদেবীর পূজা লইয়া এই শ্রেণীবিরোধ অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিত, যেমন, ধর্মমতের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদীর পৌরাণিক অবতারবাদ (রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি) ও সাধারণ শ্রেণীর লৌকিক গুরুবাদ ('নাথ গুরু'দের হইতে একেবারে আউল-বাউলের ও কর্তাভজাদের গুরুবাদ পর্যন্ত); এবং মুক্তির আদর্শেও নির্বাণ, লৌকিক মহাসুখবাদ এবং বৈদিক যজ্ঞ ও সংস্কারকর্ম এবং লৌকিক পূজা ও তন্ত্র (বৌদ্ধ বজ্রযান, সহজযান, শৈব, সহজিয়া ও শাক্ত তন্ত্র পর্যন্ত) ইহার মধ্যে রহিয়াছে মতাদর্শের বিরোধ। এই বিরোধের মধ্যখানে একটা আপোষপথ বৈষ্ণব অবতারবাদ ও গুরুবাদ এবং বৈষ্ণব সদাচার, দয়িত সম্পর্ক, পরকীয়া তত্ত্ব ও সাধনা নির্মাণ করে। আবার অন্যদিকে দেবদেবীর ব্যাপারে সাধারণ লোক পৌরাণিক দেবদেবীদের গ্রহণ করিলেও তাহা গ্রহণ করিল নিজেদের শ্রেণীজীবন ও ধারণা অনুযায়ী (প্রতিতুল্ ভগবতের শ্রীকৃষ্ণ ও ধামালির শ্রীকৃষ্ণ, পৌরাণিক শিব ও চাষী শিব ও গাজনের শিব; বণ্ডী ও বনদেবী চণ্ডী; দুর্গা ও অন্নপূর্ণা)। কখনো বা লৌকিক দেবদেবীরা উচ্চ দেবদেবীর বিরোধ সত্বেও আপনাদের প্রতিষ্ঠা করেন (যেমন মনসা), কখনো বিনা বাধায় তাহারা প্রতিষ্ঠিত হন (যেমন, দক্ষিণ রায়, কালু রায়, কিংবা 'ধুন' বা কচ্ছপরূপী ধর্মঠাকুর)। (গ) ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের বিশেষ সৃষ্টি যে জাতিভেদ (caste) সেই জাতিগত (caste) দ্বন্দ্ব, বৈষম্য প্রভৃতির আকারে শ্রেণীসংঘাতই আসলে রূপলাভ করিয়াছে (বিশেষতঃ সেন রাজত্বে কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি ও সুবর্ণ বণিক প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত বেণে বা বৈশ্য সমাজের—সম্ভবত সদ্ধর্মানুরাগী বৌদ্ধ বলিয়া।—অধোনয়ন প্রভৃতি স্মরণীয়)। সেকালের বিরোধ বৈষম্যরই ফলে বাঙলায় বৌদ্ধ নাই এবং মুসলমানের এত সংখ্যাধিক্য এবং বৈষ্ণবধর্ম এত বিস্তৃত।

বাঙলার এই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ধারা হইতে বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা বিশ্লেষণ করিলে যাহা মনে জাগে তাহা এই—

"প্রথমত, যে-বাঙলায় বৌদ্ধ ধর্মের এত প্রচলন দশম শতাব্দীতেও দেখি—সে বৌদ্ধ সম্প্রদায় বাঙলায় মধ্যযুগে কোথায় লুপ্ত হইল?

অনুমান করা হয় মৌর্য যুগ হইতে বাঙলা দেশে উত্তর ভারতীয়দের বসতি-স্থাপন আরম্ভ হয়। সপ্তম শতাব্দীতে পাহাড়পুরে জৈন বৌদ্ধ ও (বৈষ্ণব) শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার প্রমাণ হইতে বুঝি এই সব ধর্ম তখন কত প্রসারিত। পাল ও সেনরা বাঙলায় সেই ভারতীয় সংস্কৃতির বিজয় (গৌড়ীরীতি, পাল-সেন ভাস্কর্য ও স্থাপত্য প্রভৃতি) সুদৃঢ় করেন। কিন্তু বিজিত জনসাধারণ, বাঙালী জনসমাজ, সেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও আচার-নিয়ম সম্পূর্ণ পরিপাক করিয়া লইতে পারে নাই। তাহারা তাহাদের আদিম তন্ত্রমন্ত্র, যোগ-প্রক্রিয়া, লৌকিক দেবদেবী তখনো ছাড়ে নাই। তাই ব্রাহ্মণ্যবাদ অপেক্ষা বাঙলাদেশ মহাযানী তন্ত্রের (বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতির) ও শৈব সিদ্ধাচার্যদের (ইঁহারা অনেকেই ছিলেন হাড়ি, ডোম জেলে) প্রধান কেন্দ্র হয়। লৌকিক ভাষায় (বাঙলায়) ধর্ম প্রচার এই সিদ্ধাদেরই কীর্তি,—ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নয়। এই বাঙলা রচনাই ইহাদের একটা বিদ্রোহের প্রমাণ। বলা কর্তব্য, এই লৌকিক ধারা, তন্ত্রের মূলস্থিত এই গুহ্যসাধন ও যোগপ্রক্রিয়া হয়ত মৌর্য যুগের পূর্ব হইতেই আদিম জনসমাজের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল—যদিও শাস্ত্রকার তাহাকে মানিত না, উল্লেখযোগ্যও মনে করিত না; কিন্তু এই লৌকিক ধারাই সিদ্ধাদের বৌদ্ধতন্ত্র ও শৈবতন্ত্রের মধ্য দিয়া আসিয়া শাক্ত ও বৈষ্ণবের তন্ত্রাচারের বামাচার দিয়া সহজিয়া, আউল-বাউল, (দেহতত্ত্ব, কর্তাভজা, নানা ভজন) প্রভৃতিতে, ও একটু শুদ্ধিলাভ করিয়া রামপ্রসাদের কালী কীর্তনে আসিয়া পৌছিয়াছে। চর্যাপদ হইতে বাউলের গান, দেহতত্ত্বের গান, সুফী মারফতী গান, গীতি কবিতার ঐতিহ্য এবং লৌকিক সঙ্গীত ও লৌকিক কাব্যের এক বিশিষ্ট এবং সরস ধারা এই বাঙালীর সঙ্গীতপ্রিয়তা ও রসবোধের একটি প্রমাণ। বৈষ্ণব "পরাবলী" এই ধারারই লৌকিক রস ও ভাগবত মধুর রসে মিশাইয়া এক অপরূপ সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে—কীর্তন রূপে এক নিজস্ব সংগীত শৈলীও দান করিয়াছে। বাঙলায় বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার বিবর্তনে মানস-সম্পদের দিক হইতে এই ভাবে ঘটিয়াছে বৈষ্ণব ধারার উদ্বোধন; তাহা লৌকিক রস-উত্তরাধিকার ও পুনরুজ্জীবিত হিন্দু সদাচারের ফল।

বাস্তবপক্ষে বৌদ্ধ জাতিগুলি সেন যুগে অপমানিত ও অধিকার-বঞ্চিত হইয়া মুসলমান বিজয়ের পরে সহজেই মুসলমান হয় ("নিরঞ্জনের রুষ্মা' ইহারই আভাস)। যাহারা তাহার পরেও বৌদ্ধ ছিল তাহারা নিত্যানন্দ ও গোস্বামীদের প্রয়াসে 'নেড়া-নেড়ী' রূপে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করে।

দ্বিতীয়ত, মুসলমান রাজশক্তির বিজয়লাভে হিন্দু শাসকশ্রেণী যে দেড় শত দুই শত বৎসরের মত (খ্রীঃ ১২০০-খ্রীঃ ১৪০০) মুহ্যমান হইয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে 'বাস্তত্যাগী' হইয়া পুঁথিপত্র, ধনজন লইয়া নেপাল ও বঙ্গে আশ্রয় লয়, এবং নিম্নস্তরের মত উচ্চ স্তরেরও কিছু কিছু হিন্দু তখন বিজেতার ধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দু বা বৌদ্ধ নিম্নবর্ণের পক্ষে ধর্মান্তর গ্রহণে অবশ্য শুধু জাতিগত (caste) পীঠিকা (status) ভাঙিয়া ফেলা চলিল, কিন্তু সামন্ত সমাজের শোষণ তাই বলিয়া তাহাদিগকে অব্যাহতি দিল না। উচ্চস্তরের হিন্দুদের পক্ষে অবশ্য শাসক-প্রতিষ্ঠা অনেক সময়ে অক্ষুণ্ণ রহিল। কিন্তু দুই শতাব্দী অতিবাহিত হইতে হইতে দেখি—শাসকশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানরা নিজেদের শ্রেণীগত নৈকট্য ও শোষক স্বার্থের ঐক্য বুঝিয়া লইয়াছে—পুরাতন হিন্দু শাসকশ্রেণী তখন মুসলমান সুলতান ও মুসলমান শাসকশ্রেণীর সহিত বুঝাপড়া করিয়া লইয়াছে। ধর্মান্তর গ্রহণ করিলে ত কথাই নাই, না করিলেও প্রাক্তন হিন্দু শাসকশ্রেণী অনেকাংশে নূতন শাসকশ্রেণীর দোসর রূপেই পরিগণিত হইয়াছে। রাজা গণেশ ও যদুর (মুসলমান শাসকশ্রেণীর সমর্থনের জন্যই কি তিনি 'জালালুদ্দিন' হন ?) পূর্বেই সেনাপতি রায় রাজাধর, আচার্য বৃহস্পতি মিশ্র প্রভৃতিকে আমরা দেখিতে পাই মুসলমান গৌড়েশ্বরের সহকারীরূপে সনাতন-রূপ (ব্রাহ্মণ), মালাধর বসু 'গুণরাজ খাঁ,' লস্কর রামচন্দ্র খাঁ (কায়স্থ), মহাকবি দামোদর (বৈদ্য), কুলধর শুভরাজ খাঁ (বণিক)—প্রভৃতির নাম পাঠান প্রশাসকবর্গের মধ্যে সুপরিচিত। হোসেন শাহ ও নসরত শাহের সুশাসনকালে (পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে) এই হিন্দু-মুসলমান শাসকশ্রেণীর সহযোগ সুনিশ্চিত হইয়া যায়—কর্মচারী ও ভৌমিক "ভদ্রলোক" সমাজের বিকাশও চলিতে থাকে। আর উহারই আওতায় একদিকে মুসলমান শাসকদের প্রয়োজনে আর অন্যদিকে হিন্দু ব্রহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্ণের স্বধর্মরক্ষার চেষ্টায় বাঙলা ভাষার পৌরাণিক কাব্য (রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত বা শ্রীকৃষ্ণকথা ও মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি) রচিত হইতে থাকে। সামন্ত রাজাদের সভায়ও কোচবিহারে, রোসাঙ্গে, ভুলুয়ায়, পরাগল খাঁ'র সভায় এই বাঙলা রচনার ধারা উৎসাহ পাইতে থাকে। বলিতে গেলে মধ্য যুগের বাঙলার ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতিরও এক প্রধান পরিচয় বাঙলা রচনায়, অন্য পরিচয় সংস্কৃতচর্চায়—নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতির পণ্ডিত সমাজে। বিশেষত মিথিলা হইতে ন্যায়চর্চা বিজিত করিয়া আনিয়া নবদ্বীপে 'নব্যন্যায়ের' আসন প্রতিষ্ঠায়, রঘুনন্দন প্রভৃতির নূতন স্মৃতি প্রণয়নে

তাহা সুদৃঢ় হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদী ভদ্র সমাজ মুসলমান রাজত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়ান নাই —মুসলমান ধর্ম হইতে বরং হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদকে রক্ষা করিতে লাগিল, রাজনৈতিক বশ্যতা মানিয়া ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সংগঠিত করিয়া চলিল।

অবশ্য মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতির প্রধান পরিচয় এই সব শাস্ত্রে নয়,—নব্যন্যায়েও নয়, বৈষ্ণব শাস্ত্রেও নয়,—সেই পরিচয় বৈষ্ণব আন্দোলনে,—বিশেষ করিয়া বাঙলায় রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যে, পদাবলীতে, জীবনী গ্রন্থে, এবং বাঙালী হিন্দু সমাজকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গোস্বামীদের নূতন করিয়া সংগঠনে। জাতিচ্যুত বৌদ্ধ নেড়ানেড়ীদের দীক্ষা দান, নিপীড়িত সুবর্ণবণিক প্রভৃতি জাতিদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সসম্মানে স্থান লাভ; ও প্রবীর প্রতাপ রুদ্র ও বিষ্ণুপুরের বীর হাম্বীরের রাজ্যে বৈষ্ণব জীবন-চর্যার প্রতিষ্ঠা—এইসবের মধ্য দিয়া যে সত্য স্পষ্ট হয় তাহা এই যে, হোসেন শাহ নসরৎ শাহের রাজত্বে আপেক্ষিক স্বস্তি লাভ করিয়া বাঙালী পণ্ডিত ও অভিজাত গোষ্ঠী এক ভক্তি-প্রধান ও রস-প্রধান আন্দোলনে সমাজের আপামর সাধারণকে 'কোল' দিতে চাহিলেন—এটিও বুদ্ধদেবের মত সংস্কারবাদী (অরাজনৈতিক) প্রয়াস। এক বাহু রাজা ও অভিজাতের দিকে আর বাহু লোক-জীবনে প্রসারিত। ইহারই অনুরূপ একটি সংস্কারবাদী প্রয়াস করেন তন্ত্রাচার্যরা—সেই লোকসমাজের আদিম তন্ত্রচারকে খানিকটা শোধন করিয়া, খানিকটা বৈদিক আগম-নিগম ও ও পৌরাণিক দেবতা শিব ও শক্তির সহিত সংযুক্ত করিয়া।

চতুর্থত, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলেও সাধারণ পল্লীজীবী বাঙালী মুসলমান শরিয়তি ইস্‌লামকে গ্রহণ করিতে থাকে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে। তৎপুর্বে শরিয়তি জীবনযাত্রা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত একমাত্র শহর ও রাজধানীর নিকটস্থ মুসলমানদের উপর, দূর পল্লীগ্রামের জনতার উপর নয়। কিন্তু তাই বলিয়া মুসলমান ধর্মের জাতিভেদহীন বিরাট আবেদন হিন্দুধর্ম ও সমাজকে প্রভাবিত করে নাই, তাহা নয়। কবীর নানকের মত চৈতন্যেরও চেতনায় উহা নিশ্চয়ই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আবার মুসলমান বৈষ্ণব কবি পদাবলীও লিখিয়াছেন। এবং মুসলমান সুফী ধর্মের আলোকে বাঙলার লৌকিক রস-প্রধান সাধনা যে নূতন কাব্য-সম্পদ (মারফতি গান, মুরশেদি গান) লাভ করিল তাহাও স্মরণীয়। কিন্তু মুসলমান বিজয়ের প্রধান এক ফল আরবী রম্যন্যাস ও ফারসী (জিন-পরী প্রভৃতির) কল্পনা-

কাহিনীর প্রসার ; অন্য প্রধান লাভ ঐহিক জীবনযাত্রার সম্বন্ধে কাব্যচেতনা। মুসলমান কবি দেবতার গান গাহেন না—শুধু জিনপরীর কথা বা জঙ্গনামাও তাহার গান নয়। তাঁহার গান মানুষের কথা—পদ্মাবতীর (আলাওলের), লোরচন্দ্রানীর (দৌলত কাজীর)। আর অনেকাংশে এই মানবীয় চেতনাই 'ময়মনসিংহ গাথার' মত গাথা-সাহিত্যের লৌকিক ধারাকেও পুষ্ট করে। বলা বাহুল্য, লৌকিক কাব্যেরই একটি ধারা এই গাথার মধ্যে প্রবাহিত—আর বাঙলা সাহিত্যে 'ময়মনসিংহ গীতিকার' তুলনা নাই। 'চর্যাপদ', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', রামায়ণ ও মহাভারতের চিরনূতন কাহিনী, কবিকঙ্কণের চরিত্র-চিত্রণের সার্থকতা, এবং পরম মধুর বৈষ্ণব পদাবলী ও ভাব-গম্ভীর 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত', শেষে রামপ্রসাদের ও কলানিপুণ ভারতচন্দ্রের কাব্য—উচ্চ গোষ্ঠীর ন্যায় ও স্মৃতি আর সংস্কৃতি কাব্য রচনা কিংবা পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য প্রচার,—এইসব কম সম্পদ নয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মনে হয়, আদি ও মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতি বড় বৈচিত্র্যহীন,—এক ঘেয়ে,—প্রায়ই বিষয়বস্তু এক ; রাম, শ্রীকৃষ্ণ, কিংবা চণ্ডী-মনসা প্রভৃতি দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা। প্রায়ই কাব্যকলা বৈশিষ্ট্যহীন, নিরর্থক পদ মিলানো, অধিকাংশ সাহিত্য পদবাচ্য নয়। বলা বাহুল্য, এই বৈচিত্র্যহীনতা ও একঘেয়েমি বাঙলার সমতল ক্ষেত্রের প্রতিলিপি নয় (শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাহারই আভাস একস্থলে দেখিয়াছেন)। উহা অতি-দীর্ঘায়িত সামন্ত যুগের মন্থরতার প্রতিলিপি ও অতি-বিচ্ছিন্ন এক পল্লীপ্রধান কৃষি-সভ্যতার বর্ণহীনতার প্রতিচ্ছবি। আর ইহার মধ্যেও যাহা প্রধান কীর্তি তাহা লৌকিক প্রেরণার,—ও লৌকিক সংযোগে প্রবুদ্ধ এক সংস্কারপন্থী লৌকিক ধর্মান্দোলনের (বৈষ্ণব)।

বাঙলার লোক-সংস্কৃতির রূপ

কিন্তু যে বাঙালী সংস্কৃতি এই হাজার বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে, ক্রমশ নানাদিকে বিকশিত হইয়াছে, সেই পল্লীপ্রধান বাঙালী সংস্কৃতি আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। এখনো তাহা লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু অত্যন্ত পরিচিত বলিয়াই আমরা তাহার সহজ ও অনাড়ম্বর উপকরণ ও উপাদানকে আমাদের সংস্কৃতির প্রধান অবলম্বন বলিয়া ভাবিতে কুণ্ঠিত হই। তথাপি দুই একজন সংস্কৃতির

সন্ধানী বাস্তবদৃষ্টিতে উহার রূপ সন্ধানে অগ্রসর হন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। তিনি অবশ্য মোটেই বস্তুবাদী নহেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি বস্তুনিষ্ঠ; সেই হিসাবেই তাঁহার বিবরণ বস্তুবাদীর পক্ষে আরও মুল্যবান্। তাঁহার কথিত বাঙালার সংস্কৃতির দিগদর্শনীটি তাই আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। আদি ও মধ্যযুগের বাঙলার সংস্কৃতিকে আমরা কি কি সৃষ্টিতে, অনুষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠানে এখনো দেখিতে পাই, ইহা হইতে তাহা সংক্ষেপে জানিতে পারি।

"[১] বাঙলার বাস্তব সভ্যতা—বাঙলায় খড়ের চালের কুটীর, পুর্ববঙ্গের বেতের ও বাঁশের কাজ (লুপ্তপ্রায়); প্রাচীন কালের কাঠের কাজ; ঘর বা চণ্ডীমণ্ডপের থাম বা খুঁটি, চালের বাতা প্রভৃতিতে নানা চিত্র খোদাই করা (এই কাষ্ঠ-শিল্প এখন প্রায় লুপ্ত, এবং ইহা প্রাচীন হিন্দু যুগের কাষ্ঠের ও প্রস্তরময় ভাস্কর্যের ক্ষীণ ধারাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল); ইটের মন্দির; পোড়ামাটির ভাস্কর্য—ইটের উপরে নানারকমের খোদাই (মন্দির ও ইটে খোদাই কাজের কথা বলিলে, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বিষ্ণুপুরকে বিশেষ করিয়া এই শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ উল্লেখ করিতে হয়)—ইটে খোদাই ও মন্দিরের বাস্তুবিদ্যা এখন প্রায় অবলুপ্ত।

চিত্রবিদ্যা—পুথির পাটা (লুপ্ত), দেওয়ালের গায়ে ছবি আঁকা (প্রায় লুপ্ত), এবং অন্যপ্রকারের খাঁটি বাঙালী চিত্র-পদ্ধতি, যথা পশ্চিমবঙ্গের পটুয়ার পট, পুর্ববঙ্গের গাজীর পট, কালীঘাটের পট, শরায় ছবি আঁকা—ইহার অধিকাংশই এখন প্রায় লুপ্ত; মাটির ঠাকুর গড়া, ঠাকুরের চালচিত্র আঁকা, মাটীর সঙের পুতুলের পৌরাণিক ও সামাজিক চিত্র—ইহাই আমাদের বার্ষিক পুজাগুলির কল্যাণে কোনও রকাম টিকিয়া আছে; রঙ্গীন মাটীর পুতুল, কাঠের পুতুল, গ্রাম্যশিল্পের মধ্যে অন্যতম শিল্প—জাপানী সেলুলয়েড পুতুলের সহিত আর প্রতিযোগিতা করিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেনা।

দাঁইহাটা কাটোয়ার ভাস্করদের পাথরের দেবমূর্তিশিল্প ও অন্য ভাস্কর্য; মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতার ভাস্করদের হাতীর দাঁতের কাজ— মূর্তি, চুড়ি, কৌটা প্রভৃতি (বাঙলার হাতীয় দাঁতের কারুশিল্প অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রতিষ্ঠিত হয়, গত শত বৎসরের মধ্যে বাঙালী শিল্পীরা এই কাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এখন তাহাদের প্রভাব দিল্লী, জয়পুর, অমৃতসর পর্যন্ত পঁহুছিয়াছে); বিষ্ণুপুর ও ঢাকার শাঁখের কাজ—শাঁখে খোদাই, আধুনিক

মিহি কাজের শাঁখের সরু চুড়ি ইত্যাদি। সারা বাঙলায় সোলার কাজ—খেলনা, ঠাকুরের সাজ, ডাকের সাজ।

এতদ্ভিন্ন ঢাকার রূপার তারের কাজ (filgree work); কলিকাতার রূপার নকাশীতোলা কাজ (repousse work); কলিকাতার স্বর্ণকারদের অলঙ্কারশিল্প, এতে বিলাতি ধরণের মীনার কাজ—এগুলির প্রভাব বাঙলার বাহিরেও গিয়াছে।

বাঙলার পিতল-কাঁসার বাসন, মুর্শিদাবাদ-খাগড়ার কাঁসার বাসন, বিষ্ণুপুরের পিতল কাঁসা ও ভরনের বাসন, দাঁইহাট কাটোয়ার, বলপ্রাস বর্ধমানের এবং ঢাকা প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের নানাস্থানের পিতলের বাসন; কলিকাতার পিতলের বাসন ও পিতলের দেব-বিগ্রহ, নবদ্বীপের মুর্তি ঢালাই, শাসপুর কুমিল্লা প্রভৃতি স্থাপনের ইস্পাতের কাজ।

বাঙলার খাদ্যদ্রব্য—বাঙলাদেশের বিশিষ্ট শাকশুক্তানি ঘণ্ট প্রভৃতি, নিরামিষ ব্যঞ্জন ও তরকারী; বাঙলার বিশেষত পূর্ব-বঙ্গের মৎস্য ও মাংস পাকের বিশেষ রীতি, বাঙলার কাসুন্দী, ছড়াতেঁতুল, আচার, খেজুরে গুড়, পাটালী, মুড়ী, মুড়কী, চালের গুড়া নারিকেল ও ক্ষীরের তৈয়ারী নানা পিষ্টক ও মিষ্টান্ন; বীরখণ্ডী, কদমা, খাজা, গজা, সীতাভোগ, মিহিদানা ইত্যাদি; ছানার তৈয়ারী মিষ্টান্ন, বাঙলার নিজস্ব মিষ্টান্ন, নানাপ্রকারের সন্দেশ, পানিতোয়া রসগোল্লা।

বাঙলার পরিধেয়—মিহি মল্‌মল্‌, ঢাকার জামদানী (ফুলতোলা কাপড়), টাঙ্গাইল, শান্তিপুর, চন্দ্রকোণা, ফরাসডাঙ্গা (চন্দনগর) প্রভৃতি স্থানের ধুতি ও শাড়ী, কুমিল্লার ময়নামতীর শাড়ী, মুর্শিদাবাদের রেশম, গরদ, তসর, বীরভূম বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের রেশম, রাজশাহীর মট্‌কা; বীরভূম তাঁতিপাড়ার কড়িধার তসর; বিষ্ণুপুরের রেশম—কেটে, চেলী, নকশাদার ও বুটিদার শাড়ী। অধুনা বিলুপ্ত মুর্শিদাবাদের বালুচরের শাড়ী; হিমালয় প্রান্তের মোটা পশমী কম্বল; অধুনা প্রচলিত বাঙলার ছাপা রেশমের শাড়ী।

মেদিনীপুরের সূক্ষ্ম মাদুর; কুমিল্লা, নওয়াখালি ও শ্রীহট্টের শীতল পাটি; বাঙলার নিজস্ব কৃষিশিল্প—নানাপ্রকারের ধান, পান, পাট; বাঙলার মাছের চাষ।

বাঙলার নৌ শিল্প—বিভিন্ন প্রকারের নৌকা (এই নৌ শিল্প এখন প্রায় অবলুপ্ত); বীরভূমের বুহিতাল এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এই শিল্প সমধিক উন্নতিলাভ করিয়াছিল।

[২] বাঙলার অনুষ্ঠান-মূলক সংস্কৃতি—বাঙলার সামাজিক বিধি ও ধর্মসাধন সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান, বাঙলার হিন্দুর সম্পত্তি উত্তরাধিকার রীতি—দায়ভাগ; বাঙলার সামাজিকতা—বিবাহ, শ্রাদ্ধ আদিতে উৎসব ও মিলনের রীতি এবং জ্ঞাতি, কুটুম্ব ও মিত্রসম্মেলনের বিশেষ রীতি; বাঙলার পূজা, —দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, দোল, রাস, সরস্বতী পূজা, সত্যনারায়ণ পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা প্রভৃতি বিশেষত্বময় পূজা ও অনুষ্ঠানসমূহ এবং বিশেষ করিয়া বাঙালীর জীবনে দুর্গাপূজা; মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত বালিকাব্রত; পারিবারিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় জীবনকে অবলম্বন করিয়া নানা উৎসব—আটকৌড়ে, অন্নপ্রাশন, ভাইফোঁটা, জামাই ষষ্ঠী, পৌষপার্বণ, নবান্ন, অরন্ধন, নূতন খাতা প্রভৃতি।

মেয়েদের আলিপনা আঁকা, কাঁথা সেলাই ও অন্যান্য গৃহ-শিল্প।

বাঙলার লাঠিখেলা ও অন্য ক্রীড়া-কসরৎ; রায়বেঁশে নাচ; পূজার সময় ঢাকী-ঢুলীদের নাচ; পূর্ববঙ্গের আরতী নৃত্য; মেয়েদের ব্রতনৃত্য; অন্য নানাপ্রকারের নৃত্য।

বাঙলার মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ঈদের উৎসব, মহরমের ও শাহ্-মাদারের অনুষ্ঠান; ও নানাবিধ নৃত্য ও কসরৎ।

[৩] বাঙলার মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি—টোল চতুষ্পাঠি; বাঙলার সংস্কৃত বিদ্যা—জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙলার সংস্কৃত কবি, দার্শনিক ও পণ্ডিতদের কীর্তি; বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ; নবদ্বীপ, ভাটাপাড়া বিক্রমপুর, কোটালীপাড়া, ত্রিপুরা, চট্টল, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্দ্রের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের পরম্পরা; নৈয়ায়িক ও স্মার্তগণ; কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রমুখ তান্ত্রিক আচার্যগণ; মধুসূদন সরস্বতী প্রমুখ বৈদান্তিকগণ; বাঙলার আধ্যাত্মিক পদ; বৌদ্ধ চর্যাপদ; বড়ু চণ্ডীদাস। শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব; কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত; ব্রজবুলী ভাষার সৃষ্টি ও ব্রজবুলী সাহিত্য; বৈষ্ণব পদকর্তৃগণ, শাক্তপদ—রামপ্রসাদ; রামায়ণ মহাভারতের রূপ; দেশে রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর বিশিষ্ট অভিব্যক্তি; শাক্ত, শৈব ও বৌদ্ধ মঙ্গলকাব্যের উপাখ্যান—বেহুলা-লখিন্দরের কথা, কালকেতু-ফুল্লরা ও ধনপতি-খুল্লনার কথা, লাউসেন কথা (অধুনা কম প্রচলিত); পশ্চিমবঙ্গের ধর্মপূজা; বাঙলার কথকতা, কীর্তন গান—কীর্তনের অভিব্যক্তি,—গড়েরহাটি বা গরাণহাটি, মনোহরশায়ী, রাণীহাটি প্রভৃতি বিভিন্ন রীতির কীর্তন; বাউল ও

ভাটিয়াল গান ; বাঙলার শ্লোক-পড়ার সুর, কবি, ঝুমুর ; তরজা ও অন্ত গ্রাম্যগীতি ; পাঁচালী, বাঙলার যাত্রা, জারিগান ; মুসলমান মারফতী গান, মর্সিয়া গান ; বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান পুথিপড়ার সুর, বাঙলার পয়ার। পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুগানের বাঙলায় প্রচার—বাঙলার ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী, ঢপ, খেমটা।

বাঙলার সাহিত্য—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চৈতন্য বৈষ্ণবগুরুগণের চরিত্র বিষয়ক পুস্তক, পদাবলী সাহিত্য, প্রাচীন বাঙালীর কাব্যাবলী (মঙ্গল কাব্য) ইত্যাদি ; ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ, বাঙলা সাহিত্যের বিশিষ্ট বস্তু—গীতি-কবিতা।

এই প্রকারের বিভিন্ন বস্তু ও বিষয় অবলম্বন করিয়া ইংরাজদের আগমন পর্যন্ত বাঙলার নিজস্ব সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল।" ("জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য"—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—পৃঃ ৩৯-৪৩—১৩৪৫ বাং)।

এই হিসাব সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ না হোক, মোটামুটি বেশ বিশদ। ইং ১৯৩৮ সালে রচিত এই সুদীর্ঘ অভিভাষণে বাঙালী সংস্কৃতির যে পরিচয় আছে আজ তাহাতে বড় বড় গ্রন্থ ও তথ্যরাশি যোগ করিয়া আর বেশি নূতন সত্য যোগ করা হয় মাত্র। কিন্তু লক্ষ্য করিবার মত কথা এই যে, এই অমূল্য তালিকায় মানস-সম্পদের উল্লেখ আছে, পণ্যেরও উল্লেখ আছে ; উল্লেখ নাই জীবিকার মূল উপকরণের, উৎপাদন প্রথার, সমাজ-সংস্থানের। তাই এই সংস্কৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে এই হিসাবের সহায়ে আমরা কিছুটা ধারণা করিতে পারি, কিন্তু সর্বাংশে সেই সংস্কৃতি বুঝিতে পারি না।

সংস্কৃতি বনাম 'কাল্‌চার'

তথাপি অবশ্য বুঝি, যাহাকে আমরা 'বাঙলার কাল্‌চার' বলিতাম তাহা নিশ্চয়ই এইসব জিনিস লইয়া নয়। সেই 'কাল্‌চারের' দৃষ্টিতে বাঙলার এই জীবনযাত্রা মনে হইত 'সেকেলে' এবং 'পাড়াগাঁয়ে', তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। অবশ্য ক্রমশ বাঙলার পট, চালচিত্র মূর্তিমন্দির আলপানা প্রভৃতি লোক-কৃষ্টির একটা সত্যকার ও কৃত্রিম সমাদরও বাড়িয়াছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার—বাঙালী আধুনিক যুগেও গ্রামেই থাকে। শতকরা ৮০ জন বাঙালী (দুই-বঙ্গের) গ্রামবাসী ; বাঙালীর অপেক্ষা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের (বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রদেশগুলি বাদ দিলে দেখিব) অধিবাসীরা তাহাদের

শহরে বেশি বাস করে। সভ্যতার "শহুরে মাপকাঠিতে" (standard of urbanisation) বাঙালী উচ্চে নয়—যদিও পশ্চিমবঙ্গরাজ্য তাহারা এখন অগ্রসর। তাই, এই উপরের চিত্রকেই বাঙলার চিত্র, বাঙালার সংস্কৃতি, না বলিয়াও উপায় নাই। কিন্তু 'বাঙলার কাল্‌চার' বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহাই যে এই বাঙলার সংস্কৃতিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে তলাইয়া দিতেছে, তাহাতেও আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই। আর তাহাতে আমাদের দুঃখও বিশেষ নাই। অবশ্য দুঃখ থাকিলেও ফল হইত না,—কারণ 'বাঙলার কালচার' ঔপনিবেশিক যুগের বাঙলার সামাজিক অবস্থার ও ব্যবস্থার ফল—আধুনিক জীবনের সঙ্গে পরাধীন জীবনের সংযোগে তাহার উদ্ভব; কিন্তু তাহার মধ্যে আধুনিক ও ভাবী-জীবনের বীজও না ছিল তাহা নয়।

বাঙলার কাল্‌চার-বিলাস

তবে ঔপনিবেশিক মার্কামারা বাঙালীর কালচার বিলাস কৌতুক-ব্যঙ্গের বিষয়, সে দৃষ্টিতে তাহা তখন (১৯৪১ ইং) এইরূপ বোধ হইত। 'বাঙলার কাল্‌চার' 'সেকেলে'ও নয়, 'পাড়াগেঁয়ে'ও নয়। তাহা অন্য জিনিস। কিন্তু কি জিনিস, সে বিষয়ে অধ্যাপকগণ কিন্তু একমত নন, শুধু এই বিষয়ে তাঁহারা একমত যে, উহা 'পাড়াগেঁয়ে' নয়, 'সেকেলে'ও নয়। দরকার হইলে 'বাঙলার কাল্‌চার' বলিতে অবশ্য আমরা বৈষ্ণব কবিতার নাম করিব; ফ্যাশান হিসাবে কীর্তনের উচ্চাঙ্গতা প্রমাণ করিব; এমনকি রেডিওতে ভাটিয়ালী চালাইব; ড্রয়িংরুমে পল্লী-সঙ্গীতের চর্চা করিব; পুরানো কুলা, কাঁথা, পিঁড়া কলিকাতায় বহিয়া আনিয়া 'বাঙলার কৃষ্টির' জন্য প্রাণপাত করিব; আর কলম-ধরা আঙুলে আমাদের কন্যারা পর্যন্ত কলিকাতার সিমেণ্ট-বাঁধানো সভাতলে আলপনা আঁকিতে বসিবেন। কিন্তু আমরা সকলেই জানি, উহা আমাদের স্বাভাবিক ও জীবন্ত অভ্যাস নহে, কৃত্রিম 'কৃষ্টি-চর্চা'—ইহার সহিত আমাদের যোগসূত্র আর নাই, তাই এই প্রাণপাত পরিশ্রমেও সেই পল্লীপ্রাণ 'বাঙলার কৃষ্টি' বাঁচিয়া উঠিবে না। যে সামন্ততন্ত্র ও পল্লীসমাজে এইসব জীবন-উপাদান ও এই জীবনযাত্রা সহজ ও স্বাভাবিক ছিল সেই সামন্ততন্ত্র ভাঙিয়া গিয়াছে, সেই পল্লীসমাজ ম্রিয়মান—কৃষি-সংস্কৃতির সেই স্তর শিল্প-প্রধান সাম্রাজ্যবাদের আঘাতে পরিবর্তিত হইয়াছে। তাই সেই স্তরে যেসব সৃষ্টি সহজ ও সম্ভব

ছিল, তাহা পরে সহজ ও সম্ভব নয়। জনগণও তাহ এ সব উপাদান অনুষ্ঠানকে সহজ রূপ দিতে পারে না, আর তাহাকে বিকাশ করিতে পারে না। আমরা 'ভদ্রলোকেরা' ত তাহা হইতে আরও দূরে—আমরা উহাকে জীবন্ত রূপ দিব কি করিয়া? তাই ফ্যাশন হিসাবে চেষ্টা করি এসবকে বাঁচাইয়া তুলিবার। অবশ্য আমাদের এইরূপ 'কৃষ্টি-চর্চা'ও এই 'বাঙলার কাল্‌চারের' একটা অঙ্গ—যেমন, বিলাতী শিল্পীদের চক্ষে নিগ্রো আর্ট আদরণীয়, যেমন আমাদেরই শিল্পীদের চক্ষে সাঁওতাল-জীবন ও বৌদ্ধযুগ একটা রোমান্টিক বিষয়-বস্তু। আমাদের পুরাতন আচার অনুষ্ঠান আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর জীবনযাত্রার পক্ষে এতই দূরবর্তী ঠেকে যে, আজ বিদেশী অতিথিকে সংবর্ধনা করিবার কালে প্রথমেই মনে পড়ে আয়োজনটা 'ওরিয়েণ্টাল' হওয়া চাই। তারপর অধ্যাপকের বাড়িতে পাঁতি লইতে ছুটি, "স্যর, চন্দন 'ওরিয়েণ্টাল' হবে ত?" অর্থাৎ, কি আমার দেশীয়, কি আমার দেশীয় নয়, তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি, মনে শুধু একটি খাঁটি দেশীয় ভাবই তবু নিজের অজ্ঞাতে জাগিয়া আছে—পাঁতি লওয়া।"

ইহাই বিংশ শতকের প্রথমার্ধের ঔপনিবেশিক যুগের বাঙলায় কাল্‌চারের পরিচিত রূপ—উহা ৯০% জনের জিনিস নয়, অথচ উহা ৯০% জনের সেই পাঁতি লইবার মনোবৃত্তি ছাড়িতে পারে নাই; উহার আসন শহর, বলিতে পারি একটিমাত্র শহর—কলিকাতা; উহার জন্মও এই শহরের সঙ্গে, অর্থাৎ ইংরেজের কর্তৃত্বে।

বাঙলার কাল্‌চারের কেন্দ্র

ভারতবর্ষে ইংরেজের অভ্যুদয় তিনটি শহরকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হয়—মাদ্রাজ, কলিকাতা, বোম্বাই। ইহাদের গায়ে ইংরেজ রাজত্বের তিন যুগ, ইঙ্গ-ভারতীয় বা আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির তিন স্তর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইত। (লেখকের 'শহরের রূপ ও স্বরূপ', আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসর, পৌষ, ১৩৪৮; লেখকের *History of Madras*, Calcutta Municipal Gazette, Nov. 9, 1940; লেখকের *Bombay: Where it beats Calcutta*, Calcutta Municipal Gazette, Nov. 30. 1940; লেখকের *This Calcutta Culture*, Calcutta Municipal

Gezette, Nov. 25, 1939 দ্রষ্টব্য)। যেমন মাদ্রাজে প্রথম যুগের সেই আবহাওয়া রহিয়া গিয়াছিল; নূতন শিল্পযুগের হাওয়া ঠিক বহে নাই; বোম্বাইতে নবজাত 'জাতীয় ধনিক তন্ত্র' (national bourgeoisie) 'স্বাজাত্য' ও 'স্বদেশী'তে (শব্দটি বিশেষ অর্থযুক্ত) প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করে। আর কলিকাতায় খাঁটি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যাহ্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও শেষ হয় নাই—বণিক ও ধনিক ইংরেজ পুঁজিপতিরূপে এক বিলাতি পুঁজির এবং ঔপনিবেশিক জীবনযাত্রার পত্তন করিয়াছে।—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে তাহাতে দেশী মাড়োয়ারী ভাটিয়া ভাগীদার জুটিতে থাকে। মোটের উপর ইংরেজের প্রথম উদয় বাঙলায়: তাহার প্রধান প্রতিষ্ঠা বাঙলায়। আবার ইংরেজের রাজত্বের ফলেই বাঙলায় ও সমগ্র ভারতে একভাবে "আধুনিক যুগ" আরম্ভ হয়। ইংরেজ যুগের ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বোচ্চ নিদর্শনও তাই এই 'বাঙলার কাল্‌চার'; "আধুনিক যুগের" প্রথম পীঠস্থানও তাই ইংরেজের শহর এই কলিকাতা। এখান হইতেই আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত হইত। প্রধানত বাঙলাতেই আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি রূপ লাভ করে,—তারপর অনুরূপ ঢেউ অন্যান্য প্রদেশে ছড়াইয়া যায়।

ইংরেজী আমলের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আপন আপন চেতনা ইংরেজ রাজত্বে যাহা জাগিয়া উঠিতেছিল, প্রাগ্‌গামী বাঙলার জীবন ও চিন্তা হইতে তাহা প্রেরণা সঞ্চয় করে, তাহারই অবশ্য 'আপন-আপন' ছাঁদে, ভঙ্গিতে—আধুনিক হিন্দী, মারাঠী, গুজরাতীভাষী জাতিগুলি আপনাদের অনুরূপ কালচারও সৃষ্টি করিতে যত্নপর হয়। এই আধুনিক কালের খর্বিত ভারতীয় সংস্কৃতির মুখ্য প্রতিনিধি 'বাঙলার কাল্‌চার'। যাহা বাঙলার কাল্‌চার সম্বন্ধে প্রধানতম সত্য, তাহা ঐ সব আধুনিক ভারতীয় কাল্‌চার সম্বন্ধেও প্রধানতম সত্য;—গৌণ বিষয়ে পার্থক্য, অবশ্য সুবিদিত। ভারতীয় সংস্কৃতিকে যে পূর্বযুগের সংস্কৃতিরক্রমবিকাশ বলিলে চলিবে না, তাহা আমরা দেখিতেছি। তাহার কারণ, এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় জীবনযাত্রায় এক আমুল পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, ইংরেজের ভারত আগমনও সেই পৃথিবীব্যাপী পরিবর্তনের পরিচয় দেয়—তাহা হইতেই সভ্যজগতে সামন্তযুগের অবসান ও বণিগ্‌রাজের অভ্যুদয় বুঝিতে পারা যায়। আর সেই বণিকৃতন্ত্রের বহু জটিল ঘাত-প্রতিঘাতে যেমন ভারতবর্ষের ইংরেজ বণিকের রাজত্ব লাভ হইল, তেমনি প্রধানত ভারতের

ঐশ্বর্যে বিলাতে ব্রিটেনের শিল্পযুগের পত্তন হইল। আবার ভারতেও সেই শিল্পযুগের আক্রমণ ফলে লোপ পাইল কৃষি-সমাজের গৃহশিল্প ও পল্লী-সমাজের পুরানো ছাঁচ; এই কারণেই সেই পুরানো জন-সংস্কৃতির পুরানো ধারা আজ শুকাইয়া উঠিতেছে; জন-জীবনও নূতন খাতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে—কিন্তু তাহার একালের উপযোগী রূপ ঠিক গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। জন-সংস্কৃতির এই সঙ্কটের সূচনা হয় সাম্রাজ্যবাদের ও বণিকতন্ত্রের আবির্ভাবে আমাদের পুরাতন শিল্প ও কারুশিল্পের ধ্বংসে। তখন দেখা দিল নূতন শাসক ও তাহার তাঁবেদার আমলা দালালের দল; দেশীয় সামন্ত রাজ, জমিদার ও তালুকদার, ফড়ে, ব্যবসায়ী ও উপজীবিকাবলম্বী 'মধ্যশ্রেণী'। ইহা শুধু বাঙলা নয়, ভারতীয় জীবনের প্রধান সত্য। ইহার সম্মেলন-ফলে ফুটিয়া উঠিল ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবে, বিশেষ করিয়া বাঙলা দেশে, এক নূতন 'ভদ্রলোকে'র জীবনযাত্রা; উহারই শ্রেষ্ঠ কীর্তি "বাঙলার কাল্‌চার"।

বাঙলার কাল্‌চারের পর্ববিভাগ

এই কাল্‌চারেরও অবশ্য পর্ব বিভাগ করা হয়। যেমন, প্রথম পর্ব 'রামমোহনী পর্ব' (ইং ১৮১৭-৪৩)। রামমোহনের যুক্তিবাদ (rationalism) সেদিনকার ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে সহজেই আত্মীয়তা স্থাপন করিতে পারিল। কারণ, তখন ফরাসী বিপ্লবের পরস্তরে ইউরোপে রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের (Democracy), ব্যক্তি-স্বাধীনতার (Individualism) ও জাতীয়তার (Nationalism) বোধন চলিয়াছে। সতীদাহ নিষেধ, একেশ্বরবাদিতা, স্ত্রীশিক্ষা, ইংরেজী শিক্ষা প্রচলন প্রভৃতি বহু বিষয়ে রামমোহন ইংরেজের সহায়তা লাভ করেন। তাঁহার চোখে ইংরেজের সংস্কৃতি এক নূতন সম্ভাবনার বাহন রূপে দেখা দেয়; ইহা রামমোহনের যুগাবতার গণ্য হইবার শ্রেষ্ঠ দাবী, এবং উহা যথেষ্ট দাবীও। ইউরোপের সভ্যতা যে যুগান্তরকারী হইবে তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন—ইহার অপেক্ষা বড় তাঁহার প্রতিভার প্রমাণ আর কিছু হইতে পারে না। কারণ, ইংরেজী শিক্ষার অর্থ তখনকার বর্ধিষ্ণু বুর্জোয়া বা বণিকতন্ত্রের শিক্ষার ফল লাভ করা। পৃথিবীতে তখন পর্যন্ত তাহাই সর্বাপেক্ষা উন্নত শিক্ষা। উহার সংস্পর্শে আসিলে ভারতীয়গণের পৌরাণিক ও সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা ও দৃষ্টি পরিবর্তিত হইবে, ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে

ধর্মে, চিন্তায়, আচরণে, অনুষ্ঠানে বিপ্লব আসিতে বাধ্য, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। মেকলে ও লর্ড বেন্টিংকের প্রথম শিক্ষা প্রস্তাবে ও নানা সংস্কারে এই রামমোহনী পর্বের জয় ও অবসান ঘটে ১৮৪০এর পূর্বেই। দ্বিতীয় পর্বে আসিল ফোর্ট উইলিয়মের শিক্ষিত আমাদের 'ইয়ং বেঙ্গলের' পর্ব। ইঁহারা ইংরেজের শিক্ষা দীক্ষায় একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাহাতে নিজেরাই ডুবিয়া গেলেন, দেশকে তখনো নোঙ্গর-ছাড়া করিতে পারিলেন না। কারণ, তাঁহাদের পক্ষে বুঝা সম্ভব হয় নাই—ইংরেজের শিক্ষাদীক্ষা, ইংরেজ সমাজের উপকরণ ইংরেজের সমাজ-সম্পর্ক ও জীবনযাত্রা হইতে উঠিয়াছে। আর এই দেশের সমাজ, ইহার জীবনের উপকরণ, ইহার সমাজ-সম্পর্ক ইংরেজের রাজ্যাধিকারে ভাঙিতেছে বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনে ইংরেজ ধনিকতন্ত্রের ছাঁচে গঠিত হইতেছে না,—গঠিত হইতেছে "ঔপনিবেশিক" (colonial) ছাঁচে। যে 'বিদ্রোহ' প্রায়ই বিপ্লবের পূর্বাভাস 'ইয়ংবেঙ্গল' সেই বিদ্রোহের বাহন—ইতিহাসের শ্রদ্ধেয় গোষ্ঠী। এই দ্বিতীয় পর্বের শেষ হইল ওয়েলেসলি ডালহৌসির সময়ে—যখন বণিকের রাজত্ব রেল লাইন পাতিয়া ব্যবসায় ফাঁদিতে ও বাড়াইতে আরম্ভ করিতেছে। একবার যেখানে রেল লাইন বসিল, সেখানে আর শিল্পযুগের আবির্ভাব ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব হইল না—বিশেষত যখন আবার সেই দেশে আছে সস্তা মজুর, প্রচুর লৌহ ও কয়লা। (Letters—Marx and Engels)। অন্যদিকে এই সময়েই (ইং ১৮৪৩) রাজনৈতিক আন্দোলনেরও সূত্রপাত করিল বাঙালী শিক্ষিতরা এবং সাংস্কৃতিক জাগরণের সূচনা হইল। অতএব, তৃতীয় পর্বে (ইং ১৮৫৮) দেখা দিল ভারতীয় সমাজের সত্যকার সামাজিক পরিবর্তন ; এবং দেখা দিলেন বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিম, কেশব (দয়ানন্দ), ও সর্বশেষে সেই পর্বের সর্বপ্রধান ভারতীয় নেতা বিবেকানন্দ। রেল ও শিক্ষা সংযোগের ফলে প্রথম ভারতীয় স্বাজাত্যের আরম্ভ, আর সিপাহী বিদ্রোহের ফলে খাঁটি সামন্ততন্ত্রের অবসানও ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া এই সময়েই স্থির হয়। তাহার পর চতুর্থ পর্বে ভারতের চক্ষে বিংশশতাব্দীর উদ্বোধন ঘটে বুয়ার যুদ্ধে ও রুশ-জাপানী যুদ্ধে ; উহার চেতনা প্রকাশিত হয় স্বদেশী আন্দোলনে (১৯০৪-৫)। তাহার স্বরূপ ক্রমপরিস্ফুট হইয়া উঠে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শেষে। তখন হইতে (১৯১৮) শুরু হয় ঔপনিবেশক যুগের শেষ পর্ব—সংঘর্ষের পর্ব। একদিকে সোভিয়েতের জন্ম ও দুঃসাহসিক অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা উহার প্রেক্ষাপট। আর গৃহমধ্যে বঙ্কিম সে প্রেরণা আসিয়া পৌছায় (তিলক)-অরবিন্দ হইতে রবীন্দ্রনাথে

উত্তীর্ণ হয়, (গান্ধী)-চিত্তরঞ্জন-রবীন্দ্রনাথে মূর্ত হয় এবং সর্বশেষে ১৯৩০এর পরে তাহাই আর এক নূতন পর্বের ইঙ্গিত (পঞ্চম ?) দান করে—একরূপে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে, (পণ্ডিত জহরলালেও), অন্যরূপে প্রধানত সাম্যবাদী চিন্তায়। স্বাধীন ভারতের জন্মে সেই সমাজতন্ত্রী সংগ্রামের পর্বের পথ মুক্ত হয়।

দ্রষ্টব্য এই যে, বাঙলার কাল্‌চারের নায়কদের মধ্যে একজনও মুসলমান নন। ভারতীয় মুস্‌লিম জীবনযাত্রা প্রধানত শহুরে। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে ও সিপাহী যুদ্ধদমন-আঘাতে সেই জীর্ণ মুসলিম্‌ সংস্কৃতি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল—যেমন তুর্কী আগমণে হিন্দুশাসকের সংস্কৃতি একদিন মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। কিন্তু বাঙলার মুসলমানের সংস্কৃতি পল্লীগত অর্থাৎ জনগণের জিনিস। আমাদের শহুরে কাল্‌চারের উদ্বোধনে সেই পল্লীকেন্দ্রিত জনসমাজের কেহই আহূত হন নাই। তাঁহাদের মধ্যে সবে নূতন কাল্‌চারের শিহরণ জাগিয়াছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে।[১]

দ্বিতীয় কথা এই যে, এই চার পাঁচ পর্বের 'বাঙলার কাল্‌চার'কে প্রায় আধুনিক ভারতীয় কাল্‌চারও বলিতে পারা যায়, বন্ধনী মধ্যস্থ নাম কয়টি শুধু অবাঙালীর। এই কাল্‌চার যতই অগ্রসর হইয়াছে ততই অবাঙালীও সেই ভারতীয় জীবনযাত্রায় প্রাধান্য পুনর্লাভ করিয়াছে। প্রথম দিকে এই প্রাধান্য বাঙালীরই একচেটিয়া ছিল,—কেন ছিল, তাহার ঐতিহাসিক কারণ আমাদের বুঝিবার বিষয়। তাহাই আসলে বাঙলার কাল্‌চারের স্বরূপ, অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতির ঔপনিবেশিক রূপ, আমাদের চোখের সম্মুখে খুলিয়া দেয়।

১ বাঙলার মুস্‌লিম শিক্ষিতদের পক্ষে সত্যসত্যই বাঙলার নিজস্ব জনসংস্কৃতির বাহন হওয়া এই কারণে সহজতর ছিল, কারণ তাহারা জন-জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক হারায় নাই। অবশ্য তাহার অর্থ—তাহাদিগকে বাঙলার জীবন্ত যুগের জন-জীবনকে প্রকাশ করিতে হইবে, তাহার যুগোপযোগী রূপ অধিকার করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে তাহাদিগকে প্রথমত শরিয়তি ইস্‌লাম কথিত সমাজ ও সভ্যতা গড়িবার মোহ—অর্থাৎ ষষ্ঠ শতাব্দীর আরব সভ্যতাকে বাঙলা দেশে বিংশ শতাব্দে প্রবর্তিত করিবার মোহ—ত্যাগ করিতে হইত। দ্বিতীয়ত, এই নূতন মুস্‌লিম চেতনাও পঁচাত্তর বছর আগেকার হিন্দুচেতনার মত ভুল করিতে আরম্ভ করে। নোকরশাহীর আওতায় হিন্দুদের বাঙলার কাল্‌চ্যার চাকরের কাল্‌চার হইয়াছিল। মুসলমান চেতনাও ১৯৩০-৪৭এর সময়ে মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজে আবদ্ধ থাকে, তাঁহারা চাকুরী ও মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার লোভে মাতিয়া থাকায় তাহাদের প্রয়াসও চাকরের কাল্‌চার হইতেই চাহিয়াছিল। 'বাবু কাল্‌চারের' পার্শ্বে বাঙলাদেশ তাহা হইলে দেখা দিত এক 'মিঞা কাল্‌চারে'। বাঙালী মুসলমানের সে শক্তিও আয়ত্ত হইবার পূর্বে তাহারা সর্বভারতীয় মুসলমান সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া পড়েন ও দেশ-বিভাগে বাঙালীত্ব ছাড়িয়া পূর্ব পাকিস্তানী হইলেন। সেইখানে তাহারা আজ ১৯৬৩-৬৪এ সম্বিত ফিরিয়া পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়—আপন বাঙালী গণতন্ত্রী স্বাধীনতার সংগ্রামে।

তাহার পূর্বে এই বাঙলার কাল্‌চারের নানা দিক কয়টি আবার একবার এক নিমেষে আমরা দেখিয়া লই। তাহাতেই ঔপনিবেশিক ভারতেরও আভাস পাওয়া যায়, স্বাধীনতার যুগেও উহার উত্তরাধিকার বাঙলা ও ভারতবর্ষ লাভ করিয়াছে।

ভারতবর্ষে বণিক ইংরেজ রাজা হইলেন ১৭৬৪ হইতে। তারপর কাল্‌চারের নানাপর্বের মধ্যে আমরা দেখি—(১) ব্রাহ্মধর্মের বিকাশ :—ইহার প্রবক্তা রামমোহন হইতে স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী পর্যন্ত নেতৃগণ। ইহার সহিত তুলনীয় ইউরোপের Reformation ও Protestantism—বাঙলা দেশে উহাতে এক হিসাবে বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধারণার অঙ্কুরোদ্গম হয় বলা চলে। (২) হিন্দু জাগরণ :—বঙ্কিম, বিবেকানন্দ হইতে রামকৃষ্ণ মিশন ও হিন্দু মহাসভা পর্যন্ত এই স্রোত বহিয়া আসিয়াছে। ইহার সহিত তুলনীয় ইউরোপীয় ক্যাথোলিক ধর্মের Counter-Reformation. (৩) সংস্কৃত চর্চা—রামমোহনের বেদান্ত অনুশীলন, তত্ত্ববোধিনী সভার প্রয়াস, বাচস্পতির অভিধান, মহাভারতের অনুবাদ হইতে এই ধারা একেবারে বঙ্গবাসীর শাস্ত্রপ্রকাশের অধ্যায় পার হইয়া বিংশ শতকের পণ্ডিতদের মধ্যে আসিয়া ঠেকিয়াছিল। ইহার সহিত তুলনীয় ইউরোপীয় রেনেসাঁস ও তৎকালীন গ্রীকচর্চা। বাঙলাদেশ সংস্কৃত ও পালি প্রভৃতির চর্চায় ও অনুবাদে অগ্রগণ্য ছিল। কিন্তু স্মরণীয় এই যে, রেনেসাঁস বাঙলা দেশে যদি সত্য হইয়া থাকে, সংস্কৃত চর্চায় হয় নাই, হইয়াছে ইংরেজী শিক্ষায়,—অর্থাৎ বুর্জোয়া শিক্ষাদীক্ষায়। (৪) সমাজ-সংস্কার :—রামমোহন, বিদ্যাসাগর হইতে কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ ইহার প্রবক্তা। ইহার ঐতিহ্য ব্রাহ্ম-সমাজ, আর্য-সমাজ ও হিন্দুমহাসভার সম্বল ছিল। কিন্তু সমাজে আজ আর সংস্কারের যুগ নাই, বৈপ্লবিক সংগঠনের যুগ আসিয়াছে। এই দিকে শিল্পপ্রবর্তক ও সাম্যবাদাবলম্বী জনসমাজই সেই প্রেরণার উত্তরাধিকারী। (৫) সাহিত্য :—ঈশ্বরচন্দ্র (শিক্ষা-প্রবর্তক), মধুসূদন ও বঙ্কিম প্রভৃতি ইংরেজী শিক্ষিতদেরই ইহা সর্বাংশে কীর্তি। সাহিত্য হিসাবে ইহার সহিত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বা মধ্যযুগের বৈষ্ণব কাব্যের সম্পর্ক প্রায় নাই। বরং ইহার প্রেরণা—ইহার সহিত তুলনীয়ও—ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইংলণ্ডে যে সাহিত্য জন্মে তাহাই। (৬) নব শিল্প-পদ্ধতি :—স্বদেশী যুগের পরে অবনীন্দ্রনাথ,

নন্দলাল হইতে ইহার জন্ম। ইহার সহিত ভারতীয় প্রাচীন শিল্পধারার বা বাঙলার পটুয়াদের ধারার যোগসূত্র অবাধ ছিল না—যোগসূত্র আছে নিবেদিতার ওকাকুরার, হ্যাভেলের এবং কুমারস্বামীর সহিত। (৭) সঙ্গীত:—ওস্তাদের আসরে বাঙালীর স্থান ছিল গৌণ কিন্তু নগণ্য নয়;—ধ্রুপদে, (উচ্চাঙ্গের কীর্তনে), টপ্পায়, ও যে নূতন সঙ্গীতের ধারা রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেন, তাহা উহার বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রসঙ্গীতে কথা ও সুরের সমন্বয় স্থাপিত হয়। ইহার রহস্যটুকু বুঝিবার মত। লোক-সঙ্গীত সাধারণত কথাপ্রধান; বাঙলার লোক-সঙ্গীতও তাহাই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে সেই কথার সঙ্গে সুরের নূতন সমন্বয়ে ইহা একালের বাঙলায় জনপ্রিয় হইয়াছে। কিন্তু ঠিক এই বিশেষ একটি ভাষার কথার জন্যই মনে হয় তাহা এক নিখিল ভারতীয় সঙ্গীত-শৈলীরূপে গৃহীত হইবে কিনা সন্দেহ। 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত' ছাড়াও একটা বাঙালী সঙ্গীত-ধারা ক্রমশ বিকাশ লাভ করিয়াছে। বাউল, পল্লী-সঙ্গীত, ভাটিয়ালী প্রভৃতি লোক-সঙ্গীতের আবার প্রথম উদ্বোধনও বাঙালী শুরু করে। (৮) নাট্য ও নৃত্যকলা:—বলাবাহুল্য ইহার বাহিরের রূপ যাহাই হউক, ইহার প্রেরণা ও আদর্শ প্রথমত আধুনিক ইংরেজী ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির। ভারতীয় চলচ্চিত্রের আদর্শ, মার্কিন বিকৃতি। মুনাফাই চলচ্চিত্র শিল্পের লক্ষ্য, শিল্প-সৃষ্টি বা মানুষের জীবনকে রূপায়িত করা সে হিসাবে ইহার গৌণ আদর্শ ছিল। তথাপি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বাঙালী প্রতিভা বিশেষ করিয়া চলচ্চিত্রেই নূতন সৃষ্টিপথ আয়ত্ত করিয়াছে। সত্যজিৎ রায় বাঙালী প্রতিভার সেই নূতন দিকের নায়ক। (৯) সাংস্কৃতিক গবেষণা:—ইতিহাসে, পুরাতত্ত্বে, ভাষাতত্ত্বে, নৃতত্ত্বে বাঙালীর দান আদর লাভ করিয়াছে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে কলিকাতার বৈজ্ঞানিকগণই ভারতীয় গবেষকের দ্বার প্রথম মুক্ত করেন। (১০) রাজনৈতিক আন্দোলন:—উহার উদ্বোধন প্রধানত ইংরেজী শিক্ষিতদের দ্বারা বাঙলাদেশে আরম্ভ হয়, আর উহার দুইটি ধারা অন্তত আছে। যেমন, একদিকে ডব্লিও-সি-ব্যানার্জি (নামেই তাঁহার স্বাজাত্যের আদর্শ পরিস্ফুট), আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি লিবারলগণ হইতে বিংশ শতাব্দীর পদস্থ ন্যাশানালিষ্টরা; আরদিকে বঙ্কিম-অরবিন্দের প্রেরণাপ্রসূত বাঙলার নিম্ন-মধ্যবিত্ত বিপ্লবী ধারা,—যাঁহারা ক্রমে বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক চিন্তায় ও সামাজিক কর্মক্রমে বিশ্বাসী, ও গণবিপ্লবের দিকে অগ্রসর হইতে চাহিয়াছেন, মোটামুটি যাঁহারা সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী।

বলা হয়ত প্রয়োজন যে, যাহাকে আমরা 'বাঙলার কাল্‌চার' বলি প্রধানত তাহা সম্ভব হইয়াছে ইংরেজী বা পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য :—উহা ইংরেজ অধিকারেরই অবশ্যম্ভাবী ফল। কাজেই ঐ শিক্ষার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই পাশ্চাত্য শিক্ষা অবশ্য তখনকার 'বুর্জোয়া' শিক্ষা-পদ্ধতি; তাহার ফলে যে আমরা গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্ত্রীশিক্ষা, সংবাদপত্র ও সভাসমিতির মূল্য বুঝিব, ইহা আবার না বলিলেও চলে। দ্বিতীয় একটি কথা, এই বাঙলার কাল্‌চারের দিক কয়টির মধ্যে মানসিক সম্পদগুলিরই হিসাব লওয়া হইয়াছে—পাট, কয়লা, চা প্রভৃতির কথা বলা হয় নাই। কারণ, 'বাঙলার কাল্‌চার'-বাদীদের চোখে কাল্‌চারের সেই বাস্তব হিসাব গৌণ বলিয়া গণ্য হইত। সেই মারাত্মক ভ্রান্তির ফলে ভারতীয় জীবনে নেতৃত্ব লাভ বাঙালীর অসম্ভব।

বাঙলার কাল্‌চারের বনিয়াদ

মোটামুটি এই যে নানাদিকে বাঙলার কাল্‌চার বিকাশ লাভ করিল তাহার মূল কোথায়, আর সমস্ত জড়াইয়া তাহার কোন্ রূপটি প্রকাশিত হইল—অর্থাৎ তাহার স্বরূপ কী—এইবার সংক্ষেপে তাহা নির্দেশ করিতে বোধহয় অসুবিধা নাই। পুনরুক্তির দোষ ঘটিলেও বলিতে হইবে—(১) ইহা ৯০% জনের কাল্‌চার নয়; (২) ইহা ভারতীয় পুরাতন সংস্কৃতির স্বচ্ছন্দ ক্রমবিকাশ নয়; (৩) ইহা কৃষি-প্রধান পল্লী-জীবনের সংস্কৃতি নয়, (৪) ইহা মাত্র মধ্যবিত্ত ও ইংরেজী শিক্ষিতদের সৃষ্টি (এবং যেহেতু ইহারা অধিকাংশেই প্রায় হিন্দু, অতএব মুসলমানগণ ইহাতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই); (৫) ইহা শহরে জাত এবং শহরেই প্রায় সমাসীন; (৬) ইহা বাহিরের বণিক্ সংস্কৃতির আঘাতে আমাদের ক্রম-পরাস্ত কৃষি-সংস্কৃতি হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে; (৭) ইহা প্রধানত বাঙালীর মানস সংস্কৃতির ইতিহাস বহন করে, এবং তাহার আর্থিক জীবনকে ভুলিয়া থাকিতে চাহিত বা অবজ্ঞা করিত; (৮) এবং সর্বশেষে, ইহা মাত্র সামান্যাংশে আভাস দেয় সমাজগত পরিবর্তনের (রাষ্ট্রকর্মে ও সামাজিক সংস্কারে), আর জীবিকাগত বা বাস্তব উপকরণগত সংস্কৃতির (যাহা ৯০% জনের কিংবা শহরের বাকী জনগণের, মজুরের, ফেরিওয়ালার, দোকানীর, পশারির জীবনযাত্রা, জীবন-দৃষ্টি, এই সবের) প্রায় খোঁজই রাখিতে চাহে নাই।

কর্ণওয়ালিসী ভূমি-ব্যবস্থা

মানস-সংস্কৃতির উপর যে এত বেশি জোর পড়িল, এবং উহার যে এরূপ অসাধারণ বিকাশ ঘটিল তাহার কারণ ঐতিহাসিক। ইংরেজ বণিক রাজা হইলেন; ১৭৬৪ সালে তাঁহারা দেওয়ানী লাভ করিলেন। ১৭৯৩তে দশশালা বন্দোবস্ত করিলেন, এবং তাহাই পরে জমিদারী প্রথায় 'চিরস্থায়ী' রূপ লাভ করিল। অর্থাৎ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই বাঙলার ভূমি-ব্যবস্থার এত বড় একটা বিপর্যয়ের সূত্রপাত হইল যাহা পূর্ব পূর্ব যুগে সম্ভব হয় নাই। প্রথমত, বিলাতী কায়দায় খাঁজনা (rent) ধার্য করা হইল, শস্যের পরিবর্তে 'মুদ্রা কর' প্রবর্তনের চেষ্টা চলিল। পূর্বে রাজস্ব অজন্মা-অনাবৃষ্টিতে বাড়িত-কমিত, কৃষকের উহাতে সুবিধা ছিল। 'মুদ্রা কর' সেই অবস্থার হিসাব রাখে না, জমির উপর 'খাজনা' দিতে হইবে—এই তাহার হিসাব। উহা পূর্বেকার মত 'রাজস্ব', উৎপাদনে রাজার অংশ, বলিয়াও পরিগণিত হয় না। দ্বিতীয়ত, জমির মালিকানা আর কৃষকের কিংবা পল্লী-গোষ্ঠীর রহিল না। ইংরেজী থিওরি মত, উহা রাজার হইল। ইহাই বিলাতী নীতি—এই নীতি অনুযায়ী কৃষক খাজনা না দিলেই উৎখাত হয়। তৃতীয়ত, বণিক রাজা আধার মালিকানা ইজারা দিয়া দিলেন নানা খাজনা-জোগানদারদের হাতে— ইহারাই জমিদার। কার্যত জমির মালিক হন ইহারাই।[১] প্রজার খাজনা দাঁড়ায় ১৮ কোটি টাকা (আব্‌ওয়াব কয় কোটি টাকা তাহা না বলিলেও চলে), আর সরকার পাইতেন ৩ কোটিরও কম; বাদবাকী জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রাপ্য হইত। কিন্তু ১৭৯৩-এর বন্দোবস্ত অনুসারে কথা ছিল সরকারী পাওনার (যেমন তখনকার হিসাবে ৩ কোটির) এক দশমাংশের (অর্থাৎ তখনকার হিসাবে ৩০ লক্ষের) বেশি জমিদারেরা প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করিবেন না। কিন্তু ক্রমে জমিদারের নিজ আদায় মোট ৯ কোটির মত হইল—কাহারো কাহারো মতে ১৭।১৮ কোটি। অতএব 'জমিদারী' যে বাঙলা দেশের সম্পন্নদের নিকট একটা

১ ভারতবর্ষের যেখানে 'তালুকদারী' ও রায়তোয়ারী প্রথা প্রবর্তিত হয় সেখানেও 'মুদ্রা কর' প্রবর্তনে কৃষক নিঃস্ব হইল। সেখানেও মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব হইল. সেখানেও ক্রমশ গৃহশিল্পের বিনাশে শিল্পীরা আসিয়া কৃষকের সংখ্যা বাড়াইল। কিন্তু রায়তোয়ারী প্রদেশে 'জমি' মুনাফার এত বড় বস্তু হইল না; ব্যবসায়ীরাও তাই জমিদার হইতে চাহিল না।

প্রকাণ্ড লাভের ও লোভের জিনিস হইয়া উঠে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। মনে হইবে, জমিদারী প্রথায় ইংরেজ বণিকরাজের বুঝি লাভ ছিল না। কিন্তু ১৭৬৫এর পরে দেশে যে 'খাজনা নিলামের' অত্যাচার চলে আজও তাহার স্মৃতি মানুষের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" এই দেশের Black Death! ১৭৯৩তেও ইংরেজ বণিক লাভের অঙ্ক কিছু মাত্র কমাইয়া এই ভূমি-ব্যবস্থা করে নাই। তাহাদের হিসাব মতে মুঘল রাজত্বের শেষদিকে ১৭৬৪-৬৫এ রাজস্ব ছিল ৮১৮,০০০ পাউণ্ড; কোম্পানি দেওয়ানী পাওয়ার সঙ্গে ১৭৬৫-৬৬তে উহা বাড়িল, ১৪,৭০,০০০ পাউণ্ডে; আর ১৭৯৩ সালের বন্দোবস্ত অনুযায়ী সেই সরকারী ভূমি-রাজস্ব স্থির হইল ৩০,৯১,০০০ পাউণ্ড। আর যাহাই হউক, বণিকেরা মুনাফা ছাড়িয়া দেয় নাই, ইহা না বলিলেও চলে।

তাহা ছাড়া, কয়েকটি প্রধান কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন হয়—প্রথমত, বৎসরে বৎসরে বন্দোবস্ত যাহারা লইত তাহারা রায়তের উপর শত অত্যাচার করিয়াও সেইরূপ উচ্চহারে খাজনা আদায় করিয়া উঠিতে পারিত না। কাজেই সরকারী বাজেটের আদায়ী খাজনা বাকী পড়িত। দ্বিতীয়ত, কর্ণওয়ালিস্ স্পষ্ট ভাষায়ই বলিয়াছেন, তিনি চাহিয়াছিলেন এই দেশে ইংলণ্ডের অনুকরণে একদল ভারতীয় ভূস্বামী (landholder) গঠন করিবেন। ইহার এক যুক্তি—তাহারা জমির উন্নতি করিবে;—জমিদারেরা অবশ্য ইহার কিছুমাত্র করিলেন না। কর্ণওয়ালিস্ চাহিয়াছিলেন এইভাবে জমিদারদের ঘাড়ে ভারতবর্ষে চিরদিন যাহা রাজার কর্তব্য ছিল,—যেমন কৃষির প্রয়োজনে বড় বড় খালবিল খনন ও সংরক্ষণ, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, পথঘাট প্রভৃতি—তাহা চাপাইয়া দিবেন, কোম্পানি শুধু জমির মালিকানা ও রাজস্ব ভোগ করিবে। উহার ফলে এবং দুইশত বৎসরে এসব জিনিস একেবারে ধ্বংস হইল, নদীনালা বন্ধ হইল, রাজা বা জমিদার কেহই দৃক্পাত করিল না (*Public Works in India*, Sir Arthur Cotton, 1854 ও *Bengal Irrigation Committee Report*, 1930 দ্রষ্টব্য)। এই ভূস্বামী সৃষ্টি করার তৃতীয় যুক্তি—কর্ণওয়ালিস বুঝিয়াছিলেন, জমিদার সরকারের নূতন প্রতিষ্ঠিত শাসনের মেরুদণ্ডস্বরূপ হইবে। পরে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিংক আবার এই কথাই মনে করাইয়া দেন: (Lord William Bentinck—Speech on Nov. 8, 1829; quoted from *Speeches and Documents on India Policy*,

Vol. 1, p. 215, Ed. A. B. Keith দ্রষ্টব্য।) "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ত্রুটি আছে সত্য ; তবু ইহার দ্বারা জনগণের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বশালী বড় একদল ধনী ভূস্বামী সম্প্রদায় তৈয়ারী হয়। ইহাতে এই একটি বিরাট সুবিধা হইয়াছে যে—যদি বিস্তৃত গণ-বিক্ষোভ বা বিপ্লবের ফলে শাসনকার্যের নির্বিঘ্নতার ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে এই সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থে ব্রিটিশ শাসন বজায় রাখিবার জন্য সর্বদা তৎপর থাকিবে।"

পুরাতন ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তনে কিন্তু কৃষি-সমাজের পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী হইল। কারণ (১) মুঘল রাজত্বের শেষ দিকে জায়গীরদাররা প্রায় আধা-স্বাধীন সামন্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন—সেই সব বুনিয়াদী বংশের আরও পতন হইল। (২) টাকাওয়ালা 'দেওয়ান' 'গোমস্তারা' কোম্পানির প্রভুদের কৃপায় এই মুনাফার ব্যবসায়ের মালিক হইয়া নূতন জমিদার গোষ্ঠীর পত্তন করিলেন। ইহাদের অর্থলোভ স্বভাবতই ছিল অপরিমিত। কারণ অনেকেই ছিলেন কোম্পানির সাহেব সুবার অনুচর, দালাল, বেনিয়ন, মুৎসুদ্দি ; বাজারে বন্দরে সেদিন ইহারা ভাগ্যান্বেষণে জুটিয়াছিলেন। সেদিনকার ইংরেজী 'কুঠি'র কাঞ্চন মানদণ্ডই ছিল ইহাদের নিকট প্রধান। ভারতীয় অভিজাত শ্রেণীর পদবীতে উন্নীত হইবার আশা তাঁহাদের ছিল না, সেই আভিজাত্যের মানদণ্ডও তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। শোভারাম বসাক, রতু সরকার, গোবিন্দ মিত্র প্রভৃতি (১৭৫৭) প্রধানগণ পোষ্য অনুচর ও বাইজীর নামে টাকা মারিতে দ্বিধা করিতেন না—তাঁহাদের নীতিজ্ঞানে উহা দোষাবহ ছিল না। (*Long-Selection form the Records of the Government*, No, 354,358 ও 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।)। কিন্তু কর্ণওয়ালিসের কৃপায় একবারে সেই অভিজাত পর্যায়েই এই শ্রেণীর স্থান পাইবার সুযোগ হইল জমিদার রূপে, অথচ মুনাফার হিসাবেও জমিদারী তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত লোভনীয়।

ইহারও আবার ফল যাহা দাঁড়াইল তাহা বুঝিবার মত। প্রথমত যে সব পুরানো ঘর পুরানো সমাজ ও বাস্তব সংস্কৃতি পোষণ করিতেন তাঁহারা লোপ পাইলেন। নূতন জমিদারেরা শিক্ষায় (অথবা উহার অভাবে), রুচিতে (উহারও অভাবে) সেই পল্লী-সংস্কৃতিকে পালন করিতে পারিলেন না। খালবিল নদীনালা মজিয়া চলিল, পথঘাট জল সংরক্ষণের ও নিষ্কাশনের নালাগুলি, এই সবের দায়িত্ব তাঁহারা গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা শহরের মানুষ, কাজেই পল্লী-সংস্কৃতির সমাদর বুঝিতেনও না। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা দূরে দূরে গ্রামে

জমিদারীর মধ্যে বাস করিতেন—যেমন বরেন্দ্র ভূমির জমিদারেরা—তাঁহাদেরও ক্রমেই চোখ পড়িল সাহেবদের ও কোম্পানির কায়দার দিকে। সর্বত্রই কৃষিসংস্কৃতির ক্রমশ দুর্দিন আসিল। কারণ, প্রথমত ছিল নূতন নিষ্ঠুর করভার, দ্বিতীয়ত, পূর্তাভাবে কৃষির অব্যবস্থা। তৃতীয়ত, কৃষকের সহিত ব্যবহারে নূতন জমিদারেরা কোনো পুরাতন সম্পর্কের মর্যাদা রাখিলেন না। 'খাজনা দেও, নজরানা দেও, আবওয়াব দেও, না হইলে উৎসন্নে যাও'—অর্থাৎ বিলাতী বণিকরাজের যেমনিতর নীতি, তেমনিতর তাহাদের দালাল দেশীয় জমিদার বেনিয়নদেরও নীতি হইয়া উঠিল। পরবর্তীকালে ইঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ অবশ্য আবার পূর্বপুরুষের সেই দালালী-মনোবৃত্তি ছাড়িয়া নূতন আভিজাত্য-রীতির চর্চা করেন। ফলে তাঁহারা আবার দেশে নানা পর্যায়ের তালুকদার, জোৎদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীর ও মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু ইংরাজ যুগের ভূমি-ব্যবস্থায় ১৮০০ সনের পূর্বেই যে আঘাত পল্লীকেন্দ্রিক কৃষি-সমাজ লাভ করিল তাহা প্রতিরোধ করা কাহারও সাধ্য নয়—আর কাহারও সে ইচ্ছাও ছিল না।

এই সঙ্গেই এই ভূমি-ব্যবস্থার দ্বিতীয় ফলটিও উল্লেখযোগ্য: কোম্পানির এই বেনিয়ন, মুন্সী, মুৎসুদ্দি, দেওয়ান—ইঁহারা দেশের নূতন ব্যবসায়ীরূপে দাঁড়াইতেছিলেন। ইঁহারাই স্বাভাবিক বিকাশের পথ পাইলে বাণিজ্যে-ব্যবসায়ে লক্ষ্মীলাভ করিতেন—বণিক ধনিকে পরিণত হইতেন। পূর্ব যুগের সওদাগরী পুঁজি ইহাদেরই চেষ্টায় 'বণিক পুঁজি' হইবার কথা। কিন্তু বিদেশী বণিগ্‌রাজের আওতায় ইহারা প্রথমত রহিলেন দালাল শ্রেণীর ব্যবসায়ী হইয়া। তারপর দেখিলেন দেশের বহির্বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে কোম্পানির একচেটিয়া. দেশীয়দের পক্ষে উহা নিষিদ্ধ; অথচ বহির্বাণিজ্যেই আসল লাভ। অন্যদিকে অন্তর্বাণিজ্যে. অর্থাৎ ব্যবসায়পত্রেও তাঁহারা আবার দেখিলেন, কোম্পানির রাজত্বে তাহার জুলুমবাজ সাহেব কর্মচারীরা বড় বড় দিকগুলি দখল করিয়া লইতেছেন। অতএব, বাধ্য হইয়াই দেশীয় ব্যবসায়ীরা অনেকটা ব্যবসায়পত্র ছাড়িয়া বাড়িঘর, জমিজমায় টাকা খাটাইতে লাগিলেন। পরের দিকে 'কোম্পানির কাগজ'ও তাই ইহাদের নিকট একটা লোভের জিনিস হইল। এমনি অবস্থায়—যখন 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' তাঁহাদের একই কালে মুনাফা ও আভিজাত্যের পথ করিয়া দিল তখন—দেব, মিত্র, সিংহ, বসাক, শেঠ, মল্লিক, শীল সকলেই জমিদার হইতে চলিলেন। ইহাদেরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তিলি ও সাহা ব্যবসায়ীরাও

পরবর্তী সময়ে 'জমিদারবাবু' হইতে লাগিলেন। অন্যদিকে প্রদেশান্তরের ব্যবসায়ীরা ধীরে ধীরে বাঙলার অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন;—তাঁহাদেরও দুই চারিজন অবশ্য জমিদার হইলেন। বাঙলার ব্যবসাপত্র চলিয়া গেল এই ভিন্ন প্রদেশীয়দের হাতে। সেই ব্যবসা ক্ষেত্র হইতেই অন্যান্য প্রদেশের মত এখানকার সেই অবাঙালী ধনবান্ ব্যবসায়ীরাও ধীরে ধীরে শিল্পপতি ও পুঁজিপতি হইতে পারিয়াছেন। অন্যদিকে বাঙলার বাতিল জমিদার-শ্রেণীর তদুপযোগী শিক্ষাও নাই, পুঁজিও নাই; জমিদারী হারাইলেও ধনিক হন নাই।

এইরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ভূমি-ব্যবস্থায় দেড়শত বৎসরে বাঙালী ব্যবসায়ী আর রহিল না, বাঙলার ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যান্বেষীরা—বাঙালী হাইকোর্টের জজ হইতে বাঙালী পশ্চিমের কমিসেরিয়েটের জোগানদার এবং পূর্ববাঙলার ব্যবসায়ী মহাজন সকলে—শিল্প-প্রচেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়া রহিলেন। বাঙালী 'স্বদেশী' আন্দোলন করিল, 'স্বদেশী' শিল্প গড়িতে পারিল না—ইহাও সেই 'জমিদারী প্রথার' ফল।

কর্ণওয়ালিসী ভূমি-ব্যবস্থার ফল একটু বিশদ করিয়াই বলা হইল। বাঙালীর পক্ষে তাহার গুরুত্ব কাল হইয়াছে। কারণ, ইহার ফলে ব্যবসায়ীরা জমিদার হইল, বাণিজ্যের ও শিল্পের পথে পা'ও বাড়াইল না; অর্ধ-সামন্ত জমিদারের সৃষ্টিতে পুরাতন কৃষি-সম্পর্ক পরিবর্তিত হইল, সৃষ্টি হইল মধ্যস্বত্বের। আর করভারে ও নদীনালার অভাবে, বাঙলার কৃষক-সাধারণ একটা চরম দুর্দশার দিকে চলিল। তাহারই ফলে আবার প্রভাবশালী হইল মহাজন বা সাউকার ও মহাজন-জমিদার শ্রেণী; উহাদেরও টাকা ব্যবসায়ে খাটিত না, খাটিত শেষ পর্যন্ত জমিতে বা জমির উপস্বত্বভোগীদের মধ্যে।

পল্লী-শিল্পের ধ্বংস

এক কথায় জমি ছাড়া টাকা খাটাইবার আর কোনো উপায়ই ইংরেজ বণিগ্‌রাজ দেশীয় বিত্তবান লোকদের হাতে রাখিলেন না। ইহাই সাম্রাজ্য-বাদের সনাতন নিয়ম। ইহার সঙ্গে আরার স্মরণীয় আরও ভয়ঙ্কর কথা—জমি ছাড়া দেশীয় শ্রমজীবীদের জীবিকারও আর কোন পথ সাম্রাজ্যবাদ উন্মুক্ত রাখিল না। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব হইতেই বণিগ্‌রাজ এখানকার শিল্পীদের

ধ্বংস-সাধন করিতে আরম্ভ করেন। এইদিকে তাঁহাদের তখন পর্যন্ত সহায় ছিল—নিজেদের সংগঠনশক্তি এবং নবলব্ধ রাষ্ট্রশক্তি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ আরম্ভ হইতেই বিলাতের বৈজ্ঞানিক প্রয়াস বিলাতের ব্যবসায়ীদের তাড়নায় শিল্পযন্ত্র আবিষ্কার করিতে লাগিল; সেই পাদ উত্তীর্ণ না হইতেই বিলাতের 'শিল্প-বিপ্লব' সম্ভব হইল (১৮১৫)। বণিগ্‌রাজ যখন ধনিকরাজ রূপে ভারত-সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন—রাষ্ট্রশক্তি ও যন্ত্রশক্তির যুগপৎ প্রয়োগে আমাদের কৃষি-সমাজের পল্লী-শিল্প দেখিতে না দেখিতে নষ্ট হইয়া গেল। উহার স্থান লইল ইংরেজ পুঁজিদার, ইংরেজ বণিক—ইহারই নাম 'ঔপনিবেশিকতা'। এই কাহিনী আজ এতই সুপরিচিত যে বাড়াইয়া বলিয়া লাভ নাই। এই দেশের শতসহস্র নিপুণ শিল্পী দেখিতে না দেখিতে জীবিকা হারাইল—পুরানো শিল্পকেন্দ্র শ্মশান হইল—শিল্পীর দল গ্রামে গিয়া কৃষি সম্বল করিল, জনগণের জীবিকার পক্ষে একমাত্র পথ উন্মুক্ত রহিল—কৃষি। আর সেই কৃষিও রাজা ও জমিদারের অবহেলায় ক্রমশই চরম দুর্দশায় পৌছিতে লাগিল, তাহাও আমরা জানি।

এইরূপে জমির নূতন ব্যবস্থায় ও বিলাতের শিল্প-বিপ্লবে—এক কথায় সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবে, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায়—ভারতীয় কৃষি-সমাজ বিনষ্ট হইতে লাগিল, অথচ এদেশে বণিক-সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারিল না, বিদেশীয় ধনিকই শাসন ও শোষণ চালাইল।

মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশ

ইহার মধ্যে গড়িয়া উঠিল যাহা তাহারই নাম "বাঙলার ভদ্রলোক"। তাঁহাদের জন্ম ও ইতিহাসই "বাঙলার কাল্‌চারে"র জন্ম ও ইতিহাস। তাঁহাদের শিকড় পূর্বে ছিল নবাবী আমলের দপ্তরখানায়, জায়গীরদার ও রাজাদের সভায় এবং আসরে। এইবার তাঁহাদের নূতন শিকড় আঁকড়াইয়া ধরিল নূতন মুনিবের নূতন সৌভাগ্যকে ;—কুঠিতে, কাছারিতে, আপিসে, আদালতে এবং জমিদারিতে বা জমিদারের অধীনে নানা মধ্যস্বত্বে উহার আশা ও আশ্রয় মিলিল। চোখের উপর যখন কোম্পানির রাজত্ব জাঁকিয়া বসিল, তখন পূর্বেকার আমলা-কর্মচারীরা ফারসী ছাড়িয়া ইংরেজী ভাষা ও কায়দাদস্তুর শিখিবার জন্য অগ্রসর

হইয়া আসিল। কোম্পানিরও প্রয়োজন ছিল এই কর্মচারীদের। এত বড় দেশ বিলাতী কেরানীতে চলিবে না; তাই মেকলে না বলিলেও সৃষ্টি করিতে হইত নূতন বাঙালী কেরানী। অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষার দুয়ার এই মধ্যবিত্ত ভাগ্যান্বেষীদের জন্য উন্মুক্ত হইল। অন্যদিকে যেভাবে ইংরেজের প্রথম প্রসাদ-প্রার্থীরা কলিকাতায় "বাবু"রূপে জাঁকিয়া বসিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়াই দেশের ভাগ্যান্বেষীরা বুঝিতে পারিলেন—উন্নতির পথ ইংরেজের কুঠি ও কাছারির আনাচে-কানাচে; উন্নতির উপায় যে করিয়াই হউক ইংরেজের প্রসাদলাভ, আর উহার একটা সহায় ইংরেজি বাৎ, ইংরেজি কায়দা।

অবকাশের বিলাস

একদিকে 'বাবুর' যুগ ও অন্যদিকে অবকাশরঞ্জনের প্রয়াস, উহাই "বাঙলার কাল্‌চারের" প্রাথমিক নমুনা। বেনিয়ন মুৎসুদ্দির যুগটা তাহার অবতরণিকা স্বরূপ। সে পর্বের ইতিহাস বিশদ বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। 'ময়না', 'বুলবুল', 'আখড়াই গান', আর সর্বশেষে 'কানন ভোজন' ইহাই 'বাবুদের' বিলাস; আর তাঁহাদের উপজীব্য ব্যবসায় কিংবা চাকুরি কিংবা শহরের জীবিকার নানা রকমের সুরঙ্গ-পথ,—বাঙলার 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা' সেই সব সকলের গোচর করিয়া দিয়াছে। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'য় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁহার চিত্র তুলিয়া দিয়াছেন। আমাদের জন্য "বাবুর যুগ" চিরস্থায়ী হইয়া আছে 'নববাবুবিলাসে' (১৮২১-২৩), 'কলিকাতা কমলালয়ে' (১৮২৩) আর বাঙলার সাহিত্যের চিরগৌরব 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সায়' (১৮৬১-৬৪ ; হুতোমের চিত্রিত কাল একটু পূর্বেকার হইতে পারে—আনুমানিক ১৮৪৯-৬০)। রামমোহনী পর্ব ও 'ইয়ং বেঙ্গল'-পর্ব জুড়িয়াও এই বাবুদের দিন চলিয়াছিল; অবশ্য নূতনের বীজও তখনই উপ্ত হইতেছিল হিন্দুকলেজ আশ্রয় করিয়া।

তখন কেহবা কোম্পানির কর্মচারীরূপে নানাভাবে অতুল বৈভবের মালিক হইয়াছেন (যেমন স্বয়ং রামমোহন), কেহবা কোম্পানির সাহেবদের হৌসে বেনিয়ন হইয়া ধনে মানে বড় হইয়াছেন। কিন্তু সকলেই ব্যবসায় ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধায় সকলেই জমিদারী জাঁকাইয়া বসিয়াছেন (যেমন স্বয়ং রামমোহন ও তাহার বংশধরগণ)। সুখের

ও সখের মধ্যে তখন তাহাদের অকর্মণ্য বংশধরদের "বাবু-বিলাস" ছাড়া আর কী-ই বা করিবার ছিল ?

অবশ্য যাঁহারা গুণবান্ তাঁহারা এই অলস দিনরাত্রি অন্তভাবে সার্থক না করিতেন তাহা নয়। তাঁহাদের 'অবকাশ-রঞ্জনী' জীবনযাত্রার হিসাব লইলে দেখিব, উহাদের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছেন বিলাতের হুইগ্‌গণ (Whig)। টাকা-কড়ি, বাড়ি, গাড়ি, জুড়ি, শহরের উপকণ্ঠে একটু নিভৃত নিবাস, আর নানাবিধ অবকাশ-রঞ্জনী অনুশীলন,—পাল্‌কী, বেয়ারা, চোপদার, হলঘরে বড় তৈলচিত্র, ইউরোপীয় শিল্পীদের চিত্রের প্রতিলিপি—ইহারা যেন এই সব দিয়া ইংরেজ শাসকদের নিকট প্রমাণ করিতে বসিয়াছিলেন, 'আমরা তোমাদের হুইগ্‌ ভূস্বামীদেরই সগোত্র।' মিথ্যা নয়, বিলাতের 'হুইগ্‌' অভিজাতরাও অনেকেই এমনি বণিগ্‌বংশের বংশধর ছিলেন। কিন্তু বিলাতের হুইগ্‌রা ছিলেন সমাজের বিপ্লবী-শক্তি ; তাঁহারা তাঁহাদের সমাজে শিল্প-বিপ্লবের ভূমিকা রচনা করিয়াছিলেন। ধনিক-সভ্যতাতে তাঁহারাই ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের উদ্বোধন করেন। সমাজে তাঁহাদের দায়িত্বও ছিল, অধিকারও ছিল। আমাদের অবকাশ-কুশল অভিজাতের পক্ষে ইহার কোনোটাই খাটিত না—ব্যবসায় ছাড়িয়া এক আধাসামন্তযুগে তাঁহারা ঠেকিয়া গিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের আওতায় হুইগ্‌দের অনুরূপ দায়িত্বও তাঁহাদের ছিল না, অধিকারও ছিল না। এ শুধুই 'নকলের নাকাল।'

অথচ অবরুদ্ধ জীবন-চেতনা অবকাশ ক্ষেপণের আর কোনো পথই পাইল না—হয় 'বাবু-বিলাস', নয় 'অবকাশ-বিলাস।' এই অবরোধের পীড়ায়ও কিন্তু ইহারা স্বদেশ-প্রীতিতে বিশেষ উদ্বুদ্ধ হন নাই। কারণ ইহাদের নিকট ব্রিটিশ শাসনই সৌভাগ্যের মূল,—কর্ণওয়ালিসের আশা তাই সফল হইতেছিল! রাজা রাধাকান্ত মোটের উপর রক্ষণশীল (= Tory) ; তিনিও 'ব্রিটিশ রাজের বিশ্বস্ত প্রজা' বলিয়া গর্ব করিতে ব্যস্ত। সিপাহী বিদ্রোহের দিনে উত্তর ভারতের পুরাতন সামন্ত অভিজাত শ্রেণী শেষবারের মত আপনাদের অধিকারের জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। তখন বাঙলার এই ইংরেজ-স্বষ্ট নূতন অভিজাত দল গোলাপ মল্লিকের বাড়িতে সভা করিয়া বলিতেছেন—অবশ্য 'হুতোমের' ভাষায়—আমরা 'ম্যাড়া বাঙালী', আমেরিকান হইতে চাই না।

জীবনে যাহা তাঁহারা হারাইয়াছেন—যে সামঞ্জস্যহীন জীবনের মধ্যে তাঁহারা আবদ্ধ হইয়া গিয়াছেন—সাম্রাজ্যবাদের সেই দেহ-প্রাণ-বিনাশী পীড়া এই অবকাশ-বিলাসীদের বুঝাও সম্ভব হয় নাই, আর তাহা তাঁহারা বুঝিলেনও না। বরং বুঝিল তাঁহারাই যাঁহাদের মেকলে সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন, যাঁহাদের কোম্পানি নিজের কেরানীশালার তাগিদেই তৈয়ারী করিতেছিল। ইহারাই 'ভদ্রলোক' ও 'শিক্ষিত সমাজ'; হিন্দুকলেজের 'ইয়ংবেঙ্গল' যাহাদের প্রথম প্রতিভূ। ইহারাই শহরের এই বদ্ধজলের 'বিলাস'কে কতকটা বিকাশের ক্ষেত্রে পরিণত করেন। আর ইহাদের সে প্রেরণা আসে পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য দিয়া—যে শিক্ষা এই দেশের সংস্কৃতির সহিত সম্পর্কিত নহে, যাহা ইউরোপীয় বিকাশশীল ধনিকতান্ত্রিক জীবনযাত্রা হইতে উদ্ভূত।

যাহাকে আমরা 'পাশ্চাত্য শিক্ষা' বলি, তাহা আসলে বণিকতন্ত্রের দ্বারা পরিশোধিত শিক্ষা—পশ্চিমের 'বুর্জোয়া' সভ্যতার প্রণয়ন। আমাদের দেশে বাস্তবত ঔপনিবেশের অর্ধ সামন্ত যুগ কায়েম ছিল (১৯৪৭ পর্যন্ত), বুর্জোয়া-যুগ ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ পায় নাই। -- তথাপি পশ্চিমের সংস্পর্শে আসাতে এই ঊনবিংশ শতকে আমাদের লাভ হইল এই পাশ্চাত্য শিক্ষা। ইহার উৎকর্ষ বিষয়ে সন্দেহ নাই; আর ইহার প্রবর্তনের জন্য প্রধান কৃতিত্ব কলিকাতার বাঙালী বেসরকারী-লোকদের, আর গৌণভাবে মেকলেরও। সরকারের বাস্তব তাড়না ছিল—সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে কেরানী প্রয়োজন; আর আমাদের পক্ষে প্রয়োজন—জীবনে জীবিকা—বিষয়, বিত্ত, মান।

সম্পন্ন ঘরের ব্যক্তিমাত্রই ঊনবিংশ শতকে বুঝিয়াছে—জীবনে উন্নতি করিতে হইলে ইংরেজী শিখিতে হইবে। 'ইয়ং বেঙ্গলের' বিভীষিকা মোটেই তাহাদের সেই বৈষয়িক উন্নতির আশাকে দাবাইয়া দিল না। তাই, বাস্তব ক্ষেত্রে যে ধনিকতন্ত্রের দিকে আমাদের 'প্রবেশ নিষেধ' ছিল, শিক্ষার মধ্য দিয়া আমরা সেই ধনিকতন্ত্রেরই মানসিক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হইতে লাগিলাম। আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত এই শিক্ষার কোনো নিকট সম্বন্ধ ছিল না। তথাপি এই শিক্ষায়, এই বুর্জোয়া সংস্কৃতির রসাস্বাদনে আমরা মাতিয়া উঠিলাম। শুধু মাতিয়া উঠিলাম না, যেন একেবারে জীবনকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। আমাদের মন যেন ইউরোপীয় বুর্জোয়া-মনের সঙ্গে একেবারে

অভিন্ন হইতে চাহিল। আমরা সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ হইলাম—জন্মিল 'বাঙলার কাল্‌চার', একদিকে তাহা অবাস্তর, অন্যদিকে ভাবসমৃদ্ধ।[১]

---

১ বাঙলার মুসলমানদের ও ভারতবর্ষের অন্য মুসলমানদের মনোভাব কিন্তু একরূপ ছিল না—এই কথাটি এই ক্ষেত্রে আলোচনা করা হয় নাই, কারণ বাঙলার কাল্‌চারে প্রধানত তাঁহাদের দান গৌণ বলিয়া। কিন্তু হিন্দুরা যেমন ইংরেজ রাজাকে পাঠান-মুঘল রাজার বদলে সহজে মানিয়া লইতে পারিল, মুসলমান ভারতবাসী তাহা পারে নাই। তাহারা শুধু দূরে বসিয়া রহিল না, যথাসাধ্য ইংরেজের বিরোধিতা করিল। ইংরেজের আনীত পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষাকে ছুঁইতেও চাহিল না। উনবিংশ শতাব্দীর অর্ধভাগ ব্যাপিয়া উত্তরাপথে ওহাবী Puritanism-এর বিদ্রোহ ও প্রভাব থাকে—উহা শেষ হয় শুরু সৈয়দ-আহমদের অনুষ্ঠিত আলিগাড়ী আন্দোলনের পরে। বাঙলায়ও ওহাবী আন্দোলন প্রবল ছিল। তাহারা এখানেও বিদ্রোহ করিয়াছে, সন্ত্রাসবাদের পথও তখন গ্রহণ করিয়াছে। সর্বাপেক্ষা যাহা বড় কথা—ইস্‌লামের আসল প্রভাব তখনই বিস্তৃত হইয়াছে বাঙালী মুসলমান জনগণের মধ্যে। বাঙলার মুসলমান-সাধারণ, বিশেষত পূর্ব বাঙলার মুসলমান, ওহাবী আন্দোলনে,—উহার প্রভাবে ও প্রতিক্রিয়ায় দুই ভাবেই—বিশেষ রকমে শরিয়ত-নিষ্ঠ মুসলমান হইয়া উঠেন। তাহার ফলে তাহাদের ধর্মানুরাগ বাড়িয়াছে—মাদ্রাসা, মক্তব ও তাহাতে কোরাণ হাদিসের চর্চা বাড়িয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই মুসলমান জনসাধারণ নিজেদের জন-সংস্কৃতির কোনো কোনো রূপকে উপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অন্যদিকে, পার্শ্ববর্তী হিন্দুদের মত পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ গ্রহণেও উদ্যোগী হন নাই। অবশ্য একটি কথা ভুলিবার নয়—বাঙালী মুসলমান পল্লীবাসী, উত্তরাপথের মুসলমানের মত শহরে থাকে না। এখানে উত্তরভারতের মত কোনো দরবারী কায়দা-কানুন, আদব-আচার, শিক্ষা-দীক্ষা (সামান্যভাবে ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ ছাড়া অন্যত্র) গড়িয়া উঠা সম্ভব ছিল না। কাজেই সাধারণভাবে, সাধারণ বাঙালী মুসলমান উত্তর ভারতের মুসলমানের মত ইংরাজ রাজা হইলে কোনো একটা দরবারী সংস্কৃতি হারাইয়াছিল, তাহা বলা বোধহয় ঠিক নয়। তবু নিশ্চয়ই তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল—যখন তাহাদের 'আয়মা' সম্পত্তি বাতিল হয়, উহার দ্বারা পালিত মসজিদ-মাদ্রাসা অচল হয়। আর, যতই দিন গিয়াছে ততই নবাবী আমলকে নিশ্চয়ই তাহারা বেশি আপনার বলিয়া মনে মনে ধারণা করিয়া লইয়াছে। বাঙালী মুসলমানের শিক্ষায় পশ্চাৎপদ থাকার আসল কারণ, লেখকের বিবেচনায়, অত্যন্ত বাস্তব : (১) তাঁহারা অধিক দরিদ্র,—বরাবরই তাঁহারা দরিদ্র ছিলেন। কারণ তাঁহারা অধিকাংশই শোষিত শ্রেণীর লোক। মুসলমান হইয়া মুসলমান আমলে কতকগুলি ধর্মগত অত্যাচার হইতে তাঁহারা মুক্ত হন, কিন্তু জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁহারা শোষিতই রহিয়া যান। কাজেই, দরিদ্র তাঁহারা বরাবর ছিলেন। (২) তাহার উপর তাঁহারা ছিলেন পল্লীবাসী, ইস্কুল কলেজ থাকিত শহরে। এই কারণেও তাঁহারা আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই—ঠিক যেমন এরূপ শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ তখনো গ্রহণ করিতে পারেন নাই উত্তর ভারতের হিন্দুপ্রধান প্রদেশের হিন্দুরা—মুসলমানদের তুলনায় সেখানে তাঁহারা অনগ্রসর ছিল। এই কারণেই বাঙলার মুসলমান-সাধারণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় পশ্চাৎপদ। (৩) গ্রামে-গ্রামে মস্‌জিদ-মাদ্রাসায় তবু অবস্থাপন্নরা ইস্‌লামী শিক্ষা বেশি লইয়াছেন, আর তাহাতে আবার ইংরেজী শিক্ষার আরও বিরোধিতা

এই বাঙলার কাল্‌চারের পর্বগুলি নানাদিক দিয়া আবার মনে করিবার দরকার নাই। পূর্বাপর ঔপনিবেশিক কাল্‌চারের অসামঞ্জস্যটা এখন সহজেই আমরা বুঝিতে পারি। যাহা শুধু শিক্ষার মধ্য দিয়া আহরণ করিয়াছি, জীবনক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিতে পারিলাম না,—যে সংস্কৃতির প্রেরণা শুধুই মানস-গত, বস্তুগত নয়,—তাহার স্বরূপ সহজেই অনুমেয়। আভ্যন্তরীণ আত্ম-বিরোধ তাহাতে রহিয়াই গিয়াছে। প্রেরণা হিসাবে ইহা সত্যই আন্তরিক, কিন্তু ইহার গোড়ায় মাটি ছিল না। সেই গোড়ায় একটা প্রাগ্‌-ধনিক দিনের বালুর চড়া পড়িয়াছিল—তাহা হইতেও আমরা রস সংগ্রহ করিতে চাহিলাম, নূতন 'জাতীয়তাবোধে' (প্রথম হিন্দু এবং পরে মুসলমান) ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করিতে গেলাম, কিন্তু রসের আসল উৎস ছিল শুধু মনে। প্রাণবান্‌ মনীষা যেন তাই এই জীবনযাত্রায় কিছুতেই স্বস্তি পান নাই। বিবেকানন্দ তাহারই আঘাতে দরিদ্র নারায়ণের ব্রত গ্রহণ করিলেন। "বাস্তব অবস্থার প্রতি বিপুল অসন্তোষে, জীবনে গভীর অতৃপ্তিতে, ধর্মের সূচনা হয়"—"Religion begins with a tremendous dissatisfaction with present state of things, with our lives···" (Vivekananda)। তাই সেদিন ধর্মের পথই ছিল প্রাণবান্‌ পুরুষের পথ। কেশবচন্দ্র উহারই মধ্য হইতে একদিকে সমাজ-সংস্কারের যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, আর দিকে সামন্ততন্ত্রের নিকটে আত্মসমর্পণ করিলেন—সমসাময়িক বাঙালী কাল্‌চারের শ্রেষ্ঠ প্রতিলিপি

করিয়াছেন। (৪) যে মুষ্টিমেয় বাঙালী মুসলমান জনক্ষয় অভিজাতদের বংশধর বা বড় সওদাগর বণিকের বংশধর ছিলেন তাঁহাদের অবশ্য বরাবরই আদর্শ 'নবাবী'—অর্থাৎ, মৃত সামন্ততন্ত্রের আদব কায়দা গোলাম-বাঁদী, বেগম-জেনানা লইয়া তাঁহারা এমনই একটা জীবনযাত্রা অবলম্বন করিয়া বসিতেন যাহাতে আধুনিক শিক্ষা ও উহার জীবনাদর্শ গ্রহণ করা তাঁহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। ইহাকে 'ওহাবি প্রতিবাদ' বলিয়া ভুল করা ঠিক নয়। মোটামুটি তবু এই 'ওহাবি প্রতিবাদ' 'নবাবী আয়েস' ও দারিদ্র্য এবং গ্রামীণতার সম্মেলিত ফলে বাঙালী মুসলমানের মধ্য হইতে তেমন 'মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী' তখন উঠিতে পারে নাই। ইং ১৯২১-এর পর হইতে তাহার উত্থান—নানা সুবিধা লাভে তাড়াতাড়িই এই উত্থান ঘটিয়াছে। সেই নূতন মুসলমান মধ্যবিত্ত এই 'বাঙলার কাল্‌চারের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন (দ্রষ্টব্য মোঃ মুজিবর রহমান খাঁ ও আবুল মনসুর আহমদ সাহেবদের 'পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির' অভিভাষণ), কিন্তু 'পাকিস্তান কাল্‌চার'ও গঠন করিবার মতো বাস্তব ও মানসিক অবস্থাও তাহাদের ছিল না। তাই পূর্ব পাকিস্তানে আজ তাঁহারা অ-বাঙালী ঔপনিবেশিকদের শোষণে নিষ্পিষ্ট, এবং উহার বিরুদ্ধে বাঙলা সংস্কৃতি-গঠনের সঙ্গে সেই ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। এই পথেই তাঁহারা আত্মস্থ হইতেছেন।

ইহাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও এই বিলাতী পিউরিটান সংস্কৃতিকে সেই ধর্মের পথ দিয়াই বাহিত করাইয়া দিলেন। আর পরবর্তী হিন্দুসমাজ পাশ্চাত্যশিক্ষা লাভ করিয়া ভিক্টোরীয় যুগের যুক্তিবাদ ও স্বাজাত্যবোধ এবং বিবেকানন্দের প্রেরণা প্রভৃতিকে সম্বল করিয়া এই ব্রাহ্মসমাজের আসল দাবীই অঙ্গীকার করিয়া ফেলিল।

এই সমস্ত অসঙ্গতির মধ্যে একটা বিরাট ও সামগ্রিক দৃষ্টি লইয়া রবীন্দ্রনাথ উদিত হন—ঔপনিবেশিকতা ছাড়াইয়া যাঁহার দৃষ্টি বিশ্বমানবতার দিকে পৌছায় —এবং পারিপার্শ্বিক কারণে ইহাও কতকটা অস্পষ্ট থাকিয়া যায়।

একবার বাঙলার কাল্‌চারের নানাদিককার রথীমহারথীদের নামগুলি স্মরণ করিলেই এবার বুঝিতে পারিব—ইহা তাহাদেরই কাল্‌চার যাহারা ইংরেজী বুর্জোয়া শিক্ষার রসাস্বাদন করিল; আর তাহাদের আসনও আমাদের বাঙলার অর্ধসামন্ত বিত্তবানদের সঙ্গেই; আর এই মানসিক ঐশ্বর্যের জন্যই এই অর্ধ-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে তাহাদের স্থান হইল সেই সম্মানিত পংক্তিতে। মধুসূদন পাইকপাড়া ও জোড়াসাঁকোর জমিদারদের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। হেমচন্দ্রেরও সে মর্যাদালাভ ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথের কথা উঠেই না,—নোব্‌ল প্রাইজের সম্মান যদিও তাঁহাকেও ঔপনিবেশিকতার যুগের স্বদেশীয়দের চোখে আরও সম্মানিত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। জীবনে অন্য বাঙালীরা কেহ ডিপুটি, কেহ উকীল, কেহ ব্যারিস্টার,—দুই একজন মাত্র জমিদার শ্রেণীর;—মোটের উপর মধ্যবিত্তের উপজীবিকা ইঁহাদের প্রধান সম্বল। তথাপি এই বুর্জোয়া-প্রেরণাকে বাঙালী মধ্যবিত্ত আপনার করিয়া লইলেন আপনাদের মানসিক চেষ্টায়। বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙলার সাহিত্য পরিষদ্‌, বাঙলার প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, কলেজ, হাসপাতাল সব কিছুই সেই উপজীবিকাবলম্বী বাঙালী চাকরে, উকীল, ব্যারিস্টার ও দুই-একজন অর্ধসামন্ত জমিদারের সৃষ্টি। বাঙলার শিল্পপতিরা সাহেব, তাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছেন বিলাতের সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠান। তাই বাঙালীর এই কাল্‌চার, এমন কি বিজ্ঞানের গবেষণা পর্যন্ত, মানসিক ক্ষেত্রেই, প্রায় সীমাবদ্ধ।

প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের বাস্তব বিকাশ-পথ রুদ্ধ হয় নাই। একদিকে এই পাশ্চাত্য বুর্জোয়া সংস্কৃতি, অন্যদিকে ভারতীয় ঐতিহ্যের মানসিক সম্পদ; একদিকে সাম্রাজ্যনীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা, অন্যদিকে

নিষ্ক্রিয় ভিক্ষানীতির স্বদেশীতে অরুচি; তৃতীয়ত, আপন পারিবারিক ধারারও বিশিষ্ট দান;—এই সকলের পুর্ণ সমন্বয় ঘটিয়াছিল রবীন্দ্রনাথে। তাই তিনি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগের শ্রেষ্ঠ গীতিকবি, শ্রেষ্ঠ মানবধর্মী কবি—ব্যক্তি-সত্তার শ্রেষ্ঠ মহিমা তাঁহারই কণ্ঠে উদ্গীত হইল। তবু তাঁহারই জীবনকালে স্পষ্ট হইয়া উঠে—কত সামান্য বনিয়াদের উপর বাঙালীর এই কাল্‌চার গঠিত। উহার গোড়াকার 'ঔপনিবেশিক জীবনযাত্রার' মৃত্তিকাহীন শুষ্কতা ক্রমশ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। শিক্ষিত বাঙালী সংখ্যায় এত বাড়িল যে জীবিকার জন্য কেরানীশালায় স্থান হইল না। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পরে বাঙালী শিক্ষিতদের শ্রেণীতে বেকার-দশা গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল। 'ভদ্রলোকের' জীবিকায় প্রবল দাবীদার হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল নব্য শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান, নবজাত মুসলমান মধ্যবিত্ত (ও মুষ্টিমেয় নিম্নবর্ণ শিক্ষিত হিন্দু)। এই মধ্যবিত্তের চাকরির কাড়াকাড়িই মূলত বাড়িতে বাড়িতে দাঁড়াইল সাম্প্রদায়িক মারামারিতে। ১৯২১এর পর হইতে তাই বাঙালী 'ভদ্রলোকের' মনে মধুসূদন-বঙ্কিম যুগের সেই প্রবল আত্মবিশ্বাসের স্থান কোথায় ছিল? সবল মানসিকতা আর তখন টিঁকে নাই। তাহার পল্লীসভ্যতা তখন একেবারে ভাঙিয়া পড়িতেছে, অনেক পুর্বেই ব্যবসার ক্ষেত্রে তাহার স্থান সে নিজেই ত্যাগ করিয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেও তাহার আসন ধসিয়া যাইতেছে। এদিকে শিল্পক্ষেত্রে নিজের প্রবেশপথও তাহার অগোচর। যে কাল্‌চারের গোড়ায় উপকরণগত স্থিরতা নাই, যাহার পরিবেশে সমাজগত পুষ্টি নাই,—শুধুমাত্র একটা মানসিক আবেগকে সম্বল করিয়া মাত্র জনকয় চাকুরের ও উকীলের ডাক্তারের প্রয়াসে যাহা রূপ পাইয়াছিল, সেই 'বাঙলার কাল্‌চার' যে উনিশ শত ত্রিশের পরে তাহার শেষ পাদে আসিয়াই পৌছিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ ছিল না। বাঙলার ভদ্রলোক শ্রেণীর শেষ সার্থকতা ঘুচিয়া গেল স্বাধীনতা আন্দোলনের সাফল্যের সঙ্গে।

কারণ, তৎপুর্বেই তাহার 'ঔপনিবেশিক জীবনযাত্রা' ও অর্থনৈতিক বিন্যাসের মধ্যে এক বিদেশী-পুষ্ট শিল্পযুগের (Industrialism) পত্তন হইতেছিল। ভারতবর্ষ শুধু কৃষিপ্রধান দেশ নয়, ১৯২০এর পরে পৃথিবীতে সে শিল্পেও অগ্রসর হইতে চাহিল। সেই শিল্পেরও সর্বপ্রধান উদ্যোগকেন্দ্র তখনো বোম্বাই নয়, কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠ। অর্থাৎ এইখানেই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের ব্যাঙ্ক, ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী প্রভৃতি 'লগ্নী পুঁজি' (Finance Capital) শতবাহু

মেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠে। এণ্ড্-ইয়ুল, শ'-ওয়ালেস্, বেগ ডান্‌লপ, অক্টোভিয়াস্ ষ্টিল প্রভৃতি ট্রাস্ট, কার্টেল পৃথিবীময় তাহার সম্পর্ক পাতে। কিন্তু তাহার প্রসারে বাঙলার মধ্যবিত্ত বা বিত্তবানদের কোনো প্রসারের পথই হইল না। এদিকে ভূমি-সমস্যার ও ঋণভার-সমস্যার জটিল আবর্তে মৃতপ্রায় পল্লীসমাজ মরিয়া হইয়া উঠে। তাহারই এক প্রকাশ দেখা দিল বাঙলার কাল্‌চারের বিরুদ্ধে মুসলমান বাঙলার বিদ্রোহে, আর এক প্রকাশ বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী চিন্তায়। ফলে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেই বাঙলার জমিদারী প্রতিষ্ঠা যাইতে বসিল, মধ্যবিত্তের অদৃষ্টে বেকারত্ব ছাড়া কিছুই রহিল না। শতকরা পঞ্চাশজন কৃষকের তখন জমি নাই। বাঙলার কাল্‌চারের ভবিষ্যৎ তবে কোথায়? পৃথিবীব্যাপী ধনিকতন্ত্রের সঙ্কটের মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র অন্ধকারে, ঔপনিবেশিক জীবনযাত্রায় তৈলহীন স্তিমিত শিখা নিবিয়া আসিতেছিল; 'ঔপনিবেশিক কাল্‌চারের' আয়ুও শেষ না হইয়া পারে না।

১৯৪৭এর ১৫ই আগস্ট আসিল বাঙলায় বিরোধ ও বিভাগের লিপি লইয়া,—এবং এই মধ্যবিত্ত ঔপনিবেশিক কাল্‌চারের মৃত্যুলিপি লইয়া। বাঁচিতে হইলে তাহাকে এখন নতুন জনশ্রেণীর দানে নতুন জনশ্রেণীর সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হইতে হইবে।

গ্রন্থ-পঞ্জী

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলী, বিশেষত বঙ্গদেশের কৃষক, সাম্য, অনুশীলন, কৃষ্ণচরিত্র।
মধুসূদনের জীবনী (যোগেন্দ্রনাথ বসু) ও মধুস্মৃতি (নগেন্দ্রচন্দ্র সোম)।
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী।
বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দের লেখা, বক্তৃতা প্রভৃতি।
রাজনারায়ণ বসুর লেখা।
সংবাদপত্রে সেকালের কথা—সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ভারতে জাতীয় আন্দোলন, ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট (ইংরাজী)।
জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী—সুকুমার সেন।
India Today—R. Palme Dutt ('আজিকার ভারত')।
Imperialism—Lenin.
Empire of the Nababs—Hutchinson.
Economic History of India—R. C. Dutt.
A Sketch of the History of India—Dodwell.
Cambridge History of India—Vols V. VI.
History of Bengal, Vols I & II (Dacca University).
Economic History of Bengal, Vol I & Vol II,—N. K. Sinha.

সপ্তম অধ্যায়

ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা: আধুনিকরূপ

স্বাধীনতার রূপায়ণ

খ্রীঃ ১৯৪৭ সালের পনেরই আগস্ট ভারতবর্ষে যুগান্তরের সূচনা হইল। সেদিন ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়, বাঙলা দেশ ও পাঞ্জাব বিশেষ করিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। বাঙালীর সংস্কৃতি যে তাহাতে অনিবার্য সংকটের মধ্যে গিয়া পড়িবে, তাহা বুঝিতে না পারার কারণ ছিল না। সেদিন হইতে বাঙালী ভারতরাষ্ট্রে মাত্র একটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তায় পরিণত; পাকিস্তানে সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও সে অবজ্ঞাত। উভয় বাঙলারই সংকট ত্রাণের পথ—প্রথমত ভারতরাষ্ট্রের ও পাক-রাষ্ট্রের এমন গণতান্ত্রিক বিকাশ যাহাতে দুই রাষ্ট্রেই ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জাতিই নিজ নিজ মহাজাতিক রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাধীন বিকাশের ও স্বেচ্ছামিলনের অবকাশ লাভ করে, এবং ভারত ও পাকিস্তান দুই মহাজাতিক রাষ্ট্রও আবার স্বাধীনতা ও সৌভ্রাত্রের সূত্রে পূর্ণ বিকাশের অধিকারী হয়। এই-রূপ বিকাশ যে কী, ইতিহাসে তাহা অপরিজ্ঞাত নয়—গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে শোষণ-হীন সমাজগঠনে রূপায়িত করাই এই বিকাশ, বিজ্ঞান ও মানবতার সমন্বিত সৃষ্টিতেই উহার সম্পূর্ণতা। বলা বাহুল্য, এই পনের বৎসর পরে, (১৯৬৩ এপ্রিল) এই কথা বলা অন্যায় নয় যে, স্বাধীনতার এইরূপ রূপায়ণ পাকিস্তানের এখনো চিন্তারও বাহিরে পড়িয়া আছে। ভারতের অবশ্য তাহা লক্ষ্যের বাহিরে নয়—'সমাজতান্ত্রিক ধাঁজের সমাজ' যখন (দ্বিতীয় পরিকল্পনা, ১৯৫৬ হইতে) তাহার লক্ষ্য। কিন্তু উহা লাভের জন্য যে আয়োজন ভারত গ্রহণ করিয়াছে, তাহা অভিনব! পার্লেমেণ্টারি গণতন্ত্রের পথে, 'মিশ্র আর্থিক নীতি'তে সমাজতন্ত্রের বিকাশ—তর্কস্থলে মানিতে পারা যায়—অসম্ভব নয়। কিন্তু কার্যত ইতিহাসে তাহার একটিও দৃষ্টান্ত নাই। বরং কেরালার কম্যুনিষ্ট মন্ত্রিমণ্ডলের বিতাড়নের পর সে সংশয় এ দেশে আরও ঘনীভূত হয়। তাহা ছাড়া, নানা উদ্যোগ আয়োজনে ভারত যে ভাবে ঘরে-বাহিরে ধনিক-বাধায় ব্যাহত হইতেছে, তাহাও গুরুতর। অবশ্য সম্প্রতি (খ্রীঃ ১৯৬২এর ২০শে নবেম্বরের মধ্যে) চীনের

আক্রমণে ভারতের আদর্শ আরও অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে। তথাপি যে ভারতীয় নেতৃত্ব অর্থনীতিতে তৃতীয় পরিকল্পনা এখনো খর্ব করে নাই, 'সমাজতন্ত্রী ধাঁজের সমাজের' আদর্শ বিসর্জন দেয় নাই এবং পররাষ্ট্রনীতিতেও গোষ্ঠী নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে বদ্ধপরিকর, ইহাতে তাহার আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কথাটা স্বীকার্য—এমন সমস্যা পরিকীর্ণ দেশে স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক রূপায়ণও সহজ মসৃণ গতিতে সুসাধ্য হয় না। এই সব কথা মনে রাখিয়াই ভারতের এই আধুনিক রূপের হিসাব লইতে হইবে।

অ-পূর্ণ স্বাধীনতা

গোড়াতেই বুঝা উচিত ১৯৪৭এর পরিবর্তনটা মূলত বৈপ্লবিক পরিবর্তন নয়—প্রথমত ও প্রধানত উহা ছিল রাজনৈতিক। অবশ্য শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহা সীমাবদ্ধ থাকিত না, এবং তাহা থাকেও নাই। সম্পূর্ণ না হউক, সে রাজনৈতিক পরিবর্তন অংশত ভারতীয় জনগণের বিপুল ও সুদীর্ঘ বিপ্লবাত্মক প্রয়াসেরই পরিণতি; এবং, সম্পূর্ণ না হউক, সেই পরিবর্তনে ভারতীয় সামাজিক শক্তিরও আংশিক প্রতিষ্ঠালাভ অবশ্যম্ভাবী। তবে ১৯৪৭এর পনেরই আগস্ট সামাজিক শক্তির যে সম্পূর্ণ জয়লাভ ঘটে নাই, তাহাও ঠিক। সমাগত বিপ্লবকে অসম্পূর্ণ রাখিবার প্রয়োজনেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পনেরই আগস্টের ব্যবস্থা অতি দ্রুত প্রণয়ন করিয়া ফেলে। সাম্রাজ্যবাদের চরম সর্বনাশের মুখে যতটা সম্ভব নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করা ছিল তাহাদের তখন মূল লক্ষ্য। ঔপনিবেশিক বিত্তবান নেতৃশ্রেণীর অনৈক্যের সুযোগ গ্রহণ করা সাম্রাজ্যবাদের সনাতন নীতি; এই ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটে। সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষকে ভারত ও পাকিস্তান দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করিয়া দেওয়া, ইহাই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্বার্থের দিক হইতে ১৯৪৭এর ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত প্রধান কূটনীতি। তাহাদের আশা ছিল ভারতের ও পাকিস্তানের দুই বিরোধী নেতৃগোষ্ঠী তখন হইতে দুই রাষ্ট্রের সৈনিক ও পুলিশ হাতে লইয়া পরস্পরকে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে ক্রমাগত দুইপক্ষই একই রূপে ব্রিটিশ শক্তির কৃপাপ্রার্থী হইয়া থাকিবে। তাহা ছাড়াও, ১৯৪৭এর ব্যবস্থা মত উভয় রাষ্ট্রেরই অভ্যন্তরে রহিত সামন্ততন্ত্রী রাজন্যগণ, তাহারা প্রত্যেকে স্বাধীন এবং প্রত্যেকে ব্রিটিশ শক্তির

অনুচর। অর্থাৎ পনেরই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিলেও তাহা পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতাও এইরূপে অনেক দিকে খর্বিত ও ও বহুরূপে কণ্টকিত ছিল, এবং দ্বিতীয় কথা, আর্থিক স্বাধীনতা একেবারে আয়ত্তের অতীত ছিল। আর্থিক স্বাধীনতা লাভ না হইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতাও যে পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, তাহা এই যুগে পরিষ্কার। তৃতীয়ত, এই যুগে পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থ স্বদেশীয় কোনো নেতৃ-চক্রের ক্ষমতালাভ নয়, এমন কি, ১৮৭৯এর (ফরাসী বিপ্লবের) ধারণানুযায়ী দেশীয় ধনিকতন্ত্রের বা ন্যাশনাল বুর্জোয়াদির ক্ষমতালাভও তাহা বুঝায় না। কারণ, ইং ১৯১৭এর পরে পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়াইয়াছে রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক গণতন্ত্রের (political and economic democracy) প্রতিষ্ঠা, সমাজতন্ত্রী সমাজের বুনিয়াদি রচনার উপযোগী আয়োজন (creating conditions of socialism)। ১৯৪৭এর পনেরই আগস্টের স্বাধীনতায় কি ভারত কি পাকিস্তান কেহই সেইরূপ অধিকার অর্জন করে নাই।

স্বাধীনতার ভিত্তি রচনা

কিন্তু ১৯৪৭এর পরেকার কয় বৎসরের ভারতীয় রাজনৈতিক পরিবর্তনের দিকে তাকাইয়া বলা যায়—ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব সেই পনেরই আগষ্টের সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে মোটামুটি স্বাধীনতার উপযোগী বনিয়াদ রচনার কাজে (for creating conditions of independence) বহুলাংশে প্রয়োগ করিতে পারিয়াছে। যথা, সামন্ত রাজ্যসমূহ হস্তগত করিয়া ভারতীয় নেতৃগণ মোটের উপর একটি ঐক্যবদ্ধ ভারত রাষ্ট্র সংগঠিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি প্রবর্তন করিতে পারিয়াছেন। তৃতীয়ত, ব্রিটিশ বা বৈদেশিক আর্থিক স্বার্থের সহিত বিরোধিতা এড়াইয়া এতদিনকার ঔপনিবেশিকতায় পঙ্গু আর্থিক জীবনকে ('stunted growth') পরিকল্পনা-সহায়ে (Planned Economy) নবান্বিত করিতে সংকল্প করিয়াছেন। এই বিকাশ সম্পূর্ণ হইলে বলা যাইবে পূর্ণ স্বাধীনতার রূপায়ণ সম্ভব হইতেছে।

বলা বাহুল্য, এই কথা এখনো পাকিস্তানের নেতৃবর্গ সম্বন্ধে বলা যায় না।

ভারত অসম্পূর্ণ বিপ্লবের (unfinished revolution) সমস্যাকে সমাধান করিতে সচেষ্ট, কিন্তু পাকিস্তানী নেতৃবর্গ এখনো সে বিষয়ে তৎপর নয়।

ভারতের পক্ষে অবশ্য এইরূপ প্রয়াস বিস্ময়কর নয়। বহুদিন হইতে এশিয়ার বিপ্লবী জনজাগরণের এক প্রধান মুখপাত্র ছিল ভারতের স্বাধীনতা-কামী জনসাধারণ। দুঃখের বিষয় মুসলিম লীগের পরিচালিত পাকিস্তানী জনসাধারণের সে রাজনৈতিক ঐতিহ্য বেশি নয়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের ঐতিহ্য আর মুসলিম লীগের ঐতিহ্য প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী বিশ্বজোড়া গণবিপ্লবের ধারা হইতেও ভারতীয় জনসাধারণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। ভারতীয় নেতৃত্ব যতই মুনাফাতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হউক, এশিয়া-আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবী স্বাধীনতাকামীদের—নব্য চীন, ইন্দোনেশিয়া হইতে মিশর আলজিরিয়া পর্যন্ত সকল জনগণের প্রতি—উহা সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রেও 'পঞ্চশীলের' প্রবক্তা নিরপেক্ষ শক্তিরূপে ভারতবর্ষ যথার্থই বিশ্বশান্তির পরিপোষক।

অবশ্য, ভারতীয় নেতৃত্ব সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত নয়। সে নেতৃত্বের অভ্যন্তরেও দ্বিধাসংশয় প্রবল। কারণ, ভারতের ধনিকগোষ্ঠী অন্যান্য ধনিক-গোষ্ঠীর মতই গণবিপ্লববিরোধী। মিশ্র আর্থিক ব্যবস্থায় (Mixed Economy) ও আর্থিক পরিকল্পনায় নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ ও প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিতেছে বলিয়াই তাহারা আভ্যন্তরীণ উন্নয়নমূলক আর্থিক ব্যবস্থায় (development economy) স্বীকৃত। এজন্যই কংগ্রেস নেতৃত্বের 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁজের সমাজ-গঠনে'র (socialist pattern of society) কথায়ও ভারতের ধনিকগণ প্রকৃতপক্ষে গুরুত্ব আরোপ করে না। বিশেষত, মার্কিন প্রভাব এখন আর্থিক সাংস্কৃতিক নানা সূত্রেই পৃথিবীর সব দেশেই সক্রিয়। ভারতবর্ষে জনগণের মধ্যে অবশ্য মার্কিন ধনিকগোষ্ঠীর প্রভাব স্থাপিত হয় নাই। মার্কিন-পক্ষ তাই একদিকে ভারতের নেতৃগোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তারে উদ্যোগী, অন্য দিকে নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তারে সক্রিয়। ফোর্ড-রকফেলার ফাউণ্ডেশনের বৃত্তি প্রভৃতি, কিংবা মার্কিন-বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণাদি, শুধু ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবশত প্রদত্ত, এমন নয়। 'আমেরিকান লবি' কথাটি নয়াদিল্লীতে সুপরিচিত। কংগ্রেস, 'স্বতন্ত্র', জনসঙ্ঘ, 'পি-এস-পি', এমন কি উচ্চ রাজনৈতিক মহল হইতে ভারতীয় ধনিক-মহল পর্যন্ত সেই 'লবি' বিস্তৃত। বিশেষত বিড়লা

গোষ্ঠীর সাংবাদিক ও অর্থনৈতিক প্রচারকদের কংগ্রেসের সহিত যতটা যোগাযোগ, আমেরিকান লবির সহিত যোগাযোগ তদপেক্ষা বেশি। ভারতীয় অর্থনীতিকে এইসব গোষ্ঠী ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃত্বে ঔপনিবেশিকতার খাতে ধরিয়া রাখিয়া প্রধানত কৃষি-উন্নয়নের খাতে বহাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিল—অনুন্নত দেশের মৌলিক শিল্পায়ন তাহাদের অভিপ্রেত নয়। এশিয়ার জন্য প্রণীত 'কলম্বো প্ল্যানের' মত ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—১৯৫১এর এপ্রিল হইতে ১৯৫৬এর মার্চ পর্যন্ত—অনেকটা তাহাদের এই উপদেশ মানিয়াই প্রণীত হয়। তখন পর্যন্ত ভারতীয় নেতৃত্ব প্রধানত দেশবিভাগের পরবর্তী আর্থিক সামাজিক দুর্যোগ কাটাইতে ব্যস্ত ছিল; এ্যাংলো-মার্কিন আর্থিক সহায়তা, খাদ্যঋণ প্রভৃতি সেই কারণে তখন অপরিহার্য বলিয়া মনে করিত।

ভারতের পথ ঃ নির্বিরোধ বিকাশ

কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫৬এর এপ্রিল হইতে ১৯৬১এর মার্চ পর্যন্ত) অপেক্ষাকৃত স্থিরতর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থায় জাতীয় স্বার্থে প্রণীত হয়। উহাতে মূল শিল্প ও ভারী শিল্প গঠনের নীতি গৃহীত হইয়াছিল। অর্থাৎ, নীতির দিক হইতে ঔপনিবেশিকতার খাত ছাড়িয়া ভারতীয় আর্থিক জীবনকে স্বাধীনতার দিকে প্রবাহিত করাইতে আরম্ভ করানোই ইহার অন্তর্নিহিত মূলনীতি ছিল। এইরূপে পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তিরচনা হইবে। তবে ভারতীয় নেতৃত্ব তাহা সাধন করিতে চাহিয়াছে যথাসাধ্য নির্বিরোধের পদ্ধতিতে। যেমন, তাহারা এ্যাংলো-মার্কিন ধনিকতন্ত্রের সরাসরি বিরোধিতা এড়াইয়া চলিয়াছে ; কারণ ইহাদের সাহায্যের তাহারা প্রার্থী। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রী মণ্ডলীরও সহানুভূতি এবং সাহায্য তাহাদের কাম্য। আবার, যথাসম্ভব দেশীয় ধনিকগোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করিয়াই তাহারা সরকারী আওতায় শিল্পগঠন করিতে চায়, অথচ জন-সাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির মূলস্বরূপ আর্থিক প্রয়োজনকেও একেবারে বিস্মৃত হইতে পারে না। এইরূপে দেখি, ভারতের অভীষ্ট যদিও ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অবসান, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির নীতি বা পদ্ধতি সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক হয় নাই। উহা 'মিশ্র অর্থনীতি'র একটা সশঙ্ক আপোষ-রফার নীতি ও পদ্ধতি। কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা এড়াইয়া ইহা স্বাধীনতাকে কতকটা গণতান্ত্রিক ধারায় রূপায়ণের চেষ্টা করিতেছে।

স্বাধীনতা লাভের পরে ১৯৪৮এ এই মিশ্র আর্থিক (Mixed Economy) ব্যবস্থার নীতিকে ব্যাখ্যা করিয়া ভারত সরকার তাহাদের মত ১৯৫৬তে ব্যাখ্যা করিলেন। একমাত্র অস্ত্রশস্ত্র, আণবিক শক্তি, ইস্পাত, লৌহ প্রভৃতি শিল্পেই সরকারী মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইবে; কারণ এইসব ক্ষেত্রে ধনিকগোষ্ঠী অগ্রসর হইতে চাহেন না, বা পারে না। দ্বিতীয়ত, খনি, এলুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতব শিল্প, যন্ত্রপাতি কারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায়ও সরকার উদ্যোগী হইবে। সরকার নিজের হাতে এসব ভার ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করিবে, তবে ব্যক্তিগত মালিকানাও সেখানে প্রসারের সুযোগ পাইবে। তৃতীয়ত, এইসব বিভাগ ব্যতীত সর্বত্রই ব্যক্তিগত মালিকানার অবাধ ক্ষেত্র অক্ষুণ্ণ রহিবে। এইরূপ আশ্বাস লাভ করার পরে মালিকগোষ্ঠী, নিজেদের অংশের ব্যয়ভারও যাহাতে বিশেষ বহন না করিতে হয়, তাহার জন্য নানা উপায় গ্রহণ করিল। এই সময়ে তাহারা অনেকাংশে নিজেদের স্বার্থ বিস্তৃত করিতে পারিয়াছে। তাই দেখি একদিকে ব্যক্তিগত-মালিকানার ক্ষেত্র (Private Sector) প্রসারিত করিয়া ও সরকারী ক্ষেত্র (Public Sector) সীমিত করিয়া মালিকদের তুষ্ট করা হইয়াছে, অন্যদিকে ভারী শিল্পের আয়োজনও কিছুটা খর্ব করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, বৈদেশিক পুঁজিকে সর্বরকম সুযোগ-সুবিধা দিয়া বৈদেশিক কায়েমীস্বার্থ গোষ্ঠীকেও তুষ্ট করার চেষ্টা হইয়াছে। অবশ্য তাহারা তাহাতে ভুলিবার নয়, তাই পরিকল্পনার জন্য প্রত্যাশিত বৈদেশিক সাহায্য মার্কিন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে দুর্লভই রহিয়া গিয়াছিল। 'মিশ্র অর্থনীতি' ও আর্থিক পরিকল্পনা এই দুইটি ভারতের নিজস্ব পথ,—সেই পথে সমাজতান্ত্রিক ধাঁজ গড়া কতটা সম্ভব তাহাই লক্ষণীয়।

আর্থিক পরিকল্পনার অর্থ

বলা বাহুল্য, 'আর্থিক পরিকল্পনা' বলিতে সমাজতন্ত্রীরা যাহা বুঝান ভারতের আর্থিক পরিকল্পনা তাহা নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন ১৯২৯এ পরিকল্পনানুযায়ী সমাজতন্ত্রী অর্থনীতির রূপায়ণে প্রবৃত্ত হয় তখন পৃথিবীর ধনিকতন্ত্রী উন্নত শক্তিরা হাসিয়াই খুন হইয়াছিল। মানুষের সাধ্য কি আর্থিক, সামাজিক নীতি নিয়মকে নিজেদের প্রয়োজনমত পরিবর্তিত করে? সেযুগ অবশ্য এখন চলিয়া গিয়াছে। ধনিকতন্ত্রীরাও এখন পরিকল্পনা দ্বারা নিজেদের ব্যবসা

বজায় রাখিতে উদ্‌গ্রীব। তবে এই সব ধনিকতন্ত্রী পরিকল্পনা ও সোভিয়েত পরিকল্পনায় যে মূলগত পার্থক্য আছে তাহা ভুলিবার নয়। সোভিয়েত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল—মুনাফার প্রয়োজনে নয়, সামাজিক প্রয়োজনে উৎপাদন বৃদ্ধি—সমাজের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনশক্তির বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া। ধনিকদের পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইল—মুনাফা বজায় রাখা ও বাড়ানো, ধনিকদের অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যথেচ্ছ উৎপাদন কতকটা সেই উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়াও মুনাফার রাজত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা; সমাজের প্রয়োজন নয়, মুনাফার প্রয়োজনই ধনিকতন্ত্রী পরিকল্পনার মূল নীতি। কিন্তু মুনাফার রাজত্বে অরাজকতাও থাকিতে বাধ্য—ধনিকে-ধনিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিবে, এবং মুনাফার প্রয়োজনেই উৎপাদনশক্তির অপচয়ও এইরূপে ঘটিবে। তাই, ধনিকতন্ত্রী পরিকল্পনা যতই সাময়িক ভাবে সার্থক হোক আসলে উহা অপচয়ের পরিকল্পনা—Planning for planlessness. অপরপক্ষে সোভিয়েত পরিকল্পনার যত ত্রুটিই থাকুক উহা সৃষ্টিমূলক পরিকল্পনা—Creative planning; সমাজের আভ্যন্তরীণ বিরোধ অপসারিত করিয়া সমাজ-শক্তির বিকাশকে ত্বরান্বিত করাই উহার কাজ, সমাজের সৃষ্টিশক্তির মুক্তিদানই সমাজতন্ত্রী পরিকল্পনার অর্থ।

আমরা অবশ্য ভারতে ১৯৪৭এর পরেই সমাজতন্ত্র গঠন করিবার মত পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারি নাই—তাহা সম্ভবও হইত না। আমাদের প্রথম প্রয়োজন ছিল আধাসামন্ত ঔপনিবেশিক অর্থনীতির স্থলে জাতীয় অর্থনীতির প্রবর্তন, এ বিষয়ে সম্ভবত মতান্তর নাই। স্বাধীনতার অর্থই এই যে, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অবসান করিয়া জাতীয় সৃষ্টিশক্তি আত্মবিকাশের অধিকার লাভ করিয়াছে। সৃষ্টিশক্তির এই মুক্তির অর্থ—ভারতীয় জনসমাজের উৎপাদনশক্তির আর্থিক ক্ষেত্রে সার্থকতা, এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞানের অনুশীলনে, তদনুরূপ কুশলতা অর্জন। ভারতীয় আর্থিক জীবনের পক্ষে স্বাধীনতার বাস্তব অর্থ: এক, কৃষিবিপ্লব। উহার অর্থ শুধু জমিদার মহাজনের শোষণের অবসান নয়, (১) কৃষককে জমির মালিক করিয়া কৃষকবিপ্লব সূচনা, এবং (২) ভূমিসংস্কারসাধন করিয়া বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালীর প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা, (৩) সমবায়-নীতিতে কৃষক শ্রেণীর আত্মগঠন করা, ইত্যাদি—তাহাতে কৃষি-বিপ্লব সম্পূর্ণ হইত। কিন্তু ভারতে তাহা হয় নাই। দুই, পল্লী-উন্নয়ন ব্যবস্থা ও ক্ষুদ্র পল্লী-শিল্পের ব্যবস্থাপনা করিয়া দেশের বেকার অর্ধবেকার বিরাট জন-শক্তিকে ফলপ্রসূ সামাজিক কার্যে নিয়োগ করা। ইহার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন

প্রধানত বিদ্যুৎশক্তির সহায়তা ও সমবায়নীতির সার্থক প্রয়োগ (Electrification ও Cooperatives)। তিন, দ্রুত ও ব্যাপক শিল্পায়ন (Industrialization), এবং সেইরূপ শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে প্রথমত গুরু ও ভারীশিল্পের (basic and heavy industries) পত্তন। অবশ্য, (চার), উহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজন সার্বজীনন প্রাথমিক শিক্ষা, এবং ব্যাপক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও কারুশিক্ষার প্রসার; দেশের চিন্তায় ভাবনায় বিজ্ঞান-সম্মত সাংস্কৃতিক আদর্শ স্থাপন। বলা নিষ্প্রয়োজন সকল প্রয়াসের মূল কথা—সর্বদিকে, সর্বক্ষেত্রে জনসাধারণের উদ্যোগ-উৎসাহ; কারণ, জনশক্তির প্রাণে উৎসাহ সঞ্চার করিতে না পারিলে জনসমাজের সৃষ্টিশক্তি বিকাশ লাভ করিবে কিরূপে? কৃষিতে শিল্পে সর্ববিধ ব্যবস্থাপনায় জনসাধারণকে সহযোগী করিতে হইলে, তাহাদের পরিশ্রম ও ত্যাগ এই বিরাট যজ্ঞে প্রার্থনা করিলে, তাহাদের জীবনধারণের উপযোগী নিম্নতম আয়ের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। উহা জনতার উৎসাহসৃষ্টির পক্ষে এইটি অপরিহার্য বাস্তব শর্ত। সেই নিম্নতম জীবন-মান লাভ করিলে দেশ-গঠনে, জাতি-গঠনে জনশক্তি স্বেচ্ছায় অনেক বেশি ত্যাগ স্বীকার করে,—গত মহাযুদ্ধের কালে যুদ্ধরত ধনিক দেশে ও সমাজতান্ত্রিক দেশে বরাবর তাহা দেখা গিয়াছে। অতএব, দরিদ্রতম জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন, এবং কর্মক্ষম সকল মানুষের কর্মসংস্থান, স্বাধীনতার রূপায়ণেও ইহা প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত।

পরিকল্পনার পথে ভারত

ভারতের পরিকল্পনাকারীরা অবশ্য এইসব কথা চিন্তা কবিবার অবকাশ পূর্বেই পাইয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্রের উৎসাহে প্রথম ১৯৩৮এ জাতীয় কংগ্রেস জাতীয় পরিকল্পনা-সংসদ গঠন করিয়াছিল। পণ্ডিত জওহরলাল ছিলেন উহার সভাপতি। তখন ব্রিটিশ আমল; সেই সংসদের রিপোর্টসমূহে মহোৎসাহে নানা তথ্য ও নির্দেশ প্রকাশিত হয়। যুদ্ধান্তেও টাটা-বিড়লাদের জাতীয় ধনিকগোষ্ঠীর প্ল্যান রচিতহয়। অন্য ধরনের গান্ধীবাদী প্ল্যানও ছিল—শ্রীমন্ নারায়ণের বোম্বাই প্ল্যান; উহার লক্ষ্য অবশ্য শিল্পসমৃদ্ধ সমাজ গঠন নয়, বিকেন্দ্রিত ক্ষুদ্র শিল্পের সমাজগঠন। তারপর ১৯৪৭এ ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইল। স্বাধীনতা লাভ করিয়া ১৯৫০ সালে কংগ্রেস সরকার পরিকল্পনা-কমিশন নূতন করিয়া নিয়োগ করিলেন। গান্ধীবাদীরা যাহাই চাহুন, সমাজের মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে কংগ্রেস

নেতাদের তখন ভুল হইল না। স্থির হইল যে, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করিয়া জনসমাজকে সমৃদ্ধ ও বিচিত্র জীবনের সুযোগ দান করাই হইবে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দ্বারা এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, ১৯৭৭এ ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় যাহাতে অন্তত দ্বিগুণ হয়। ১৯৫০-৫১ সালে মোট আয় ছিল বার্ষিক ৯,১১০ কোটি টাকা, মাথাপিছু আয় বার্ষিক ২৫৩৲ টাকা। ১৯৭৭এ তাহা হইলে মাথাপিছু আয় (টাকার তখনকার মূল্যে) হওয়া চাই প্রায় বার্ষিক ৫০০৲ টাকা। পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত জাতির মাথাপিছু আয়ের সঙ্গে তুলনা করিলে ইহা সামান্যই উন্নতি। বিশেষত আমরা যখন প্রতি পাঁচ বৎসরে এক পা এক পা করিয়া পঞ্চ পদক্ষেপ করিব, যাহারা পূর্বেই দশ পা আগাইয়া আছে তাহাদের ততক্ষণে পঞ্চপদ নয়, আরও দশপদ, মোট বিশপদ আগাইয়া যাইবার সম্ভাবনা—অবশ্য যদি আভ্যন্তরীণ বিরোধিতায় বা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই উন্নত শক্তিরা নিজেদের শক্তি ক্ষয় না করে।[১] যুদ্ধ না বাধিলে সোভিয়েত ভূমিরও এরূপ উন্নতির সম্ভাবনা, কারণ, আর্থিক অরাজকতা দ্বারা সোভিয়েত দেশের কাজ বৈজ্ঞানিক ও বৈষয়িক উন্নতি ব্যাহত হয় না। অবশ্য অনুন্নত দেশের পক্ষে প্রথম পাঁচ পদক্ষেপই সর্বাধিক কঠিন কাজ। একবার চলিতে আরম্ভ করিলে আমরা আমাদের বিরাট জনশক্তি লইয়া পরে কাহাকে কাহাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারিব, সামাজিক গতি-বিজ্ঞানের ছাত্র কেন, সাধারণ বুদ্ধির যে কোনো মানুষও তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারে। অতএব সমস্যাটা আসলে এই প্রথম যাত্রার—প্রথম পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক উদ্যোগের।

এই প্রাথমিক প্রয়াস হিসাবেই ভারতের পরিকল্পনা সমূহ ও কার্যত তাহার উদ্যোগ-আয়োজন বিচার্য। সেদিক হইতে অবশ্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে বিশেষ মূল্যবান বলা চলিবে না। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনা—বা ১৯৫৬এর এপ্রিল হইতে স্বাধীনতার রূপায়ণের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

(১) ১৯৬৪এর মধ্যভাগে পৃথিবীর অনুন্নত জাতিদের উন্নতি প্রয়াসের হিসাব লইতে গিয়া একটি বৈজ্ঞানিক পরিষদ দেখিয়াছে, যদি এখন যে গতিতে তৎপর অনুন্নত দেশ সমূহ অগ্রসর হইতেছে, উহার দ্বিগুণ হারে তাহারা এখন হইতে বরাবর অগ্রসর হইয়া চলে তাহা হইলে একশত বৎসর পরে বৈজ্ঞানিক ও কারবৈজ্ঞানিক উন্নতিতে তাহারা এখন উন্নতি দেশসমূহ যে ধাপে আছে সেই ধাপে পৌঁছাইবে। অবশ্য সেই একশত বৎসরে এই উন্নত শক্তিরা যে কত উচ্চ উঠিয়া যাইবে তাহা কল্পনা করাও অসম্ভব। এই কথা ইংলণ্ডের নিউ সিটস্‌ম্যান হইতে লব্ধ।

তবে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার স্বপক্ষেও একটা কথা বলিবার আছে। দেড়শত দুইশত বৎসরের ব্রিটিশ রাজত্বে যেখানে "কিছুই করা যায় না" এই ছিল স্বীকৃত নিয়ম, সেখানে স্বদেশীয় সরকার 'কিছু করা হইবে,' এই নীতি মানিয়া লইয়াছিল। যেখানে কিছুই ছিল না, সেখানে যে কিছু হইতেছে, দুইশত বৎসরের অচল অবস্থা ভাঙিবার পক্ষে ইহাই একটা বড় কথা। অবশ্য ২,৩৬৫ কোটির মধ্যে ১,৯৬০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া যথার্থই দ্রুততর অগ্রগতির উপযোগী ভিত্তি রচিত হইয়াছে কিনা এবং অনুষ্ঠিত আয়োজনের কতটা যথার্থই, পুরাপুরি সম্পূর্ণ না হউক, সেই ভাবী গঠনের দিক হইতে অন্তত পাশ মার্ক পাইবার মতও সফল হইয়াছে, তাহা একটা বড় বিচার্য বিষয়। সেখানে কোনো কোনো বিষয়ে মতভেদের অবকাশ রহিয়াছে। কারণ, অনেক সরকারী হিসাব কাঁচা হিসাব। সেই হিসাব সত্য হইলেও সন্দেহের অবকাশ থাকিয়া গিয়াছে, কারণ সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা বিশেষ বাড়ে নাই। ধনীরা আরও ধনী হইয়াছে, গরীবেরা গরীব হইয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, দ্রুততর উন্নতির উপযুক্ত বুনিয়াদ প্রথম পরিকল্পনায় রচিত হয়, তাহা মানিয়া লওয়া যাউক। ইহা ধরিয়া লইয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত ও প্রারব্ধ হয়। এবং সেই পরিকল্পনার মোট রূপটি যে স্বাধীনতার রূপায়ণের পক্ষেও বহুলাংশে অনুকূল তাহাও মানিয়া লওয়া যাউক। তারপর দ্রষ্টব্য তৃতীয় পরিকল্পনার (১৯৬১-৬৬) ব্যাপকতর প্রয়াস—আবার চীনা আক্রমণও সেই সময়ে বাধা হইয়া উঠে।

পরিকল্পনার রূপ

অঙ্ক ও তথ্য দ্বারাই অবশ্য পরিকল্পনার আয়তন ও আয়োজন বুঝিতে হয়। কিন্তু পরিকল্পনার রূপ বুঝিতে হইলে সেই অঙ্কের অরণ্যে পথ না হারাইয়া, গৌণ তথ্যের বাঁকে বাঁকে দিগ্‌ভ্রান্ত না হইয়া, উহার মূল সত্যকেই বুঝিতে চেষ্টা করিতে হয়। পরিসংখ্যান ছাপা হইতে না হইতেই বদলাইয়া যায়—কিন্তু পরিস্থিতি তত বদলায় না। তাই অঙ্ককে মূল্যবান মনে করিলেও তাহার উদ্ধৃতি অনাবশ্যক। মূল সত্য প্রধানত পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যে পাওয়া যায়, দ্বিতীয়ত পাওয়া যায় বাস্তব উদ্দেশ্যের (objective) হিসাব হইতে। কারণ, অঙ্ক খাতায় থাকে, তথ্যও পরিবর্তিত হয়, মূল উদ্দেশ্যও পরিবর্তিত হয়, অতএব পরিবর্তমান আয়োজনের গতিরূপের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সেই পরিকল্পনার রূপ

বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য শেষ হিসাব—কার্যত কী হইয়াছে, খাতার হিসাব মিথ্যাও হইতে পারে।

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল নীতি বলা হইয়াছে সমাজতান্ত্রিক ধাঁজের সমাজগঠনের অনুকূলনীতি। পরিকল্পনার রূপ বিচারের পক্ষে ঐ কথাটি অবশ্য বিস্মরণীয় নয়। কিন্তু, 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁজের সমাজ' কথাটি অস্পষ্ট। কে এই কথায় কী বুঝেন, তাহার ঠিকানা নাই। অতএব, উহাতে তত গুরুত্ব না দিয়া উহার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহই (objectives) বরং অধিক লক্ষণীয়। সেই প্রধান উদ্দেশ্য কি কি ?

প্রথমত, জাতীয় আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি; দ্বিতীয়ত, দ্রুত শিল্পায়ন (industrialization), বিশেষত গুরুশিল্প ও ভারী শিল্পের বিকাশ; তৃতীয়ত, কর্মসংস্থানের বড় রকমের সুযোগ বৃদ্ধি; চতুর্থত, আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস ও আর্থিক শক্তির অধিকতর পরিমাণে সমবণ্টন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে তৃতীয় পরিকল্পনা (১৯৬১-৬৬) প্রণয়ন কালে সুদীর্ঘ হিসাব দিয়া পূর্ব দুই পরিকল্পনার সাফল্যের প্রমাণ উপস্থিত করা হয়। সেই সব অঙ্ক ও গণনায় প্রবেশ নিরর্থক। শুধু এই জানাই যথেষ্ট যে, প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতিতে জাতীয় আয় শতকরা ১২ভাগ বাড়িবার কথা ছিল, বাড়িয়াছিল বলা হয় ১৮ ভাগ। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পবৃদ্ধি প্রায় ২গুণ হয়, কৃষি বৃদ্ধিও শতকরা ৪৬ ভাগ হয়, আর জাতীয় আয় শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়—যদিও ২৫ভাগ বাড়িবার কথা ছিল। ইহা সত্ত্বেও দুই তিনটি কথা বুঝিবার মতো :—

মুদ্রাস্ফীতির ও দ্রব্যমূল্যের কথা মনে রাখিলে বুঝিতে পারিব আসলে আয়বৃদ্ধির হার বেশি নয়।

দ্বিতীয়ত, জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে পরিকল্পনায় বেশি কর্মসংস্থান করিলেও বেকার সংখ্যা আরও বাড়িয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে এইরূপ বেকারের সংখ্যা ৯০ লক্ষ ছিল; তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ১ কোটির অনেক বেশি হইবে; উহার সহিত অর্ধবেকারদের সংখ্যা যোগ করিলে বুঝা যায় অবস্থা ভয়াবহ।

তৃতীয়ত কথাটি এই 'জাতীয় আয়'। মনে রাখা দরকার—মাথাপিছু গড়পড়তা আয়-ব্যয় কথা দুটি শোষণবাদী ব্যবস্থার একটা ফাঁকি। বিড়লা ও বিড়লার মজুরের আয় মাথাপিছু আয়ের হিসাবে এক সমান। 'জাতীয়

আয়ের' মধ্যে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ঢাকা পড়িয়া যায়। তাই, সামাজিক বৈষম্য বুঝিতে হইলে, দারিদ্র্য দূরীভূত হইতেছে কিনা তাহা বুঝিতে হইলে, নিম্নতম আয়ের, তদূর্ধ্ব নিম্নতর আয়ের, তদূর্ধ্ব নিম্ন আয়ের, বিবিধ আয় স্তর, এবং মধ্য আয়ের, উচ্চমধ্য আয়ের ও উচ্চতর, উচ্চতম আয়ের প্রতিস্তর বিভাগ করিয়া তবেই হিসাব উত্থাপিত করা প্রয়োজন—তাহাতে বুঝা যাইবে জাতীয় আয়ের কত ভাগ পায় জাতির শতকরা ৬০ ভাগ বা কত ভাগ পায় ৮০ ভাগ মানুষ ; আর কতভাগ শোষণ করে ঊর্ধ্বস্তরের সামান্য কয়েক হাজার লোক—জাতি কাহার কবলিত, সাধারণ মানুষের না, ধনিকদের।

এই হিসাব কিরূপ ?

ধনি-দরিদ্রের লাভালাভ

১৯৬৩এর প্রজাতন্ত্র দিবসের (২৬শে জানুয়ারি) পূর্বে শুক্রবার, ২৫শে জানুয়ারি, ভারতের পরিকল্পনা কমিশন বরাবরের মত এক অধিবেশনে দেশের আর্থিক উন্নতির একটি হিসাব গ্রহণ করেন।[১] তাহাতে তাঁহারা যে চিত্র, বর্তমানের ও ভবিষ্যতের যে সম্ভাবনা দেখিতে পান তাহা কাহারও অকল্পিত ছিল না। অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই প্রেক্ষাপটের দিকে তাকাইয়া তথাপি কেহ না আঁৎকাইয়া উঠিয়া পারেন নাই। তৃতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসর চলিতেছিল—দেশে যেই হারে জাতীয় ও মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি পরিকল্পিত তাহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলেও যে হারে লোকবৃদ্ধি প্রত্যাশিত তাহা মনে করিয়া দেখা যাইতেছে— এখন অবস্থা কত কঠিন। কমিশন দেখিতেছেন : (১) এই শতাব্দীর শেষে, অর্থাৎ ইং ২,০০০ সালেও ভারতবর্ষের এক তৃতীয়াংশ লোক জীবনধারণের উপযোগী অন্নলাভও করিতে পারিবে না। অবশ্য বর্তমানে (১৯৬৩) দুই তৃতীয়াংশ লোকই তাহা হইতে বঞ্চিত। (২) দেখা যাইতেছে যে 'জাতীয় আয়' বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোকই তাহাতে সুবিধা করিয়া লইতেছে, অধিক সংখ্যক লোকই সেই আয় হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইতেছে। কমিশনের পরিসংখ্যানের দ্বারা কথাটা স্পষ্ট হইয়া উঠে।

১ তৎপরেকার হিসাবেও (১৯৬৪ এপ্রিল) এই সব সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য সন্ধান করিবার জন্য একটি বিশেষ কমিশন সরকার নিযুক্ত করিয়াছেন।

(ক) সমাজের উপরস্থিত মোট জনসংখ্যার ১০% শতকরা দশজন গ্রাস করিতেছে মোট জাতীয় আয়ের ৩৩'৩, শতকরা একতৃতীয়াংশ ভাগ, এবং এই উপরের দশ জন গ্রাস করে মোট জাতীয় ভোগ্য বস্তুর শতকরা পঁচিশ (২৫%) ভাগ।

অন্যদিকে (খ) নিম্নস্থিত মোট সংখ্যার শতকরা দশ জন (১০%) পায় মোট জাতীয় আয়ের মাত্র ২½%, আড়াই শতাংশেরও, কম। স্বভাবতই এই শতকরা (১০%) দশ জন পায় মোট ভোগ্যবস্তুর তিন শতাংশেরও (৩%) কম।

অর্থাৎ টাকার হিসাবে অবস্থা দাঁড়ায় এইরূপ :

নিম্নতম জনসংখ্যার ১০% দশ শতকরা দশ জনের মাথাপিছু আয় মাসে ৭৲ টাকারও কম

ঠিক তদূর্ধ্ব	১০%	,,	,,	,,	,,	,,	১০৲	,,	,,
আরও ঊর্ধ্ব ,,	১০%						১২৲		
,, ,, ,,	১০%	,,	,,	,,	,,	,,	১৫৲	,,	,,
,,	১০%			,,	,,	,,	১৮৲	,,	,,
,,	১০%		,,	,,	,,	,,	২১.৫০		,,
অর্থাৎ শতকরা মোট ৬০%		মানুষ		,,	,,	,,	২৫৲		,,

অথচ, বিশেষজ্ঞরা প্রমাণ করিয়াছেন যে অন্ততঃ মাসে ৩১৲ টাকার কম খরচে কাহারও স্বাস্থ্য কর্মশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা যায় না। কমিশনও এই কথা অস্বীকার করেন না। তবে তাঁহারা আশা করেন—এখনো না হয় মাসে ২১৲ টাকাতেই কোনো রূপে প্রাণধারণ করা চলুক। সেই নিম্নমানে খাইয়া বাঁচিয়া থাকিলেও তাঁহারা দেখিতেছেন আগামী ২,০০০ খ্রীষ্টাব্দেও শতকরা ৩০ জনের মাথাপিছু ২৫৲ টাকা আয় হইবে না।

কমিশন চাহেন আর্থিক উন্নতির হার এখন শতকরা ৫% ভাগ হইতে শতকরা ৭% ভাগে বাড়াইতে হইবে—১৯৭৫ সালে যেন অন্তত কেহ অনাহারে না থাকে। অবশ্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি উহার একটা প্রধান প্রয়োজন—তাহা ছাড়াও প্রয়োজন আর্থিক বিনিয়োগ (fiscal) নীতির পরিবর্তন, পল্লী অঞ্চলে দ্রুত বিরাট শিল্প-সন্নিবেশ ব্যবস্থা, এবং জাতীয় উন্নয়ন 'লেভির' প্রবর্তন।

উপরের এই হিসাব হইতে ভারতরাষ্ট্রের স্বরূপ, উহার "চরিত্র" বুঝা আর কষ্টকর নয়।

ভারতরাষ্ট্র শোষণেরই প্রশ্রয় দিতেছে, সামন্ততন্ত্রের প্রাধান্য শেষ করিয়া ধনিক-আয়ত্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইয়া উঠিয়াছে। এই বিংশ শতকে বিপ্লবের যুগে উনবিংশ শতকের পুঁজিতন্ত্রী প্রথায় শিল্প-বিপ্লব সম্পূর্ণ সম্ভব কিনা তাহা দেখিবার মতো। তবে 'সমাজতন্ত্রী ধাঁচের সমাজ' এই মিশ্র অর্থনীতিতে গড়িয়া উঠিতেছে না। শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প দেখিয়া মনে করা উচিত নয় যে, সমাজতন্ত্র বুঝি এই ভাবে নির্মিত হইতেছে। রাষ্ট্র কাহার আয়ত্ত, কোন্ সামাজিক শক্তির, তাহা বুঝিয়া রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের মালিক কার্যতঃ কোন্ শ্রেণী তাহা উপলব্ধি করা যায়। অথবা, শোষণের হার বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাহা দিয়াও বুঝা যায় সমাজতন্ত্রের দিকে সমাজ চলিতেছে, না, ধনিকতন্ত্রের দিকে চলিতেছে। না হইলে প্রতিক্রিয়াশীল তুর্কীরাষ্ট্রেও শতকরা ২৫% ভাগ শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত, আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প পরিমাণে তদপেক্ষা অনেক কম।

তৃতীয় পরিকল্পনা বড় করিয়াই করা হইয়াছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে (অর্থাৎ ১৯৬১-১৯৭৬) দৃষ্টি রাখিয়াই তাহা স্থির করা হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় সাড়ে দশ হাজার (১০,৫০০) কোটি টাকা নিয়োগের প্রস্তাব ছিল। চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রস্তাব—একুশ শত (২১,১৫০) কোটি টাকা; পঞ্চম পরিকল্পনার প্রস্তাব পঁচিশ শত (২৫,০০০) কোটি টাকা বা বেশি নিযুক্ত হইবে। তার শেষে আমাদের মিশ্র অর্থনীতি স্বয়ং চালিত হইতে পারিবে, ইহা আশা করা যায়। তাই তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য বহু পরিমাণে নির্ভর করিবার কথা ছিল বৈদেশিক (বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের) ঋণের উপর। কিন্তু চীনা আক্রমণের (২০শে অক্টোবর, ১৯৬২) পূর্বেই এই বিষয়ে নিরাশ হইতে হয়। ফলে বুঝা গেল আমাদের পরিকল্পনার লগ্নীর অর্থ তুলিতে হইবে বহুলাংশেই নিজ দেশ হইতে। পরে আত্মরক্ষার জন্য ব্যয়ও বাড়িয়াছে। তাহা ছাড়াও, তৃতীয় পরিকল্পনা বহুদিকে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইতেছে (১৯৬৪)। কি করিয়া উহার অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে তাহাও লক্ষণীয়:

(১) জাতীয় আয়ের অংশ সঞ্চয় করিয়া :—অর্থাৎ করবৃদ্ধি করিয়া (ক) এই করবৃদ্ধি 'পরোক্ষ কর' রূপে সাধারণ মানুষের বেশি বহন করিতে হইবে। (খ) মালিকশ্রেণীকে প্রত্যক্ষ কর বেশি দিতে বাধ্য না করিয়া তাহাদিগকে ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহিত করিবে। উহাতে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং শোষণবাদী উদ্যোগের দিকটি প্রসারিত হইবে। অন্যদিকে পরোক্ষ করে শোষিত মানুষ আরও দুঃস্থ হইবে।

(২) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প হইতেও অধিক পরিমাণে অর্থনিয়োগ করিতে হইবে। ইহা কার্যতঃ কতটা সম্ভব বলা দুরূহ। কারণ, রেল ব্যতীত অধিকাংশ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পই এখনো বিশেষ লাভজনক নয়। উহা যে সব ধনিক গোষ্ঠীর অনুচরের দ্বারা পরিচালিত তাহাতে সার্থক না হইবারই কথা। সাধারণ শ্রমিকরা ঐসব শিল্পকে আপনার মনে করিতে পারে না। কাজেই তাহা হইতে আশানুরূপ অর্থ লগ্নী হওয়া কঠিন হইবে। অবশ্য ব্যাংক ও রপ্তানী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করিলে এই আয় বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু তাহা রাষ্ট্রীকরণে সরকার অস্বীকৃত।

(৩) বিদেশী ঋণ :—প্রথমতঃ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র কড়া সুদে ঋণ দিতে চাহে —তাহাও রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগে নয়, বরং ব্যক্তিমালিকানার উদ্যোগে। কাজেই উহাতেও পুঁজিতন্ত্রই প্রসারিত হইবার কথা। অবশ্য সমাজতন্ত্রী দেশ (সোভিয়েত, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে ঋণ দিতেছে। কিন্তু তাহারা মার্কিণ রাষ্ট্র বা পশ্চিম জার্মানির মতো অতো সুসমৃদ্ধ রাষ্ট্র নয়—অতো ঋণদানে সমর্থও নয়।

প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখা প্রয়োজন—নিশ্চয়ই বৈদিশিক ঋণ আপন আদর্শানুযায়ী কর্মে আপন শর্তানুযায়ী পাইলে তাহা আর্থিক উন্নয়নে পরম আদরণীয়। উহা একেবারে না পাইয়াও অবশ্য সোভিয়েত সংঘ আত্ম-সংগঠন করিয়াছিল। নিশ্চয়ই বাহিরের সহায়তা পাইলে তাহাদেরও শিল্পায়নে আরও বেশি সুবিধা হইত। কথাটা এই—ঋণ প্রয়োজন, কিন্তু আদর্শ বা লক্ষ্যকে বিপন্ন করিয়া নয়। ভারত সেই লক্ষ্য ততটা বিপন্ন না করুক কতকাংশে চাপা দিতে বাধ্য হইতেছে। তাহা ছাড়া, পরোক্ষ করবৃদ্ধি করিয়া অর্থাৎ দরিদ্রকে করভারগ্রস্ত করিয়া পরিকল্পনানুযায়ী শিল্পায়ন করা ভুল নীতি,—তাহা সম্ভবও নয়। দেশের অর্থ বিনিয়োগ করিতে হইলে ব্যাংক ও প্রধান-প্রধান আয়ের উপায়গুলি (যেমন পাটের, চায়ের রপ্তানি ব্যবসায়) রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া উহার মুনাফাই লগ্নী করিতে হইবে। এইরূপ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পত্তন

হইলে পুঁজিতন্ত্রের ক্ষমতা হ্রাস পাইবে। 'মিশ্র অর্থনীতি' সমাজতন্ত্রের পথ কতকাংশে প্রস্তুত করিতে পারে—যদি সত্যই পুঁজিতন্ত্রকে তাহা ঝাঁপিতে না দেয়।

যাহাই হউক, ভারতের পরিকল্পনায় একটা সংকট দেখা দিতেছিল ১৯৬২তে, তৃতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে। 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের' দিক হইতে দেখিলে দেখা যাইত—মিশ্র অর্থনীতি আসলে ভেজাল অর্থনীতি; উহাতে পুঁজিতন্ত্রীদের সুবিধা ও প্রসার ঘটিতেছে, রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানার ক্ষেত্র সে পরিমাণে প্রসারিত হইতেছে না; উহাতে শ্রমিকসাধারণের উৎসাহ বাড়িতেছে না। বলা বাহুল্য, স্বাধীন ভারতের সামাজিক চরিত্র আমাদের বিজ্ঞান-সাধনায় ও সংস্কৃতি সাধনায়ও প্রকট হইয়া উঠিতেছিল। খাদ্যেও ঔষধের মতো সংস্কৃতির রূপায়ণেও ভেজাল জুটিতেছিল। এমন সময় এই সামাজিক পরিস্থিতির উপর চীনা আক্রমণে অভাবনীয় আঘাত পড়িল। তৃতীয় পরিকল্পনা রক্ষার জন্য যতই চেষ্টা করি, প্রতিরক্ষার ব্যয় ও পরিকল্পনার পুঁজি একই সঙ্গে সংগ্রহ করা ভারতীয় জনসমাজের পক্ষে এক অসাধ্য পরীক্ষা। বুঝা যায় বিদেশের সাহায্য গ্রহণ করিতে গিয়া বাধ্য হইয়া স্বদেশে মালিক গোষ্ঠীকে আরও পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে। আর দেশের শিক্ষাদীক্ষা কালচার এমন কি, বৈদেশিক নীতিতেও ধনিক গোষ্ঠীর খবরদারি সহিতে হইবে। ইহারও মধ্যে যে, ভারত রাষ্ট্র গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি রক্ষা করিতে সচেষ্ট, পরিকল্পনানুযায়ী শিল্পপ্রসারে, কৃষি উন্নয়নে এখনো প্রয়াসী, উহাই প্রমাণ কতখানি সবল এখনো ভারতের জনসাধারণের জাতীয় চেতনা; এবং কতখানি সুস্থ প্রেরণা ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পিছনে—কতখানি সম্ভব ছিল ভারতের পক্ষে সুস্থ বৈজ্ঞানিক সম্প্রসারণ, সামাজিক মৌলিক বিবর্তন ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর।

ভারতীয় প্রয়াসের অর্থ

ভারতের এই স্বাধীনতার রূপায়ণ যে পথে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা বিপ্লবের পথ নয়—বিপ্লবের বন্ধুর পথ আমরা গ্রহণ করি নাই। রক্তপাত অনিবার্য না হইলেও বিপ্লবের পথে বিরোধ অনিবার্য। কায়েমী স্বার্থ কখনো বিনা বিরোধে পথ ছাড়িয়া দেয় না। কিন্তু বিপ্লবের পদ্ধতিতে যে বিকাশ

ত্বরান্বিত হয়, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সত্য বটে, মৌলিক দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের পথে এখন পর্যন্ত কোথাও সম্ভব হয় নাই। অথচ মৌলিক ও দ্রুত পরিবর্তন চাহিলে ব্যক্তিস্বাধীনতাও অনেক দিকে খর্ব করিতে হয়, মানুষ বড় বেশি রকমে আদেশে-নির্দেশে চালিত হইতে থাকে, ইত্যাদি সত্য কথা। তাহা ছাড়া, এইরূপ বিপ্লব নির্বিরোধে সম্ভব হয় না, কারণ শ্রেণী-বিরোধই উহার পিছনের তাড়না। এই পথে দেশের কায়েমী স্বার্থ ও বিদেশের কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামেই অগ্রসর হইতে হয়; কায়েমী স্বার্থকে পরাভূত করিয়া করিয়া বিপ্লবীদের চলিতে হয়। অবশ্য পাশ্চাত্য অর্থ-নীতিজ্ঞদের পথ অনুসরণ করিয়া এদেশের কোনো কোনো অর্থনীতিজ্ঞ বলেন, সোবিয়েতের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী এই সব সমাজতান্ত্রিক দেশ সাধারণের ভোগ্য পণ্য (consumers goods) বিশেষভাবে হ্রাস করিয়া রাখিয়া ও উৎপাদন পণ্যে (productive goods) সমস্ত অর্থশক্তি প্রয়োগ করিয়া দ্রুত শিল্পাদি বাড়াইতেছে। এই কথা মূলতঃ সত্য। কিন্তু আত্মগঠনের কালে কোনো সমাজের পক্ষে অন্য উপায় নাই। তাই আমাদের পরিকল্পনা-প্রবৃত্ত নেতৃবৃন্দও কেহই ইহাকে বিশেষ দোষাবহ বলিয়া মনে করেন না। তবে নির্বিরোধ উন্নয়নের পথই তাঁহারা বেশি সুগম, এবং বাস্তব ও মানসিক আধ্যাত্মিক সর্বকারণে বেশি সুবিধাজনক মনে করেন।

এমন কথা জোর করিয়া বলা অসম্ভব যে, ভারতের এই পথ একেবারেই ভ্রান্ত। তবে দ্রুত উন্নয়নের পক্ষে এইটি প্রকৃষ্ট পথ নয়, তাহা নিঃসন্দেহ। কারণ, দুই একটি মূল কথা বিস্মৃত হইবার নয়। যেমন, আমাদের পরিকল্পনার পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যচতুষ্টয় বিচার করিলে দেখি—প্রথমতঃ, জাতীয় আয় যদি সম্পূর্ণ সুবণ্টিতও হয় তথাপি ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় ১৯৭১-৭৫এ হইবে ৫৪৯৲ টাকা। পৃথিবীর অন্য জাতিদের আয় যদি সেই সময়ে বিন্দুমাত্র না বাড়ে, তাহা হইলেও আমরা তখনো থাকিব প্রায় দরিদ্রতম জাতিদের কোঠায়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ-ক্ষেত্রে ও ব্যক্তি-মালিকানার শিল্পক্ষেত্রে আমরা যেরূপ সমান হারে টাকা খাটাইতেছি, তাহাতে মালিকেরা ক্ষুদ্র শিল্পেই শুধু নয়, গুরুশিল্পেও সুযোগ অর্ধেক ভোগ করিতেছে। তৃতীয়তঃ, কর্ম-সংস্থানের হিসাবে দেখি মোটের উপর এখনকার বেকারের উপরেও আরও লক্ষ লক্ষ বেকার বৎসরে বৎসরে বাড়িবে। চতুর্থতঃ, আয়-বৈষম্য হ্রাস করিবার সংকল্পে কি ফল হইতেছে? এই বিষয়ে বিষম ব্যর্থতা জমিতেছে। সন্দেহ নাই

যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে এখন পর্যন্ত এই দেশে ধনীই আরও ধনী হইতেছে, দরিদ্র দরিদ্রই রহিয়া যাইতেছে। সম্ভবতঃ এইজন্যই পরিকল্পনাগুলি দেশের জনসাধারণের মন এখন পর্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে না। যে কোনো পরিকল্পনারই সার্থকতা নির্ভর করে জনসাধারণের উদ্যম-উৎসাহের উপর, সংকল্প সাধনার উপর, কঠিন পরিশ্রম ও কঠোর ত্যাগের উপর। অথচ, ঠিক এই প্রধান ও প্রাথমিক বিষয়েই পরিকল্পনার রূপায়ণে মারাত্মক ত্রুটি রহিয়া যাইতেছে। অনেক দেশের আর্থিক পরিকল্পনাতেই ত্রুটি কিছু না কিছু থাকে। তাহা শোধরাইয়া লওয়ার মত হইলে জনসাধারণ আপনাদের ত্যাগ ও পরিশ্রমের দ্বারা তাহা শোধরাইয়া লইতে পারে। ভারতের পরিকল্পনাসমূহ অতি বৃহৎ বা অতিরিক্ত আশাবাদী পরিকল্পনা নয়। এই সীমিত পরিকল্পনাতেও অর্থনৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিতে পারে—ডিফিসিট ফিন্যান্স, মূল্যবৃদ্ধি, বৈদেশিক বিনিময়ের ক্রমবর্ধিত সংকট, এবং বৈদেশিক সহায়তার অভাব, প্রভৃতি সমস্যাসমূহ হয়ত তাহার ফল। এ সব অবজ্ঞা করিবার মত নয়। কিন্তু জনশক্তি প্রাণ-ভরা আকাঙ্ক্ষাতে সে সব ত্রুটি যে কাটাইয়া ইহাকে সার্থক করিতে পারে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। অথচ এখনো সে লক্ষণ কোথাও দেখা যায় নাই। বরং পরিকল্পনার উদ্যোগাদিতে এখনো জনসাধারণ তেমন উৎসাহ বোধ করে না, ইহাই সাধারণভাবে সত্য। যেটুকু উৎসাহ দেখা যায় তাহা অনেক সময়ে স্থানীয়, ব্যাপক নয়;—কিংবা সাময়িক, দীর্ঘস্থায়ী নয়। চীনের আক্রমণের পর যে দেশব্যাপী গণজাগরণ দেখা দিয়াছিল তাহাও স্থায়ী হইতে পারিল না। বরং ১৯৬৩-৬৪এর বাজেটের বোঝায় তাহা বিমূঢ় হইয়া গেল।

জনশক্তির অবসাদ

১৯৪৭এর স্বাধীনতার পরেও জনসাধারণের মনে এইরূপ যে আশা-উৎসাহের শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ক্রমে স্তিমিত হইয়া গিয়াছিল। এখনো আবার যাইতেছে। ইহার অনেক কারণ আছে। কিন্তু যে সব কারণে জন-সমাজের অবসাদ অসিয়াছে তাহা বুঝিয়া রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, জমিদারী প্রথা রহিত হইলেও এখনো জমি বণ্টন হয় নাই। কৃষক জমি পায় নাই, পাইবে কিনা, কতটুকু পাইবে, তাহাও অনিশ্চিত। জমি সে পায় নাই, ইহাই প্রধান কথা।

দ্বিতীয়তঃ, কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে সব ব্যবস্থা হইতেছে তাহার সুযোগ এখনো কৃষক গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। সেচ, সার, বীজ-বিলি প্রভৃতির অব্যবস্থায় ও দুর্ব্যবস্থায় কার্যতঃ বহু পরিমাণে নিরর্থক হইতেছে। বিশেষতঃ রাজনৈতিক দলপুষ্টির জন্য উহা গ্রাম্য জোতদারের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। চাষী তাহার ফল পায় না। তৃতীয়তঃ, পল্লীশিল্প ও বস্তুশিল্পের আয়োজনে এখন পর্যন্ত গ্রামের প্রায় বেকার ও প্রচ্ছন্ন বেকার জনগণের উপকার হয় নাই। সমবায় নীতির যথার্থ প্রসার হয় নাই। এমন কি, পল্লী-উন্নয়নমূলক কার্য প্রভৃতিতে জনসাধারণ নিজেরা আকৃষ্ট হয় নাই—ইহা সরকারী রিপোর্টেও স্বীকৃত সত্য। সমস্তটাই আমলাতান্ত্রিক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। সমবায় পর্যন্ত জোতদার মালিকদের কুক্ষিগত। গ্রাম্য জনতার সংকল্প ও উদ্যোগ তাই এখনো অপ্রকাশিত ও অবিকশিত। সহজ কথাটা এই, ভারতের কৃষিবিপ্লব অসমাপ্ত এবং প্রায় অনারব্ধই রহিয়া যাইতেছে। সে বিপ্লবকে ভিত্তিস্বরূপ করিতে না পারিলে ভারতের শিল্পায়নও ব্যাহত হইবে, অগণিত জনসাধারণের সৃষ্টিশক্তি মুহ্যমান থাকিবে, ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পাইবে না, শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় অসম্ভব হইবে, এমন কি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুযোগ পর্যন্ত বিফলে যাইবে।

ইহার অর্থ এই নয় যে, 'কলম্বো প্ল্যানের' নির্ধারণানুযায়ী কৃষি-সংস্কারকেই একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া মানিয়া চলাই আমাদের উচিত ছিল। কারণ; সামাজিক শক্তির মুক্তিও সার্থকতা কৃষি বিপ্লবেরই অপরিহার্য অঙ্গ। যেমন, পল্লীঅঞ্চলে শিল্পে বিদ্যুৎ প্রয়োগ ও সেইজন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন শিল্পের পত্তন, এবং শিল্পবিপ্লবের সূচনাস্বরূপ গুরু ও মূল শিল্পের পত্তন। ত্রুটি ঘটিয়াছে এইখানে যে, পরিকল্পনার নানা আয়োজনে কায়েমী স্বার্থের সুযোগ ও সহায়তা লাভ যে পরিমাণে ঘটিতেছে, সাধারণ মানুষের উৎসাহ উদ্যোগের সহায়তালাভ সেভাবে ঘটিতেছে না। যেমন, সরকারী ব্যয়ভারের চাপ পড়িতেছে সাধারণের উপর। দুর্মূল্যতায় সাধারণ মানুষ দিশাহারা। অথচ পরোক্ষ করের (indirect tax) পরিমাণেও তাহারাই প্রপীড়িত। অন্যদিকে আয় কর, সম্পত্তি কর, উত্তরাধিকার কর প্রভৃতিতে ধনিকের প্রদেয় অংশ হইতে সরকার কোটি কোটি টাকা বঞ্চিত হয়। এই ধনিক পোষণের নীতিতে ও বঞ্চনার বাহুল্যে সাধারণ মানুষ আরও বিমূঢ় হইয়া পড়িতেছে। ইহার উপর প্রতিদিকেই তাহারা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে দেখে—পরিকল্পনার নামে শাসকগোষ্ঠীর অপচয়,

ধনিকশ্রেণীর লুণ্ঠন, চারিদিকে চোরাবাজার। দেখে কর্মচারী-গোষ্ঠীর অকর্মণ্যতা ও অসাধুতা। আর দেখে তাহাদেরই পরিচিত নেতৃগোষ্ঠীর দুর্নীতি, অপদার্থতা, আত্মীয় পোষণ, স্বার্থপর অর্থগৃধ্নুতা, বিলাস-ব্যসন, ঔদ্ধত্য ও বেপরোয়া লুণ্ঠন। তাই সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইতেছে যে, পরিকল্পনা হউক আর যাহাই হউক, সাধারণের স্বার্থে কিছুই হইতেছে না; মুষ্টিমেয় ফন্দিবাজের স্বার্থেই সব চলিতেছে। ইহাই হয়ত ভারতের পরিকল্পনার দিক হইতে সর্বপ্রধান সংকট এবং ভারতের ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের পক্ষে সর্বাধিক কলঙ্কের কথা: **সাধারণ মানুষ তাহাদের পরিকল্পনায় আস্থা পোষণ করে না বা করিতে ভরসা পায় না।**

সত্য সত্যই তাই শুধু অর্থব্যয়ের হিসাব দিয়া ভারতের পরিকল্পনার সার্থকতা বা ব্যর্থতা পরিমাপ করিবার উপায় নাই। কারণ, পঞ্চাশ বা ষাট কোটি টাকার কাজ যদি একশত কোটি টাকা ব্যয় করিয়া সমাপ্ত হয়. বাকিটা যায় অপচয়ে ও লুণ্ঠনে,—সেই পঞ্চাশ কোটি টাকার কাজ যদি কাঁচা কাজ না-ও হয়,—তাহা হইলেও টাকার হিসাব যাহাই বলুক, উৎপাদনের গণনায়, সম্পদসৃষ্টির গণনায়, সেই কাজকে ব্যর্থই বলিতে হইবে। অবশ্য প্রত্যেক প্রয়াসেই কিছু অপচয় হইতে পারে। কিন্তু দামোদোর উপত্যকা, হীরাকুদ বাঁধ প্রভৃতি নানা ব্যাপারে অর্থের অপচয় যে বেশিই হইয়াছে তাহা মিথ্যা নয়। তাহার পর, সেই দামোদর উপত্যকার বিদ্যুৎ নতুন শিল্পে ব্যয়িত না হইয়া ধনিক কোম্পানীর মুনাফা বাড়াইয়া শহরে শহরে চড়া মূল্যে বিক্রয় হইলে, ময়ূরাক্ষীর সেচের জলের দাম ক্ষুদ্র দরিদ্র চষীর আয় বাড়াইতে বাধা দিলে, সে সব প্রয়াসকে খাতাপত্রে যাহাই বলা হউক, সাধারণ লোক 'লুণ্ঠনের পরিকল্পনা' বলিয়াই ভাবিতে আরম্ভ করিবে। সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হয় যখন উচ্চতম নেতারাও (যেমন, বিলাতের জীপ্ ক্রয়, রাইফেল ক্রয় প্রভৃতির অপচয়ে ও দেশে জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের টাকার লগ্নির ব্যাপারে) সেই সব দুর্নীতি ও অপচয়ের অভিযোগ ধামা-চাপা দিতে চেষ্টা করেন। রাচীর ভারী শিল্পের অন্তর্ঘাত চোখে আঙুল দিয়াই দেখাইয়া দিতেছে আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কী ভাবে চলে। বৃটিশ সরকারের লুণ্ঠন ও অপচয় জনসাধারণ ধরিয়া লইত বৈদেশিক শাসনেরই অঙ্গ। কিন্তু স্বদেশীয় শাসনে সেইরূপ লুণ্ঠন দেখিলে দেশের মানুষের ক্ষোভ দশগুণ বৃদ্ধি পায়। দুইদিনে তাহা সকলেই জানিয়া ফেলে, আর তাহা সাধারণের মনে একটা ক্ষোভ, অশ্রদ্ধা ও হতাশার সৃষ্টি

করে। এ কথা আজ তাই অনেকের মুখেই শোনা যায়—আমরা স্বাধীনতার অযোগ্য। চীনা আক্রমণের পরে বিভ্রান্ত ভারতীয়দের মুখে আরও হতাশার কথা শোনা যায়।

মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের অপঘাত

কথাটা হয়ত ক্ষোভের বশেই বলা হয়, কিন্তু আমাদের শাসক শ্রেণীর সম্বন্ধে যে কথাটা একেবারে অপ্রযোজ্য তাহা নয়। শ্রেণীহিসাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাহার বিপ্লবী শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। জাতি হিসাবে তো আমরা অযোগ্য নই। সাধারণ মানুষ তো এখনো প্রয়োজন উপলব্ধি করিলে দেশের জন্য মুখ বুঝিয়া খাটিতে প্রস্তুত। দুই শত বৎসরের পরাধীনতার পাপ একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে আরও কয়েক বৎসর কঠোর পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ করিতে যদি হয়, তাহা হইলেও তাহাতে সাধারণ ভারতবাসী কুণ্ঠিত হইবে না, ইহা জানা কথা। কাজেই, জাতি অযোগ্য নয়, অযোগ্য প্রমাণিত হইতেছে তাহার শাসক-শ্রেণী। তাহারা পুঁজিতন্ত্রের কবলে আত্মভ্রষ্ট, নীতি হিসাবে প্রগতিশীল হইলেও কার্যক্ষেত্রে আমাদের নেতৃশ্রেণী প্রগতিশক্তি দৃঢ় করেন নাই, ধনিক গোষ্ঠীরই উপর ভরসা রাখিয়াছেন।

ভারতের সেই ধনিক-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যও আবার সামান্য। শিল্প অপেক্ষা বাণিজ্যে, উৎপাদনের মুনাফা অপেক্ষা যুদ্ধকালীন চোরাবাজারের মুনাফায়, তাহারা ধনাধিকারী হইয়াছে। কাজেই, উৎপাদন মূলক কোন বিরাট প্রয়াসে অগ্রণী হইয়া গিয়া শিল্পগঠন করিবে, এমন ধনিক এদেশে এখনো বেশি নয়। ভারতের ধনিক-গোষ্ঠী এই স্বাধীনতার রূপায়ণে নিজেদের সার্থক করিবার অপেক্ষা, রূপায়ণের নামে অভ্যস্ত মুনাফাশিকারেই নিজেদের পরিস্ফীত করিতে ব্যস্ত। অবশ্য, ধনিকদের অযোগ্যতার অপেক্ষাও শোচনীয় নেতাদের অযোগ্যতা। নেতাদের একটা ঐতিহ্য ছিল দেশসেবার, ত্যাগের, দুঃখ সহনের ও কর্মকুশলতার। ইঁহারা ঠিক ধনিক-শ্রেণী বা সামন্ত-শ্রেণীর মানুষ নন, এ দেশের মধ্যবর্গের শিক্ষিত শ্রেণী। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ইঁহারাই সংগ্রামে নেতৃত্ব করিয়াছেন—যত দ্বিধাগ্রস্থ হউক তাঁহাদের সেই নেতৃত্ব। কিন্তু ইঁহাদের যতটুকু বিপ্লবী ভূমিকা ছিল তাহা ১৯৪৭ এর সঙ্গেই নিঃশেষ হইয়া গেল। এই গণতন্ত্রী বিপ্লবের আয়োজনে আজ আর তাঁহারা অগ্রণী

ভূমিকা গ্রহণ করিতে অক্ষম। তাঁহাদের সাধ্য নাই যে, কৃষি-বিপ্লব সার্থক করেন, শিল্পায়নে উদ্যোগী হইয়া জনগণকে নেতৃত্ব দান করেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তাই গোষ্ঠী হিসাবে আজ নিঃশেষিত আয়ু, অবক্ষয়ের পথে। এইখানেই ভারতের স্বাধীনতার রূপায়ণের আসল সংকট। এই সংকল্পভ্রষ্ট শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর ও বিকৃত ধনিকপদ্ধতির অধিকারী দেশীয় ধনিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে স্বাধীনতার সার্থক রূপায়ণ আর সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

অসম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি

এই কথা তথাপি যেন আমরা না মনে করি, এই রূপায়ণের চেষ্টাটাও অলীক। এ চেষ্টা অলীক নয়, তবে দ্বিধাগ্রস্ত। খণ্ডিত হইলেও পরিকল্পনা সমূহ মিথ্যা নয়। তাহার পরিচালক গোষ্ঠীই বহুলাংশে অক্ষম ও অযোগ্য। জনগণের দাবীর চাপে ও নিজেদের লুণ্ঠন-লোভে, এবং ধনিক স্বার্থে, তাঁহাদেরও অনেকটা নব রূপায়ণে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে, আর তাহার পরিমাণও নিতান্ত তুচ্ছ নয়।

প্রথমতঃ, যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে আজ এই কিছু গড়িবার চেষ্টা হইয়াছে। কৃষি-উন্নয়নের দিক হইতে সেচের ও বাঁধের যে সব আয়োজন হইয়াছে, এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে চেষ্টা হইয়াছে গত দুইশত বৎসরের ইংরেজ রাজত্বে তাহা অভাবনীয় ছিল। এমন কি প্রথম পর্বেই যেসব আয়োজন চলিয়াছিল সেগুলির কথা মনে করিলে পরিবর্তনের যথার্থ ছবিটা মনে আসিবে: পাঞ্জাবের ভাকরা-নাঙ্গল বাঁধ, দাক্ষিণাত্যের তুঙ্গভদ্রা, উড়িষ্যার হীরাকুদ বাঁধ, মধ্যভারতের চম্বল, বিহারের কুশী, উত্তর প্রদেশের রিহান্দ—ইহার যে কোনোটি স্মরণীয় কীর্তি। অগ্রগামী জাতিদের তুলনায় আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন কিছুই নয়, কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগের তুলনায় নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। শিল্পবৃদ্ধি আমাদের প্রয়োজনানুরূপ নয়, কিন্তু শিল্পের উৎপাদন প্রতি পরিকল্পনাতেই কিছু বাড়িয়াছে। রাষ্ট্রাধিকৃত শিল্পের মধ্যে সিন্ত্রি সার কারখানা, রূপনারায়ণপুরের হিন্দুস্থান কেবল্‌স্‌-এর কারখানা, বিশাখাপত্তনম্‌-এর হিন্দুস্থান জাহাজী কারখানা, চিত্তরঞ্জনের ইঞ্জিন কারখানা, পেরামুরের রেল-কোচ তৈরির কারখানা, বাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান বিমান-কারখানা ও টেলিফোন্‌-কারখানা এবং এলওয়ের দুর্লভ মৃত্তিকা কারখানা প্রভৃতি প্রথম

পরিকল্পনা-কালেই আরম্ভ হইয়াছিল। রূঢ়কেলা, ভিলাই, দুর্গাপুর প্রভৃতি সার্থক উদ্যোগ আজ আশার জিনিস। পুরাতন কারখানাগুলি এ সময়ে আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে বোকারোতে লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা তৈয়ারী হয়, বিশাখাপত্তনম্ ও গোয়াতে শিল্পের কেন্দ্র নির্মিত হইবে। অন্যদিকে তাঁতের কাপড়, পল্লীশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্প ও হস্তশিল্প প্রভৃতিও অনেক বেশি সহায়তা লাভ করিতেছে। পরিবহন, যোগাযোগ প্রভৃতি বিভাগেও প্রসার প্রচুর।

শুধু এই অর্থনৈতিক উদ্যোগের হিসাব দেখিয়াও থামা উচিত নয়। স্বাধীনতার এই কয় বৎসরে খাঁটি সাংস্কৃতিক প্রয়াসও যে দেখা দিয়াছে, তাহাও মনে রাখা উচিত। সত্য বটে, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন করিতে কর্তৃপক্ষ বিলম্ব করিতেছেন। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসরের চেষ্টায়ও ইংরেজ আমলে আমরা এই নীতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে দিয়া স্বীকার করাইতে পারি নাই, তাহা স্মরণীয়। ইহাও সত্য, শাসক-গোষ্ঠীর অপদার্থতায় আজ শিক্ষার মান নিম্নগামী; কিন্তু শিক্ষার প্রসার যে সর্ববিভাগে আজ সহজতর হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্বাপেক্ষা ব্যয়ও অনেক বেশি হইতেছে, অবশ্য উহাতেও অপব্যয় কম নয়। নিছক শিক্ষা-বিস্তার ছাড়াও কলাবিকাশ নূতন উৎসাহে দেখা দিয়াছে। সে দিকে স্মরণীয় ললিতকলা একাদেমি, সঙ্গীত নাটক একাদেমি, সাহিত্য একাদেমি প্রভৃতির জলসা, প্রদর্শনী, রেডিও প্রচার, পুরস্কার ও প্রকাশন কর্ম। জাতির এইসব সংস্কৃতি সম্পদে বিদেশীয় সরকার ছিল সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাহীন। প্রতিনিধি-গাষ্ঠীর মাধ্যমে বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগও এ যুগেই ভারতবর্ষ স্থাপন করিতে পারিয়াছে —পূর্বযুগে উহার গোড়াপত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন শুধু রবীন্দ্রনাথের মত মহামনস্বী। আজ সঙ্গীতশিল্পী ও অভিনেতারা দলে দলে বিদেশে চলিয়াছেন। কলাবিভাগের অপেক্ষাও বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিভাগের কার্য আরও বেশি গুরুতর। অবশ্য যুদ্ধকালেই ইহার সূচনা হইয়াছিল। ইহা আজ একজন মন্ত্রীর বিশেষ অধিকার; কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ একটি প্রসিদ্ধ আয়োজন। ইহার প্রতিষ্ঠিত জাতীয় গবেষণাগারসমূহ (ন্যাশনাল লেবরেটরিজ) ভারতের নতুন সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণের ও উন্নত আকাঙ্ক্ষার প্রমাণ। আজ আর বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে আধ্যাত্মিকতার নামে প্রচারে কেহ কান দেয় না। স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞান আমাদের

জীবন-দর্শনের সঙ্গে যুক্ত হইতে চলিতেছে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, পৃথিবীরই এই দিকে নতুন জন্ম সূচিত হইতেছে—আণবিক যুগের বিজ্ঞান-বিপ্লবে সাধ্য কি আমরা দূরে বসিয়া 'ধ্যান' করিব।

এই সব আয়োজন-উদ্যোগের চেষ্টা হইতে আমরা যাহা বুঝিতে পারি তাহা এই—ভারত স্বাধীনতার রূপায়ণে সচেষ্ট। কিন্তু তাহার 'সমাজতন্ত্র ধাঁচের সমাজ' গঠনের আশা ও আয়োজন সীমাবদ্ধ, নীতি হিসাবে মিশ্র অর্থনীতিতে তাহা সম্ভব কিনা সন্দেহস্থল। তাহা ছাড়া, কর্মপন্থায় উহার অভ্যন্তরে অকর্মণ্যতা ও দুর্নীতির অন্তর্ঘাতী শক্তি রহিয়াছে। ফলে শোষণবাদী পুঁজিতন্ত্র প্রবল হইতেছে। চীনা আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের প্রতিক্রিয়া শক্তি যেন চীনের আক্রমণে হাতে স্বর্গ পাইল। চীন যাহা ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে চায় তাহাই কার্যতঃ অনুষ্ঠিত করাইবার জন্য ভারতীয় প্রতিক্রিয়া শক্তি উঠিয়া পড়িয়া লাগিল—যথা, ভারত গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি ত্যাগ করুক ; মার্কিন-ইংরেজ সামরিকগোষ্ঠীর অধীন হউক—অর্থাৎ শান্তি নীতির পরিবর্তে যুদ্ধবাদী নীতিতে ভারত রাষ্ট্র সামিল হউক। আর্থিক উন্নয়ন হয় বন্ধ থাকুক, না হয় মার্কিন সাহায্য-লাভার্থে রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প বন্ধ করিয়া ব্যক্তি-মালিকানায় শিল্পপ্রসার নীতি গ্রহণ করুক। এক কথায় ভারত সমাজতন্ত্র কেন, সকল রকমের প্রগতিমূলক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্য পরিত্যাগ করিয়া একটি নতুন পাকিস্তানে পরিণত হউক! এইরূপে চীন আক্রমণ ভারতের আভ্যন্তরীণ জীবনে যে সংকট আনিয়াছিল, তাহাতে আরও প্রমাণিত হয়—মধ্যবিত্ত শাসক শ্রেণীর জনশক্তিকে জাগ্রত না করিয়া তোলাতেই এই সংকট। অসমাপ্ত জনবিপ্লবকে সার্থক করাই ভারতের সম্মুখে আসল পথ।

তৃতীয় খণ্ড

বিজ্ঞানের বিপ্লব

অষ্টম অধ্যায়

বিজ্ঞানের জগৎ

মানুষের সভ্যতা মোটের উপর একই পথ অতিবাহিত করিয়া একই দিকে ছুটিয়াছে—ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাপারেও তাহার বিশেষ ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু সমাজের বিকাশ অসমান, কোথাও তাহা খুব অগ্রসর, কোথাও তাহা পিছনে পড়িয়া আছে। ইহার অনেক কারণ আছে। একটা কারণ বহুদিন পর্যন্ত প্রধানত সভ্যতা ছিল নানা বিভিন্ন কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত,—কোনো গিরিগুহায়, কোনো তৃণক্ষেত্রে, কিংবা দূর-দূরের নদী-উপকূলে। এই দূরত্ব নানা ভূখণ্ডের মানুষদের পরস্পরের নিকট সুপরিচিত হইতে দেয় নাই। এই কারণেও অনেক সময়ে মানুষের সমাজ সমছন্দে চলে নাই। কেহ একবার পথ হারাইলে আবার পথ খুঁজিয়া পাইতে বহু শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে। ইহার প্রমাণ আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিই। কিন্তু ইতিমধ্যে মানুষের সভ্যতা সেই দূরত্বের বাধাও দূর করিয়া দিয়াছে, প্রায় সকল কেন্দ্রের সকল সভ্যতার ধারাকেও তাহার বিপুল প্রবাহে টানিয়া লইতে দুর্জয় বেগে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। তাহার ফলে ছোট বড় তরঙ্গ-সংঘাত দেখা দিয়াছে, দেখা দিয়েছে সভ্যতার প্রবল বাহনদের বিকট দম্ভ, বিভিন্ন খণ্ডের সংঘর্ষ, বিভিন্ন স্রোতের ঘূর্ণীপাক। কিন্তু ইহার মধ্য দিয়াই আবার মানুষের সভ্যতা এক ও ঐক্যবদ্ধ "সমগ্র" হইয়া উঠিতেছে—হইতেছে আবার বিচিত্রতর ও বৃহত্তর,—তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই মানব-সংস্কৃতি জাগিয়া উঠিতেছে ধীরে ধীরে। আজও তাহার প্রধান কেন্দ্র পশ্চিমেই; তাই বলিয়া তাহা আর ইংলণ্ডে সীমাবদ্ধ নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বরং বলিতে পারি সে কেন্দ্র এখন মার্কিন দেশে ও সোভিয়েত ভূমিতে। এই নূতন সংস্কৃতির রূপ আজ প্রায় আমাদেরও পরিচিত। আমরা চাহি বা না চাহি, সে নিজেই আসিয়া আমাদের সহিত পরিচয় করিয়া লয়—তারপর আমাদের পরিচয়ই প্রায় উল্টাইয়া দেয়। এই পরিচয়ের সূত্রে তাঁহার নূতন যন্ত্র (machines) ও নূতন আবিক্রিয়া (inventions); তাগিদ তাহার

নূতন উৎপাদন-শক্তি (forces of production), বাস্তবতঃ শিল্পোৎপাদন (industrial production); আর ইহার ফলে তাহার আয়ত্ত হইয়াছে জীবনে এক নূতন অভাবনীয় শক্তি—সাধারণভাবে যাহাকে আমরা বলি বিজ্ঞান।

আসলে বিজ্ঞানই এই নূতন সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পাথেয়, তাহার বাস্তব সম্পদের মূল। উহাই তাহার শ্রেষ্ঠ মানস-সম্পদও। যদিও এই সত্য মানুষ সবে মাত্র উপলব্ধি করিতেছে, সমস্ত জীবন দিয়া তাহা সে এখনো স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়। তাই এখনই হয়ত সে মানিবেও না, পৃথিবীকে যে চোখে সে দেখিতেছে, সে আর প্রাচীন চোখ নয়। বিজ্ঞানের আবিষ্কারে সেই পৃথিবীও তাহার চোখে নূতন পৃথিবী হইয়া উঠিতেছে।

বিজ্ঞানের জন্মমূল

আধুনিক কালের প্রারম্ভে দেখি, সামাজিক পারিপার্শ্বিকে ও চিন্তায় মানুষ অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্নতা লাভ করিয়াছে,—জীবন-যাত্রার কৌশলগুলি অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু হইয়াছে, আপনার চিন্তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা না করিলে সে তাহা গ্রহণ করিতে চাহে না। এই সময়ে সেই জীবনযাত্রার তাগিদে মানুষ খুঁজিতেছে নূতনতর কৌশল (technique) সহজতর যন্ত্র (tools), উন্নততর জীবিকা-পদ্ধতি (forms of existence)। সেই তাগিদেই একটু একটু করিয়া এই যুগের বিজ্ঞান পশ্চিম দেশে ভূমিষ্ঠ হইল—যেখানে জীবনের তাড়নায় মানুষ বহিঃসমুদ্রে যাত্রা করিয়াছে, বণিক্ সম্রাট্‌গণ চাহিয়াছেন দিগ্‌দর্শন যন্ত্র; চাহিয়াছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান,—সমুদ্রের, পৃথিবীর, আকাশের তথ্য; বাণিজ্য-বিস্তারের নূতন নূতন পথ। এই আর্থিক বা সামাজিক প্রেরণাই বিজ্ঞানের জন্মমূল। এক একটি নূতন অভাব সমাজে অনুভূত হয়, বণিক-সমাজের মাথার টনক নড়ে; বৈজ্ঞানিকদের মাথায় বুদ্ধি আসে; নূতন আবিষ্কার তাঁহারা বণিকদের হাতে তুলিয়া দিয়া আপনাদের বৃত্তি ও বেতন গ্রহণ করেন। তার ফলে জীবনযাত্রা একপদ অগ্রসর হইয়া যায়—আর এক পা তুলিবার জন্য উন্মুখ হয়। আবার অভাব, আবার তাড়না, আবার প্রেরণা ও আবার আবিষ্কার—এই ইতিহাস বহন করিয়া আজ বিজ্ঞান দিকে দিকে আপনার রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, আর দিনে দিনে তাহার পদ্ধতিকে স্থির

ও সুমার্জিত করিয়া লইয়াছে। (*The Social Function of Science,* J. D Bernal, *The Social Relations of Science,*—I. Crowther এবং *Science for Citizens*—L. Hogben এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।) যেমন, বিলাতের কাঠ-কয়লা ক্ষয় হইয়া আসিল, খনির কয়লা পোড়াইয়া লোহা গলানো চলিল। কয়লা তুলিতে গিয়া খনির জল পাম্প করিতে হয়; সেই উদ্দেশ্যে শক্তি খুঁজিতে খুঁজিতে বাষ্পশক্তির নাগাল পাওয়া গেল। জেম্‌স ওয়াট সেই বাষ্প-ইঞ্জিনকে লাগাইলেন কলে। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সুতাকলে এই ষ্টিমের প্রয়োগ, ১৮০৫এ যানবাহনের কাজে লাগিল ষ্টিম; তারপর ১৮২৫-এ বিলাতে প্রথম চলিল রেলগাড়ী। পঁচিশ বৎসর যাইতে-না-যাইতেই ডালহৌসির চেষ্টায় আমাদের দেশেও বিলাতের পুঁজিপতিরা মুনাফার তাড়ায় রেললাইন পাতিয়া ফেলিলেন। কারণ, ইতিমধ্যে বিলাতে শিল্প-বিপ্লব 'ঘটিয়াছে, আমাদের বাজারে বাজারে তাহার পণ্যভার না পৌছাইলে নয়, আমাদের গ্রাম গ্রামান্তর হইতে কৃষিজ সামগ্রী বিলাতী কারখানাতে না জোগাইলে চলে না। প্রকাণ্ড দেশের নববিস্তৃত শাসন ও শোষণকৌশল আপনাকে রেল-পথের বন্ধনে সুদৃঢ় করিয়া লইল—সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও পরস্পরকে পরস্পরের নিকটতর না করিয়া পারিল না।

বিজ্ঞান ও কর্মজগৎ

এক নিঃশ্বাসে এই যে ইতিহাস বলা হইল ইহা বিজ্ঞানের ইতিহাস নয়, শুধু কেমন করিয়া সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে বিজ্ঞানের প্রসার আধুনিক যুগে আরম্ভ হয় তাহারই কথা। তাহাতেও হাসি পাইবার কথা। কারণ ইহা যে কত বড় পরিবর্তনের ইতিহাস তাহা এইরূপভাবে বলিলে আমরা বুঝিতেও পারি না। মানুষ ইহাতে শুধু ভৌগোলিক দূরত্বের অবসান করিল না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কিছু আয়ত্ত করিয়া ফেলিল,—প্রকৃতির অনেক দেশ-মহাদেশ একটু একটু করিয়া জয় করিয়া লইল। সেইরূপ এক দেশ—পদার্থের দেশ। পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নের উহাই গবেষণাক্ষেত্র। সেদিকে এই বিজ্ঞানের কার্যগত সার্থকতা আজ ভাবিয়া শেষ করা যায় না। এক একটা তুচ্ছ দ্রব্য গ্রহণ করিলেও তাহার ইতিহাসই মনে হয় অশেষ। যেমন 'সেলুলোস'-এর ব্যবহার বলিতে গেলে সেই মহাদেশের একটা পাড়াগাঁ। কিন্তু বলিতে গিয়া মনে করিতে হয় 'রেয়ন' 'নাইলন' প্রভৃতি বস্ত্রশিল্পের কথা, যাহাতে

আমাদের রেশমের-মট্‌কার ব্যবসায় বিপন্ন হইল ; মনে করিতে হয় ফিল্‌মের কথা, ক্যামেরার কথা, মোটরের উইণ্ড স্ক্রীন্‌-এর কথা ; উড়োজাহাজের 'ডোপ' বা বার্নিশের কথা ;—উনিশ শতকের শেষ দশক হইতে শুধু কাঠের চাঁছা ও ঝাড়তি-পড়তি তুলা হইতেই এরূপে অজস্র এই সব জিনিস তৈয়ারীর কৌশল আয়ত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় এক বিস্ময়কর কাহিনী এই শিল্পোৎপাদনে জীবজন্তুর ও গাছগাছড়ার সার্থকতা। উহা জীববিজ্ঞানের মহাদেশের অন্তর্গত। গো-পালন এখনো লুপ্ত হয় নাই ; প্রাণিমাংস এখনো জীবিকার বড় উপাদান। কিন্তু চর্বি, সাবান, তৈল, মার্জারিন, দুধের কাসিন (গুঁড়া), নকল আইভরি, শিঙ, হাড়, টর্টয়েস্‌-শেল, এম্বার, এবনি, সিগারেটকেশ হইতে ছুরি কাঁটা, ছাতার বাঁট—কোথায় যে এইসব না লাগে তাহাই বলা দুঃসাধ্য। এমনি রেজিনের কথা। পেট্রোলিয়মের ও রবারের তো কথাই নাই। আবার, খনির আঁধারে, লোহা ঢালাইর চুল্লিতে, পাথরের পাহাড-খনিতে (quarry), তেলের সমুদ্রে, সিমেণ্ট ও চিনামাটির কারখানায়, কাঠের কারখানায়, চটকলে, সূতাকলে, কাগজের কলে, অরণ্যানীর ছায়ায় চা-বাগানে, রবারের ক্ষেতে—আমাদেরই দেশেও এইরূপ যে-কোনো একটি স্থানে একবার তাকাইলেই বুঝিব মানুষ বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক পদার্থকে কি ভাবে আয়ত্ত করিতেছে, কিসে পরিণত করিতেছে ; জৈব সম্পদকেও তাহার সহিত যুক্ত করিয়া কী নূতন পরিণতি দান করিতেছে। আর এই এক-একটি পদ্ধতি আবার কত কত পদার্থের এমনি প্রযোগে ও পরিবর্তনের ফলে সম্ভব হইতেছে। অবশ্য ইহারই মধ্যে রহিয়াছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিক, আর মানুষের সমাজ বিজ্ঞানের দিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সকল বিকাশের দিক,—বৈজ্ঞানিক নীতিতে যাহার গবেষণা না করিলে মানুষের আত্মশক্তি যথার্থ আত্মপরিচয় পাইবে না। অর্থাৎ বিজ্ঞানের এই অভিযান শুধু নিষ্প্রাণ বস্তু ও জীব জগতেই সীমাবদ্ধ নয়—একই কালে জানিয়া-না-জানিয়া পৃথিবীর বহুবিধ পদার্থের উপর ক্রমাধিকার বিস্তার চলিতেছে। এমন কি, মানুষের চিন্তার রাজ্যও তাহা হইতে বাদ যায় না। প্রত্যেকটি বিশেষ ক্ষেত্রের সফলতার সঙ্গে অপরাপর সকল ক্ষেত্রের প্রয়াসের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষিত হইয়াছে ; আর তাই সকলের সক্রিয় সম্পর্কে সামান্য এক একটি বৈজ্ঞানিকের প্রয়াসও সফল হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। মানুষের মনও তাহাতে সচেতন রূপে আত্ম-পরিচয় লাভ করিতেছে। এইরূপ দুই একটি সামান্য ক্ষেত্রের কথা ভাবা যাক।

সেইতো মানুষ কবে পৌছিয়াছিল লৌহের যুগে,—সেদিন সত্যই নূতন পৃথিবীর গোড়াপত্তন সে করিতেছিল। অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে আনুষঙ্গিক পদার্থনিচয়ের উপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত না করার পূর্বে এই লৌহ ও ইস্পাতের সম্পূর্ণ সার্থকতা সে সম্পাদন করিতে পারে নাই। চুল্লিতে লৌহ ঢালাই মিতান্নীদের মধ্যেই প্রথম হয়তো চলিয়াছিল। বাঙলাদেশেও 'অসুর' নামে উপজাতিরা এখনো সেই পূর্ব যুগের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছে। সেই চুল্লিই হইয়াছে ব্লাষ্ট ফার্ণেস্—জামসেদপুরে-বার্ণপুরে যাহার খানিকটা আধুনিক রূপ আমরা দেখিতেছি। 'কাষ্ট আয়রন' ('Cast Iron), 'রট আয়রণ' (Wrought Iron) 'শীয়ার ষ্টিল' (Shear Steel), 'কাষ্ট ষ্টিল' (Cast Steel) দ্বারা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই ইংলণ্ডের ভাবী যুগের পথ করিতেছিল (মনে রাখা মন্দ নয়, এই ঢালাই লোহার লাইনের অভাবেই নাকি রোমের সভ্যতা বিভ্রান্ত। হইয়া পড়িয়াছিল!)। তখনো (১৮০০তে) লৌহের রাসায়নিক বিশ্লেষণ চলিত না, পারিমাণিক রসায়নের (Quantitive Chemistry) জন্ম হয় নাই। নেইলসনের (Neilson) আবিষ্কারে (১৮২২) চুল্লির তাপ উঠিল ৬০০ ডিগ্রি ফার্ণহীটে,—আজিকার ব্লাষ্ট ফার্ণেসে তাপ ২ হাজার ডিগ্রিতেও ওঠে। বেসেমার পদ্ধতিতে (Bessemer Process) ১৮৫৬-৬০ মধ্যে গলিত 'পিগ্ আয়রণের' ময়লা উড়াইয়া দিবার প্রক্রিয়া বাহির হইল। ইস্পাত সহজপ্রাপ্য হইল; এক সঙ্গে ২৫ টন ঢালাই করাও সম্ভব হইল। চার বৎসরের মধ্যে "খোলা চুল্লিতে" ১০০ টন ইস্পাত ঢালাই করা গেল। এক একটা এইরূপ খোলা চুল্লি হইতে ঘণ্টা পিছু এখন শতখানেক টনের ইস্পাত ঢালাই করা কিছুই নয়। বিদ্যুৎ চুল্লি (electric furnace) আসিয়াছিল ১৮৯৫তে। তাহাতে দেখা দিল 'এলয় ষ্টিল' (alloy steel); মোটর গাড়ীতে ও মরচে-হীন ইস্পাতে ইহার প্রয়োগ চলে। বোতাম টিপিলেই আজ গলিত লৌহ গড়াইয়া পড়ে—আর চুল্লির প্রচণ্ড তাপ মজুরের মুখ-চোখ ঝল্‌সাইয়া দেয় না। সোয়া শত বৎসরে লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন বাড়িয়াছিল এক-আধ গুণ নয়, ১৩১ গুণ। আর সঙ্গে সঙ্গে আবার ইস্পাতের রা[illegible] বিশ্লেষণ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতেও ইস্পাত [illegible]

আমাদের মত বুঝিত ছুরি, কাঁচি। আজ সেই ইস্পাতেই রকম ফের প্রায় ১০।১২ ধরণের, কারবোন্ ষ্টিলই ৬।৭ ধরণের। কারবোন্ ষ্টিলে আছে কারবোন ছাড়াও ফসফরাস, সালফার সিলিকোন্, মেংগানিজ্। টনেজ ষ্টিলে আবার মেংগানিজই বেশি। "অধিক নরম" (extra soft) কারবোন্ ষ্টিল এখন 'রট আয়রণকে' হটাইয়া দিতেছে। ষ্ট্রক্চুরাল ষ্টিল সেতু, বয়লার, মালগাড়ীতে লাগে। 'মধ্যম' (medium) ষ্টিল লাগে জাহাজ-তৈয়ারীতে ও কল-কব্জায়। 'মধ্যম দৃঢ়' (medium hard) ষ্টিল দরকার রেলে, রেলওয়ে ইঞ্জিনে ও গাড়ীর এক্সেলে। দৃঢ় (hard) ষ্টিল চাই চাকার জন্য কাঠ-কাটার যন্ত্রের। সাত রকমের 'কারবোন্ ষ্টিলের' দৃঢ়তায়ও তফাৎ আছে। কারবোনের সূক্ষ্ম পরিমাণের তফাৎ থাকেই আবার মেংগানিজ, নিকেল, টুংগষ্টেন, ক্লোরিয়াম প্রভৃতির পরিমাণের সঙ্গেও দৃঢ়তার তফাৎ হয়। মেংগানিজ ষ্টিলেরও এইরূপ নানা প্রকারভেদ আছে—ট্রামওয়ে পয়েণ্ট, ড্রেজার-বালতি, এইসব হয় এই ষ্টিলে। এমনিভাবে 'নিকেল ষ্টিল' 'ক্রোমিয়াম ষ্টিল'ও আবার নানা ধরণের শক্ত ইস্পাতের নাম। 'কারবোন ষ্টিলের' যন্ত্র কাটিতে পারে মোটের উপর কম; তাতিয়া উঠিলে ইহার ধার পড়িয়া যায়। টুংগষ্টেন্ মিশাইলেই সেই ষ্টিলের কাটিবার ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। 'কারবোন্ ষ্টিল' যেখানে মিনিটে কাটে ১৬ ফিট, 'হাই-স্পিড্' ষ্টিল সেখানে কাটে ১০০ শত ফিট; আর 'টুংগষ্টেন্ কারবাইড' ষ্টিল সেখানে ৩০০।৪০০ ফিট কাষ্ট-আয়রন মিনিটে কাটিয়া শেষ করে। আবার, এই টুংগষ্টেন্ই উড়োজাহাজে ও মোটর গাড়ীতে লাগিত, ইহাই বিদ্যুৎ-বাতিতেও দরকার হয়, বেতারটেলিফোনে ও বেতারবার্তায়ও প্রয়োজনীয়। মনে রাখা দরকার, একদিকে যেমন এই লৌহের ইস্পাতের প্রসার ঘটিতেছে, অন্য দিকে আসিয়া যাইতেছে নূতনতর পদার্থ—টিটেনিয়াম, এলোমিনিয়াম, জিব্কোনিয়ম সিমেণ্ট, কাঁচ প্রভৃতি। কোনো একজন বিশেষজ্ঞের পক্ষেও বলা অসম্ভব—লৌহ ইস্পাতের এই কথা। তারপর আণবিক যুগে এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে পরিবর্তন হয়তো অসম্ভব হইবে না।

মানুষের "বল-বৃদ্ধি"

এই পদার্থ-বিজয়েরই প্রধান সহায় এখন—'বল' (power)। মানুষের এই জ্ঞানায়ত্ত দেশই পূর্বকালে প্রকৃতিকে দেবতা করিয়া তুলিয়াছিল; আকাশ

বাতাস সবই হইয়াছিল মানুষের চক্ষে দেবতা বা দৈববলের আধার। সেই বলের রাজ্যে ক্রমাধিকার বিস্তার আজ বিজ্ঞানের অন্য এক প্রধান কৃতিত্ব। মানুষ তাই অপরিমিত বলের অধিকারী হইল। তাহার এই বলবৃদ্ধিতে তাহার নিজের কার্যশক্তি অতুলনীয় পরিমাণে বাড়িয়া গেল। মিশরের ফেরাওর শতসহস্র দাস দিনের পর দিন যে পরিমাণ পরিশ্রমে যে কাজ করিত, আজ সামান্য কারখানায়ও দুই দশ জনেই একদিনে তাহার অপেক্ষা ঢের বেশি কাজ করে। কারণ, বহুগুণ বলশালী দাসদের আজ কাজে লাগানো চলিয়াছে। এতদিন পর্যন্ত সেই দাসদের বল জোগাইতে কয়লা, পেট্রল, জলস্রোত—সেই দাস ষ্টিম গ্যাস, তেল, বিদ্যুৎ। জেমস্ ওয়াট্ হইতে ইহার নূতন যাত্রা আরম্ভ হয়। টারবাইন ইঞ্জিনে ইহার প্রকাশ ঘটে ও ইণ্টার্ণাল কমবাশ্‌শন্ ইঞ্জিনে ১৮৭০-৭৮-এর মধ্যে ইহা আর একদিকে প্রসার লাভ করে। পাশে পাশে বাষ্পের রাজত্বও বাড়িয়া চলিল। তখনো তেলের ইঞ্জিন দেখা দেয় নাই। এখন অবশ্য খনিতে না নামিয়াই কয়লাকে খনির অভ্যন্তরে গ্যাসে পরিণত করা চলে। সম্ভবত আরও দাহ্যবস্তু হইতেই বিদ্যুৎ উৎপাদনেও আরও বৈপ্লবিক আবিষ্কার ঘটিবে। ১৮৮৪তে ডেইম্‌লার পেট্রোল ইঞ্জিন আবিষ্কার করিলেন। সেই বৎসরই ষ্টিম্ টার্‌বাইন্ ইঞ্জিনেরও বৎসর। ডিজেল ইঞ্জিনের সূচনা ডিজেলের 'মোটা তেলের' ইঞ্জিনের পেটেণ্ট হইতে ১৮৯৫-তে—বৎসর বিশেকে ইহার কাজ শুরু হয়। দিনে দিনে কম তেলে বেশি উন্নত ইঞ্জিন চালাইবার উপায় বাহির হইতে লাগিল। ফলে ষ্টিম ইঞ্জিনের জায়গা জুড়িয়া বসিতেছে তেলের ইঞ্জিন। ইহাতেই কারখানা চলে, বিদ্যুৎ-উৎপাদন চলে, মোটর চলে, জাহাজ ও উড়োজাহাজ চলে। আর, ভবিষ্যৎ তৈলপ্রবাহ পৃথিবীর উপর হইতেই নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব হইতে পারে। ষ্টিমের রেলগাড়ী আমাদের দেশেও মোটরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অস্থির হইয়া পড়িতেছে। আর এই তেলের জন্যই যুদ্ধ চলে,—আবার যুদ্ধ বাধেও। এইসব ইঞ্জিন দিনের পর দিন যেমন সূক্ষ্ম, যেমন উন্নত হইয়াছে, তাপ, চাপ ও ক্ষিপ্রতা এই সবের মধ্যে যেরূপ ভাবে সংযোজিত হইতেছে, ইহাদের বলকে দূরে দূরে প্রয়োগ করিবার উপায়ও সেরূপ আসিয়া পড়িয়াছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র হইতে বহুদূরের শিল্পকেন্দ্রে যেভাবে বিদ্যুতের শক্তি চালান হইতেছে, তাহাতে বিস্ময়ের অবধি থাকেনা।

কিন্তু তাহারই পাশাপাশি আবার পুরানো বলের নূতন বিক্রম আরও বিস্ময় বাড়াইয়া তুলে। হাওয়ার জোরে কুঁয়ার জল তোলা, আর নদীর স্রোতোবলে

কল চালানো—বহু শতাব্দী পূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল। বিদ্যুতের নূতন বলের উন্নতিতে সেই বাতাসের ও জলের নূতনতর 'বল' প্রযুক্ত হইয়াছে। পুরাতন দিনে কয়লা পোড়াইয়াই বিদ্যুৎ পাওয়া যাইত—আমাদের দেশে এখনো তাহাই বিদ্যুতের প্রধান উপকরণ। কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশে জলবিদ্যুৎই প্রধান আশ্রয় হইয়া উঠিতেছে। আণবিক শক্তির আবিষ্কারে অফুরন্ত বিদ্যুৎ-বল বাড়িয়া গেল—যদিও এখনো তাহাতে ব্যয় বেশি। ইহার পরে সূর্যতাপ আয়ত্ত করিবার বিদ্যা যদি বিজ্ঞান আবিষ্কার করে তখন তো বলের উৎস অনন্ত হইবে। এইসব নূতন 'বলের' নিকট সেই গ্যাস ও তেল মনে হইবে 'সেকেলে'—'Fossil Power.' তাই বলিয়া তাহা বাতিল হইবে না, বরং তাহারও আরও উন্নততর প্রয়োগ আয়ত্ত হইবে। মানুষ প্রকৃতির সম্পদকে এখন বিনষ্ট করিয়া আর বলবৃদ্ধি করিতেছে না, প্রকৃতির নিয়মিত গতি হইতেই এবার তাহার বল সংগ্রহ করিতেছে। ঘূর্ণ্যমান পৃথিবী ঘুরিতেছে, তাহার সমুদ্রে জোয়ার ভাটা বহে, তাহার মেঘ আকাশ ছাইয়া আসে, তাহার নদীতে বান ডাকে, বন্যা আসে, স্রোত ছুটিয়া চলে—এই বিরাট জগৎ-যন্ত্রই তো মানুষের বিরাট ডাইনেমো।

দূরত্বের বিনাশ

বল-বিজ্ঞানের এইরূপ প্রসারেই পৃথিবীর দূরত্বও আর বাধা হইয়া রহিল না; ক্রমশই পৃথিবীর দেশদেশান্তর নিকটতর হইয়া পড়িল। আর এই যানবাহনের উন্নতিতে—প্রথমতঃ রেলওয়ের সূত্রপাত হইতেই তাই বলা যায়—এক নূতন পৃথিবীর পরিচয় বিজ্ঞান পৃথিবীর দুয়ারে দুয়ারে বহিয়া লইয়া উপস্থিত হইল। আজ তাই খাদ্যের জন্য, পরিধানের জন্য, জীবনযাত্রার সহস্র উপকরণের জন্য দেশবিদেশের মানুষ পরস্পরের মুখাপেক্ষী। আমরা কুণো জাতি। তথাপি জীবনযাত্রার যে কোনো শিল্প-দ্রব্যের জন্যই পৃথিবীর অন্য কোণে আমরা তাকাইয়া থাকি। এমন কি, আমাদের কৃষিজ ও খনিজ সম্পদের জন্য পর্যন্ত আমরা অন্যের মুখাপেক্ষী। পূর্বে ছিল রেঙ্গুনের চাউল না আসিলে আমাদের দুর্ভাগ্য; বোম্বাই-জাপানের বস্ত্র না আসিলে আমরা অসহায়। এখন তো কানাডা আমেরিকার গম না হইলেও আমাদের চলে না। আর বিদেশে আমাদের পাটের চাহিদা না থাকিলে, আমাদের চায়ের বাজার না থাকিলে, আমরাই বা বাঁচি

কিসে? রেল ও জাহাজ-তাই আমাদের চোখে পৃথিবীকেও প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। মোটরের প্রচলনে ও বিমানের আবির্ভাবে আমাদের সেই পৃথিবী যেন আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছে না। আবার, ইহারই সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে সংবাদপত্র, আসিয়াছে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন্, আর আসিয়াছে বেতার যন্ত্র, আসিয়াছে সবাক্‌চিত্র, আসিয়াছে বেতার ফটোগ্রাফী, টেলিভিসন। —আমাদের কাছেও লণ্ডন-কলিকাতা 'এপাড়া-ওপাড়া' হইয়াছিল পূর্বেই, এবার হইয়াছে এঘর-ওঘর। বোম্বাই হলিউডের পাড়াগাঁ মাত্র। আর কে বলিবে "দিল্লী দূর হনুজ অশত"? দিল্লী আর দূর নয়। মানুষ যখন মহাবিশ্ব ঘুরিয়া আসিতেছে, রকেটস্থ যন্ত্রে চন্দ্রের ফটোগ্রাফ তুলিতেছে, মহাকাশের বেতার তথ্য সংগ্রহ করিতেছে, তখন দিল্লীর দূরত্বের কথা আর কেন তোলা?

ক্ষুৎপিপাসা জয়

তবু যাহা ঘটিতে পারে—পৃথিবীর অন্যত্র ঘটিয়াছে, কিন্তু আমাদেরই আয়ত্ত হইল না,—তাহাও কম নয়। এক কথায় বলিতে গেলে—তাহা বিজ্ঞানের বলে মানুষের পক্ষে ক্ষুৎপিপাসার পীড়ন জয়, এবং মানুষের পক্ষে মেঘ ও রৌদ্রের রাজ্য জয়। খাদ্য এখনো কৃষিক্ষেত্র হইতে আসে, কিংবা আসে কৃষকেরই পালিত জীব হইতে। কিন্তু তাহা ছাড়াও খাদ্য আজ দেখা দিয়াছে—জেম, জেলি, আচার, আমরা জানি; অষ্ট্রেলিয়ার-আরজেণ্টিনার চালানি মাংসও দেখি। কিন্তু 'উপজাত' (ersatz) খাদ্যও আজ সুপরিচিত। বৈজ্ঞানিক সারে ও প্রজনন বিদ্যার উন্নতিতে শস্যের ও জীবজন্তুর পরিমাণ ও প্রকৃতি অসম্ভব রূপে বাড়িয়া গিয়াছে—জমির উর্বরতা বাড়িয়াছে, শস্যের উৎপাদনও বাড়িয়া চলিয়াছে। নূতন 'যন্ত্রের লাঙ্গল' আবিষ্কৃত হইয়াছে, বিদ্যুতের লাঙ্গল পর্যন্ত ইউরোপে আমেরিকায় চলিয়াছে। বিদ্যুতের যন্ত্রে ফসল কাটা, ছাড়ানো, বাছাই, বহু দেশে এখন চলিতেছে। বিদ্যুতের প্রয়োগে কৃষকের পশুপালনের চেষ্টাও নূতনরূপ লইতেছে। যেমন, ডিম হইতে বিদ্যুতের তাপে যথাসময়ে শাবক ফুটিয়া উঠে, নষ্ট হইবার উপায় নাই; যথারূপে সংরক্ষিত হয় ফসলের বীজাণু ও প্রাণী জীবাণু (bacteria)। ইহা তো আমাদের দেশেও এখন কার্যত হইতেছে। মানুষ কি সংখ্যায় বাড়িতেছে? খাদ্য ও জলেস্থলে বাড়িবার কথা।

বৃক্ষ-জগতের ও জীব-জগতের জীবনের প্রবাহ নানারূপে একদিকে যখন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে কৃষকের সম্মুখে, আর দিকে নিজকে কৃষক আবিষ্কার করে এই প্রাণীপ্রবাহের নিয়ামক হিসাবে—এক নূতন ঐশ্বর্যে। এই যন্ত্র, বিদ্যুৎ ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রয়োগে তাই কৃষিকার্য ও কৃষকের জগৎও আর সেই পুরানো জগৎ নাই। সেও আর নিজকে মনে করে না প্রকৃতির খেয়ালের বশ, মেঘ ও রৌদ্রের ক্রীড়ণক, শুধুমাত্র অদৃষ্টের অন্ধদাস, মানব-সভ্যতার ভারবাহী পশু।

মেঘ ও রৌদ্রের পরাজয়

কারণ, বিদ্যুৎ যেখানে কৃষকের গৃহে আসিয়াছে সেখানকার মানুষ আর মেঘ ও রৌদ্রের কৃপাবশ নাই। সে আবহাওয়াকেও খানিকটা জয় করিয়াছে। পরিচ্ছদে সে আপনাকে সংরক্ষণ করে; প্রসাধনে সে নিজেকে সুসজ্জিত করে; রৌদ্র হাওয়ার দাপট হইতেও সে নিজকে রক্ষা করিতে পারে। গৃহ তার আর শত-ছিদ্র নয়; গ্রাম তাহার শহর হইয়া উঠিতেছে; আবাসস্থল স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতায় সমৃদ্ধ। তাহাতে রেডিও-টেলিফোন্ রহিয়াছে, সংবাদপত্র আসিতেছে, যানবাহনেরও অভাব নাই। আবার শহর তাহার উদ্যানের সম্পদে উন্মুক্ত, স্থাপত্যে সমৃদ্ধ। এইসব কারণে তাহার সামাজিক সম্পর্কগুলিও তাই নূতনতর হইয়া উঠিতেছে, তাহার চোখে পৃথিবীরই যে পরিবর্তন হইয়া যাইতেছে হয়ত তাহা সে সম্পূর্ণ জানেও না।

ইহাই মোটের উপর সাধারণের চক্ষে বিজ্ঞানের রূপ ও বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত জগতের রূপ। তাহাদের বাস্তব কর্মজীবন এই কর্ম জগতের সঙ্গে একেবারে এক হইয়া উঠিতেছে। যন্ত্র ও শিল্পের সাহায্যে এইভাবেই বিজ্ঞান উৎপাদন-প্রণালীকে নূতন করিয়া তুলিয়াছে, প্রায় পৃথিবীব্যাপী ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে। তাই উৎপাদনক্ষেত্রের এই দানই বিজ্ঞানের মূল দান, প্রাথমিক দান ও প্রধান দান। ইহার সহিত পরিচয়ও তাই সকলেরই প্রত্যক্ষ। সাধারণ মানুষের জীবনের রূপ যেমন শিল্প প্রবর্তনে পরিবর্তিত হইতেছে তেমনি জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা-অভিজ্ঞতাও প্রধানত এই 'ফলিত বিজ্ঞানের' দানেই নূতনতর হইতেছে।

এই বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে কিন্তু বাধাও সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে—কিরূপে, ঠিক কোথায়, তাহা বুঝিয়া দেখা যাউক।

বিজ্ঞানের পক্ষে 'নিষিদ্ধ-জগৎ'

দুই একটি কথা এখন স্মরণ করিতে হইবে—প্রথমত, পৃথিবীর সকল জাতির নিকট বিজ্ঞানের এই বাস্তব দান এখন পর্যন্ত পৌছে নাই; যেমন আমাদেরই দেশেও তাহা এখনো সীমাবদ্ধ। আমরা জানি পৃথিবীতে এই বিজ্ঞানোন্নত উৎপাদন-প্রণালীই জয়ী হইয়াছে। যদিও এখনো সেকেলে ধরণের কৃষি রহিয়াছে, পশুপালন আছে, ইতিহাসের কোনো দানই অগ্রাহ্য নয়, তথাপি বিজ্ঞানের দানই প্রধান এবং ইতিহাসের হিসাবে তাহাই আজ 'ঐতিহাসিক উৎপাদন-প্রণালী'। দ্বিতীয়ত, যাহাদের নিকট বিজ্ঞানের দান পৌছিয়াছে, তাহাদেরও সকলের নিকট তাহা সমভাবে পৌছে নাই। যেমন, আমাদের খনির মজুর ও কারখানার মজুর যতটা প্রত্যক্ষভাবে এই নূতন জগতের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আমাদের বি-এস্-সি পাশ ইস্কুল মাষ্টার মহাশয়ও তাহা করিতে পারেন না। তৃতীয় কথা: পৃথিবীর বিজ্ঞানোন্নত জাতিরা বিজ্ঞানকে সৃষ্টির কাজে না লাগাইয়া ধ্বংসের কাজে, যুদ্ধের কাজে প্রয়োগ করাতই প্রায় অর্ধাংশ শক্তি ও অর্থ বিনষ্ট হয়। মানবতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের এই প্রয়োগই মানুষের চক্ষে আজ প্রত্যক্ষ। চতুর্থ কথাও গুরুতর কথা—বিজ্ঞানের এই বাস্তব দান এখনও অংশত উৎপাদন ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইতেছে. সেইখানেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, এমন কি সেখানেও তাহাকে অনেক সময়ে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা চলে। কিন্তু—তাহা পঞ্চম কথা—উৎপন্ন দ্রব্য বিনিময় ও বণ্টনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সত্যকে প্রয়োগ করা এখন পর্যন্ত আরম্ভ হয় নাই—একমাত্র সমাজতন্ত্রী ভূমিতে ছাড়া। এমন কি অন্যত্র মানুষ কর্মজগতে বিজ্ঞানকে সময়ে সময়ে প্রসারিত করিতেও ভীত। কারণ, তাহাদের সমাজ-সম্পর্কের ওলট-পালট যে তাহাতে অনিবার্য। তাহাদের এতদিনকার সামাজিক ধ্যান-ধারণা তাহাতে নষ্ট হইবে, রীতিনীতি যাইবে, সহস্র ছোট বড় সুযোগ-সুবিধা ধ্বংস হইবে। ধর্ম ভূত ভগবান কিছুই যে আর টিকে না; টিকে না তাহাদের এতদিনকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত নীতিবোধ। তাই, মানুষ সমাজের বাস্তবক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে প্রবেশ করিতে দিতে চায় না। বরং বিজ্ঞানের মুখ ফিরাইয়া দিতে চায় সমাজক্ষেত্রের দিক হইতে ধ্যানের জগতে, অবাস্তব চিন্তার জগতে। সমাজ হইল আজও বিজ্ঞানের পক্ষে কার্যত 'নিষিদ্ধ জগৎ'।

বিজ্ঞান ও চিন্তাজগৎ

বাস্তব জগতের যে রূপান্তর ঘটিল স্বভাবতই সে পরিবর্তন চিন্তার জগতেও তাহার ছায়া ফেলিয়াছে। সাধারণ মানুষের কথাবার্তা, ধ্যান-ধারণা, অর্থাৎ জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে চেতনা একটু একটু করিয়া পরিবর্তিত হইতেছে। তাহারা নিজেরাও তাহা হয়ত জানে না—এমনি সূক্ষ্ম, এমনি বিচিত্র সেই পরিবর্তন। কিন্তু তবু তাহাদের চিন্তায় চেতনায় অস্পষ্ট পরিবর্তনের রেখাপাত প্রতিনিয়ত চলিতেছে। অবশ্য যাঁহারা চিন্তা জগতের নায়ক তাঁহাদের মনেই এই পরিবর্তনের স্পষ্ট ও সচেতন প্রতিলিপি পাওয়া যায়। কিন্তু সমাজে যেখানে পূর্ব হইতেই বহু বাধা (inhibition) রহিল সেখানে এই চিন্তার ধারাও বাঁকিয়া চুরিয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই, বৈজ্ঞানিকদের চিন্তার জগৎ যতই বাস্তবলোক ছাড়িয়া মানস-লোকের দিকে অগ্রসর হয় ততই যেন অদ্ভুত ও অবাস্তব হইয়া উঠে। কিছুতেই যেন তাঁহারা বিজ্ঞানের কর্মজগৎ ও বিজ্ঞানের চিন্তাজগৎকে এখনো মিলাইয়া লইতে পারেন না। ইহার কারণ—এই দুই জগতের মাঝখানে যে একটু মধ্যদেশ রহিয়াছে সেখানে তো বিজ্ঞানের পথ এখনও রচিত হইয়া উঠে নাই। সেই দেশই সমাজক্ষেত্র—যেখানে বিজ্ঞান নিষিদ্ধ। অবশ্য সেই বৈজ্ঞানিক চিন্তাজগৎও তাই বৈজ্ঞানিকদেরই শুধু মনে আলোড়ন তোলে। সাধারণ লোক কর্মজগতের লোক, বিজ্ঞানের বাস্তব-লোকের কথাই তাহাদের পরিচিত। তাহারা দেখে ষ্টিমের, গ্যাসের, বিদ্যুতের ব্যবহারিক জগৎ। বৈজ্ঞানিকদের 'আধিমানসিক' (intellectual) কল্পনা-জল্পনার তাহারা খোঁজও রাখে না। এই 'চিন্তাজগতে' বিজ্ঞান তাই চিন্তানায়কদের সম্মুখে জগতের যেই রূপ তুলিয়া ধরিতেছে তাহা এই যুগের এই বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণ জয়ের ও মানুষের বর্তমান মুহূর্তের ব্যাহত সংস্কৃতির এক পরিচয় প্রদান করে।

'শুদ্ধ বিজ্ঞানের' সেই ক্রমপ্রসারিত রাজ্যের কোনো একটি কোণের সম্পূর্ণ পরিচয়ও নাকি আজ আর কোনো একজন বৈজ্ঞানিক দিতে পারেন না,—ইহাই বৈজ্ঞানিকদের মত। তাই, তাহার সামান্য পরিচয়ও আমরা সহজে পাইব না। তবু পরিচয় একটা সংগ্রহ করিতে হয়। বাঁচিয়া থাকিলে সে

পরিচয় আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। তবে তাহা বিশেষজ্ঞের পরিচয় নয়, কাজ চালাইবার মতো পরিচয়। শিক্ষিত মানুষের আধুনিক চিন্তার জগতে বিজ্ঞান মোটের উপর এইরূপ তিনটি দিক হইতে তাহার তরঙ্গ তুলিতেছে—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Sciences) রূপে, প্রাণিবিজ্ঞান (Biology) রূপে, আর নবজাত মনোবিজ্ঞান (Psychology) রূপে। পূর্বে তাহার পরিচয় কিছু পাইয়াছি ; এখন এই বিষয়টিকে আরও বুঝিয়া দেখা যাউক।

পদার্থবিজ্ঞানের জগৎ

এক সময়ে একটা কথা বাঙলায় প্রচলিত ছিল—প্রাণহীন বস্তু হইল জড়বস্তু। জড়বিজ্ঞান কথাটা এখনো চলিত। 'জড়' কথাটা আজ আর প্রকৃতির অচেতন অংশ সম্বন্ধেও খাটে না। সূর্য চন্দ্র গ্রহাকাশ হইতে পৃথিবীর ধূলিকণা পর্যন্ত সবই এক সময়ে মনে হইয়াছিল জড়জগৎ, আর জড়বিজ্ঞান ছিল তাহাদের কথা। প্রকৃতির এই কোঠাই বৃহৎ ; অন্য কক্ষে প্রাণিজগৎ ; আর তাহারও ছোট একটি কোণ মাত্র চেতন-প্রাণীর। কিন্তু বিজ্ঞান যেখানে আসিয়া ঠেকিয়াছে সেখানে আজ নিখিল বিশ্বে 'জড়'ই কিছু নাই ; 'জড়পিণ্ড'ও কিছুই আছে বলিয়া মনে হয় না। বস্তুর এই নূতন জ্ঞানই বিজ্ঞানকে ভাবুকতার পক্ষপাতী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে।

পরমাণুর কাণ্ড

বিশ্বের গোড়ার সামগ্রী খুঁজিতে গিয়া অনেকেই ভাবিয়াছিলেন এক জড় কণাই বুঝি শেষ কথা, উহাই মৌলিক জিনিস। উহাকেই এক যুগে কণাদ অবলম্বন করেন, আর যুগে তাহাই ডাল্‌টনের 'অ্যাটম' বা 'পরমাণু' রূপে প্রকাশিত হইল। ক্রমে দেখা গেল তাহাও যৌগিক পদার্থ, আর পদার্থ মাত্রই দেখা গেল দুই বিদ্যুৎ-কণার সমষ্টি ; ইলেকট্রন ও প্রোটনের, অর্থাৎ ধনাত্মক ও নির্ধনাত্মক বিদ্যুতের যোগ-বিয়োগের ফল। শুধু তাই নয়, পদার্থ মাত্রই নানা 'অতি-পরমাণু'র ঘূর্ণী ; কেন্দ্রে রহিয়াছে প্রোটন, তাহার চারিদিকে হাল্‌কা ইলেকট্রনের অস্থির ঝড় ; প্রতি সেকেণ্ডে ইলেকট্রন ছুটিতেছে ১৩৫০ মাইল। আবার ইলেকট্রনের নূতন জাতও ক্রমে বাহির হইল,

পজিট্রন। ঐ শাখায় আরও আবিষ্কার চলিতেছে। ইহাদেরই অবস্থিতি পার্থক্যে চরাচরের তাবৎ বস্তুর প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। যেমন, সর্বাপেক্ষা হাল্‌কা পদার্থ হাইড্রোজেন। ইহা একটা গ্যাস, তবু ইহা বস্তুই। তাহার কেন্দ্রে আছে সাধারণত একটি প্রোটন; আর চারিদিকেও ঘুরিতেছে মাত্র একটি ইলেক্‌ট্রন। সর্বপেক্ষা ভারী বস্তু য়ুরেনিয়ম; উহা বহন করে ৯২টি প্রোটন, ১৪৬টি ন্যুট্রন। রদরফোর্ড দেখিয়াছিলেন পরমাণু যেন এক এক ক্ষুদ্র সৌরমণ্ডল। ম্যাক্‌স্‌ প্ল্যাংক. নীলস্‌ বোহর-এর গবেষণান্তে (Quantum Theory) তেজ মনে হইল দমকে দমকে গুলির মত ছিটাইয়া পড়ে। ইলেকট্রনেরও ঘূর্ণীনাচে দেখা গেল উহারা কক্ষ কক্ষান্তরে লাফালাফি করিয়া বেড়ায়; আর সেই লাফালাফিতে বিকীর্ণ হয় কিরণ। ফলে আমরা পাই আলো। ১৯২৫ এর কাছাকাছি আবার গণিত-বিজ্ঞানী বলিলেন—ইলেক্‌ট্রনের চালচলনের মধ্যে আছে একটা ঢেউ-খেলা; তাহাকে আর গণিতের সাহায্য ছাড়া বোঝাই যায় না।[১]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে এই পরমাণু-তত্ত্ব সমূহকে অবলম্বন করিয়া বিরাট রকমের গবেষণার আয়োজন হইল। তাহাতেই আণবিক শক্তি মানুষ আয়ত্ত করিল, উহারই পরিচয় দেখা গেল হিরোশিমার বিস্ফোরণে, তাহার মূল উরেনিয়াম্‌। উহার পরে হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষাও হইয়াছে। অবশ্য শান্তিপূর্ণ কাজেও আণবিক শক্তি প্রযুক্ত হইতেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত অস্ত্র হিসাবেই উহার বেশি গবেষণা চলিতেছে। ইহার বিরুদ্ধেই বিজ্ঞানীদেরও বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৯৫৫ এর এপ্রিলে আইনস্টাইন, রাসেল, জুলিও কুরী প্রমুখদের যুক্ত ঘোষণা বিজ্ঞানের পক্ষ হইতে মানবতার অখণ্ডতার প্রধান ঘোষণা। বিজ্ঞানীদের এই শান্তিবাদী আন্দোলন মূর্ত হইয়াছে 'পুগওয়াশ সম্মেলন' নামে।

কিন্তু প্রশ্ন হইল পদার্থের অভ্যন্তরে এই ইলেকট্রনের ঘূর্ণী তো সতত চলিতেছে, তাহা হইলে পদার্থকে জড় বলিয়া লাভ কি? আর জড়বিজ্ঞানই বা কোথায়? সমস্তটাই দ্বন্দ্বময়, চাঞ্চল্যে অস্থির, আকস্মিক, লম্ফমান, গতিশীল, তাহার সাম্যও ক্ষণস্থায়ী। এই অস্থিরতা ও গতির অনিশ্চয়তা কোয়াণ্টাম থিওরির পর হইতে বৈজ্ঞানিকদের প্রথম অনিশ্চিতবাদী করিল; তাহার পর করিল ভাবুকতার পন্থী, রহস্যবাদে মস্‌গুল। তাঁহারা বিশ্বকে দেখিলেন এক

(১) এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উপাদেয় বিবরণ রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন 'বিশ্বপরিচয়ে' পৃষ্ঠা, ১৮—৩৭।

রহস্য হিসাবে উহা আর মোটেই পদার্থ (substance) মাত্র নয়, গণিতের অঙ্ক মাত্র।

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার খেলা

আধুনিক বিজ্ঞানের দেশ এই গণিতের আঁকের দেশ—এইখানে বাস্তবের সঙ্গে মিলমিশের আর প্রশ্ন নাই। এই কথা বার্ট্রাণ্ড রাসেলও বারে বারে মনে করাইয়াছেন। গণিত আরম্ভ হইয়াছিল জীবিকার তাগিদে বহুশতাব্দী পূর্বে—মিশরে, ব্যাবিলনিয়ায়, ভারতে। জমির হিসাব রাখিতে জন্মিল জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ইত্যাদি। কৃষির তাড়ায় জন্মিল জ্যোতির্বিদ্যা, দিন মাসের হিসাব। তাহার পরবর্তী সময়েও ইহার পিছনে ছিল নূতন বণিকদের তাগিদ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গণিতেরও একটা নিজের রাজ্য আবিষ্কার হইল ; তাহা মানসিক (subjective) ; সর্বাংশেই ইহা যুক্তির দেশ (consistency)—বাস্তবের (reality) সঙ্গে সে রাজ্যের যোগ নাও থাকিতে পারে।[1] ভাষা ছাড়াইয়া যেমন পরিভাষা জন্মে, এও যেন তেমনিতর। পরিভাষা কিন্তু ভাষা নয়—তাহা একটা মানিয়া-লওয়া কৌশল স্বরূপ। গণিতও তাহাই। এইটি মনে রাখিবার মত কথা দুই কারণে ; প্রথমত, গণিতের ব্যাখ্যা মাত্রই তাহা হইলে সত্য নহে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক বিদ্যারই আরম্ভ যদি বা বাস্তবে হউক, মানস-ক্রিয়া হিসাবে উহার প্রসার অনেক সময়ে বাস্তব হইতে বিচ্ছিন্ন প্রদেশেও ছড়াইয়া যাইতে পারে। গণিতের ও আধুনিক বিজ্ঞানের দুই একটি দিক সেইরূপ ভাবলোকের দিকেই অগ্রসর হইতেছে ; কিন্তু আবার প্রতিহত হইয়া ফিরিয়াও আসিতেছে। অবশ্য ঐতিহাসিক কারণে যেমন এক-এক বিদ্যা ও বিজ্ঞানের উদ্ভব, তেমনি ইতিহাসের গতিও আবার এইসব প্রত্যেক বিদ্যা ও বিজ্ঞানের মানসিক ধ্যান-ধারণা, নানা বিদ্যার ক্রমগঠিত নানা মতবাদ এবং তাহাদের অসম্ভব রকমের জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়। জীবিকার প্রেরণা মূল সত্য, কিন্তু উহাই একমাত্র সত্য নয়, অন্যান্য প্রভাবও আছে। উৎপাদনের তাগিদ মোটের উপর প্রধান ও মৌলিক তাগিদ, এই মাত্র।

"The economic situation is the basis, but the various elements of the superstructure—political forms of class

[1] *Mathematics for Millon*, *Hogben* এবং Anti-Duthring হইতে পরবর্তী উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

struggle and its consequences, constitutions established by the victorious class after a successful battle, etc. forms of law—and then reflexes of all these struggles in the brains of the combatants, political, legal, philosophical theoties, religious ideas and their further development into systems of dogma—also exercise their influence upon the course of historical struggles and in many cases preponderate in determining their form. There is an interaction of all these elements, in which amid all the endless host of accidents (*i.e.* of things and events whose inner connection is so remote or so impossible to prove that we regard it as absent and can neglect), the economic movement finally asserts itself as necessary."[1]

বিজ্ঞানের ভাববাদিতা যেন একদিকে আত্মসচেতনতা, অন্যদিকে আত্মরতি। অতএব গণিতের ও বিজ্ঞানের কোনো কোনো প্রসার আমাদের চোখে জগৎকে শুধু 'গণিতের খেলা' ও 'বুদ্ধির অতীত লীলা' বলিয়া প্রকাশ করিতে চাহে। তাবৎ চরাচর যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার খেলা সেই সত্যটি উহাতে চাপা পড়িয়া যায়। গণিত ও বিজ্ঞানের এই পরিণাম মোটেই নূতন কিছু নয়; অন্যান্য বিদ্যা ও বিজ্ঞানেরও এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে।

"Like all other sciences, Mathematics arose out of the needs of men; from the measurement of land and of the content of vessels, from the computation of time and mechanics. But as in every department of thought, at a certain stage of development the laws abstracted from the real world became divorced from the real world, and are set over against it as something independent, as laws coming from outside, to which the world has to confrom. This took place in society and in the State, and in this

[1] *Letters of Marxs and Engels*, Lawernce and Wishart, p, 457, *The Marxist Philosophy and the Sciences*, J. B. S. Haldane, P. 49-50 হইতে উদ্ধৃত।

way, and not otherwise, pure mathematics is subsequently applied to the world, although it is borrowed from the same world and only represents one section of froms of its interconnection ; and it is just precisely because of this it can be applied at all."[1]

বস্তুর প্রবাহ

গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান এইরূপে নিজেদের রাজ্যকোণে বাঁধা পড়ে চারিদিক্‌কার অজস্র-ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হইতে বিযুক্ত রাজ্য গড়িতে গিয়া। পরমাণু কিন্তু তাহার 'জড়তা' হারানোতে মোটেই অস্তিত্ব হারায় নাই। দেখা গেল তাহা এক চঞ্চল ঘূর্ণী, তাহা জড়পিণ্ড নয়, বস্তুর প্রবাহ ; ইলেকট্রন্-প্রোটনের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়, আর মধ্যে মধ্যে আবার উৎক্রান্তি (jump)। অর্থাই পদার্থ-জগৎ অফুরন্ত ঘটনার জগৎ (events) ; জটিল প্রবাহ স্বরূপ ("a complex of processes")। কথাটা এমন অভাবনীয় বা অসম্ভব কিছুই নয়। আমাদের দেশের ক্ষণিকবাদ বা 'প্রতিচ্চসমুচ্চবাদ' হইতে একেবারে রবীন্দ্রনাথের গতিবাদে, গ্রীসের হেরক্লিটাস হইতে এই যুগের বের্গস্‌, হোয়াইট্‌হেড্‌দের চিন্তায়ও জগতের এইরকমের রূপই প্রতিভাত হইয়াছে। তাঁহাদের মূল কথা জগৎটা 'গম্‌-'ধাতুতে গড়া, তবে তাহা সিদ্ধ 'নিপাতনে' —অর্থাৎ তাহার নিয়ম জানা নাই। ইহারই বিরুদ্ধে বিজ্ঞান অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল ; বলিল, জগৎ যন্ত্রস্বরূপ। আজ আবার এই দ্বন্দ্বের শেষ এক সমন্বয়ে পৌঁছিতেছে—আর এক উচ্চতর স্তর হইতে আবার পূর্বেকার কথা বলিতেছে—জগৎ একটা প্রবাহ। ইহার সঙ্গে শুধু মনে রাখিবার কথা এই যে, এই ঘটনা ও প্রবাহ একটা বাস্তব ব্যাপার, বাস্তব প্রবাহ, মস্তিষ্কপ্রসূত ধারণা মাত্র নয় ("existing outside our cognition")।

অনিশ্চয়তাবাদ

কিন্তু শুধু ঘটনার প্রবাহ বলিলেই পরমাণুর কথা বৈজ্ঞানিকদের কাছে শেষ হয় না। এখনো তার পথ অনিশ্চিত অর্থাৎ নিপাতনে কাজ চলে। পরমাণু-তত্ত্বের সহিত একই কালে আরও সমস্যা আসিয়া তাঁহাদের হাতে জুটিয়াছিল।

---

[1] *Anti-Duehring*, Engels, 1878 দ্রষ্টব্য। *Materialism and Empirico-Criticim*, Lenin, 1909. দ্রষ্টব্য।

যেমন, আলো কি? উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে কোয়াণ্টাম্‌বাদ জন্মে; তখন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল জটিলতর। আলোর তরঙ্গের রূপকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া প্রশ্ন হইল—'আকাশ' হইতে আলো কিসে দিয়া আসে? ইথরের সম্বন্ধে যত ধারণা ছিল সব বদলাইতে হইল, তবু ইথর টিকিল না। এদিকে আলো হইতে পরমাণুবাদে আসা গেল। দেখা গেল আলো "লাফ মারা ইলেকট্রনের চমক।" তাহার এই এক এক দমকে (jerk) এক একটি বিশেষ পরিমাণ কিরণ বিকীর্ণ হয়; তারই নাম হইল কোয়াণ্টাম্। এক এক রঙের আলোর মধ্যে এক এক আকারের 'কোয়াণ্টা'; আবার 'কোয়াণ্টা'র সংখ্যাতেই আলোর ঔজ্জ্বল্য কমে বাড়ে। তাহার 'তেজ'ও আবার একটা দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের চিরপ্রবাহ মাত্র।

কিন্তু সমস্যা জটিলতর হইল ক্রমেই—সূক্ষ্ম পরমাণুর সন্ধান-কালে দেখা গেল সন্ধান-পদ্ধতিতেই তাহার কিছু না কিছু পরিবর্তন সাধিত হয় ('complimentary relationship') অর্থাৎ সন্ধানীর সঙ্গেও বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যোগ ঘটিতেছে। 'দ্রষ্টা' তাহা হইলে শুধুমাত্র নিরপেক্ষ দ্রষ্টা নহে—'স্রষ্টা'ও। অতএব, বৈজ্ঞানিক বলিলেন—বস্তুর প্রকৃতি জানিবার আর উপায় কোথায়? আমার মনের ছায়া যে তাহার সহিত মিশিতেই আছে। তাহা হইলে বস্তু বস্তুতই মনোময়, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ মনোময়। এই ভাবেও দেখিলে বলা যায়, কথাটা তেমন নূতন নয়—অনেকদিন হইতেই দার্শনিক বলিতেছেন—'ঈশাবাস্যামিদং সর্বং জগৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'। অন্যদিক হইতে দেখি, জীবনের ক্ষেত্রেও বুঝি—সমাজের গবেষকগণও সমাজেরই লোক; হয় উৎপাদন করেন, নয় ভোগ করেন। তাঁহাদের দৃষ্টিও তাই হয় উৎপাদকের নয় ভোগকারীর; তাহাদের সামাজিক মতবাদও মোটের উপর তদনুযায়ী গঠিত হয়। এইরূপ অধ্যাত্মবাদ তাহা হইলে অর্থনীতি ও স্বার্থের তাগিদেই জন্মে।

কিন্তু এই 'আধ্যাত্মিক' বিজ্ঞানের যুক্তিতে জগৎ উড়িয়া যায় না। বড় জোর যাহা প্রমাণিত হয় তাহা এই—প্রথমত, নির্লিপ্ত বা নিরপেক্ষ কিছুই নাই। নির্বিশেষ তেমন কোনো ব্রহ্মও নাই, আত্মাও নাই, চেতনাও নাই। কারণ, সকল চেতনাই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সংঘাতে রূপায়মাণ। দ্বিতীয়ত, যে ইলেকট্রনের কাজ-কারবার অনিশ্চিত বলিয়া এত শুনিতেছি এক একটি ইলেকট্রনের বেলাই তাহা সত্য। কিন্তু বহু ইলেকট্রন একসঙ্গে লইলে মোটের উপর তাহাদের কারবার যথেষ্ট স্থিররূপে নিধারণ করা যায়। সমাজের ক্ষেত্রেও

ব্যাপারটা এইরূপই। ব্যক্তি-বিশেষ কিভাবে চলিবে, বলা শক্ত। কোনো হিন্দুর নিকট ইয়র্কশায়ার বীফ্ হয়ত প্রিয়ও হইতে পারে। কিন্তু মোটামুটি হিন্দু-সাধারণের পক্ষে গোমাতা পূজনীয়া। বিত্তবানের দৈত্যবংশে প্রহ্লাদ জন্মিতে পারে, তাই বলিয়া মোটামুটি বিত্তবানের শ্রেণীস্বভাব আমাদের অপরিচিত নয়।

মোটের উপর কোয়াণ্টাম্ থিওরির সার কথা এইরূপ দাঁড়ায়—যদিও কথাটা পঞ্চাশ বছর পূর্বেকার লেখা (1878) এঙ্গেল্স্-এর *German-Philosophy*তে (পৃঃ ৫৫):

"One knows that what is maintained to be necessary is composed of sheer accidents and that the so-called accidental is the form behind which necessity hides itself."

আপেক্ষিকতাবাদ

এদিকে ইথর যখন টিকিল না, তখন বৈজ্ঞানিকদের ভাবনা হইল, 'আকাশ' (space) তাহা হইলে কিরূপ। স্থান-কাল সম্বন্ধে যে ধারণা মানুষের মনে ছিল তাহাও আর টিকে না। এই নিমেষে আমাদের দেশে ছটা দশ মিনিট, বিলাতে প্রায় অপরাহ্ণ; তাই ঠিক আমাদের চোখে যাহা ঘটিতেছে বিলাতের চোখে তাহাই ফুটিবে আলোক-গতিতে গেলেও আরও একটু পরে। সকল দেশে সমকালিক (simultaneous) কোনো কিছুই প্রায় নয়। সবই নাকি আপেক্ষিক (relative)। অবশ্য এই কথা মোটেই নূতন নয়, কার্যত কোনো একটা জিনিসের রদ-বদল ইহাতে হয় নাই। কিন্তু ইহার পরে স্থান ও কালকে আর স্থির মানদণ্ড ধরিবার উপায় নাই। ১৯০৫ হইতে ১৯১৫-এর মধ্যে আইন্‌ষ্টাইনের কাজে এই পুরানো আপেক্ষিকতাবাদ অভাবনীয় বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ঘটাইল। শিক্ষিত জগৎ শুধু জানিল, স্থান কালে মিলিয়া নূতন এক আয়তন (dimension) এবার স্বীকার করিতেই হইবে। এতদিন মানুষের চিন্তার প্রাকার ছিল তিনটি—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর বেধ। এবার স্থান-কাল তাহার চতুর্থ প্রাকার হইয়া উঠিল। চতুর্থ dimension স্থান-কালের আবিষ্কারের ফলে পুরাতন জ্যামিতি, পুরাতন পদার্থবিজ্ঞান সবই আবার নূতন করিয়া

ঢালিয়া সাজিতে হইতেছে। সব অদ্ভুত কথা শোনা গেল—দুইয়ে দুইয়ে নাকি চার হয় না। বিশ্বের সর্বত্র হয়ত দুইয়ে দুইয়ে চার হয় না, ঠিকই; কিন্তু সাধারণ নিয়মের সংসারে তাই বলিয়া দুইয়ে দুইয়ে একবার চার, একবার পাঁচ হইবে, তাহাও নয়। সেখানে চার বা পাঁচ, একটি সত্য; যদিও সেই নিয়মের সংসারের বাহিরে তাহা আর সত্য না হইতে পারে। উপগ্রহের পথ ডিম্বাকৃতি (eclipse); 'চতুর্থ আয়তনে' তাহা হইবে পাকানো পথ (spiral); আবার 'যুগ্মতারা'র নিকটে এই দুই পথই বর্জিত হয়—এই তৃতীয় পথকে সেখানে 'সরল রেখা' বলিতেও আপত্তি নাই। এইরূপই আপেক্ষিক দুনিয়ারও ছোট-ছোট হাটে এক একটা নিয়ম—কোনটাই তাহা নিখিল বিশ্বের নির্বিশেষ (absolute) বা চূড়ান্ত নিয়ম নয়। বড জোর নিজের ক্ষেত্রেই তাহা চূড়ান্ত—আর সেই হিসাবেই খাঁটি সত্যও। ১২০৩ সনেব একজন বাস্তববাদী (লেনিন) এই বিষয়ে যে আভাস দিয়াছিলেন ১৯০৫এর পরে আইনষ্টাইনের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাহা মিথ্যা হইয়া যায় নাই।

"Human conceptions of space and time are relative, but on the basis of these relative conceptions we arrive at (approach ?) absolute truth. These relative conception in their development follow the line of absolute truth and continually approcah it. The mutuability of human ideas in regard to space and time no more refutes the objective reality of either than the mutuability of scientific knowledge concerning the structure and forms of matter in motion refutes the objective reality of the outer world." [1]

বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত জগতের মোট দুইএকটু খোঁজ মিলিল। 'জড়' বিজ্ঞানের জডতা ভাঙ্গিলে শেষ পর্যন্ত এই জগৎ দেখা দিল—এখানে প্রকৃতি মায়া নয়, বাস্তব সামগ্রী; তেজই (energy) তাহার স্বরূপ, তাহার পাথেয়, আর এই দ্বন্দ্বের ফলে গতি তাহার স্বভাব। "Motion

[1] *The Physical Nature of the Universe.* **J. W. N. Sullivan.** *The Marxist Philosophy and the Sciences* **J. B. S. Haldane.**

is the mode of existence of matter··· Matter without motion is as unthinkable as motion without matter."[1]

'মহতো মহীয়ান্'

পদার্থ বিজ্ঞানের এই এক প্রদেশের দুই একটি নূতন চিন্তায় হিসাব লইতেই অনেক সময় কাটিয়া গেল, অথচ বলিতে গেলে এক পাড়ার এক পরিবারের সামান্য হিসাবও ইহা নয়। প্রকৃতির এই রূপই তথাপি শিক্ষিত মানুষের নিকট বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্ব-সংকটের যুগে নানাভাবে উপস্থিত করেন—যেখানে প্রকৃতি মনে হয় অনিয়মের দেশ, যেন অত্যন্ত অপ্রাকৃত। কিন্তু প্রকৃতি মোটের উপর প্রকৃতিই রহিয়াছে, এই কথাটা ভুলিবার উপায় নাই। তাহার জটিলতা ও বিচিত্রতার অর্থ এই নয় যে, প্রকৃতি আসলে মায়াপুরী,—কার্য-কারণের রাজত্ব সেখানে নাই। এই কথা আবার বিশ্ব ও মহাকাশের খোঁজ লইলেও বিজ্ঞান স্বীকার করিবে। সেখানেও অবশ্য বৈজ্ঞানিকদের চিত্ত রহস্যাকুল হইয়া উঠিতে পারে। কারণ পরমাণুর হিসাবে একদিকে যেমন সৃষ্টি 'অণোরণীয়ান্'; বিরাট-এর মাপকাঠিতে তেমনি সে 'মহতো মহীয়ান্'। এই বিশ্ব শেষ পর্যন্ত অশেষ নয় (finite)—ইহা আজিকার বিজ্ঞানের মত। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার প্রান্তে পৌঁছানো যাইবে, তাহা নয়; সেই ডিম্বাকৃতি পথে ঘোরাই হইবে সার। এই অশেষ বিশ্বের যে চিত্র ১৯১৭ হইতে মহাকাশ অভিযান আমাদের চোখে তুলিয়া ধরিয়াছে, সেখানে আমাদের বিস্ময়েরও শেষ থাকে না। মহাকাশের সেই সমুদ্রে অন্ততঃ ১০ লক্ষ নক্ষত্র-নীহারিকার পুঞ্জ বিঘূর্ণীত হইতেছে দেখা যাইতেছে। ইহারা এক-একটি ছায়াপথ রচনা করিয়াছে। এমনি প্রায় ১০ লক্ষ ছায়াপথের মধ্যে, ১০ হাজার কোটি নক্ষত্র লইয়া এক-একটি ছায়াপথ। সেই ছায়াপথের ১০ হাজার কোটি নক্ষত্রের মধ্যে আমাদের সূর্য মাত্র মাঝারি গোছের একটি নক্ষত্র। আমাদের সৌরমণ্ডল একটা কণার মতো। এই সৌরমণ্ডলের বাহিরে যাইবার সাধ্য এখনো কোনো মানবের নাই। কিন্তু সেই সৌরমণ্ডলের মধ্যে আমাদের ২৫ হাজার মাইলের মেখলাপরা এই পৃথিবীকে তো প্রায় খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না। মাত্র দুই শত (২০০) কোটি বৎসর আগে তাহার জন্ম—হয়ত সে সূর্যের বুক

[1] *Anti Duehring*, Engels p. 71

হইতে খসিয়া-পড়া একটা নির্বাপিত ফুল্‌কি মাত্র; সৌরমণ্ডলের আলোকিত আকাশে এক কণা ছাই। সেই সূর্যের আলোও ক্রমে বিকীর্ণ হইতে হইতে আপনার তাপ হারাইয়া ফেলিতেছে। এই ছাই-এর কণার চারিদিকে এক চির-সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকার ক্রমশই ঘনাইয়া আসিতেছে, এমন আশঙ্কাও চলিত আছে। এমনি ভাবে দেখিলে মনে হইবে, বৃহৎ বিশ্বের মধ্যে পৃথিবীর নিয়তিও যেন বড় করুণ, বিজ্ঞান যেন পৃথিবীর এক সুদূর অন্তিম ক্ষণের আভাস দিতেছে। অন্যদিকে মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা বলিতেছেন—এই কোটি কোটি নক্ষত্রের কোনো একটির চারিদিকে আরেকটি বা আরও বহু বহু সৌরমণ্ডল নাই, সেই সৌরমণ্ডলে এরূপ প্রাণবাসযোগ্য বায়ুমণ্ডল নাই, কোনো চৈতন্য পরিপুষ্ট প্রাণী জন্মে নাই বা জন্মিবে না, তাহাই বা ভাবি কেন? আর, মানববুদ্ধি যে এই পৃথিবীর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পূর্বেই তদুপযোগী প্রাণধারণের ব্যবস্থাও করিয়া ফেলিতে পারিবে না তাহাই বা কে বলে? সেই পরমাণুর প্রমাণ যেমন মানুষের কাছে আজ বড় বিস্ময়ের, তেমনি বিরাটের প্রমাণও বড় বিস্ময়ের। দুই দিকের কোনো প্রমাণই মিথ্যা নয়; মিথ্যা নয় এই কথা—এই আপেক্ষিক সত্য—পৃথিবী চলিয়াছে, তাহার বুকে এই পরম বিস্ময়কর বিশ্বের পরিচয় লইবার জন্য পরম বাস্তব এই জীবজগৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে—সেই বিশ্বের মহানাট্যশালায় মানুষ নামক একটি জীব এখন নিজেও এক বিস্ময় রাজ্যের স্রষ্টা, আর তাহার সেই জীবনও এক মহানাটক। কিন্তু মহাবিশ্বে অন্য কোথাও প্রাণী ও চেতন প্রাণী ছিল না, বা নাই, ইহাও বলা যায় কি? না। তবে এখন পর্যন্ত মানুষই আমাদের জ্ঞাত প্রধান সচেতন সত্য।

প্রাণি-বিজ্ঞানের জগৎ

পৃথিবীর যখন দেড়শত কোটি বৎসর বয়স এমন সময়ে নাকি তাহার কারখানা ঘরে কোথা হইতে জন্মিয়াছিল প্রাণ। সেই প্রাণের মহানাটক অগ্রসর হইতেই জীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল আবার মন। দুই দুই বারে প্রকৃতির ধরা-বাঁধা জীবনযাত্রায় এই যে বিপ্লব ঘটিল আধুনিক বিজ্ঞান সবে তাহার অর্থ বুঝিতে শুরু করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়া উঠিতেছে 'জড়'-প্রকৃতির সঙ্গে জীব-প্রকৃতির দ্বন্দ্ব-সমন্বয়; আবার মানব-প্রকৃতির সঙ্গে জীব-প্রকৃতির ও জড়-প্রকৃতির নানা ঘাত-প্রতিঘাতের অর্থ, বারে বারে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের এই ইতিহাস।

কোথা হইতে প্রাণ আসিল এই প্রশ্নের মীমাংসা অবশ্য আজও হয় নাই; তবু এই প্রশ্ন যে বারে বারে উঠিবে, তাহা নিঃসন্দেহ। প্রাণহীন বস্তুর সীমা ও প্রাণবান্ বস্তুর সীমার মধ্যে বৈজ্ঞানিকেরা প্রায় এক অর্ধ-স্পষ্ট সেতুর সন্ধান পাইয়াছেন—এই জাতীয় বস্তুর নাম ভিরাস্; আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক ষ্ট্যানলি ইহার প্রথম গবেষণা করেন; ইংলণ্ডে উহার গবেষণা করিয়াছেন পিরি, বডেন ও বের্নাল। সেই সন্ধান আরও অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে সোভিয়েত দেশে, এবং আরও অনেক দিন তাহা চলিবে। কারণ, প্রাণ ও নিষ্প্রাণের সীমারেখা এখানে। কেহ বলিবেন ভিরাস্গুলি বাঁচে ও বাড়ে; কেহ বলিবেন ভিরাস্গুলি আছে ও ছড়াইয়া পড়ে। কার্যত কথাটা প্রায় এক। কারণ, প্রাণ-নিষ্প্রাণের এইখানে যেন যুগ-সন্ধি; তাই দুইরূপ বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়, দ্বন্দ্বের সমন্বয় তাহার মধ্যেও অনুস্যূত।[1] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে প্রাণের উদ্ভব সম্বন্ধে গবেষণা আরও অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ১৯৫৭ খ্রীঃ-এর আগষ্ট মাসে আন্তর্জাতিক প্রাণ রসায়ন সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য ছিল এই বিষয়। তাহাতে সোভিয়েতের একাডেমিসিয়ান্ ওপারিন-এর গবেষণা এই বিষয়ে আরও জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়াছে, বলা হয়।

প্রাণের এই উন্মেষটিই এখনো মানুষের অগোচর, না হইলে বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত প্রাণীর ইতিহাস আজ আর প্রশ্নের বিষয় নাই—ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ শুধু বিজ্ঞানের জগতে সর্ববাদিসম্মত নয়, সাধরণ মানুষেরও জীবন সম্বন্ধে চিন্তায় তাহা সহজ সত্য হইয়া উঠিতেছে। উহার মূল কথা লইয়া আজ আর বিবাদ নাই। জীবাণুকোষ প্রথম ছিল একা সম্পূর্ণ—যেন এক-একটি প্রাণ পরমাণু; তাহার পর একত্রিত হইল স্পঞ্জের মত প্রাণপুঞ্জে, তাহারও উচ্চস্তরে এক শাখা দেখা দিল সামুদ্রিক-এনিমোনের মধ্যে; আর এক শাখায় কেঁচোর মত জীব; আর একটু পরে গ্রন্থিময় জীব—যেমন চিংড়িমাছ বা বিছা; আর এক শাখায় দেখি মলাস্ক বা শুগ্‌লি, বা ঝিনুক প্রভৃতি; আর এক শাখায় মেরুদণ্ডবান প্রাণী। ইহাদের প্রত্যেকের শাখা প্রশাখারও শেষ নাই; সেইখানেও মনে হয় কত অজস্র সৃষ্টি ধারা!

প্রাণবিজ্ঞান যেইভাবে মানুষের জীবনকে কার্যত সহায়তা করিতেছে তাহা

[1] *The Marxist Philosophy and the Sciences*, J. B. S. Haldane. *The Origin of the Life on Earth*, A. I. Oparin, 3rd edn. 1957.

পুনরুল্লেখ না করিলেও চলে—কৃষি ও ফসলের উন্নতির পিছনে ইহার আবিষ্কারই কার্যকরী হইয়াছে। সেইরূপে ব্যাক্‌ট্রিয়ার জগৎ পাস্তুর আবিষ্কার করায় পীড়ার প্রতিষেধ আমাদের করায়ত্ত হইয়াছে।[1] আসলে, মানুষের সমস্ত সমস্যার প্রেক্ষাপট রচনা করিয়াছে প্রাণবিজ্ঞান। জীবনের এই বৃহৎ পটভূমিকা এখন মানুষের কাব্য ও দর্শনের এক প্রধান উপজীব্য—যেমন, বের্গস'র চিন্তার, বার্ণার্ডশ'র নাটকের, রবীন্দ্রনাথের কবিতার। এই প্রকাণ্ড পট সাধারণ মানুষেরও মনকে প্রসারিত, প্রশান্ত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে—এত বৈচিত্র্য, এত সৌন্দর্য, এত বিকাশ, এত বিস্ময়, এমন সংঘাত আবার এমন সহযোগিতা, প্রাণধারণের এমন অনন্ত প্রয়াস অথচ প্রাণদানের এমন দুর্নিবার আগ্রহ, দিনরাত্রির মত এমন জন্ম-মৃত্যুর আলিঙ্গনবদ্ধ জীবলীলা, দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়,—ইহা পদে পদে আসিয়া মানুষের চিত্তকে সচকিত ও সচেতন করিয়া তুলিতেছে। ইহার মধ্য দিয়া যে কয়েকটি ধারণা ক্রমেই স্বীকৃত হইয়া পড়িতেছে তাহা মোটামুটি এই:[2] (১) মানুষ শুধুমাত্র যন্ত্র নয়—যদিও কতকাংশে দেহযন্ত্র যে এক জটিল যন্ত্র তাহাও সত্য। (২) জীব-জগতের ইতিহাসের ধারায় না দেখিলে মানুষকেও যথার্থ দেখা যায় না—জীবমাত্রেরই সেই বাস্তব ইতিহাস মানুষের মধ্যেও জীয়াইয়া আছে। (৩) সেই ইতিহাস আবার নূতনও হইয়া চলিয়াছে। কথাটা, একেবারে দৈহিক (germ plasm) হিসাবেও সত্য। (৪) "জীব-ক্রিয়া-পরিবেশ" (Organism-Function-Environment) এই তিনে জীবনের গড়া-পেটা চলিয়াছে (তাহারই সহিত মানুষের সমাজে যোগ হয় "জাতি-কর্ম-দেশ"—এই নূতন বৈচিত্র্য : আর বাড়ে তাহার ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়)। (৫) এমনি প্রাক্তনের ও সন্ততনের ঘাত-প্রতিঘাতে নিত্য নূতন বৈচিত্র্যের (Variation) আবির্ভাব ঘটিতেছে, জীবের জন্ম ধারা শেষ হয় নাই,—নবতন জীবরূপ সর্বদাই আসিতেছে। এইরূপে জীবের দেহবস্তুর মধ্যে তিন বস্তুর সমাবেশ ও সমন্বয় দেখা যায়। (১) পরিবর্তনের মধ্যে প্রোটিনের অক্ষুণ্ণ অস্তিত্ব; কলোডয়েল-প্রটোপ্লাজমের ভাঙা-গড়া; প্রতি জীবের মধ্যে তাহার প্রোটিনের নিজস্বতা (Specification)। (২) এই দেহবস্তুতে জীবের জীবনক্রিয়ারও তিনটি লক্ষণ স্পষ্ট :—

---

[1] দ্রষ্টব্য *Applied Biology* : N. N. Pirie.

[2] *Biology*, Patrick Geddes. *Biology and Human Progress*, J. Aurther Thompson.

বৃদ্ধি (Growth), সংখ্যাবৃদ্ধি বা বংশবৃদ্ধি (Multiplicity), খণ্ডের পরিণতি (Development)। (৩) আর জীবের অন্য তিন চিহ্নও তেমনি স্পষ্ট—অতীতের সংরক্ষণ (Enregistration); বিকাশের সম্ভাব্যতা (Evolvability) ও সচেতন প্রাণীর পক্ষে সচেতন ভাবে ব্যবস্থা আয়ত্তীকরণের শক্তি।

ডারুইনের পরে এই প্রাণবিজ্ঞানের চর্চাতেও যে ডারুইন-বিরোধী দ্বন্দ্ব জাগিয়াছিল, তাহার ছায়াও অবশ্য এই গবেষণাক্ষেত্রে পড়িয়াছিল। যথা, যন্ত্রযুগের আধিপত্যে মানুষকে প্রথম দিকে শুধু একটা দেহযন্ত্র বলিয়াই প্রমাণ করা চলিয়াছিল (Mechanist)। উহার প্রতিক্রিয়ায় আসিলেন প্রাণবাদীরা (Vitalists) ; রবীন্দ্রনাথ, বের্গসঁ প্রমুখ প্রধান মনস্বীরা ইহার সাহিত্যিক জয়ডঙ্কা বহন করিতেন। কিন্তু দেহযন্ত্রকে একেবারে উড়াইয়া দিবার শক্তি বা সাহস প্রাণ-বাদীদেরও নাই। বরং পাব্লভ, ওয়াট্‌সন প্রভৃতির গবেষণায় শিশুদের দেহকে যন্ত্র হিসাবে পুনর্গ্রহণের চেষ্টা চলিত। ডারুইনের পরেকার বিবাদের পরে আবার সমন্বয় দেখা দিতেছে। ঠিক এইরূপই ঘটিতেছে পরিবেশ ও প্রাণীর গুরুত্ব লইয়া বৈজ্ঞানিকদের গবেষণায়ও। প্রকৃতির ঝাড়াই-বাছাইতে (Natural Selection) সেই প্রাণীই টিকে যে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে ; জীবজগতের সংগ্রামে (Struggle for Existence) উহাই বাঁচিবার পথ—ডারুইন তাহা দেখাইলেন। এখনকার বংশানুক্রম-বিজ্ঞানের গবেষণায়ও দেখা যাইতেছে, জন্মের গোড়ায় যে স্ত্রীপুরুষের জোড়া জেনী (Gene) বা জীববীজ আছে তাহার আদান-প্রদানের বৈচিত্র্যেই বিচিত্র জীব জন্মায়, নূতন জীব দেখা দেয়। কিন্তু প্রায়ই সেই নূতন জীব বাঁচে না, কারণ পরিবেশের পক্ষে তাহারা অনুপযোগী হয়। তবু কথাটা পরিষ্কার—জীবজগতের বিকাশ শুধুই ধারাবাহিক নয়,— অনেকাংশে যেমন ডারুইন মনে করিয়াছিলেন ; জীবেরও বিকাশ হয় দমকে দমকে, লাফে লাফে। তাই জীবের রকমারী (Variation) হইয়াছে—এখন তাহাকে 'আভ্যুদয়িক অভিব্যক্তি'ই ('Emergent Evolution'—Lloyd-Morgan) বলি, কি ক্রমবিকাশই বলি। ইহাও ডারুইনবাদের এক নূতন বিরোধ।

আরেক বিরোধ পরিবেশ সম্বন্ধে। ডারুইনের পূর্বে লামার্ক বলিয়াছিলেন মানুষের কোনও এক অভ্যাস পূর্ণায়ত্ত হইলে তাহাও পুরুষানুক্রমে মানুষে বর্তায়। এবং পরিবেশের প্রভাবে নিত্যই নূতন স্বভাব মানুষের মধ্যে জন্মিতেছে,

তাহাতেই পুরুষের পর পুরুষে বৈচিত্র্য ও নূতনত্ব আসিতেছে। ডারুইনের ঝোঁক ছিল পরিবেশের পরিবর্জনের দিক দেখাইবার দিকে, এখনকার ঝোঁক উহার পরিবর্ধনের দিক দেখাইবার দিকে।[1] ইহাই প্রাণবিজ্ঞানের তৃতীয় এক বিতর্ক। মোটের উপর নূতন জীবের জন্মের কারণ জীববীজ। কিন্তু কোষ অবস্থা হইতেই সেই বীজ বাহিরের প্রভাবে-ধাক্কায়, ঘাত-প্রতিঘাতে, জীব রূপ লইতে থাকে। ডারুইন দেখিয়াছিলেন—জীবের পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জীবের বিকাশ; উহা অনেকাংশেই যেন আত্মধ্বংস। অন্যদিককার মতে জীবের আসল দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় পরিবেশের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে; যেই প্রকৃতিরই অংশ আবার প্রাণ। এই পরিবেশের উপর যে পরিমাণে যে জীব আপন অধিকার বিস্তার করিতে পারিয়াছে, সেই পরিমাণেই সেই জীব হইয়াছে জীবন সংগ্রামে জয়ী—অর্থাৎ উন্নত জীব। নিজেকেও তৎপর সে নিয়ন্ত্রণ করিয়া লইতে পারিয়াছে, নিজের চেতনার সাহায্যে বাহিরকেও সে নিজের উপযোগী করিতে পারিয়াছে। এইখানেই প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির ধারায় আসিয়াছে চিন্তার উৎকর্ষ; অর্থাৎ মনের কৃতকার্যতা। প্রাণ ও পরিবেশের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ে মনই শ্রেষ্ঠ উপায়। আর তাই বুদ্ধির সৃষ্টি, বিজ্ঞানেরও বিশেষ কার্যকারিতা এই পথে দিনের পর দিন বাড়িবার সম্ভাবনা। তাই মনস্তত্ত্বকে এখন মনোবিজ্ঞানে পরিণত করার প্রয়োজন।

মনোবিজ্ঞান

মন লইয়া মানুষের মন বরাবরই ভাবনায় পড়িয়াছে। সংবেদনা, জ্ঞান, অনুভূতি ইত্যাদি লইয়া দর্শনের শাখা হিসাবে 'মনস্তত্ত্ব' তাই অনেক দিনই চলিত ছিল। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের জন্ম হইয়াছে অত্যন্ত অল্প দিন। ইতিমধ্যেই তাহাতে দুই এলাকা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—যেমন মনস্তত্ত্ব (Psychology) ও মনোবিকলন বা গূঢ় মনস্তত্ত্ব (Psychoanalysis বা 'Depth' Psychology).

---

[1] *1 Heredity and Politics*, J. B. S. Haldane; *Genetics and Social Order*, Max Graubard; *The Science of Life*, H. G. Wells, Julian Huxley, C. P. Wells. *Animal Biology*, J. B. S. Haldane and Julian Huxley প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

ডারুইনের পর হইতে মনের হিসাবও নূতন করিয়া করিতে হইয়াছে। জীব-জীবনের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করিয়া হর্বর্ট স্পেন্সার মনের সহযোগিতা সূত্রে (association) ক্রমবিকাশ আবিষ্কার করিলেন। ইহার বিরুদ্ধবাদ গাল্‌টনে দেখা যায়। ডারুইনের মতে বৈচিত্র্য (variation) নির্বাচন (selection) ও পরিগ্রহণের (adoption) সূত্রে ব্যষ্টিই অগ্রসর হয়। ব্যষ্টিমনের বৈশিষ্ট্য তাই গাল্‌টন মানিয়া লইলেন। মনে রাখা দরকার তখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ। গাল্‌টন বাহির করিতে বসিলেন বিবিধ ব্যষ্টিমনের ও মনের বিবিধ বৃত্তির পরস্পর সম্পর্কের হিসাব (co-efficient correlation)। আবার, জীব ও অনুন্নত শিশু ও বিকৃতচিত্তদের মনের তুলনামূলক বিচারও ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ হইতেই শুরু হইল। এইরূপে পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব (Experimental Psychology) মনোবিজ্ঞানের স্তরে উঠিয়াছে—শ্রমশিল্পে (Industrial Psychology) অ্যাভেলিং প্রভৃতি, বিদ্যাশিক্ষার (Behaviourist Psychology) ওয়াট্‌সন, ডিয়ুই আদি দার্শনিক এবং শেষে সামাজিক ক্ষেত্রে (Social Psychology) ম্যাকডুগাল প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনের ক্রিয়া প্রক্রিয়া, নিয়ম অনিয়ম, বিশেষ গবেষণার বিষয় করিয়া তোলেন। শিল্পাগারের ও পুঁজিপতির প্রত্যক্ষ তাগিদে "শিল্প-সহায়ক মনোবিজ্ঞানের' জন্ম—শ্রমিকের মনের ক্লান্তিতে হাতের কাজ যাহাতে কমিতে না পারে, ক্রেতার মনে যাহাতে পণ্যের বিজ্ঞাপন দাগ কাটিতে পারে,—এই সবই তাহার বাস্তব উদ্দেশ্য। "আচরণবাদী" মনোবিজ্ঞান মনের প্রকাশ দেখিল "আচরণে"। তাহার গবেষণায় মনই আর নাই; আছে মস্তিষ্কের কোঠায় স্নায়ুতে ও পরিবেশে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘাত-প্রতিঘাত আর সেই ঘাত-প্রতিঘাতে নির্ধারিত প্রতিলিপি (conditioned reflex)। এই তত্ত্ব প্রথম যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতা (mechanistic)-বাদের নূতন বিকাশ; মানুষের চিন্তা-ভাবনা হইতে সমাজ নিয়মন-পর্যন্ত ইহার উদ্দেশ্য। রুশদেশে শারীর বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পাব্‌লভ্‌ কুকুরের উপর প্রথমদিকে এইরূপ ধারণায় গবেষণা চালান, পরে তাঁহার ধারণা কিছু পরিবর্তন করেন। আমেরিকায় ওয়াট্‌সনের অনুসরণে প্রসিদ্ধ মনস্বী ডিয়ুই শিক্ষার ক্ষেত্রে আচরণবাদী নীতির প্রয়োগ করেন। মার্কিন পুঁজিপতিরা উহা প্রয়োগ করিতেছেন বিজ্ঞাপন প্রচারে। প্রচারকের হাতে মানুষের মন যে প্রায় যন্ত্র—এই কথা গোয়েবল-হিটলার হাতে হাতেই প্রমাণ করিয়াছেন; আর মন যে পরিবেশের পরিবর্তনে পরিশীলিত হয় তাহাও

সোভিয়েত ভূমিতে প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু পাব্লভের মতে এই স্নায়বিক আবিষ্কারের এত একরোখা সরল ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। সোভিয়েতের মতে এই যে মনও পরিবেশকে আবার প্রভাবিত করে, পরিবর্তিত করে। অর্থাৎ মনও মিথ্যা নয়, তবে তাহাই আদিবস্তু নয়—বস্তুর যাত্রাপথে প্রাণের প্রবাহে মন একটা বিপ্লবী বিকাশ। আর তাই মনও বস্তুর প্রবাহের একটা প্রবাহ (process)—নিরেট পদার্থ নয়। তাই সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থার ছায়ায় মনের ধ্যান-ধারণা স্থির হয়। একেবারে আদিযুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত সামাজিক ব্যবস্থার প্রভাব এইভাবে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক আলোচনায়ও মোটের উপর লক্ষ্য করা যায়। (*The Marxist Philosophy and the Sciences*, J. B. S. Haldane, p. 121-135. দ্রষ্টব্য)। জার্মান টোটোলিটানিয়া-নিজমের পূর্বাভাস যেমন ট্রিটস্কে বা স্পেংলারএর রাষ্ট্রচিন্তায় পাওয়া যায়, তেমনি তাহা জার্মান "সামগ্রিক মনস্তত্ত্ব" বা 'গেস্টাল্ট সাইকোলজি'র (Gestalt Psychology) প্রবক্তা কোহলের, কোফ্‌কার মতবাদেও পাওয়া যাইবে। 'সমগ্র' যাহা তাহা শুধু অংশ-সমূহের এক যোগ ফল নয়, তাহা নিজেও একটা নূতন জিনিস। এইমতে মন শুধু একের পর এক যোগ করে না, উহাদের সংযোগের ফলেও জন্মে না; মন খণ্ডকে সমগ্র করিয়া তোলে। দেহের স্নায়ুর মধ্যেও তেমনি এক একটি সমগ্রের প্যাটার্ণ রহিয়াছে,—তাহাই বাহিরের প্রয়োজনে আবার সাড়া দেয়। স্পেন্সারের সময় হইতে যে 'সংযোগবাদ' দেখা দিয়াছিল, এইভাবে ইহারা তাহারই প্রতিবাদ করিলেন। ইহারা বলেন, সম্মুখস্থ উদ্দেশ্যের তাগিদেই এই সমগ্রতাও সাধিত হয়; উদ্দেশ্যও পূর্বেই নিহিত থাকে। যেমন, নাৎসি সামগ্রিকতাবাদও হয়ত উদ্দেশ্যের তাগিদেই দেখা দিল—ইতিহাসে 'আর্য' জাতির, অর্থাৎ জার্মান জাতির প্রাধান্য স্থাপনই সেই উদ্দেশ্য।—হিট্‌লারের জন্য কোহলে-কোফ্‌কাও পথ তৈয়ারী করিয়াছিলেন।

কিন্তু আধুনিক কালে মনোবিজ্ঞানের জগতে বিপ্লব ঘটাইয়াছে মনোবিকলন—বিশেষ করিয়া ফ্রয়েড। বলা হয় নিউটনের পরে বৈজ্ঞানিক চিন্তায় এমন বিপ্লব নাকি আর কেহ সাধন করিতে পারেন নাই। অবশ্য গত বিশ বৎসরে তাহার সংশোধন চলিতেছে। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের মূলসূত্র আজ কলেজের ছাত্র মাত্রেরই মুখে মুখে ফোটে—এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা মনোবিকলনের ভুল কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। মোটের উপর

এইরকমই শিক্ষিত জগতে ফ্রয়েডের অপ-প্রভাব। ফ্রয়েড অবশ্য প্রাণবিজ্ঞানের এবং সমাজ-বিজ্ঞানের গবেষক ছিলেন, কিন্তু মানুষের চক্ষে তিনি শুধু মাত্র যৌন মনস্তত্ত্বের (Sex Psychology) প্রবর্তক হইয়া রহিলেন। লোকের এই ধারণা একেবারে ভুলও নয়। সত্যই ফ্রয়েড মনে করিতেন—মানুষের মন ছাইয়া আছে আসঙ্গলিপ্সা ; তাহারই ছলনা তাহার নানা ক্রিয়া-কলাপের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠে। কারণ, সমাজের অনুশাসনে সেই লিপ্সার তো স্পষ্ট প্রকাশ সম্ভব নয়। অতএব, মানুষের কথা-কাজ সবই 'প্রতীক' (Symbol),—ধোঁয়ার ছল করিয়া কাঁদা। কিন্তু মজা এই, এই ছল সে নিজেই জানে না ; ভাবে সত্যই ধোঁয়ার জন্যই কাঁদিতেছে ; অথচ কান্না জমিয়া থাকে বুকের তলায় 'নির্জ্ঞানে' (Unconscious)। মানুষের যতটুকু মন জানা (conscious) ততটুকুই সভ্য মন, পোশাকী মন, সমাজশাসিত মন,—তাহা লইয়াই এতদিন মনস্তত্ত্বের কারবার চলিয়াছে। মনের অতল সমুদ্র অজানা, সেই 'নির্জ্ঞানের' সমুদ্রেই বন্দীকামনার ক্ষুব্ধ গর্জন। ফ্রয়েড ব্যক্তির মনের তিনতলায় তিন দেবতা দাঁড় করাইলেন—আদিম উদ্দাম কামনা বা ইদ্ (Id), যে স্বার্থ-সর্বস্ব ও তাই কাম-সর্বস্ব। 'অহং' (Ego), যে বাহিরের সঙ্গে কামনার সন্ধি-সমন্বয় করিতেছে। তাহার প্রহরীরা (Censor) পরাস্ত হইলে বা ঘুমাইয়া পড়িলেই 'ইদ্' অপদেবতা ঘুমের রাজ্য ও মানব রাজ্য ছারখার করিয়া ফেরে—মানুষ বিকৃত-চিত্ত হইয়া পড়ে। আর মনের তৃতীয় প্রদেশে কর্তা 'পরাহং' (Super Ego)। তাহার শাসন আসলে আদর্শের দৌরাত্ম্য, 'ইদ্' এর বাড়াবাড়িরই উল্টা পিঠ। বাস্তবের সহিত 'পরাহং'এরও সমন্বয় করিতে থাকে 'অহং'। ইদ ও পরাহং এই দুই চাপে পড়িয়া 'অহং' প্রতি নিমেষেই হারিতেছে ; কিন্তু মোটের উপর তবু বাস্তবের শাসন টিকাইয়া রাখিতেছে। তবে যতই আদর্শের দৌরাত্ম্য বাড়ে ততই বাস্তবের বাঁধন খসিয়া পড়ে ; তখন 'অহং' আর মনের সাম্য টিকাইয়া রাখিতে পারে না। মনে তখন নানা নিউরোসিস, নানা বিকৃতি দেখা দেয়। খাড়া থাকিতে পারিলে 'অহং' শেষ পর্যন্ত ইদের প্রচণ্ড শক্তিরও উন্নয়ন বা রূপান্তর (sublimation) করিতে পারে। আবার অহং খাড়া থাকিলেও তাহাকে নানাভাবে ফাঁকি দিয়া কামুক ইদ্ কখনো মানুষকে করিয়া তোলে তরোরিব সহিষ্ণু বৈষ্ণব (masochist) আর কখনো বা হিংস্র অত্যাচারী (sadist)। মানুষর যুদ্ধ বিগ্রহ আদি পরপীড়ন এবং নানা তপশ্চর্যায় আত্মপীড়ন—সেই একই নির্জ্ঞান কাম-লিপ্সার দুইরূপ, বিকৃত প্রকাশ।

ফ্রয়েডের গবেষণার সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই নির্জ্ঞানলোক। কিন্তু এই নিজেরই অজ্ঞাতে নিজের বুদ্ধিকে ফাঁকি দেওয়া—নূতন আবিষ্কার নয়। নিজের মনকে জানিয়া না জানিয়া চোখ ঠারিতে অনেকদিন হইতেই মানুষ শিখিয়াছে। না শিখিয়া উপায় ছিল না—বৈষম্যময় সমাজে বাস্তব জীবনযাপন দুঃসহ হইত। বাস্তব প্রয়োজনে মানুষ নিজেরই অগোচরে যুক্তি-যোজন (Rationalisation) করে; আর সেই বাস্তব প্রয়োজন বাস্তবিকই সামাজিক। তবে ফ্রয়েড বলিয়াছেন—এই তাড়না বাঁচিবার অর্থাৎ কামনার তাড়না; আর আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান বলিবে—তাড়না মূলত বাঁচিবার, আর তাই খাইবার-পরিবার, যৌন-কামনার অপেক্ষাও ক্ষুৎপিপাসা জীবজগতে বেশি আদিম, ব্যাপক এবং প্রচণ্ড। এই আহার্য ও জীবিকার জন্যই শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শ্রেণীমনোভাব জন্মে, আর শ্রেণীমনোভাব প্রয়োজনানুরূপ যুক্তিও আপনা হইতেই জোগায়। সামাজিক দিক হইতে "নির্জ্ঞানের" এইরূপ আবিষ্কার তাই পঞ্চাশ বৎসর পুরাতন : "All the driving forces of actions of any individual must pass through his brain, and transfrom themselves into motives of his will in order to set him into action." (*Feurbach and German Philosophy* Engels, 1885). ইহার উপরই এক অর্থে মার্কসের মতবাদ গঠিত। দ্বিতীয় কথা, ফ্রয়েডের গবেষণা-বিষয় ব্যক্তি-মন তাঁহার সমস্ত চিন্তায় তিনি এই কথা মূল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন,—ব্যক্তিমন ও সমাজের দাবীতে দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। ব্যক্তিমন স্বার্থান্ধ, কামান্ধ, আর সমাজ চায় দশ জনের প্রয়োজনে স্বার্থত্যাগ, কামনা-সংযম; অতএব ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক। এই কথাটা বড় ভুল। ব্যক্তি যদি সমাজ-দ্রোহীই হইত তাহা হইলে সমাজের আদৌ বিকাশ হইত না, মানুষের অ-সামাজিক প্রবণতাগুলি (স্বার্থান্ধতা, কামান্ধতা যা ইদের শক্তি এবং অ-সামাজিক আদর্শবাদিতা, যা 'পরাহং'এর অত্যাচার) অপেক্ষা মানুষের সামাজিক চেতনা (সমন্বয় শক্তি, বিপ্লবী শক্তি, যা 'অহং'এর কাজ) মোটের উপর বেশী শক্তিশালী—তাই সমাজের জন্ম সম্ভব হইয়াছে। মনোবিকার এই সামাজিক-ধর্মচ্যুতিরই (de-socialisation) নাম; আর sublimation অর্থ জৈব প্রবৃত্তির সামাজিকতাসাধন, অর্থাৎ সমন্বয়-সাধন। আসলে এই ভুলের কারণ—ধনবৈষম্য পীড়িত সমাজে মানুষের কাছে সমাজকে ব্যক্তির প্রপীড়ক বলিয়াই ঠেকে। ফ্রয়েড লক্ষ্য

করেন নাই—সামাজিক বৈষম্যে ব্যক্তি-মন কতটা বাঁকিয়া চুরিয়া যায়। দেখেন নাই ব্যক্তিবিশেষ যদি বা—ইলেকট্রন বিশেষের মত—স্বশ্রেণীর বন্ধন কাটাইয়া উঠে, সাধারণ মানুষ—সাধারণ ইলেকট্রনের মতই—চালিত। ফ্রয়েডের নিজেরও এই মূল বিষয়ে ভুলই তাহার প্রমাণ; এবং যদিবা পৃথিবীর অপরিমিত দুর্দশার—এবং ফ্রয়েডেরও নিজেরও দুর্দৈবের—কারণ কোনো এক নিউরোটিক হিটলার, ভুলিলে চলিবে কেন তাহারও পশ্চাতে আছে সমস্ত জার্মান জাতির চিত্তবিকার ও আর্থিক বিকার ভার্সেইর সন্ধি, প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, পুঁজিবাদের গভীর সংকট। মনোবিজ্ঞান তাই অনেকাংশে সমাজ বিজ্ঞানেরই একটি প্রদেশ। এই কথাই বিজ্ঞানের সাক্ষ্য। তবে এখনো পর্যন্ত তাহার সমস্ত এলেকার সন্ধান কমই মিলিয়াছে। মানুষের ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য এখনো আছে কান্টের কথিত সেই বিস্ময়—উপরের মহাকাশ আশ মনের মহাবিশ্ব।

তবে এইবার বিজ্ঞান যে দিক নির্দেশ করিয়াছে সেখানে তাহার 'প্রবেশ নিষেধ'। মানব-প্রয়াসের নানা ক্ষেত্র যখন বিজ্ঞানের প্রয়োগে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে তখনি বুঝা গেল—এক নূতন জগতের জন্ম হইতেছে। উৎপাদনের ক্ষেত্র হইতে অনিবার্যরূপে বিজ্ঞান অগ্রসর হইতে চাহিল সামাজিক ক্ষেত্রে—বৈজ্ঞানিক সমাজ-সম্পর্ক তাহার প্রয়োজন। আর তাহা হইলেই বৈজ্ঞানিক-মন তাহার আবেষ্টনীতে সম্পূর্ণ বিকাশলাভ করিতে পারিবে, বিজ্ঞানের দান মানুষের মানসলোকে স্বচ্ছন্দে পৌছিবে। কিন্তু এইখানেই বিজ্ঞান ঠেকিয়া গিয়াছে। শ্রেণীর ইদ্ নানা ওজরে আপনার রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। মাত্র পৃথিবীর একটি দেশে বিজ্ঞানসম্মত সমাজ-সংগঠনের সজ্ঞান প্রয়াস প্রথম ১৯১৭এর পরে লক্ষিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে বিজ্ঞানের বিপ্লব স্পষ্ট হইল। তাহার পর এক-তৃতীয়াংশ পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজ গঠনে ব্রতী। বাকী পৃথিবী আমেরিকা-ব্রিটেন চালিত পথে পূর্বতন সমাজকে বৈজ্ঞানিক পথে মেরামত করিয়া চলিতে সচেষ্ট হন। সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে স্বীকার করিতে তাহারা কুণ্ঠিত আর কতকটা তাহারা মানব সমাজের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ প্রয়োগে অস্বীকৃত। তবু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান গ্রহণে তাহারাও বিমুখ নন—তাহাদের আশা টেক্‌নোলজির বা কারুবিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, শ্রেণী বিভক্ত সমাজও অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

গ্রন্থপঞ্জী

পঠিতব্য গ্রন্থগুলির নাম প্রবন্ধ মধ্যেই উল্লেখিত হইয়াছে। যে দুই একখানা গ্রন্থ এই সব বিষয়ে অবশ্য পাঠ্য ও সহজলভ্য এখানে তাহারই শুধু নাম করা হইল।

Marxist Philosophy and the Sciences, J. B. S, Haldane.

The Science of Life, Juian Huxley, H. G. Wells.

Outline of Modern Knowledge (Gollancz).

Science for the Citizen, L. Hogben.

Social Functions of Science, J. D. Bernal.

Social Relations of Science, J. G. Crowther.

Plastics. V. and E. Earsley E. G. Couzens. (Pelican *Books* Reprin 1945-63)

নবম অধ্যায়

ভারতে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা

পৃথিবীতে মানুষের যাত্রা সমছন্দে চলে নাই, তাহা পরিষ্কার। মানুষের সংস্কৃতিতে তাই তালেরও তফাৎ ঘটিয়াছে, মানেরও তফাৎ ঘটিয়াছে। তাহা লইয়াই আমরা সংস্কৃতির মধ্যে জাতিভেদ সৃষ্টি করিয়া বসি! আসলে মূলত যে এক বিরাট ঐকতান মানুষের সমস্ত ইতিহাস জুড়িয়া সমুত্থিত হইতেছে— প্রকৃতির হয়ত ইহাই পরিহাস যে, মানুষ তাহাই শুনিতে চায় না। যে মানুষ দিনের পর দিন প্রকৃতির রাজ্য জিনিয়া লইতেছে, সে-ই সচেতন নয় যে, কত বড় বিরাট তাহার সাধনা। তাই নিজের ইতিহাস-জোড়া সে প্রকাশকে কেবলি খণ্ড করিয়া দেখে, খণ্ড করিয়া ফেলে; তাহার মধ্যে জাতিভেদ বর্ণভেদ সৃষ্টি করিয়া বসে—বৈশিষ্ট্যকে জানে বিভেদ বলিয়া। এমন কি, খণ্ডকে সমগ্রের সহিত মিলাইয়া বুঝিতেও সে চায় না।

খণ্ডকেও অবশ্য দেখিতে হইবে,—কারণ, মানুষের যাত্রা সমছন্দে চলে নাই, সংস্কৃতির বিকাশ সমতালের নয়। ইহার কারণ এই যে, বিকাশও অসমান। নানা কারণেই এই অসমানতা আসিয়াছে। আমাদের মতো প্রাচীন দেশ একদিন সংস্কৃতির পুরোধা ছিল; আজ তাহা পিছাইয়া-পড়া দেশের কোঠায়। যেমন সম্রাট আকবরের কাল পর্যন্তও ধরিলে মনে করিতে পারি, উহা এলিজাবেথের যুগ হইতে গৌরবে ম্লান নয়। ভারতবর্ষ পৃথিবীতে তখনো তাহার আসন খোয়ায় নাই—মানুষের যাত্রায় তাহার স্থান পিছনে নয়। অবশ্য সেক্সপীয়র আছেন—আর একা সেক্সপীয়রই আবহমান মানব সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অতুলনীয় মহিমা। কিন্তু ফৈজী, আবুল ফজল, কিংবা বিচক্ষণ তোডরমল, আর আকবরের সভায় জৈন, খ্রীষ্টান, পারশী, হিন্দু, মুসলমান সকল ধর্মের সেই আলোচনা—ইহাতে সংস্কৃতির যে পরিচয় লাভ করা যায়, তাহা তখনকার যে কোনো দেশের পক্ষে নিশ্চয়ই গৌরবের হইত। তবু এক শতাব্দী পার হইতে না হইতেই দেখি—ভারতবর্ষ একেবারে ম্লান।

ইহার কারণ অবশ্য অনেক আছে। কিন্তু যে কারণটি সহজেই চোখে পড়ে

তাহা এই—বিজ্ঞানের জন্ম। আকবর এ্যালিজাথের যুগের তুলনা হইতেও তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইউরোপের বাস্তব জীবনযাত্রা তখন জীবিকার তাড়নায় চঞ্চল, তাহা পৃথিবীব্যাপী ছুটিয়া বেড়াইতেছে আর তাহার সম্মুখে এক Brave New World। তাহার চক্ষে মানুষ এক পরম বিস্ময়, তাহার দৃষ্টিতে তাই বৈজ্ঞানিক ঔৎসুক্য। গেলিলিও-বেকন সে যুগের জন্মদাতা। উহার তুলনায় মনে হয় আমাদের তখনকার সমস্ত চেষ্টাই যেন "ভারতীয় মস্তিষ্কের অপব্যবহার।" তাই শতখানেকে বৎসরের মধ্যে ইউরোপ যখন মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্র হইতে নূতন বণিকতন্ত্রে নবজন্ম লাভ করিল আমরা তখনো রহিলাম সেই সামন্ত যুগেই। ইহার ফলে আমাদের জীবনে বিজ্ঞানও স্বাভাবিকভাবে আসিল না, আসিল পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনে; আমরাও স্বাভাবিকভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অধিকারী হইতে পারিলাম না, বিজ্ঞানকে পাইলাম পরের সম্পত্তি হিসাবে।

আমাদের জীবনযাত্রার পক্ষে ইহার অর্থ যে কত গুরুতর তাহা হয়ত স্পষ্ট করিয়া আমরাও বুঝি না এবং আমাদের বৈজ্ঞানিকগণও বুঝিয়া দেখেন না। কারণ, এই বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টির বিকাশের অর্থ—বৈজ্ঞানিক মনের বিকাশ। জীবনের প্রধানতম ক্ষেত্রচয়ে বিজ্ঞানের প্রবেশলাভের অর্থ—জীবন-বোধে নূতন উপকরণ লাভ। হয়ত জীবন-অভিজ্ঞতা ইহার ফলে হইত তীক্ষ্ণতর, জটিলতর ও বিচিত্রতর. এবং তাহা হইলে মানুষের রূপসৃষ্টিতে (Creative Art), অর্থাৎ অভিজ্ঞতার প্রকাশ-কলায়ও, সেই সূক্ষ্মতর বিচিত্রতর বেদনার ছাপ পড়িত। কিন্তু এই কথা আজও সত্য যে, বিজ্ঞান এখনো আমাদের জীবনবোধে বিশেষ নূতনত্ব দান করিতে পারে নাই। আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞানের সেবা করিয়াছেন দূর হইতে। ইহার কারণ তো ছিলই—এদেশে বিজ্ঞানের জন্ম হয় নাই—পাশ্চাত্যদেশে হইয়াছে। সত্য বটে, এক কালে এই দেশেও বৈজ্ঞানিক গবেষণা হইত। কিন্তু ভুলিবার উপায় নাই, চরক-সুশ্রুত-নাগার্জুন হইতে আলেকজেন্দ্রিয়ায় যূনানী বা আরব্য গবেষকমণ্ডলী পর্যন্ত যে ধারা অনুসরণ করিয়াছেন, বর্তমান বিজ্ঞানকে তাহারই বিকাশ বলা চলে না। মানুষ চিরদিন জ্ঞান আহরণ করিয়াছে, চিরদিনই নূতন কৌশলে (technique) জীবনকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাই বলিয়া সব জ্ঞানই সমমূল্যের বা এক গোষ্ঠীর নয়; সব কৌশলই সমান কার্যকরী হয় নাই। পুরাতন জ্যোতির্বিদ্যা ও রসায়নের সহিত আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ও রসায়নের তফাৎ

এই হিসাবে মৌলিক। তখনকার দিনের গবেষণার মূলে ছিল তখনকার সামাজিক জীবন—সেই মন, সেই ব্যবস্থা, তাহার আবিষ্কৃত জীবনপ্রণালী। সেদিনকার বৈজ্ঞানিকের চিন্তার ও চেষ্টার পুঁজি ছিল সেই সব কৌশল; তাহার গবেষণাগারও ছিল তেমনি সামান্য যন্ত্রে পরিপুষ্ট। বর্তমান কালের বিজ্ঞানের এই দিকে যে সম্পদ আয়ত্ত হইয়াছে, তাহা তখন ছিল কল্পনার অতীত।

ভারতে বিজ্ঞান আমদানী

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের দেশে এইরূপেই আমদানী হয়—বিলাতী পণ্যের মত। আমাদের সামাজিক পরিবেশে তাহার উদ্ভব হইতে পারে নাই। তাই, আমাদের দেশে বিজ্ঞানের গবেষণাও তাহার স্বাভাবিক রূপ এখনো লাভ করে নাই। সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় এই দেশে শিল্প-প্রয়াস চাপা পড়িয়া থাকে, কল-কারখানা গড়িয়া উঠিতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদের নিজস্ব শিল্প ও বিজ্ঞানের গবেষণা তাহার নিজের ঘরে বিলাতেই চলে—সেখানকার বৈজ্ঞানিকেরাই সাম্রাজ্যের ধনিক-শ্রেণীর সেই তাগিদ মিটায়। এই দেশ শাসনের জন্য যদি বা কোনো বৈজ্ঞানিকের দরকার হয়, শাসকগণ সেই বৈজ্ঞানিক ও গবেষক বিলাত হইতে আমদানী করিত। লোকের অভাবও হয় নাই; কারণ বৃত্তি তাঁহাদের স্বভাবতই বেশী মিলিত; আর বিচিত্র ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুযোগও তাহাদের অফুরন্ত ছিল। অবশ্য বৈজ্ঞানিক কৌতূহলেই এদেশের ইউরোপীয়দের মধ্যে স্যর উইলিয়ম জোন্‌সের মতো মনস্বী এদেশে খ্রীঃ ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত করেন। উহাই ভারতে বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রথম উৎস। উহারই প্রেরণায় ভারতে বিজ্ঞান কংগ্রেস প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় খ্রীঃ ১৯১৪ তে। তারপর ক্রমশঃ গড়িয়া ওঠে ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স ১৯৩৫-এ এবং সরকারী কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এ্যাণ্ড ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ ১৯৪১এ। উনবিংশ শতাব্দের ভারতবর্ষে সরকারপুষ্ট সাহেব বৈজ্ঞানিকদের ভূগোল, (সার্ভে অব ইণ্ডিয়া খ্রীঃ ১৮০০ তে প্রতিষ্ঠিত) ভূতত্ত্ব, বৃক্ষতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, আবহাওয়াতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের গবেষণা আজও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। উহা শ্রদ্ধারই যোগ্য, কিন্তু তাহার পিছনকার ইতিহাস সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুক্ত।

ইহাদেরই তত্ত্বধায়রূপে তথাপি ভারতীয় বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী আবির্ভূত হইতেছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের উদ্যোগে ভারতীয় বিজ্ঞানানুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাই (ইং ১৮৭৬) বোধহয় প্রথম নিজস্ব আয়োজন—সে কীর্তি আজ গবেষণাগার রূপে বর্ধিত শ্রী লাভ করিয়াছে। ক্রমে অবশ্য দেশীয় শিল্পপতিরা (industrialists) যখন একটু একটু করিয়া বোম্বাইতে ও অন্যত্র কল-কারখানা গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন, তখন বিংশ শতাব্দে পৌছিয়া তাঁহারা বুঝিলেন, বিজ্ঞানের সাহায্য না পাইয়া তাঁহাদের শিল্প-প্রয়াস অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বাঙ্গালোরে ১৯১৯এ টাটার প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট্ অব সায়েন্স ব্যবহারিক দিকে এক প্রধান চেষ্টা। কিন্তু দেশীয় শিল্পপতিরা এদেশে তখনো নগণ্য। ধনবান্‌রা বাঙলাদেশে অন্ততঃ ছিলেন জমিদার। তাঁহাদের উচিত ছিল কৃষিবিজ্ঞানে সাহায্য করা। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমলে কৃষির উন্নতি ও গবেষণা ভূস্বামীদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। ভারতীয় বিজ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে প্রথম উদ্যোগী হন একজন মধ্যবিত্ত চিকিৎসক। অবশ্য সেই সমিতির পুষ্টির অভাবের অন্যতম কারণ বঙ্কিম-চন্দ্র নির্দেশ করিয়াছিলেন—উহার আলোচনা মাতৃভাষায় হইত না। দেশের অধিকাংশ বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানই তখন ছিল সরকার প্রতিপালিত। তাহারা দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার কথা কল্পনাও করে নাই; দেশীয় শিল্পের জন্ম চাহে নাই, সাম্রাজ্য শিল্পের পুষ্টি চাহিয়াছে। এইরূপে নিজেদের শিল্পোন্নতিতে সহায়তা না পাইয়া নেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে নানা অধ্যয়নশালায়, গবেষণা গৃহে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের বিজ্ঞান-চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করিতে চাহিলেন,—তাহা ছাড়া তাঁহাদের গত্যন্তর ছিল না। সেইখানেই নানা বাধার মধ্যে সি, ভি, রামন, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর মতো অগ্রণীদের আবির্ভাব সম্ভব হয়। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এক গবেষকমণ্ডলীকেও উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু ইহার ফলে বিজ্ঞান ভারতবর্ষে গবেষণার বিষয়ই হইয়া রহিল—শিল্পক্ষেত্রে নামিয়া যাইতে পারে নাই, শিল্প-কৌশল (technique) ও শিল্পযন্ত্র (machinery) চাহে নাই, পারিপার্শ্বিক জীবন-যাত্রার সঙ্গে যোগসূত্র পায় নাই—বিজ্ঞানের অনুশীলনে একটা "ধ্যান" ও "আরাধনার" (subjectivism) চিহ্নও দেখা দিল। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরেও এই লক্ষণটিই প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। যিনি নানা প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে বেতারবার্তার উদ্ভাবনা করিতেছিলেন, পৃথিবীতে মার্কনির সঙ্গে তাঁহার নামও উল্লেখযোগ্য হইত—শুধু যদি গবেষণাগারে

বৃহত্তর সুযোগ তাঁহার জুটিত ; অর্থাৎ পরাধীনতার আওতায় যদি জগদীশচন্দ্রের দিন না কাটিত। প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের সুযোগ কোথায় ছিল ?

পরাধীনের বিজ্ঞান চর্চা

এই পরাধীনতা ও বাস্তব প্রযুক্তির সুযোগের অভাবেই উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে এমনি একটা জীবনোত্তর, বাস্তবোত্তর লোকে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রবণতা দেখা দেয়। বিজ্ঞানের সত্য যেন ধ্যানের বস্তু, ভাবগত সাধনার জিনিস, বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ !—জীবনের ধূলিময় পথে বৈজ্ঞানিক পদচারণা করিবেন না—সমাজের পরিবর্তমান স্রোতের উপর, বিলীয়মান চিন্তা-ভাবনার বহু ঊর্ধ্বে এই বিজ্ঞানের নিত্য শাশ্বতলোক ; সেখানকার তত্ত্ব চিরন্তন সত্য, চির অম্লান। এই মনোভাবের কারণ বুঝিতে আমাদের এখন আর বেগ পাইতে হয় না। প্রথমত, দেখিয়াছি আমাদের দেশে বিজ্ঞানের উদ্ভব হয় নাই, আমদানী হইয়াছে। আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে বিজ্ঞানের বিকাশ হয় নাই। দেশীয় ভাষার সহায়ে সেরূপ সম্পর্ক স্থাপনেরও চেষ্টা হয় নাই। দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদের আওতায় এদেশের দেশীয় শিল্প ও তাহার সহোদর দেশীয় বিজ্ঞান দুইই স্বাভাবিকরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তৃতীয়ত, সাম্রাজ্য-শিল্পের ও সাম্রাজ্য-বিজ্ঞানের ছায়ায় আমাদের দেশে যে 'বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিল তাহার পক্ষে' বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অমনি গবেষণা-মন্দিরে গণ্ডী টানিয়া 'বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের' ধ্যান করা ছাড়া পথ ছিল না—বিজ্ঞানও যে সামাজিক পরিবেশের (social environment) প্রয়োজনে গড়িয়া উঠে, ভাঙ্গিয়া পড়ে, বাঁকিয়া-চুরিয়া যায়, এই সত্য আমাদের পক্ষে তখন বুঝা অসম্ভব। আর ইহার চতুর্থ কারণ এই যে, আমাদের এই বৈজ্ঞানিকরা অনেকাংশে ইউরোপীয় বিদ্যাগারে (academic) বৈজ্ঞানিকদের ছাত্রত্ব করিয়া আসেন ; পরে দেশে সেই বিদ্যাগার-সুলভ (academic) মনোভাব পোষণ করেন ; শিল্পাগারের (industry) সংস্পর্শেও বিশেষ আসিতে পারেন নাই।

কিন্তু এই 'ধ্যানী' মনোভাবটা (subjectivism) শুধু ভারতবর্ষের অস্বাভাবিক পরিবেশে ভারতবর্ষেই জন্মিয়াছে, এমনও মনে করা আর উচিত নয়। উনবিংশ শতাব্দের শেষ দিকে ও বিংশ শতাব্দের এই প্রথম পাদে এইরূপ চিন্তা ইউরোপেও বিদ্যাগারী (academic) বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ক্রমশ প্রকট হইয়া উঠে। জীবিকার প্রত্যক্ষ পীড়ন হইতে এইরূপ বৈজ্ঞানিকগণ

মুক্ত; তাই ইঁহাদের নিকট বিজ্ঞান একটা মুক্তি-মার্গ স্বরূপ। বিশেষত বাহিরের জীবনে তখন নানা জটিলতার সূত্রপাত হইয়াছে; যন্ত্রপরিপোষক বিজ্ঞান এক নির্মম তাণ্ডবতার ও আবিলতার সৃষ্টি করিয়াছে; বৈজ্ঞানিকদের বৈজ্ঞানিকবুদ্ধি ও শৃঙ্খলাবোধ তাহাতে আহত হইয়াছিল। তাঁহারা ভাবিলেন, "বিজ্ঞান কোথায়? ইহা অবৈজ্ঞানিক অরাজকতা মাত্র।" অতএব, এই 'ফলিত বিজ্ঞান', 'ব্যবহার্য বিজ্ঞান' (applied science), 'শিল্প বিজ্ঞান' (industrial science) প্রভৃতি ইঁহাদের চক্ষে বিজ্ঞানের অস্বীকৃতি বলিয়াই প্রতিভাত হইল। তাঁহারা দেবমার্গের পথিক, শুক্রাচার্যের দানব-প্রয়াস তাঁহাদের নয়। অথচ সেই দানব-বিদ্যা ও দানব-প্রয়াসকে ঠেকাইবার মত উপায়ও তাঁহাদের নাই। কারণ, শিল্পপতিরা ধনৈশ্বর্যের মালিক। বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞানাগার তাঁহাদের প্রসাদে চলিতেছে; বিজ্ঞানের ধ্যান-জীবনও গির্জার ধ্যান-জীবনের মতই শিল্পপতির কৃপায় পালিত ও পুষ্ট। অতএব পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের পক্ষেও তখন দুই পথ মাত্র অবলম্বন করা সম্ভব হইল—হয় আপনাদের বিজ্ঞানের গবেষণা-ফল ধনিক শ্রেণীর হাতে তুলিয়া দিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করা এবং তাঁহাদের শোষণ-নীতিতে প্রত্যক্ষ সহায়ক হওয়া; নয় ধনিকদেরই প্রতিপালিত বিজ্ঞান-মন্দিরে 'বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে'র ধ্যান করিয়া পরোক্ষে এই শোষণ-ধর্মী অরাজক সমাজ ব্যবস্থাকে সাহায্য করা। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষীরাও জানিয়া-না-জানিয়া অনেকেই 'বিশুদ্ধ বিজ্ঞান' নামক অ বাস্তব বিদ্যাকে এইভাবে বড় করিয়া আসিতেছিলেন। বিজ্ঞানের জন্ম যে সামাজিক প্রয়োজনে, বিস্তার যে সামাজিক প্রেরণায়, বিজ্ঞানেরই আবার দায়িত্ব যে সামাজিক সমন্বয়—তাহা তাঁহাদের মনে উদিত হইল না।

পরাধীনের চিন্তাসঙ্কট (১৯১৮-১৯৩৮)

যে অস্বাভাবিক সামাজিক ব্যবস্থায় ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বীক্ষণাগারে সাধনার বস্তু হইয়া উঠে, তাহারই আর এক কোঠায়, বিজ্ঞানের জন্মভূমিতে, অনুরূপ সামাজিক অসামঞ্জস্যে বিব্রত বৈজ্ঞানিকদল ক্রমশ বিজ্ঞানের মন্দিরে আপনাদের বন্দী করিয়া তোলেন। একদিন যে ক্রমবর্ধিত বণিক ও ধনিকদের তাগিদে বিজ্ঞান পৃথিবীজয়ে বাহির হইয়াছিল, আরদিন সেই বণিক ও ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কই বিজ্ঞানের বন্ধন-রজ্জু হইয়া পড়িল। তখন দেখা

গেল, বিজ্ঞানের আবিষ্কার আর ধনিকদের কৃপা লাভ করে না। যন্ত্রের পরিবর্তন ব্যয়সাধ্য বলিয়া আর নূতনতর উন্নততর যন্ত্র প্রবর্তিত হয় না। ধনিক-গোষ্ঠী নূতন নূতন আবিষ্কার কিনিয়া লইয়া তাহা বন্ধ করিয়া রাখে, ধ্বংস করিয়া ফেলে। গবেষণাগার হইতে বিদ্রোহী বৈজ্ঞানিক বরং বহিষ্কৃত হয় তথাপি নূতন উদ্ভাবনায় সাহায্য পায় না। বিজ্ঞানের অকল্পিত দানে এখন প্রচুর কৃষিজাত খনিজাত ও শিল্পজাত ঐশ্বর্য মানুষের ভোগে আসিতে পারে, অথচ মুষ্টিমেয় ধনিকের তাহাতে লাভ নাই বলিয়া সেই সব বৈজ্ঞানিক-বিদ্যা প্রযুক্ত হয় না। এখন একদিকে অভাবগ্রস্ত নরনারী ক্রন্দন করিতেছে, অন্যদিকে সহস্র সহস্র মণ গম, চা, কফি, রবার, তুলা সস্তায় বিক্রয় করিবার ভয়ে ধনিক-শ্রেণী ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। একদিকে মানব সমাজের প্রভূততম অংশ দৈন্যে, পীড়নে, রোগে, অজ্ঞানতায় তিমিরাচ্ছন্ন, অন্যদিকে অগ্রগামী অংশ বিজ্ঞানের মৃত্যুঞ্জয়ী মন্ত্রকে মারণ-ষড়যন্ত্রে প্রয়োগ করিয়া আপনাদের ঐশ্বর্য ফাঁপাইয়া তুলিতে ব্যস্ত। বুঝা গেল বিজ্ঞানের এক যুগসন্ধ্যা সমাগত—তাহার আর অভ্যস্ত পরিবেশে অভ্যস্ত দৃষ্টি লইয়া চলা সম্ভব নয়। এই কারণে দুইটি মহাযুদ্ধের মধ্যেই (১৯১৮-১৯৩৮) পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সমাজে দুইটি ধারা দেখা দিয়াছিল—জিনস্ এ্যাডিংটন প্রমুখদের বৈজ্ঞানিক অধ্যাত্মবাদ; আর জে,বি,এস্, হল্‌ডেন্, অধ্যাপক বের্নাল প্রমুখদের বৈজ্ঞানিক সামাজিকতাবাদ।

ধ্যানী বৈজ্ঞানিকের দল বস্তুর (matter) বিশ্লেষণ করিয়া যখন দেখিলেন, তাহার প্রকৃতি সর্বাংশে এখনও সুনিশ্চিত জানা যায় না,—যখন বুঝিলেন বস্তু স্থূল নিরেট জড়পিণ্ড নয়, এক সূক্ষ্ম চঞ্চল শক্তি—তখন তাঁহারা এক অধ্যাত্মবাদের আশ্রয় লইয়া বলিলেন, বস্তু নাই, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, অথবা (জিন্‌সের ভাষায়) সর্বং খল্বিদং ম্যাথেমেটিক্স্; অথবা ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। জগতের বাস্তব দাবী, সমাজের সমাগত সঙ্কট এবং পৃথিবীর ভয়ঙ্কর জটিলতাময় আবর্তের সম্মুখে এমনি করিয়াই পলায়নপর প্রতিভা আপনার সামাজিক দায়িত্বকে অস্বীকার করে, কঠিন কর্তব্য হইতে নিজের মুক্তি খোঁজে; আর তাঁহাদের বিভ্রান্ত মনীষার চমকপ্রদ আলোকে পথচারীদেরও বিভ্রান্ত করিয়া তোলে। না হইলে এই অধ্যাত্মবাদী বৈজ্ঞানিকগণের যুক্তিতেও নূতনত্ব নাই, আবিষ্কারেও অধ্যাত্মবাদের সমর্থক কিছু নাই। বস্তুকে নিরেট বলিয়া কেহই আর মনে করে না; কিন্তু তাই বলিয়া বস্তু অস্তিত্বহীন বা 'ভাবের সমষ্টি' বলিয়াই বা কি করিয়া প্রমাণিত হইল? বস্তুর জটিলতর গঠন,

জটিলতর নিয়ম-প্রণালী বিজ্ঞানই আবিষ্কার করিয়াছে। ইহাতে বিজ্ঞানের অক্ষমতা অপেক্ষা তাহার সার্থকতারই পরিচয় মিলে। আসলে এই মহামনস্বী বৈজ্ঞানিকদল নিজেদের ক্ষেত্র হইতে দর্শনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আর পথ খুঁজিয়া পান নাই—অতি সাধারণ দার্শনিক তথ্যকেই সেখানকার বৃহৎ সত্য বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। ফলে, সাধারণ মানুষ—যাহারা বিজ্ঞানে ও দর্শনে নিতান্তই পথহারা—তাহারা ইহাদেরই দার্শনিক কল্পনাকে 'বিজ্ঞান সম্মত দর্শন' মনে করিয়া আবার ইহাদের পিছনে পিছনে ছুটিয়াছিল। কিন্তু এই পথ পিছনেরই পথ—সম্মুখের পথ নয়, বৈজ্ঞানিক পথ ত নিশ্চয়ই নয়।

হল্‌ডেন ও বের্নাল প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ কিন্তু বিজ্ঞানের জন্ম ও জীবন সামাজিক কারণের (social cause) দ্বারা নিয়মিত দেখিয়া বিজ্ঞানকে সামাজিক অরাজকতা (social anarchy) হইতে উদ্ধারের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে চাহেন ; আর তাই চাহেন সমাজের বৈজ্ঞানিক বিন্যাস (organisation)। এই পথ বস্তুবাদীর পথ। ইহারা জানেন, চেতনা ছাড়াও বাস্তব ঘটনা ঘটিয়াছে, এখনো ঘটিতেছে,—জগতে চেতনা-উন্মেষের পূর্বেও তাহা ঘটিত। অতএব 'চেতনা' আদি নয়, বরং 'বস্তু' আদি। তাঁহাদের মতে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে সংশয় মোটামুটি জাগিয়াছে দুইটি ভুল ধারণায়। তাহার একটি দেখা দিয়াছে—বস্তু সম্বন্ধে পুরাতন ধারণা আর খাটিতেছে না বলিয়া, অর্থাৎ বস্তু 'জড়পিণ্ড' নয় বলিয়া। অন্য ধারণা এই যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা বস্তুর আর নাগাল পাওয়া যায় না ; কারণ, তাহা 'অনিশ্চিত' (indeterminate)। এই কথার ভুল কোথায় তাহা বুঝা দরকার। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রধান অবলম্বন কার্য-কারণ সূত্র (law of causality)। শতাব্দীর গোড়া হইতে বিজ্ঞান দেখিতেছে, বস্তুর কোনো কোনো কাণ্ড ধরা যাইতেছে না, তাহা সুনিশ্চিত নয়। কিন্তু এই অনিশ্চয়তার আসল অর্থ দাঁড়ায় এই যে—বিজ্ঞানের জ্ঞাতব্য বিষয় শেষ হইয়া যায় নাই—বিজ্ঞান থামিয়া পড়িবে না,—ইহা স্থির নিশ্চিত হইয়া 'ধর্মে' পরিণত হয় নাই। বরং আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এই জাগ্রত জিজ্ঞাসাই বিজ্ঞানের প্রাণ, আর সেই জিজ্ঞাসার পদ্ধতিও এই কার্য-কারণ সূত্র। আসলে ভাবময়, মনোময় পথ কোনো বিজ্ঞান গ্রহণ করে নাই ;—বৈজ্ঞানিকও নিজের জীবনযাত্রায় পর্যন্ত তাহা গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র নহেন। জীবনযাত্রায় বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক সবাই সমান বাস্তবপন্থী—মোটেই বস্তুকে "ভাবের ফানুস" মনে করেন না, বা কার্য-কারণ সূত্রকে অবজ্ঞা করিয়া অনিশ্চয়তাবাদ

(Indeterminism) আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকেন না। তথাপি ভাবের ঘরে তাঁহারা যে কেহ কেহ এইরূপ চুরি করিতেছেন তাহার কারণ—তাঁহাদের এই চুরির পিছনে আছে তাঁহাদের সামাজিক দায়িত্ব অস্বীকারের চেষ্টা—যুক্তি-হীন সামাজিক বিন্যাসকে যুক্তি-বিরোধী চিন্তাধারা টিকাইয়া রাখিবার প্রয়াস। এই কারণেই "আদর্শবাদী বিজ্ঞান" (?) মোটামুটি কার্যত প্রতিক্রিয়াশীল, পশ্চাদ্‌গামী।

'আধ্যাত্মিকতা' বনাম বিজ্ঞান

এই বিজ্ঞান-বিরোধিতা যে আমাদের দেশে স্বভাবতই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। একটি সহজ কারণ অবশ্য এই যে, বিজ্ঞানকে আমরা বিলাতের জিনিস বলিয়া গণ্য করি ; এবং তাহার অসম্পূর্ণতা প্রমাণিত হইলেই মনে করি আমাদের প্রাচীন চিন্তা ও ভাবনার সম্পূর্ণতা প্রমাণিত হইল। কিন্তু আমাদের বিজ্ঞান-বিরোধিতার প্রধান কারণ শুধু এই মিথ্যা 'স্বাদেশিকতা'ও নয়। ইহার প্রধান কারণ আমরা পুর্বেই দেখিয়াছি,—বিজ্ঞান আমাদের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক পরিবেষ্টনীতে স্বাভাবিকভাবে আমাদের মধ্যে উদ্ভূত হইতে পারে নাই। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা আমাদের জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে খর্ব করায় আমাদের মনও পরোক্ষভাবে খর্বিত হইয়াছে। তাই আমাদের দেশে বিজ্ঞানকে যেমন আমরা আপনার বলিয়া জানি না, বৈজ্ঞানিক মনকেও তেমনি আপনার করিয়া লইতে পারি না। ডাক্তার মেঘনাদ সাহা এইদিকে গতানুগতিক 'ভারতীয়তা'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে আমাদের অধ্যাত্মজ্ঞানীরা বিচলিত হন। কারণ, আমাদের বৈজ্ঞানিকদের মুখ হইতেও আমরা এতদিন অনুরূপ 'বুলি'ই শুনিয়াছি—শুনিয়াছি, একদিকে প্রাচীন ভারতে 'বিজ্ঞান-চর্চার' কথা (অর্থাৎ 'সব বেদে আছে'); অন্যদিকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতার কথা (অর্থাৎ ইহা নিতান্তই অবিদ্যা ; তবে "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতমাশ্নুতে")। প্রধানত এই অস্বভাবিক রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক পরিবেশের জন্যই পরাধীন ভারতে আমাদের বিজ্ঞান-চর্চা স্বাভাবিক হয় নাই, বৈজ্ঞানিক মন বিকশিত হইতে পারে নাই—বিজ্ঞানাগারের বাহিরের জীবনের সঙ্গে আমাদের বৈজ্ঞানিক তাঁহার গবেষণারও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন নাই। এখনো যে সর্বাংশে পারিয়াছেন তাহা নয়। তাই,

বৈজ্ঞানিকেরাও ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানের সাধনা করিয়া উহার বাহিরে আসিয়া গতানুগতিক জীবনযাত্রাই মানিয়া লন। তাই দেখি সূক্ষ্ম গবেষণাশেষে বাহিরে আসিয়া যে কোনো 'গুরুজী' বা 'সাধু বাবা'র পায়ে মাথা লুটাইয়া দিতে আমাদের বৈজ্ঞানিকদের বাধে না। সার্থক-কীর্তি ডাক্তারের চক্ষে গঙ্গার জলে আশ্চর্য রকমের প্রকৃতিদত্ত সম্পদ ভাসিয়া উঠে—রোগের জীবাণু চক্ষেই ঠেকে না। বিজ্ঞানের শেষ ডিগ্রী নামের পিছনে লিখিয়া বিজ্ঞানাগারের মধ্যেই আমরা করকোষ্ঠি বা গ্রহ-বিচারে বসিয়া যাই—গ্রহ-উপগ্রহের সেই আধ্যাত্মিক তেজে ফট্‌কার বাজার ও ঘোড়দৌড় হইতে পুত্রকন্যার ভবিষ্যৎ পর্যন্ত উদ্‌ঘাটন করিয়া ফেলি। পবিত্র গঙ্গামৃত্তিকায় ও গঙ্গাজলে অমোঘ আরোগ্য-শক্তি আবিষ্কার করি, আর রিফ্রিজিরেটরে তাহারও পবিত্র শীতলতা পবিত্রতর করিয়া তুলি। মাদুলীর সাহায্যে অলক্ষিত শত্রুর অলক্ষিত 'বাণ' ব্যর্থ করি, আর দৈবজ্ঞের নিকট হাত পাতিয়া জানিতে বসি প্রধান মন্ত্রিত্বের শিকা আমার ভাগ্যে কবে ছিঁড়িবে। আশ্চর্য নয় যে, এই প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব জিন্‌স্‌-এডিংটন-ওলিভার লজ্‌কে নিজেদের অকাট্য যুক্তি করিয়া তুলিত, তাঁহাদের কথায় 'ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা'র নূতন নজির খুঁজিয়া বাহির করিত, আর আধুনিক সাইকোলজি ও 'অলিভার-লজি' এই আধ্যাত্মবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে শেষ-অস্ত্রের মতো হইয়া উঠিত। ইঁহাদের কথার সঙ্গে তন্ত্র ও বিজ্ঞানের বুক্‌নি মিশাইয়া নতুন অধ্যাত্মবাদীরা আমাদের এখনো শোনান,—"সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্নায়ুর (neuron?) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় দেহে-মনে কত না অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে! কত না উপায়ে গ্রন্থিরস (ductless gland secretions) জীবন ও চিন্তাকে নিয়মিত করে! অতএব জাগাইয়া তোলো 'কুণ্ডলিনী-শক্তি'কে, যোগ-বিভূতিতে ত্রিভুবন বিজিত হইবে। শোনো নাই, সামান্যতম পরমাণুর মধ্যে যে শক্তি রহিয়াছে তাহাতেও পৃথিবীকে উড়াইয়া দেওয়া যায়?—আবিষ্কার করো সেই শক্তিকেন্দ্র। বিজ্ঞানে তাহা নাই; ভৌতিক সে বিজ্ঞান তো নিম্নস্তরের পদ্ধতি—'প্রজ্ঞানে', তন্ত্রের প্রক্রিয়ায়, যোগের প্রকরণে,—অথবা গীতায় কিংবা বেদে—সেই শক্তির সন্ধান মিলে।"—কথা বাড়াইয়া লাভ নাই, যেখানে শ্রেষ্ঠ মনস্বীদেরই এইরূপ মধ্যযুগীয় মনোভাব সেখানে প্রত্যেক কলেজের ছাত্র যদি ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের আশ্চর্য গবেষক হয় তাহাতেই বা বিস্ময় কি? আর সাধারণ মানুষ যদি বিজ্ঞান ও যাদুতে গোল পাকাইয়া ফেলে এবং নিজেদের জীবনকে এক দৈব-নিপীড়িত দুর্ভাগ্য বলিয়াই গ্রহণ

করিতে স্বীকৃত হয়, তাহাতেই বা বিস্ময় কি? কারণ আমাদের শিক্ষাধ্যক্ষগণ বলিয়া দিয়াছেন, বুদ্ধির অতিরিক্ত চর্চা ও বাস্তববাদ ("...over-intellectualism of modern education and the over-emphasizing of materialism to the neglect of the spiritual" : দ্রষ্টব্য *Report of the All India Education Committee.*) না কমাইলে আমাদের উপায় নাই।

এই ট্রাজি-কমিক অবস্থার পিছনে যে কারণ ছিল তাহা স্মরণ করিলে বুঝি এই সম্পর্ক কাটিতে দেরী হইতেছে কেন। এক অস্বাভাবিক সামাজিক ব্যবস্থার জন্যই বিজ্ঞান আমাদের মাটিতে এতকাল শিকড় গাড়িতে পারে নাই, বৈজ্ঞানিক চিন্তাও আমাদের মনে বহুকাল স্বাভাবিক হইয়া উঠে নাই—আমাদের নিকট বিজ্ঞান আসিয়াছে ল্যাবরেটরির গবেষণা বিষয় হিসাবে। বিদেশীয় শিল্পপতির চেষ্টায় যেটুকু 'ফলিত বিজ্ঞান' আমাদের দ্বারে আসিয়াছে —রেল, কল, বিজলী, গ্যাস, ষ্টিম এবং শিল্পজাত পণ্যের রূপ ধরিয়া,—তাহা অবশ্য আমাদের গ্রহণ করিতেই হয়। কিন্তু মূলত তাহার উৎপাদনে আমাদের বৈজ্ঞানিকদের প্রয়োজন হয় নাই বলিয়া এইসব যন্ত্রের পশ্চাদস্থ বৈজ্ঞনিক প্রয়াস বা পদ্ধতিও আমাদের নিকট অপরিচিতই ছিল।

ভারতে বিজ্ঞানের তাগিদ

বের্নাল সত্যই বলিয়াছিলেন (ইং ১৯৩৯) যে, ভারতে বিজ্ঞানের স্বপক্ষে তাহারাই প্রধান কর্মী যাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত। কারণ, দেখা গেল গান্ধীজীর বিজ্ঞান-বিরোধিতা সত্বেও (রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-আগ্রহও স্মরণীয়) সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রথম বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, জওহরলাল হন সেই কমিটির নায়ক।[১]

চাহি বা না চাহি—ইতিমধ্যে সামাজিক কারণেই আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের তাগিদ আসিয়া পৌঁছিল। যে মুষ্টিমেয় বণিকগণ বিজ্ঞানের কণ্ঠরোধ করিয়া বিজ্ঞানগত ব্যবসা ও মুনাফা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা

---

১ যুদ্ধকালে প্রকাশিত সার্জেন্ট রিপোর্ট, কিংবা তাহারও পূর্বে প্রকাশিত ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা কিন্তু বিজ্ঞানবিরোধী দৃষ্টির সমর্থন করে নাই। ঐ দুই পরিকল্পনারই ত্রুটি ধরা যাইতে পারিত, যথা—যথেষ্ট বৈপ্লবিক চেতনা দ্বারা তাহা অনুপ্রাণিত নয়; কিন্তু উহাতে বিজ্ঞান-চর্চাকে তুচ্ছ করিবার চেষ্টা নাই, তাহাও স্মরণীয়।

করিতেছিলেন, তাঁহাদের পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও লোভের লড়াই ক্রমে দ্বিতীয় মহাসংগ্রামে পরিণত হইল (ইং ১৯৩৯)। সাম্রাজ্যবাদের এই পরিণতি অনিবার্য। আর তাই নিজেদের ব্যবসা ও লাভ অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টায় তখন এই ধনিকেরাই আবার বিজ্ঞানের দুয়ার খুলিয়া দিলেন, বলিলেন: "অস্ত্র দাও, অস্ত্র দাও।" ইঁহারাই একদিন চাহিয়াছিলেন আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি গবেষণাগারেই নিবদ্ধ থাকুক; ইঁহারাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংকটে আমাদের নিকটও ব্যবহারিক-বিজ্ঞান ও শিল্প-বিজ্ঞানের প্রচুরতম প্রসার যাচ্ঞা করিলেন। সর্বনাশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইঁহারা ভারতের বিজ্ঞান-পূজারীদেরও তখন ডাক দিলেন: "মন্দির ছাড়িয়া বাহির হও। কল-কারখানার দাবী মিটাও। অস্ত্রাগারের ভাণ্ডার পূর্ণ করো। বিজ্ঞানের স্থান আর মন্দিরে নয়—শিল্পাগারে, কৃষিক্ষেত্রে, খনিতে, আকাশে, মাটির তলে।"

এই ডাক আমাদের বৈজ্ঞানিকদের কানে পৌঁছিতেই আমাদের বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী তাহাতে সমস্বরে সাড়া দিতে সচেষ্ট হইলেন। যে সাম্রাজ্যবাদ তাঁহাদের ধ্যাননিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরূপে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল—ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের স্বাভাবিক উদ্ভব ঘটিতে দেয় নাই,—সেই সাম্রাজ্যবাদই সংগ্রামের দায়ে বৈজ্ঞানিকদের শিল্পনিষ্ঠ গবেষক করিয়া তুলিতে বাধ্য হইতেছিল, ভারতবর্ষেও বিজ্ঞানকে মুক্তি দিতে চাহিল। যে অস্বাভাবিক কারণে আমরা বৈজ্ঞানিক হইলেও বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টির অধিকারী হই না, এইভাবেই তাহাও লোপ পাইতে থাকে।

আর তারপর সেই সাম্রাজ্যবাদের আসন টলিয়া গেল—ভারত যখন (ইং ১৯৪৭) স্বাধীন হইতে চলিল—তখন তাহার প্রথম এক চেষ্টা হইল আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের সাহায্যে আধুনিক রাষ্ট্র গঠন। ইং ১৯৫১ হইতে গৃহীত হইল প্রথম পরিকল্পনা—উহার নীতি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বেই ১৯৩৮-এ কংগ্রেসে স্বীকৃত হয়।

স্বাধীনতার বিজ্ঞান-সাধনা

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে যে সদ্বুদ্ধিরও প্রকাশ আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না—তাহার প্রমাণ স্বাধীন ভারতের বিজ্ঞান-সাধনায় স্পষ্ট। 'আধ্যাত্মিকতার' সেই আত্ম-সান্ত্বনার প্রয়োজন ঘুচিয়া গিয়াছে। এখন বিজ্ঞানের, বিশেষ করিয়া ফলিত বিজ্ঞান ও কারুবিজ্ঞানের সহায়তা, গ্রহণ করিতে আমাদের

কাহারও দ্বিধা নাই। ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেক্‌নিক্যাল স্কুল যে আজ ছাত্রের প্রধান আরাধ্য বিদ্যালয় তাহা স্পষ্ট;—অবশ্য জীবিকা ও উপার্জন উহাদের প্রধান আকর্ষণ। চিরদিনই তো মানুষের আকর্ষণ জীবিকা, তারপর কাঞ্চন-প্রধান সমাজে অর্থার্জনই মোক্ষলাভ। তাই, ইঞ্জিনীয়ারিংএ ভীড় অস্বাভাবিক নয়। উহার বিকৃতিওতাই স্বাভাবিক—যখন সমাজ চিনে একমাত্র টাকা। সত্য বটে, এখনো আমাদের মধ্যে বিজ্ঞানের ইহ-সর্বস্বতা এবং আমাদের ভারতীয় মানসের অধ্যাত্মমুখিতার দোহাই শোনা যায়। কিন্তু তাহা অনেকটা প্রথাগত 'পেট্রিয়টিজম্'; খানিকটা বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে জাত আশঙ্কা ও সংশয়। এই মতের লোকেরাও কেহ আর বলেন না—বিজ্ঞানের দান অগ্রাহ্য। এদিকে গান্ধীবাদের (ভ্রান্ত?) ব্যাখ্যাও আর কার্যকরী হয় না। ক্ষমতা হাতে পাইতেই গান্ধী-ভক্ত জাতীয় নেতৃত্ব নিঃসংশয়ে আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের ও ফলিত বিজ্ঞানের সহায়ে ভারতবর্ষকে শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। মনে রাখিতে পারি—আমাদেরও বাস্তব বিদ্যার প্রতি আস্থার ঐতিহ্য আছে, অক্ষয়কুমার দত্ত বিদ্যাসাগর প্রভৃতি হইতে 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমের বিজ্ঞান-আলোচনা পার হইয়া আমরা রবীন্দ্রনাথের সুদৃঢ় বিজ্ঞান-আগ্রহে এইরূপ একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এদিকেও উত্তরাধিকারী সূত্রে লাভ করিয়াছি; ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার হইতে এই নব পর্যায়ের মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু প্রমুখ খাঁটি বৈজ্ঞানিকদের কথা বলাই বাহুল্য।

বিজ্ঞান-চর্চার উদ্বোধন এশিয়াটিক সোসাইটিতে (ইং ১৭৮৪) আরম্ভ হইলেও সত্যই জাতীয়-জীবনে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার সুযোগ আসিয়াছে স্বাধীনতা লাভে (ইং ১৯৪৭)। প্রযুক্তিবিজ্ঞান ও কারুবিদ্যার সাহায্যে আর্থিক জীবন গঠন আরম্ভ হইয়াছে পরিকল্পনাগত আর্থিক উন্নয়ন হইতে (ইং ১৯৫১)। বিজ্ঞান-সাধনার অনেকটাই আজ তাই পরিকল্পনাগত প্রকল্প ও উদ্যোগের কথা। সেই আর্থিক উপযোগিতার দৃষ্টিতেই সেই সব প্রয়াস বিচার্য। এই সকলের মধ্যে যাহা বিজ্ঞানসাধনার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য এক একটি আয়োজন, তাহারই নাম শুধু এখানে স্মরণীয়। পরাধীনতার যুগেও আমরা কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়াছিলাম (যেমন, ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অব্ সায়েন্স), তাহা দেখিয়াছি। কিছু কিছু সরকারী প্রতিষ্ঠানও আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছি (যেমন, 'সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া'র প্রতিষ্ঠান সমূহ), আর কিছু কিছু অধিকারও করিয়াছি (যেমন, এশিয়াটিক

সোসাইটি, কলিকাতা)। ইহা ছাড়া প্রত্যেক বিজ্ঞানেরও বহু সোসাইটি (সমিতি) ইনষ্টিটিউট (অনুশীলন পরিষদ) গঠিত হইয়াছে। নানা বিজ্ঞানের পত্র-পত্রিকাও প্রকাশিত হইতেছে। জাতীয় প্রয়োজনের সুস্থ আবহাওয়ায় আজ ইহারা বহু দিকে সঞ্জীবিত। তবু যে উহা সকল দিকে আশানুরূপ ফলদায়ী হইয়া উঠিতে পারে না, তাহাও আমাদের জাতীয় ত্রুটিরই জন্য। সাধারণ ভাবে বৈজ্ঞানিক আলোচনার মহাসম্মেলন 'ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস'—(প্রতিষ্ঠিত ইং ১৯১৪)—ইহা অনেকটা বৈজ্ঞানিক কুম্ভমেলায় পরিণত হইয়াছে। দেখাদেখি অন্যান্য বিদ্যার কংগ্রেসগুলি ছোটখাটো মেলা হইয়া যাইতেছে; আলোচনার ক্ষেত্র হইতেছে না। 'ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট্ অব্ সায়েন্স' (ইং ১৯৩৫এ প্রতিষ্ঠিত) প্রধানত সরকারী বেসরকারী নানা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ সহযোগিতা রক্ষার কাজে নিযুক্ত। আর সরকারী কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক্ এ্যাণ্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ (যুদ্ধকালে ইং ১৯৪১ এ প্রতিষ্ঠিত)-এর কাজ এখন স্বাধীনতার আমলে বিরাট, ক্রমবর্ধমান, এবং আমাদের জাতীয় ত্রুটির ফলে কিছুটা তালমাত্রাহারা। এই বিভাগের পরিচালিত 'ন্যাশানাল লেবরেটরিজ ও রিসার্চ ইনষ্টিটিউট্' (নয়া দিল্লীর ন্যাশানাল লেবরেটরি প্রভৃতি) ও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ (বিহারের জীয়লগড়ার সেণ্ট্রাল ফ্যুয়েল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট্ প্রভৃতি) আমাদের জাতীয় বিজ্ঞান-চেতনার সাক্ষ্য। স্বাধীনতা যে কী সুযোগ, তাহার জলন্ত ঘোষণা এইসব সংস্থা। কিন্তু সে চেতনা যে সামাজিক রাষ্ট্রিক অপটুতায় খর্বিত হইতেছে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। অধ্যাপক ব্ল্যাকেট্ ও অধ্যাপক ষ্টেপান দেদিয়ার দিল্লীর ফিজিক্যাল লেবরেটরির প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এই অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, উহাতে জাতীয় নীতি অনুযায়ী ফলিত বিজ্ঞানের গবেষণায় বিশেষ দৃষ্টি না দিয়া বহুদূরস্থিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রতিই দৃষ্টি দেওয়া হয়; কিন্তু ভারতের প্রয়োজন এখন ফলিত বিজ্ঞানের গবেষণা। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চায় এখনো আমরা (দু' একজন রামন, বসু ব্যতীত) উচ্চ পটুতা ও উচ্চ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারি নাই। উহা সঞ্চয়ের পরে সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রবেশ করাই শ্রেয়ঃ। এই মন্তব্য সাধারণভাবে প্রতিটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে প্রযোজ্য। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য যে, বিজ্ঞানের গবেষণার মান কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে (চাকুরীর প্রতিযোগিতার জন্য?) নিচু করা হইতেছে,—কেন্দ্রীয় লেবরেটরিজ সমূহেও কী ঘটিতেছে, তাহার এখনো প্রমাণ নাই।

তৃতীয় কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা যেমন অধ্যাপনা অপেক্ষা চাকরির পলিটিক্সে ঝুঁকিতেছেন, এসব বিজ্ঞানাগারেও কতকটা তাহা ঘটিতেছে শোনা যায়। অন্ততঃ বড় বৈজ্ঞানিকরা কেহ কেহ গবেষণা অপেক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কর্মে অধিক জড়াইয়া পড়িতেছেন। বিদেশাগত কৃতী যুবক বিজ্ঞানীরা অনেকে এইসব স্থলে সুযোগাভাবে বিদেশে ফিরিয়া যাইতেছেন—অর্থলোভই উহার একমাত্র কারণ নয়। অর্থাৎ আমাদের জাতীয় জীবন এখনো অসংগঠিত, বিজ্ঞান চেতনা সক্রিয়া হইলেও উক্ত প্রভাবে সম্পূর্ণ সার্থক হইতে পারিতেছে না।

সরকার পক্ষ হইতে বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তিবিদ্যার গবেষণার বিশেষ লক্ষ্য (তৃতীয় পরিকল্পনার কথায়) বলিয়া এইরূপ উল্লেখিত হয়: (১) এইসব গবেষণাগার ও সংস্থার উন্নয়ন, প্রসার ইত্যাদি; (২) বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলিক গবেষণায় উৎসাহ দান, (৩) বিশেষ করিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজির গবেষণায় উৎসাহ দান, (৪) গবেষক তৈয়ারি করা, ফেলোশিপ বৃত্তি প্রভৃতির ব্যবস্থা; (৫) বৈজ্ঞানিক ও শ্রমশিল্পের উপযোগী যন্ত্রনির্মাণের গবেষণা ব্যবস্থা, (৬) সরকারী বেসরকারী নানা গবেষণা সংস্থার গবেষণার মধ্যে সংযোগ সাধন, এবং (৭) ছোট ছোট প্রাথমিক ও পরীক্ষামূলক উদ্যোগের দ্বারা গবেষণা ফল পরীক্ষা করিয়া উহার ব্যাপক প্রয়োগ।

কাজে ও কথায় আমাদের যে এ যুগে বিপুল পার্থক্য থাকে, এক্ষেত্রেও তাহা ভুলিবার নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখিতে পারি স্বাধীনতালাভের পূর্বে বিজ্ঞানের এই ধরণের প্রয়োগের কথা চিন্তা করিবারই কি সুযোগ আমাদের ছিল? না, সেদিন বিজ্ঞানের এই বিপ্লবী শক্তিতে আমাদের এমন বিপুল আস্থা দেখা যাইত?

আসল কথা—ত্রুটি মূলে। বিপ্লবের যুগে পুঁজিতন্ত্রী লাভ ও লোভের প্রাধান্য আমরা সমাজে চালু করিয়াছি; বিজ্ঞান-সাধনায় বৈজ্ঞানিক চেতনা প্রতিষ্ঠিত হইবে কিরূপে এই সামাজিক-রাষ্ট্রিক ব্যাহত বিন্যাসে?

সমাজ-মানসের রূপান্তর

বিজ্ঞানের সুস্থ বিকাশ ঘটিলে যে সামাজিক ও মানসিক বিপ্লব অনিবার্য হইয়া পড়িবে, আমরা হয়ত তাহা এখনো ভাবিয়া দেখিতে চাহি নাই। অথচ তাহা সুস্পষ্ট করিয়া বুঝিলে আমাদের যাত্রাপথে আমরা স্থিরপদে অগ্রসর হইতে

পারি। স্মরণ করিতে হইবে, বিজ্ঞান শুধু কতকগুলি জ্ঞানের সংগ্রহ নয়—উহা এক নূতন জীবনচর্যা (Way of Life)। সমাজে কৃষিবিদ্যার আবিষ্কারে যেমন অকল্পনীয় বিপ্লব ঘটিয়াছে, আধুনিক বিজ্ঞানের ও কারু-বিজ্ঞানের প্রবর্তনে তেমনিতর বিপুল পরিবর্তন আজ সংঘটিত হইতেছে। সমাজের সেই সমাগত পরিবর্তন ও সুসঙ্গত রূপের ইঙ্গিত বৈজ্ঞানিকের চক্ষে সুস্পষ্ট। আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নির্ভয়ে তাই এই জীবনযাত্রার রূপান্তরের সঙ্গে মানসিক ও সাংস্কৃতিক ভঙ্গীকেও পরিবর্তিত করিতে স্থিরসংকল্প হইবে, আশা করিতে পারি।

প্রশ্ন হইবে এই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ব্যবহারে মানসিক রূপ কেন পরিবর্তিত হইবে?—দেখিয়াছি, জীবনযাত্রায় মৌলিক পরিবর্তন আসিলে চিন্তায় কল্পনায়ও তাহার ছাপ পড়ে। কৃষির প্রবর্তনেও তাই সমাজের রূপ বদলাইয়াছে আর চিন্তার গড়নে নূতনত্ব আসিয়াছে। তেমনি বৈজ্ঞানিক জীবনধারার প্রচলনেও সমাজ পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে—তাহাকে বাধা দেওয়া অসাধ্য ;—আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তায়ও নূতনত্ব আসিতেছে। মানুষের সভ্যতা বিজ্ঞানের প্রয়োগে নব কলেবর ধারণ করিতেছে ; মানুষের সংস্কৃতিও সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হইয়া চলিয়াছে। তাই ভবিষ্যতের পথে মানুষের প্রধান অস্ত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ; আর বিজ্ঞানই মানুষের সেই নূতন জীবন-বেদ।

যে পৃথিবী আদিকালের মানুষ দেখিতে পাইত, তাহা আর নাই। মানুষের চোখে তাহার রূপই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। মনে হইবে, সেইতো সূর্য উঠে, সূর্য ডুবে ; সেইতো মানুষ জন্মে-মরে ; সেই প্রাণলীলা তেমনিইতো চলিয়াছে। সত্য। তথাপি আমরা জানি—মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী আর তেমনটি নাই। বিজ্ঞান তাহার পরিচিত জগৎ ও পরিচিত ধ্যান-ধারণা বদলাইয়া দিতেছে। এখনো বিজ্ঞানের সব শিক্ষা ও তত্ত্ব আমরা সজ্ঞানে গ্রহণ করিতে পারি না। জীবনের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারি না। ইহার কারণ আমাদের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক নয়, তাহা নানাভাবে মুনাফা ও শিক্ষার বিশৃঙ্খলায় ও পরিবেশের প্রভাবে আচ্ছন্ন। আমাদেরই সেই সজ্ঞান মনের অগোচরে তবু আমরা নূতন দৃষ্টিশক্তিও পাইতেছি। না পাইয়া উপায় নাই ; কারণ, পৃথিবী যে নূতন হইতেছে—বিজ্ঞানের জগৎ যে আমাদের জ্ঞান ও চেতনার নিকট একেবারে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে।

বিজ্ঞানের সাধনা এই বাস্তব ও আধ্যাত্মিক রূপান্তরের সাধনা—ভারতবর্ষে সংস্কৃতির নব-রূপায়নের সাধনা।

গ্রন্থপঞ্জী

'বিজ্ঞানের ইতিহাস'—(ডাঃ সমরেন্দ্র সেন লিখিত বাঙলায় ও লভ্যহ ইংরেজি বহু বই আছে।

ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞান-চর্চার বিষয়ে কোনো ইতিহাস বা বিবরণ লিখিত হইয়াছে কিনা জানি না। সরকারী নানা বিভাগীয় বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট ও সরকার প্রকাশিত গ্রন্থাদি ছাড়া, এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গলের প্রকাশিত গ্রন্থাদিই এ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার পক্ষে প্রধান অবলম্বন। বিশেষজ্ঞের জন্য লিখিত নানা গবেষণা ও প্রবন্ধাদি সর্বদাই বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত হয়। সাধারণ পাঠকের পক্ষে এদেশে বিজ্ঞান চর্চার অবস্থা জানা সম্ভব—(১) Indian Science Congreessএর প্রকাশিত গ্রন্থ ও পুস্তিকাদি হইতে (যেমন, An Outline of Field Sciences in India Ed.S. L. Hora, 1928, Silver Jubilee Session উপলক্ষে প্রকাশিত), এবং উহার অধিবেশনের অভিভাষণ ও প্রবন্ধাদি হইতে; (২) সাধারণ-বোধ্য বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রাদি হইতে। ইহার মধ্যে সহজলভ্য Science and Culture, কলিকাতা ৯২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে প্রকাশিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্বেকার 'প্রকৃতি' লোপ পাইয়াছে; তবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' সুপরিচালিত পত্র। বিলাতী Popular Science প্রভৃতি হইতে বিজ্ঞানের যত ভেল্‌কির গল্প বাঙলা মাসিকপত্রের দেওয়া নিয়ম; ঐসব পড়া অপেক্ষা না-পড়াই সম্ভবত ভালো।

একাদশ অধ্যায়

কথা-শেষ

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পৌছিয়া আমরা মানুষের ভাগ্য পরীক্ষা চক্রের সম্মুখে নিরীক্ষণ করিতে পারিতেছি। ধনিকতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রে পৌছিতে, শোষণবাদী সমাজ হইতে শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজে উত্তীর্ণ হইতে দুই-এক শতাব্দী লাগিলে বেশি সময় লাগিল বলা চলিবে না, এই কথা বিশ বৎসর পূর্বে (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে) যতটা আশার সঙ্গে বলিয়াছিলাম, আজ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি বিশ্বাস লইয়াই বলিতে পারি—বিশ্ববিপ্লব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাহা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে সোভিয়েত শক্তির জন্মে, বৈজ্ঞানিক সাধনায় এবং সাম্যবাদ গঠনের সংকল্পে। তাহা অগ্রসর হইয়াছে পৃথিবী-ব্যাপী জনশক্তির জয়যাত্রায়, সুনিশ্চিত হইতেছে ধনিকতন্ত্র-সমাজতন্ত্র সকল সমাজব্যবস্থারই বিজ্ঞানের বিশ্বজয়ী শক্তির নিকট নতিস্বীকারে। আর উহাই অপ্রতিরোধ্য হইবে বিজ্ঞানের সঙ্গে মানবতার সমন্বয়ে, সংস্কৃতির সেই সমারব্ধ রূপান্তরে। বলা কি অন্যায় যে, বিংশ শতকের এই শেষভাগে বিশ্বশান্তি ও সকল জাতির সহাবস্থান-নীতিকে রূপায়িত করিবার সাধানাতেই মানুষের ভাগ্যপরীক্ষাও চলিয়াছে ?

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাক্‌লের লেখা 'ইংলণ্ডে সভ্যতার ইতিহাস' প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭—আমাদের সিপাহী যুদ্ধের বৎসর, ভারতবর্ষে পুরাতন সামন্ততন্ত্রের অবসান কাল। বিলাতে তখন ধনিক-তন্ত্রের দীপ্ত মধ্যাহ্ন, ঐশ্বর্যের অশেষ সমারোহ। বিলাতের সভ্যতার গোড়াপত্তন করিতেছে তখন বিজ্ঞান। বাক্‌লে বলিলেন—এতকাল সভ্যতা জলবায়ুর বশ ছিল। কিন্তু এইবার বিজ্ঞানের আবির্ভাবে সভ্যতাই প্রকৃতিকে নিয়মিত করিতে পারিতেছে।

ষাট সত্তর বৎসর পরে ইংলণ্ডের হিসাব হইতে দেখি,—লাখ ত্রিশেক লোক বরাবরের মতো বেকার ; ওয়েল্‌সের খনি অঞ্চলে আর স্বচ্ছলতার সম্ভাবনাও নাই ; ল্যাঙ্কেশায়েরের কাপড়ের কলে আর সুদিন ফিরিয়া আসিবে না। অথচ ইংলণ্ডের ক্রয়-বাণিজ্য তখনো সাত-সাগরের পারে ছুটিতেছে, অর্ধেক পৃথিবী তাহার সাম্রাজ্যের জালে ঘেরা ; ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা

এবং আফ্রিকারও প্রায় অর্ধাংশ তাহারই শাসন ও শোষণের কবলে। ইংলণ্ডের ঐশ্বর্যের জোয়ারে তবু সত্তর বৎসরের মধ্যেই ভাটা পড়িয়াছেল—সভ্যতা এখন শোষণমুক্ত জাতিকে পরস্পরের সহযোগীরূপে ঐশ্বর্য সৃষ্টিতে ডাক দিয়াছে। 'সহাবস্থান' তাহারই নাম; উহার অর্থ শোষক-শোষিতের সহাবস্থান নয়; প্রত্যেকটি জাতির আপন-আপন পথে শোষণমুক্ত সমাজ-বিন্যাসের অধিকার ও সাধনা।

বিংশ শতকের এই বৎসরগুলি বিশেষ করিয়া তাই বিশ্বশান্তির সাধনারই বৎসর। সেই সাধনা যদি ব্যর্থ হয় তাহা হইলে মানুষের ইতিহাসও আপাততঃ ব্যর্থ হইবে। বিশ্বশান্তির রূপায়ণেই আজ সংস্কৃতির সার্থকতা।

যুদ্ধ যে অবাঞ্ছিত, তাহা তো ধনিকতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র, কোনো তন্ত্রই অস্বীকার করিতে পারে না। ধনিকতন্ত্রী শক্তিরা কেন তাহা হইলে প্রায়ই শান্তির প্রতিকূল, আর সমাজতন্ত্রী শক্তিরা কেন শান্তিতে উৎসাহী? অবশ্য বলিতে পারা যায়—এই কথাটা সত্য নয়; ইহা সমাজতন্ত্রীদের একটা 'প্রচার'; —তাহারা স্বদেশের ও সর্বদেশের মানুষের কাছে নিজেদের শান্তিকামী বলিয়া প্রচার করিতে ব্যস্ত। কথাটা মানিয়া লইলেও উহার মধ্যে যে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় তাহাও অর্থপূর্ণ। যুদ্ধ বাধায় রাষ্ট্রনেতারা, যুদ্ধ পরিচালনা করে সামরিক নেতারা। কিন্তু জনসাধারণ সর্বদেশেই যুদ্ধবিরোধী। বর্তমানকালে যুদ্ধ সামগ্রিক যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে—সৈনিকই শুধু যুদ্ধ করে না—শ্রমিক-কৃষকও সাহায্য না করিলে যুদ্ধ অসম্ভব। তাই জনসাধারণ আজ পরোক্ষে যুদ্ধের নিয়ন্তা হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বে কোনদিন জনশক্তি যুদ্ধে এইরূপ অপরিহার্য হইয়া উঠিতে পারে নাই, নিজের এই শক্তি সম্বন্ধেও এত সচেতন হইতে পারে নাই। শান্তির পক্ষেও তাই প্রথম কথা—সর্বাপেক্ষা বড় লাভ আজ—জনশক্তির এই অভ্যুদয়।

দ্বিতীয় কথা, প্রত্যেকটি পরাধীন জাতির স্বাধীনতালাভের সঙ্গেই জাতিতে জাতিতে শাসন-শোষণের সম্পর্ক দূর হয়, সাম্রাজ্যবাদী বিরোধের পথ বন্ধ হয়, সঙ্গে সঙ্গে শান্তির পথও প্রশস্ত হয়।—সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যেকটি পরাজয়ে শান্তির শক্তিলাভ। সেই সঙ্গে প্রত্যেকটি স্বাধীন দেশের অভ্যন্তরে যদি জনশক্তি জয়ী হয়, তাহা হইলে শান্তির শক্তিই আরও দৃঢ়তর হয়, যুদ্ধবাদীরা আরও দুর্বল হয়। বলা বাহুল্য, এই জনশক্তির জয় সুদৃঢ় হইতে পারে

সামাজিক বিন্যাসে, সামন্তশক্তি ও ধনিকশক্তি প্রভৃতি শোষণবাদী শক্তির অবসানে, অন্ততঃ জনায়ত্ত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায়।

আভ্যন্তরীণ এই বিকাশ সম্পূর্ণ না হইতে স্বাধীনতার রূপায়ণে শান্তি ও সহাবস্থান নীতিকে সাময়িক ভাবে প্রধাননীতি বলিয়া স্বীকৃত করাই তাই যথার্থ স্বাধীনতাকামীদের স্বার্থ। তাঁহাদের নিজস্ব আর্থিক বিকাশের জন্যও বিশ্বশান্তি একটা প্রয়োজনীয় নীতি। স্বাধীনতালাভের সঙ্গেই এই উদার সত্য ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন—দুই দিক হইতেই, মানবতার দিক হইতেও, আপন জাতীয় বিকাশের দিক হইতেও। বিশ্বশান্তির আদর্শকে ভারতের রাষ্ট্রনেতারা পৃথিবীর কাছে অকুণ্ঠিত ভাবে ঘোষণা করিতে পারিয়াছেন। সেই হিসাবে ভারতের শান্তি ঐতিহ্যের প্রতিও পৃথিবীর শান্তিকামী জাতিদের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছে; ভারতের রাষ্ট্র চেতনার সম্পর্কেও তাঁহারা গভীর বিশ্বাস পোষণ করিয়াছেন। চীনা-আক্রমণের পরেও ভারতের শান্তিকামী ঐতিহ্যের জন্যই সোভিয়েত প্রভৃতি সমাজতন্ত্রী শক্তি ভারতের প্রতি আস্থা হারায় নাই। নিশ্চয়ই জাতীয় স্বাধীনতার মতোই জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রত্যেক জাতির সশস্ত্র আয়োজনেও রক্ষণীয়—সেরূপ যুদ্ধ বিশ্বশান্তির প্রতিকূল নয়। কিন্তু এই প্রতিরক্ষার উন্মাদনায় যুদ্ধবাদিতায় ও সংকীর্ণ জাতীয়তার পথে যাঁহারা পদার্পণ করেন,—সামরিক জোটে জুটিয়া পড়িবার জন্য চীৎকার জুড়িয়া দেন—তাঁহারা ভারতের বন্ধু-বিচ্ছেদের, নৈতিক আদর্শত্যাগের ও রাজনৈতিক অপঘাতের দূত হইয়া পড়েন। দ্বিতীয়তঃ, যতক্ষণ প্রতিরক্ষা প্রয়োজন ততক্ষণ সমস্ত আয়োজনে যথাসম্ভব আত্মনির্ভর হইবার চেষ্টাও প্রধান কর্তব্য। সেই আয়োজন সুসম্পন্ন করিবার জন্য চাই যেমন সামরিক প্রস্তুতি তেমনি শিল্পোন্নয়ন, জনসাধারণের ধনবল, মনোবল ও আস্থাবৃদ্ধি,—এই সব কথা এখানে না বলিলেও চলে। বুঝিবার মতো মূল কথা এই—যুদ্ধ কাহারও পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। বিশেষতঃ ভারতের মতো, এবং যত দূর বুঝি চীনের মতো, দরিদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে আধুনিক যুদ্ধ সর্বনাশের কারণ না হইয়াই পারে না। চীনেরও তাই এমন দুর্বুদ্ধির কারণ আছে কি? তাইওয়ানে, কোরিয়া ও ভিয়েৎনামেই তাহার (সামরিক শক্তি থাকিলে) প্রথম উদ্যোগী হইবার কথা। অবশ্য নিজ পূর্ব সীমান্তে পথঘাটের জন্য কোনো কোনো অঞ্চল চীনের পক্ষে নিজ আয়ত্তে রাখাও প্রয়োজন। কিন্তু সেজন্য ভারত আক্রমণ করিলে তাহা মূঢ়তাই হইবে। চীনেরও তো আর্থিক উন্নয়নই এখন প্রথম প্রয়োজন—যুদ্ধ বা রাজ্যজয় নয়। ভারতেও

পরিকল্পনামূলক আর্থিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়া আমরা স্বাধীনতার রূপায়ণ করিতে চাই। এবং সে রূপায়ণে নানাবিধ অপটুতায় দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। যুদ্ধের জন্য পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। অতএব, স্বার্থ ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শান্তির পথে এই বিরোধের সমাধানের জন্য আমরা যদি প্রস্তুত থাকি তাহা হইলেই আমাদের এই আর্থিক স্বাধীনতার আয়োজন অগ্রসর হইতে পারিবে। আর আর্থিক স্বাধীনতা যদি না থাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতারই বা তাহা হইলে থাকিবে কী?

সোভিয়েত সংস্কৃতিও যে বিশ্বশান্তির উদ্যোক্তা রূপে আজ পৃথিবীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিয়াছে তাহারও কারণ ইহাই। শান্তি সোভিয়েতের পক্ষে অপরিহার্য নিজস্ব স্বার্থ। শান্তির অভাবে সাম্যবাদ নির্মাণ সোভিয়েতে আরও পিছাইয়া যাইতে বাধ্য। তাহা ছাড়া, বিশ্বশান্তি মানবতারও দাবী। সেই মানবতার দাবী সত্য করিয়া না তুলিতে পারিলে সাম্যবাদও সাধ্য হইয়া উঠিতে পারে না। সাম্যবাদ নিশ্চয়ই অবশ্য আর্থিক উপযোগিতাতে নূতন এক ঐতিহাসিক বিকাশ। কিন্তু আর্থিক বিকাশকে অন্য সমস্ত নৈতিক-আধ্যাত্মিক বিকাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, একান্ত করিয়া, দেখাও যথার্থ ঐতিহাসিক দৃষ্টি নয়। দেখিয়াছি সমাজতন্ত্রে ইতিহাসের আর্থিক বিন্যাস ঘটিতেছে; ইতিহাসের নৈতিক আধ্যাত্মিক বিকাশকে অবজ্ঞা করাও নিশ্চয়ই ইতিহাসের বিরোধিতা। সাম্যবাদী মানবতাকে বুর্জোয়া যুগের মানবতার অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত ও অধিকতর সমৃদ্ধ হইতে হইবে, তাহার অপেক্ষা নিম্নতর তো নিশ্চয়ই নয়। বুর্জোয়া মানবতা শতকরা ৫ জনকেই মাত্র 'মানুষ' বলিয়া গণ্য করে,—সাম্যবাদী মানবতা শতকরা একশত জনকেই 'মানুষ' করিতে চাহে। সমগ্র অতীত ইতিহাসের আগামী পরিণতি যেমন সাম্যবাদ, 'অতীতের সমস্ত উত্তরাধিকার'ই (entire inheritance of humanity) যেমন সাম্যবাদীদের আপনার, তেমনি সমস্ত মানুষের ভবিষ্যতের মহৎ দায়িত্ব তাহাদের। মানুষের আর্থিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত সৃষ্টিকে পূর্ণতর করিয়াই সাম্যবাদ সার্থক:—এই নিকষেই সোভিয়েত-শাসনের দোষ-ত্রুটী, সংগ্রামকালীন ভ্রম, পরীক্ষাকালীন অপূর্ণতা-বিচ্যুতি সব ধরা পড়ে,—তাহার আপেক্ষিক অক্ষমতাও বুঝিতে পারা যায়। এই কারণেই স্তালিনের ত্রুটি বা বিকৃতি বা দুষ্কৃতিকে বিচ্ছিন্ন বা চূড়ান্ত করিয়া দেখাও আবার ভুল। সেই সঙ্গে দেখিতে হইবে একদিকে রুশিয়ার জার-আমলের পটভূমি, স্বৈরাচারী শাসন-

ঐতিহ্য, ধনিকতন্ত্রী সুদীর্ঘ যুদ্ধ, অবরোধ-চক্রান্ত, প্রভৃতি। অন্যদিকে স্তালিনযুগের সমস্ত বিকৃতি-বিচ্যুতির সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে হয় স্তালিন-ব্যবস্থার কার্যগত কৃতিত্ব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় সোভিয়েতে পূর্বাপর বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীন প্রয়োগ, সংস্কৃতির সার্বজনীন বিস্তার, বহুজাতিক মিলন, নারীর স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠা,—এককথায় মানুষের নবরূপায়ণের (Remaking of Man) সেই সব কৃতিত্বে মানব-সংস্কৃতির রূপান্তর আরম্ভ হয় সেই স্তালিনের আমলেই। না হইলে, শুধু বিজ্ঞানের সাধনায় ও ফলিত বিজ্ঞানের কৃতিত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই তো পৃথিবীতে অগ্রগণ্য। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে—মুষ্টিমেয় লোকের উচ্ছিষ্টের তাহা অবশেষ হইলেও—এখনো মার্কিন দেশের জীবন-মান সর্বোচ্চ। ব্যক্তিগত মনীষার ও মহদাশয়ের দৃষ্টান্তও নিশ্চয়ই সেই মার্কিন সমাজে সামান্য নয়। কিন্তু কি স্বদেশে কি ভিন্নদেশে, বিজ্ঞানের সকল ফল সার্বজনীন উন্নয়নে প্রয়োগ করিতে মার্কিন নেতৃত্ব আগ্রহান্বিত নন। পৃথিবীর ধনৈশ্বর্যকে সমাজায়ত্ত করিতে, বা শোষণহীন ও কল্যাণব্রতী করিতে তাঁহাদের আপত্তি। আপনার শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-সম্পদকেও মানুষের মধ্যে বিলাইয়া দিতে তাঁহাদের অনিচ্ছা। বরং একদিনকার মানবাধিকারকে, বুর্জোয়া সংস্কৃতির সেই মহৎ দানকে, মার্কিন নেতৃত্ব আজ সময়ে-সময়ে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত। তাহাও 'অন-আমেরিকান্ কাজ' রূপে মার্কিনবিচারে দণ্ডনীয়। এমন কি, পৃথিবীর বহুজাতির জাতীয় উন্নয়নের পরিপন্থী যত পঙ্গু ও কলঙ্কিত নায়ককেই (স্মরণীয় তাইওয়ান, কঙ্গো, কোরিয়া, ভিয়েৎনাম ইত্যাদি) ধনবলে অস্ত্রবলে সৈন্যবলে নিজ নিজ জাতির বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া রাখাই আজ মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়—এত প্রতাপ ঐশ্বর্য সত্ত্বেও কেন বুর্জোয়া সংস্কৃতির এই ক্ষয় দশা; আর সাম্যবাদী সংস্কৃতিই বা কেন বুঝায় উৎকর্ষ।

শেষ কথা:—নিছক সোনা-রূপার গণনায়, বা ভোগবিলাসের আতিশয্যে, নিশ্চয়ই সংস্কৃতির মান স্থির হয় না। আর্থিক বিকাশের সঙ্গে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ অপরাজেয় হইতেছে বলিয়াই তো সভ্যতার উৎকর্ষ। সংস্কৃতির বনিয়াদ আর্থিক ব্যবস্থাতেই বটে, কিন্তু 'রুটি ও সার্কাসে' সংস্কৃতির পরিচয় হইলে সেই সংস্কৃতির অপঘাত অনিবার্য। ভিত্তি রুটি হইলেও প্রথম অভীষ্ট আনন্দ ও চৈতন্যের প্রকাশ ও বিকাশ। মূল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আয়ত্ত হইলে পর বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক সুসমন্বিত সৃষ্টিসম্পদেই সংস্কৃতির পরিচয়।

তাহার অর্থ অবশ্য পারত্রিক বা অলৌকিক কোনো ভাব বা কর্মকাণ্ড নয়। লৌকিক, মানবীয় কর্ম, মানবীয় ভাবনা। 'বহুজন হিতায় চ বহুজন সুখায় চ' এই মানবাদর্শেই বৈজ্ঞানিক সাধনার সিদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার সার্থকতা। লৌকিক অর্থেই 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' ইহাই সোভিয়েত মানবতার লক্ষ্য। এই বিজ্ঞান-প্রবুদ্ধ মানবতাই আধুনিক সংস্কৃতির বাণী ॥

পরিশিষ্ট

[প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণের 'কথারম্ভ']

কথাটা উঠিয়াছিল এইরূপে—উঠিয়াছিল ১৯৪০ সনের মে-জুন মাসে—মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন কারারুদ্ধ হইয়াছেন; 'জীবন-সাহিত্য' নামক একখানি ক্ষুদ্র হিন্দী মাসিকপত্রে পণ্ডিত বানারসী দাস চতুর্বেদী রাহুলজীর একটি জীবনী-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। যাঁহারা হিন্দী সাহিত্যের খবর রাখেন তাঁহারা জানেন যে, চতুর্বেদীজী এই বিষয়ে সিদ্ধহস্ত—বাঙলায়ও তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। কিন্তু কথাটি এইদিকে গেল না, গেল অন্য দিকে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'জীবন-সাহিত্যে'র সেই চৈত্র-সংখ্যা আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই দেখুন, রাহুল সাংকৃত্যায়নের ফটো, আর তাঁর পার্শ্বে—যার জন্য এই পত্রখানা আপনাকে দেখাচ্ছি—দেখুন তো কি, কার চিত্র?"

দেখিলাম মাতৃ-আলিঙ্গন-নিবদ্ধ এক ক্ষুদ্র শিশু। নীচেকার লেখা পড়িলাম—"মহাপণ্ডিত শ্রীরাহুল সাংকৃত্যায়নকী পত্নী শ্রীমতী এলেন স্মের্তোল্‌না, অপনে নবজাত পুত্র ইগোর রাহুলোভিচ্‌ সাংকৃত্যায়নকে সাথ।"

কৌতুক ও কৌতূহল দুইই প্রচুর বাড়িয়া গেল। মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ান সম্পর্কে আমার যাহা জানা ছিল তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সংবাদ যথেষ্টই পাইয়াছিলাম। তাহার উপর জানিতাম—এই অশান্ত মানুষটি যখন সেবার রুশিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, পূর্ববর্তী জীবনের বৈষ্ণব মোহান্তের পরিচ্ছদের মতোই পরবর্তী এই বৌদ্ধ শ্রমণের বেশবাসও পরিত্যাগ করিয়া, কিসান কর্মী হিসাবে বিহারের অগ্নিগর্ভ কিসান আন্দোলনের মধ্যখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন বিহারের জমিদার-প্রভাবিত কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডল তাঁহাকে এক প্রবল শত্রুরূপে গণ্য করিতে বাধ্য হন। লোকচক্ষে তাঁহাকে হেয় করিবার প্রধান অস্ত্ররূপে সেদিন বিহারের সেই মন্ত্রিমণ্ডলী প্রয়োগ করিয়াছিলেন রুশিয়ায় রাহুলজীর এই পরিণয়-সংবাদটি।

বলা বাহুল্য, সংবাদটি মিথ্যা নয়; রাহুলজীও তাহা অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু শুধু সংবাদের মধ্যেই প্রচার নিবদ্ধ রহে নাই। আর সেই প্রচার কিরূপ ক্রমবর্ধিত মিথ্যায় স্ফীত হইয়া উঠিল তাহাও সহজেই অনুমেয়। যে দেশে ব্রহ্মচর্যের এত সমাদর যে, বিবাহ না করিলেই মানুষের চক্ষে মহৎ হইয়া উঠা যায়, সে দেশে সন্ন্যাসী বা শ্রমণের পক্ষে দার-পরিগ্রহ করিলে কি আর প্রশ্ন আছে? রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রেও তাই রাহুলজী যে 'পতিত' এই কথাটি প্রতিপাদন করিবার জন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে ছিল তাঁহার রুশ-পত্নী ও পুত্রের চিত্র প্রভৃতি ডাকযোগে প্রাপ্ত এই সব প্রমাণ। অতএব, 'জীবন সাহিত্যে'র ক্ষুদ্র ফটোটি সকৌতুকে ও সকুতূহলে দেখিলাম।

কিন্তু শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ঔৎসুক্য সেদিকে নয়। তিনি বলিতে লাগিলেন—"নামটি দেখলেন?—রাহুল-পুত্র ইগোর। এই ইগোর নামটির জন্যই আপনাকে এই ছবি দেখানো। ইগোর ছিলেন রুশ দেশের রুশ বীর। তিনি ১১৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাতার আক্রমণ থেকে রুশদের রক্ষা করেন। রুশের বীরত্ব-গাথায় তাঁর আসন হচ্ছে তাই জাতীয় বীরের আসন। সাড়ে সাত শত বৎসর আগে রুশ দেশের উপরে, ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে, তাতার-তরঙ্গ ভেঙ্গে পড়ছিল; বীর ইগোর তা রোধ করতে যান। তাঁকে নিয়ে রচিত হয়েছে রুশের তখনকার এক স্‌াগা। মোটামুটি জাতীয় মনে ইগোর হন জাতীয় বীর। রুশিয়া তো এখন সাম্যবাদী; আর সেই হিসাবে জাতীয়তাবাদ ও 'জাতীয়-মনের' অস্তিত্বই স্বীকার করে না; স্বীকার করে শুধু উৎপাদন-সম্পর্কে-নির্ণীত সামাজিক সম্বন্ধ আর তেমনি পরিবর্তনশীল সমাজের পরিবর্তনশীল ব্যক্তি-মানস। কিন্তু যা-ই বলুক যে, ধীরে ধীরে আবার জাতীয় মন ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি রুশ-শাসকদের দৃষ্টি পড়ছে; আবার তাঁরা একটা রুশ-বৈশিষ্ট্যের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। তারই প্রমাণ এই 'ইগোর'-স্‌াগা পুনরুদ্ধারের কাহিনীতে পাবেন। 'ইগোরে'র সেই বীরত্বগাথার প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এক রুশ মঠে। ছাপার অক্ষরে প্রথমে তা গাঁথা হল ১৮০০তে। তার পরে নেপোলিয়নের সমরকালে মস্কো-দাহতে সে ছাপা বই ও তার মূল পুথি সবই প্রায় যায় পুড়ে। এখন সোভিয়েত সরকার তা খুঁজে-পেতে পুনরুদ্ধার করেছেন; আর গত ১৯৩৪-এ—সেই সময়টার কাছাকাছিই রাহুলজী ছিলেন রুশিয়ায়—তাঁরা এই ইগোরের "সার্ধ-সপ্ত শতাব্দ উৎসবের" মহাসমারোহে আয়োজন করেন। সেই উপলক্ষ্যে নূতন করে আবার ইগোর-গাথা মুদ্রিত

হয়েছে—পুরানো রুশ হরফে চমৎকার চিত্রাবলীসহ। শান্তিনিকেতনে তার এক সংখ্যা পাঠিয়েছেন তাঁরা; আপনাকে দেখাবো। কিন্তু কথা হল, উৎসব হয় শত বৎসরে—এক শত হোক, দু' শত হোক বা সাত শত হোক—এরূপ শত বৎসর পরে। বর্তমান রুশের ইগোর-উৎসাহ কিন্তু সেরূপ দেরী সইতে আর পারল না—সাড়ে সাত শ' বা অমনি একটি ভাঙা-চোরা বৎসরেই উৎসব অনুষ্ঠিত করলে। ওঁদের জাতীয়তাবোধ আজ না হলে তৃপ্তি পাচ্ছে না। তাই, রাহুলাত্মজের নাম হয়েছে ইগোর। যেমন আয়ার্লাণ্ডের নাম আজ আয়ার, শ্যামের নাম তাই-দেশ, পারস্যের নাম ঈরান, রেজা শাহ হলেন পহ্লবী, আর তাঁর পুত্র হলেন ঈরাণের জাতীয় বীরের নামানুসারে নামাঙ্কিত—পুহর। পৃথিবীতে 'জাতীয় মন' আবার নিজ জয়ই ঘোষণা করছে—ফ্যাশিস্তরা নিচ্ছে তার সুযোগ।"

বৃহদাকার ইগোর-গাথা পরে দেখিলাম। চমৎকার দেখিতে। অধ্যাপক মহাশয়, মূল রুশ হইতে মাঝে-মাঝে পড়িয়া শুনাইলেন; উহার অর্থ করিয়া গেলেন; চিত্রগুলির নীচেকার পরিচয় বুঝাইয়া দিলেন। কোথাও শিশু ইগোর, কোথাও যুদ্ধোন্মুখ অশ্বারূঢ় বিজয়ী বীর ইগোর। আবার কোথাও ইগোর-পত্নী আকাশ-বায়ু-দেবতাদের দিকে ঊর্ধ্বনেত্রে আকুল আবেদনে রত—কোথায় তাঁহারা তাঁহার সেই মহাবীর পতিকে অপহরণ করিলেন?—প্রাচীন যুগের বীরত্ব-গাথার এই সব সুপরিচিত রূপ তাহাতে বিদ্যমান। কিন্তু কৌতুককর এই নূতন গ্রন্থের চিত্ররীতি। চিত্রগুলি বর্তমানকালকার রুশ-শিল্পীর আঁকা; কিন্তু মস্কোর 'কালাপাহাড়ী' মনের কোন চিহ্নই যে তাহাতে নাই। আমার স্বল্প-বিদ্যায় মনে হইল এ যেন বাইজেণ্টাইন প্রভাবিত প্রাচীন রুশরীতির অনুযায়ী। সুনীতিবাবুও তাহাই উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"একেবারে শিল্পরীতির পর্যন্ত পুনর্বর্তন। কি বলবেন এর পরে? জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন কি মস্কোর এই সব প্রয়াসের মধ্য দিয়ে প্রকট হচ্ছে না? —কিন্তু ছোট ছোট অন্য জাতিদের বেলা এখন আর রুশিয়া সেই পূর্বেকার সহিষ্ণুতা দেখাচ্ছে কি?"

আমার মনের সম্মুখে আর একটি চিত্র জাগিতেছিল:—বৌদ্ধ গয়ায় অশোক (? সুঙ্গ)-রেলিংএ সমুৎকীর্ণ চিত্রাবলী আমাকে একবার দুইজন 'ইনটেলেকচুয়াল'-অভিমানী ভারতীয় 'বামপন্থী' নেতৃবরের সঙ্গে দেখিতে হইয়াছিল। দল হিসাবে তাঁহারা অবশ্য কম্যুনিষ্ট নন, মত হিসাবে তাঁহারা

কন্তু তখন ছিলেন মার্কস্‌বাদী। ভারতশিল্পের সেই নিদর্শনগুলি তাই তাঁহাদের নিকট অর্থহীন ও হাস্যকর। তাহাতেও আমি বিস্মিত হয় নাই। বিস্ময় বোধ করিয়াছিলাম—ভারতেতিহাস সম্বন্ধেও তাঁহাদের সুগভীর অজ্ঞতায়। কিন্তু তাহাতেও বিস্ময়বোধ না করিয়া কৌতুকবোধই করিতে পারিয়াছিলাম খানিকক্ষণ পরে। কারণ, আমার সঙ্গীদের আচরণে এই অজ্ঞতার সাফাই গাহিবার একটা চেষ্টা ছিল সুস্পষ্ট। তাহা এইরূপ :—এই ইতিহাস, এই শিল্প যে তাঁহারা জানেন না তাহা নয়। জানেন। তবে এইসব বিশেষ কিছু নয়, সবই অতীত। দেখিয়া গেলেই হইল। আর দেখিবার মতো ইহাতে কি-ই-বা আছে? বাতিল জিনিস তো। -অজ্ঞতামাত্রই ঢাকিবার চেষ্টা স্বাভাবিক। এই ক্ষেত্রে সেই চেষ্টা হইতেছিল মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিভঙ্গীর নামে। উক্ত চেষ্টাও স্বাভাবিক,—এবং কৌতুকাবহ। মনে আছে প্রাচীন ভারতীয় বেশ-বিন্যাসে ইঁহাদের হাস্য উচ্ছ্রিত হইয়া উঠিয়াছিল। হ্যাম্‌লেট ইন্ প্লাস্‌ফোর্স কিংবা সুজাতা ইন্ কস্‌মেটিকস্ না হইলেই ইঁহাদের আধুনিক রুচিতে ও বাস্তব-বোধে বড়ই বেমানানো হয়।

সুনীতিবাবুর কথা শুনিতে শুনিতে মনে পড়িল, আমার সেই মার্কসিষ্ট ইন্‌টেলেকচুয়ালদ্বয়ও হয় ইগোরকে ইন্ প্লাস্‌ফোর্স দাবী করিতেন, না হইলে মস্কৌর এই শিল্প-নিদর্শনকে বলিতেন—'জাতীয়বাদী রিঃেকৃশ্যানারি'। শিল্পের ও স্মৃতির এইরূপ পুনরুজ্জীবনে শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক মহাশয়ও সাম্যবাদের বিরোধী ধারার বিকাশই দেখিতেছেন। ইগোর 'রাহুলোভিচ' নামটি তাঁহার নিকটে রুশ জাতীয়-ধারার জয়চিহ্নরূপেই উল্লেখযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

মস্কৌর তখনকার (১৯৪০) আর একটি সংবাদ—

"আজুরবাইজানের মহাকবি নিজামী গান্‌জেবীর (১১৪২-১২০৩ খৃঃ অঃ) 'অষ্টশতাব্দ জন্মজয়ন্তী' আগামী বৎসরে (১৯৪০-১) সমস্ত সোভিয়েত রুশিয়ায় অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষে আজুর বাইজানের সোভিয়েট সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকের প্রধান নগর বাকু হইতে নিজামী ও তাঁহার কাব্যাবলী বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।"

নিজামী দ্বাদশ শতাব্দীতে গান্‌জার জন্মগ্রহণ করেন। তখন আজুরবাইজান, আরব ও পারসিক আক্রমণকারীদের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করিতেছে। গান্‌জার বর্তমান নূতন নাম কিরোভাবাদ। নিজামীর নামও

আমাদের নিকট অপরিচিত নয়। মস্কোর সংবাদটি বলিতেছে, "নিজামীর কাব্যে প্রাচ্যের সমৃদ্ধিশীল সংস্কৃতি রূপগ্রহণ করিয়াছে।" পাঁচখণ্ডে তাঁহার কাব্যমালা বিভক্ত যথা—রহস্য-ভাণ্ডার, খোসরো-শিরিণ, লাইলা-মজনুন, সপ্ত-সুন্দরী এবং সেকান্দর-নামা। ককেশীয় ও সমীপপ্রাচ্যের পরবর্তী কবিকুল এই পঞ্চকাব্যের আখ্যায়িকা, রীতি, শব্দ ও বাগ্-ভঙ্গী লইয়া আপনাদের কবিতা রচনা করিয়াছেন। 'মস্কো নিউজ' বলিতেছেন—"নিজামী মানব প্রেমিক ছিলেন। তাঁহার কাব্যে মানুষ ও মানুষের জীবনের সকল প্রকাশ-ভঙ্গীর প্রতি এক সুগভীর প্রেম পরিদৃষ্ট হয়। অগণ্য কাহিনীতে তাঁহার স্মৃতি সঞ্জীবিত হইয়া আছে। নিজামীর কাব্য কালের বিচারে জয়লাভ করিয়াছে—বিশ্বসংস্কৃতিতে আটশত বৎসর পরেও তাহার মূল্য রহিয়াছে অক্ষুন্ন।"

প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি মস্কোর এই অনুরাগকে এই ক্ষেত্রে শুধু মাত্র 'রুশ জাতীয়তাবাদ' বলিবার উপায় নাই। কারণ, নিজামী রুশ কবি নহেন ; তিনি আজুরবাইজানের কবি। 'রুশ জাতীয়তাবাদ' বা "জারের সাম্রাজ্যবাদ" এই অবজ্ঞাত দেশের কবির প্রতি সমগ্র ইউ. এস. এস. আর-এর এইরূপ সম্মান প্রদর্শনের আয়োজন সমর্থনও করিত না, সহ্যও করিত না। তাহা হইলে বিশ্বসংস্কৃতির প্রতি সোভিয়েত চিন্তার সশ্রদ্ধ অনুরাগই কি ইহাতে সূচিত হইতেছে না? ১

সোভিয়েত চিন্তার গতি নির্ধারণ করিতে হইলে সোভিয়েত সৃষ্টি-প্রয়াসের আরও দুই একটি বিষয় অনুধাবন করা উচিত। মস্কোর ১৯৩৯ সনের সাহিত্য সৃষ্টির একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব হইতে দেখি—পুরাতন রুশ সাম্রাজ্যে যেই সব জাতি ছিল অবজ্ঞাত ও অজ্ঞাত আজ তাহাদের জীবন-কথাই রুশেরা সগর্বে বলিতে শুরু করিয়াছেন। যুকানি ও চুকচি জাতি প্রায় মেরুমণ্ডলের অধিবাসী, ল্যাপল্যাণ্ডের যাযাবর জাতি। তাহাদেরই কাহিনী রচনা করিয়া ক্রাৎ ও মেন্‌শিকফ্ নামীয় দুইজন ঔপন্যাসিক রুশদেশের সম্মুখে ল্যাপল্যাণ্ডের জীবনধারা তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহাদের লেখার ভঙ্গীতে কৃপার দৃষ্টি নাই,

---

১ এই সম্বন্ধে গত বিশ বৎসরে এত প্রমাণ হস্তগত হইয়াছে যে তাহা লইয়াই এক বিপুল গ্রন্থ লেখা চলে। এযুগের ইতিহাসের এক প্রধান ঘটনা সোভিয়েত্‌তন্ত্রে বিভিন্ন জাতির, বিশেষত এশিয়াখণ্ডের অবজ্ঞাত জাতিদের এই সাংস্কৃতিক বিকাশ। এ বিষয়ে যে কোনো প্রামাণিক গ্রন্থ পাঠ করাই যথেষ্ট। যুদ্ধকালেও সোভিয়েত দেশে 'মহাভারত' ও 'তুলসীদাসের রামায়ণ' প্রভৃতির অনুবাদ চলিয়াছিল ;— ইহাও স্মরণীয়।

তাহাতে আছে সহযাত্রীর ও সহকর্মীর প্রাণময় স্পর্শ। রুশ লেখক বলিতেছেন, "গত বৎসরের (১৯৩৯) রুশ সাহিত্যে আর একটি লক্ষণও সুস্পষ্ট। তাহা এই যে, ইউ. এস্. এস্. আর. এর (সোভিয়েত-সংঘের) নানা জাতির (১৯৩৯ সনের আগে ১১টি দেশের এবং ছোট বড় ১৮৫টি জাতির সমবায়ে গঠিত ছিল এই সংঘ) তরুণ ও বর্ষীয়ান্ লেখকেরা আজ নিজ নিজ জাতির প্রতি ভালবাসা তো পোষণ করেনই, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জাতির বিষয়েও আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছেন। উহাদের জীবনধারাকে জানিবার ও জীবনপ্রণালীকে রূপ দিবার জন্যও তাঁহাদের অশেষ আগ্রহ। সোভিয়েত লেখকেরা সোভিয়েত-সংঘের জাতিসমূহের ঐতিহাসিক অতীতকে মোটেই অবহেলা করিতে চান না। এই এক বৎসরেরই মধ্যে গুর্জী (জর্জিয়ান) জাতীয় বীর 'সা কাদ্‌জে'র স্মৃতিতে আন্না অন্তোনোভোস্‌কা এক পাঁচশত পৃষ্ঠার উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। মুখ্‌তার আউজোফ্ রুশীয়দের বিরুদ্ধে নিজ কাজাক জাতির বিদ্রোহের কাহিনী অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন নাটক! মধ্য এশিয়ার জাতীয় বীর খোজা নাসিরুদ্দীনের বীরত্ব-গাথাকে অবলম্বন করিয়া লিউনিদ্ সলোভিয়ফ রচনা করিয়াছেন তাঁহার কল্পনা-কুশল গ্রন্থ।"

মোটের উপর কথাটি এইবার পরিষ্কার—সোভিয়েত ভূমিতে রুশ জাতীয় বীর, আজুরবাইজানের জাতীয় লেখক এবং গুর্জী (জর্জিয়ান) বা অন্যান্য জাতির লেখকদের স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে বাধা নাই। এই নূতন 'জাতীয়তাবোধ' যে সোভিয়েত 'জাতি-বিধানের' অনুযায়ী, এবং অসহিষ্ণু "রুশ জাতীয়তাবাদ" বা জার-যুগের সাম্রাজ্যবাদ নয়, সংস্কৃতিগত সাম্রাজ্যবাদও নয়, তাই তাহাও স্পষ্ট। আর, সোভিয়েত সংঘে নিজের দেশের প্রতি অনুরাগ যে কত আদরণীয় তাহার প্রমাণ পাই সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শলোকফ-এর কথায়। And Quiet Flows the Don ও Virgin Soil Upturned প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক এই কসাক সাহিত্যিক আমাদেরও অনেকের সুপরিচিত। রাহুল সাংকৃত্যায়নের হিন্দী গ্রন্থ "সোভিয়েত ভূমি"তে শলোকফ্ এর যে একটি সুন্দর চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; তাহাতে দেখিতে পাই—শলোকফ্ সোভিয়েত পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। নির্বাচনকালে বক্তৃতায় তিনি বলিতেছেন—"আমি আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করছি। কারণ, আমি ডনের এক নির্বাচন-ক্ষেত্র থেকে নির্বাচন-প্রার্থী হয়েছি। ডনের তীরে আমি জন্মেছি, ডন আমায় লালন-পালন করেছে, এখানেই আমি শিক্ষালাভ করেছি। এখানেই

যুবক হয়েছি, লেখক হয়েছি, হয়েছি আমার নিজ মহান্ কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। আমার মহান্ ও অনুপম মাতৃভূমির আমি ভক্ত—সগৌরবে আমি বলতে চাই, আমার জন্মধাত্রী ডন-ভূমির আমি ভক্ত।" ভারতভূমির সাম্যবাদীরা এই বাক্যে অবশ্য চমকিত হইবেন না। কিন্তু বৈষম্যবাদীদেরও উল্লাসের কারণ নাই। কারণ এই দেশপ্রেমই সার্থক। গোটা দেশই সেখানে দেশের সকল মানুষের—বিশেষ কয়জন মুষ্টিমেয় লোকের নয়। তাই, বিকাশোন্মুখ সাম্যবাদী-সংস্কৃতি ও সোভিয়েত-সংস্কৃতি বুঝিবার পক্ষে এই সব তথ্য দিগদর্শন-স্বরূপ।

[নিম্নবর্তী অংশ ১৯৪৮-এ সংযোজিত]

১৯৪৮এর জুলাই মাসেও কিন্তু কথাটা চুকিয়া যায় নাই। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মুখে প্রশ্ন শুনিলাম—'কমিউনিজম উইদাউট রুশিয়া' হয় না ?—রুশদের বাদ দিয়া কি সাম্যবাদ গড়া চলে না ?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে। ভারতের বহু পণ্ডিত ও বহু নেতার সমস্ত গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করিয়া হিটলার-মুসোলিনী-তোজোর দল পরাজিত হইয়াছে; এবং মহাযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় সোভিয়েত জাতিসংঘ সসম্মানে সমুত্তীর্ণ হইয়াছে; এমন কি, এই যুদ্ধান্তের পর্বে সেই সোভিয়েত সংঘ পুনঃসংগঠনের কঠিনতর অগ্নিপরীক্ষায়ও এখন উত্তীর্ণ হইতেছে। অর্থাৎ, কি যুদ্ধের পরীক্ষায় কি শান্তির পরীক্ষায়, কোনো পরীক্ষাতেই সোভিয়েত ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে নাই। সেই সময়কার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য রাহুল সাংকৃত্যায়ন সোভিয়েত দেশ হইতে সম্প্রতি (১৯৪৭) আবার ফিরিয়াছেন; ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি হইতেও তিনি বাহির হইয়া গিয়াছেন; বর্তমান ভারতের হিন্দী প্রতিষ্ঠাকামী রাজনীতিকদের দ্বারা আবার মহাপণ্ডিতরূপে তিনি সংবর্ধিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মুখে মুখে এই কাহিনীও নানাভাবে প্রচলিত—এবার সোভিয়েতে বাসকালে রাহুলজীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক আদর্শের নানা স্বপ্নই ভাঙিয়া গিয়াছে। অধ্যাপক সুনীতিকুমারের কানেও তাহা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। রাহুলজীর মুখে অবশ্য সোভিয়েত দেশ সম্বন্ধে উল্টা কথাই শোনা গিয়াছে, বারে বারে তিনি সোভিয়েত ব্যবস্থার উৎকর্ষ ও অগ্রগতির কথাই সর্বত্র বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত সেই কাহিনী ষোল আনা সত্য হইলেও বিস্ময়ের কিছু হইত না। কারণ, যাহা 'স্বপ্ন' তাহা ভাঙাই

প্রয়োজন। আর, সোভিয়েত দেশ কেন, কোনো দেশই 'স্বপ্ন দিয়া গড়া' চলে না। সোভিয়েত দেশটাও মাটির এবং মানুষের; তবে নতুন মানুষের। অধ্যাপক মহাশয় কিন্তু আর একটা স্বপ্নের খোঁজ করিলেন,—'রুশদের বাদ দিয়া কি সাম্যবাদ গড়া চলে না?'

কথাটার উত্তর এই: কোনো জাতিকে বাদ দিয়াই সাম্যবাদ গড়া চলে না। রুশিয়ার মত বিপুল দেশ ও বিশাল জনসমাজকে বাদ দেওয়ার তাই কথাই উঠে না। ঠিক এই কারণেই সাম্যবাদ ভারতবর্ষ বা চীনকে (তখনো চিয়াং কাই শেক শাসিত) বাদ দিয়াও গড়া চলে না। সম্ভবত আমেরিকাকে বাদ দিয়াও গড়া সম্ভব নয়। কারণ সাম্যবাদ তো নৈয়ায়িকের তর্কের বিষয় নয়; উহা যে একটা বাস্তব সমাজ-পদ্ধতি। এই জন্যই আজিকার বাস্তব পৃথিবীতে প্রধান প্রধান জাতিগুলিকে বাদ দিয়া সাম্যবাদের সম্পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব নয়। অবশ্য তেমন বড় দুই একটা দেশ পাইলে সেখানে সম্ভব হয় শুধু সাম্যবাদের গোড়াপত্তনের—সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ও তারপর সাম্যবাদের দিকে অগ্রগতির। রুশিয়া নামক একটি দেশে শুধু নয়, সোভিয়েত সংঘের ষোলটি জাতির দেশে এইরূপ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই হইতেছে। এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তাই এখন রুশিয়া ও অন্য সেই পনেরটি দেশের অভিজ্ঞতা,—তাহাদের ভুলত্রুটি, সার্থকতা, শিক্ষা-দীক্ষা এই সবই হইল পৃথিবীতে যে-কোনো দেশে সাম্যবাদ গড়িবার পক্ষে এক অপরিহার্য উদাহরণ, উহার আদর্শ ও অবলম্বন। তাই পৃথিবীতে সাম্যবাদ গড়িবার পক্ষে রুশিয়াকে বাদ দিলে আজ চলে না; চলে না যেমন সোভিয়েত সংঘের পক্ষেও 'পশ্চিম ইউরোপকে' বাদ দিয়া রুশিয়াতে কমিউনিজম্ পুরাপুরি গড়িয়া ফেলা। এই মুহূর্তে বাস্তবক্ষেত্রে চীনকে বাদ দিয়া, কিংবা ভারতবর্ষকে বাদ দিয়াই, কি স্থায়ীভাবে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করা যায় ইউরোপের বা এশিয়ার কোথাও? কিংবা ধনিকতন্ত্রই কি বেশীক্ষণ টিকিয়া থাকিতে পারে চীন ও ভারতবর্ষ যদি এখন ধনিকতন্ত্রীদের করচ্যুত হইয়া যায়?

অধ্যাপক সুনীতিকুমারের উক্ত প্রশ্নে এই বাস্তব সত্যের ও সাম্যবাদের স্বরূপ সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়াছে। তাহার মতো অনেকেরেই সংশয় এখন এই নয় যে, 'রুশিয়া' স্বজাত্য বর্জন করিয়াছে, এখন তাঁহাদের ধারণা—রুশিয়া উৎকট রকমের 'স্বদেশী' হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি সাম্যবাদের নামে মধ্য এশিয়ার ছোট ছোট জাতিদেরও গিলিয়া খাইয়াছে। তাঁহাদের মতে ইহার প্রমাণ—সেই সব দেশে রুশভাষী অনেক অধিবাসী রহিয়াছে এবং সেই সব দেশের

মানুষের নাম পর্যন্ত রুশ-ধরনের হইয়া উঠিতেছে—যেমন, 'রহিম' হইয়াছেন 'রহিমফ', শ্রীমতী 'মোক্‌সদা হাজী' হইয়াছেন 'মোক্‌সদা হাজীয়েভা'। বলা বাহুল্য, মার্কিন-ইংরেজ প্রমুখ ধনিকতন্ত্রীদেরও একটা প্রধান প্রচার এই যে, সোভিয়েত রাজ্য-বিস্তার করিতেছে, ইহাই 'নতুন সাম্যবাদ'। ১৯৪০-এও এই সন্দেহ সুনীতি বাবুর মনে ছিল। তখনকার দিনে উহার উত্তর লাভ তখনকার একটি সংখ্যা 'মস্কো নিউজ' হইতেও সংগ্রহ করিতে পারা যাইত, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু ১৯৪৮-এ সেই সন্দেহের নিরসন হইতে পারিত। (১) কারণ যুদ্ধকালে ফ্রান্‌স্ ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির ভাগ্য দেখিয়া ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, আজিকার পৃথিবীতে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে, প্রাণ দেয় প্রধানত প্রত্যেক দেশের শ্রমিক শ্রেণী, বিশেষ করিয়া সাম্যবাদী শ্রমিক সাধারণ; আর নিজের দেশের স্বাধীনতাকে শ্রেণীর স্বার্থে অকাতরে বিকাইয়া দেয় ফ্রান্‌সের 'দুই শত পরিবার' ও তাহাদের শ্রেণীর ফরাসী "জাতীয়তাবাদী" ভদ্রলোকেরা। অন্যদিকে সোভিয়েত সংঘের অন্তর্ভুক্ত উজবেগ, গুর্জী, আর্মানী প্রভৃতি পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিদেরও তিনি এদেশে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। ইচ্ছা করিলে সোভিয়েত ভূমি সম্পর্কেও আরও অধিকতর তথ্যও সংগ্রহ করিতে পারা যায়—যুদ্ধান্তে এই সুযোগও আজ আছে। মার্কিন সাম্রাজ্যের প্রচার, নানা দেশের মালিক নেতার মন-ভুলানো ছড়া গল্প সংগ্রহ করিয়া আজ আর তবু এ দেশেও কোনো অনুসন্ধিৎসু-মন তৃপ্ত হইতে পারে না, উহাতে শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা করিতে পারে। অবশ্য সেই আত্মপ্রবঞ্চনার উপযোগী কাগজ-পত্র ও সুযোগ আজ ভারতবর্ষে ভারতের বিকৃত ধনিকতন্ত্রের কৃপায় আরও অনেক গুণ বেশি। না হইলে এদেশ হইতেও সোভিয়েত সম্বন্ধে সংবাদ এখনো সংগ্রহ করা যায়—সোভিয়েট সংঘে রুশদের সংখ্যা ১১ কোটির (১৯৬০) উপরে, উজবেগীর সংখ্যা ৮০ লক্ষও (১৯৬০) নয়; অতএব রুশরা জাতে, সংখ্যায় ও শিক্ষায় প্রধান। তাহাদের প্রভাবও যে সমধিক

(১) ১৯৪৮-এর পরে পৃথিবীতে এই বিরাট পরিবর্তনই ঘটিয়াছে। চীন ও ভারতবর্ষই শুধু নয়, এশিয়া আফ্রিকা ও প্রায় সম্পূর্ণতঃ দক্ষিণ আমেরিকার কিউবা এমন সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত। অন্তদিকে সোভিয়েত দেশেও সাম্যবাদ গড়িবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। (১৯৬৩)

ব্যক্তিগত ভাবে অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ও দুইবার (১৯৫৮।১৯৬০ এ) সোভিয়েত দেশ দেখিয়া আসিয়াছেন। যতদূর জানি তিনি ভালোমন্দ শুদ্ধই সেই দেশকে বিচার করেন। তিনি মোটেই সাম্যবাদী হন নাই; কিন্তু ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির সভাপতি।

তাহা সুনিশ্চিত। কিন্তু প্রভাব মাত্রই কি বৈশিষ্ট্য-বিনাশী? সোভিয়েত রুশিয়া ও উক্রেনীইদের প্রভাবে কি উজবেগী বা তাজিকদের আর্থিক, রাষ্ট্রিক, বা আধ্যাত্মিক বিনাশ ঘটিতেছে, না বিকাশ ঘটিতেছে, তাহাই প্রথম প্রশ্ন। সোভিয়েত বিরোধীদের 'প্রমাণগুলি' কি সত্যই প্রমাণ, না ছুটা-ছাঁটা কয়েকটি দৃষ্টান্ত? আর কতটুকুই বা সেই প্রমাণের গুরুত্ব? ঐসব ছুটা ছাঁটা দৃষ্টান্ত অস্বীকার না করিয়াও এইভাবে তাহা যাচাই করিয়া দেখিতে পারি। কারণ পুঁথিপত্র না ঘাঁটিয়াও অনুরূপ তথ্য এবং আরও অনেক অনেক বেশি, আরও অনেক ভারী দৃষ্টান্ত দেখানো যাইতে পারে। তাহা দিয়াও সেই দেশের সাধারণ অবস্থার বিচার করিতে হইবে।

উজবেগ কবি জাম্বুলের নাম সমস্ত সোভিয়েত ভূমিতে উপাখ্যানে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবীর অন্য দেশেও তাঁহার নাম শুনিয়াছে অনেকে। ১৯৪৫এ শতবৎসরের উপকণ্ঠে পৌছিয়া জাম্বুল দেহত্যাগ করিয়াছেন। উজবেগিস্তানের স্বাধীনতায় ও অগ্রগতিতে উদ্বুদ্ধ এই বৃদ্ধ চারণকবি লেনিন ও স্তালিনের কীর্তিগাথা গাহিতে কোনোদিন শ্রান্তি বোধ করেন নাই। মৃত্যুর পূর্বেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রিয় পুত্রের মৃত্যুশোকে আহত কবি বুক ভরিয়া গাহিয়াছেন সোভিয়েতের নব-রচিত বিজয় গান। হয়ত বলা হইবে—এই কারণেই সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ (রুশগণ) তাঁহার নাম রটাইয়া বেড়ান। কিন্তু উজবেগ কবি আলী শের নভোই সোভিযেত যুগের মানুষ নন। তিনি জন্মিয়াছিলেন মধ্যযুগে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে। একাধারে তিনি উজবেগীদের কবি, দার্শনিক, মানব-বিদ্যার উদ্গাতা। সেকালের নিয়মে তিনি আরবী বা ফার্সি ভাষায় কাব্য-রচনা করেন নাই; কবিতা লিখিয়াছেন উজবেগী ভাষায়। তুলনা করিয়া ফার্সি অপেক্ষা নিজের উজবেগী ভাষার গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। প্রায় হাজার পঞ্চাশেক শ্লোকে তাঁহার 'হাম্‌জা' (পঞ্চাধ্যায়ের কাব্য) লেখা; উহা শিরীণ-ফরহাদ, লয়লা-মজনু প্রভৃতির গাথা। নভোই'র কবিত্বের, তাঁহার দার্শনিকতার, তাঁহার মানব-মমতার অজস্র প্রমাণ রহিয়াছে শিরীণ-ফরহাদ, লয়লা-মজনু প্রভৃতি প্রেম-কাহিনী ব্যাখ্যায়। জাতিতে জাতিতে মৈত্রীবন্ধনের, সাধারণ মানুষের জন্য মমতার, অত্যাচারী শাসককুলের বিরুদ্ধে ক্ষোভেরও ব্যক্তিহৃদয়ের প্রেমপ্রীতির প্রতি দরদের বহু ইঙ্গিত তাহাতে। পঞ্চদশ শতাব্দীর উজবেগ কবির নিকট এই দৃষ্টিভঙ্গী একটু অপ্রত্যাশিত। নভোই'র পাঁচশত বৎসরের জন্মোৎসব এবার (১৯৪৮) মে মাসে পালিত হইতেছে সমস্ত

সোভিয়েত দেশে—মস্কো, লেনিনগ্রাদ, কিয়েফ্ প্রভৃতি প্রত্যেকটি বড় শহরে ১৫ই মে এইজন্য নানা অনুষ্ঠান হয়। উজবেগ রাজধানী তাশখন্দে এই জয়ন্তী উৎসবে বহুদিন ব্যাপী উৎসব চলে। সোভিয়েতের নানা জাতির কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীরা এক সম্মেলনে সমবেত হন। রুশ কবি কন্‌ষ্টানটিন সিমনেভ্ তাহাতে পৌরোহিত্য করেন। তাশখন্দে সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় অপেরার নাম এখন হইতে হইবে 'নভোই অপেরা।' নভোই'র নামে সেই গৃহে একটি মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহারই মর্মর পাদপীঠে স্থাপিত হইতেছে কবির ব্রোঞ্জের নব-নির্মিত প্রতিমূর্তি। উজবেগিস্তানের বহু সমবেত কৃষি প্রতিষ্ঠান, থিয়েটর, ইস্কুল ও লাইব্রেরির নামকরণ হইতেছে নভোই'র নামে। সমরখন্দে কবি যৌবন কাটাইয়াছিলেন: তাই সমরখন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের ও উজবেগ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারেরও নাম রাখা হইল তাঁহার নামে। উজবেগ বিজ্ঞান-পরিষদের এবার 'সার্ধ-শত উৎসব' হইতেছে; উহারও একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে কবির স্মৃতিতে। পাঁচ শত বৎসরের পূর্বেকার এই উজবেগী ভাষার কবিকে লইয়া সোভিয়েত-জগতের এই যে উৎসব, সোভিয়েতময় কবিপূজা, ইহা কি উজবেগী সংস্কৃতি বিনাশের ষড়যন্ত্রের প্রমাণ, না, উহার বিকাশের প্রয়াসের দৃষ্টান্ত?

এইরূপ ছুটা-ছাঁটা দৃষ্টান্ত অবশ্য উদ্ধৃত করিয়া শেষ করা যায় না। সেই কারণেই আর বেশি বাস্তব তথ্য তুলিয়াও লাভ নাই। বিশেষত তথ্য পরিবর্তিত হয়, নতুন তথ্য প্রতিনিয়ত যোগ হয়। সোভিয়েত পদ্ধতিতে সে পরিবর্তনের গতি আবার এত ক্ষিপ্র যে তাহার সহিত তাল রাখিয়া লেখকের চলা সহজ নয়। কিন্তু সেই সব তথ্যের মধ্য হইতে উজবেগ জাতির (ও সোভিয়েতের অন্যান্য জাতির) গতিপথের যে আভাস অভ্রান্ত হইয়া উঠে তাহা স্মরণীয়—আর তাহাই আসলে উজবেগ সংস্কৃতির অবস্থা বিচারের প্রধান প্রমাণ। যেমন, প্রথম কথা হইল, উজবেগিস্তান শুধু জারের শাসন-মুক্ত হয় নাই, মোল্লা ও ওমরাহ্‌দেরও সমস্ত রকম শোষণ-মুক্ত হইয়াছে। আজ উজবেগ রাষ্ট্র (ইউ. এ. এস. এস. আর) সোভিয়েত সংঘে রুশ রাষ্ট্রেরই (আর. এস. এফ. এস. আর) সমতুল্য ও সমকক্ষ; দুইই সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘের সভ্য; উজবেগীদের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত; আর নিজ রাষ্ট্রে আজ উজবেগী জনসাধারণই ভাগ্য-নিয়ন্তা।

এই 'রাষ্ট্রীয়' কথাটাই হয়ত কেহ কেহ মানিবেন না। মানিলেও বলিবেন,

এই অধিকারের আড়ালে উজবেগ-জাতি অপরাপর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হারাইতেছে।

আর্থিক তথ্যের সাক্ষ্য তাঁহাদিগকে দেখানো যাইতে পারে। কিন্তু আর্থিক জীবনের হিসাবপত্রে হয়ত প্রয়োজন নাই। সংশয়বাদীরা বলিবেন, আসল কথা হইল, উজবেক সংস্কৃতি কতটা ঐশ্বর্যশালী হইয়াছে এই নূতন সোভিয়েত ব্যবস্থায়?—উহারও প্রমাণ সুবিদিত—যেখানে ১৯২৬এ ছিল শতকরা ১০.৬ জন মাত্র অক্ষরজ্ঞানা, সেখানে সেকালের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ছাড়া সকলেই এখন অক্ষরজ্ঞানা। উজবেগী অধ্যাপক, উজবেগী বৈজ্ঞানিক, উজবেগী গবেষক হইতে উজবেগী রাষ্ট্রবিদ্ আজ সে রাজ্য চালান। তাঁহারা অনেকেই আজ মস্কোতেও যান সসম্মানে; আবার রুশ বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞও আসেন তাশখন্দে। শুধু রুশ নয়, উজবেগী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে প্রতিবৎসর উজবেগ, তাজিক. কিরঘিজ, তুর্কমেন, কাজাক প্রভৃতি প্রায় ২০টি জাতির ছাত্রছাত্রী পড়িতে আসে। উহার অধ্যাপক গবেষকদের মধ্যেও নানাজাতির লোক আছেন; নাম শুনিলেই বুঝা যায়—রসায়নের মহোপাধ্যায় (ডীন্) হইলেন সাদিকভ্; টি. কারি নিয়োজভ্ গণিতের; আব্দুল্লায়েভ্ ভূ তত্ত্বের; বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ (রেকটর) হইলেন ওমরভ (প্রত্যেকটি মুসলিম নামের পিছনে আছে রুশ প্রত্যয় 'অভ্')। চোখ মেলিলে হয়ত সেই গৃহে মধ্যএশিয়ার চন্দ্রমুখীদের সঙ্গে দেখিব সেখানকার গোলমুখ, অনুচ্চনাসা, তির্ষক নেত্র সেই চ্যাপ্টা টুপি-পরা উজবেগ তুর্কদের, এবং দুই একটি ইউরোপীয় নাক মুখ রঙও দেখিব।

হয়ত এই শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কারুবিদ্যার (টেকনোলজির) বিবিধ উজবেগ ব্যবস্থাও উজবেগ সংস্কৃতির সমুত্থানের সম্পূর্ণ প্রমাণ হিসেবে গণ্য হইবে না। কিন্তু সমরখন্দের উজবেগ মিউজিয়ামে যে প্রাচীন ভাস্কর্যের, কারু শিল্পের, পুরাতত্ত্বের ও ইতিহাসের এবং জীবন্ত শিল্পকলার অজস্র নিদর্শন এখন সুরক্ষিত হইতেছে, বিশেষত ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক গবেষণার যে নূতন সূচনা সেখানে সম্প্রতি দেখা দিয়েছে, তাহাও কি উজবেগ সংস্কৃতির পরিপোষক নয়? যে উজবেকিস্তানে 'থিয়েটর' ছিল না, যে উজবেগী ভাষায় ১৯১৮এর সময়ে উজবেগ নাট্যগুরু হামজা হাকিমজাদা নিয়াজী নামে মাত্র নাটক লিখিতেছিলেন, (এইরূপ ধর্মদ্রোহিতার জন্যই তিনি নিহত হন গুপ্ত প্রচেষ্টায়), সেখানে আজ ৪০টির উপর নাট্যশালা। অপেরা [illegible]

অভাব নাই। নূতন কালের উজবেগী বেতারকেন্দ্র ও উজবেগী ফিল্‌ম বা ছায়াচিত্রতো সর্বত্রই গড়িয়া উঠিতেছে; উজবেগীরা ফিল্‌মের গবেষণারও শিক্ষাপরিষদ্ স্থাপন করিয়াছেন। উজবেগ নট-শিল্পীরাও আজ সুপ্রতিষ্ঠিত—সোভিয়েত দেশের অন্য রাষ্ট্রেও সুপরিচিত।[1] আর নিয়াজীর সময় হইতে অনুবাদ ছাড়াইয়া কামাল ইয়াশেম, তুইগুন্, ইজ্জৎ সুলতানভ, সবির আবদুল্লা প্রভৃতির হাতে উজবেগ নাট্যসাহিত্যও গড়িয়া উঠিতেছে। ইহাদের কোনো নাটকের বস্তু উজবেগী ধারার কথা, কোনটির কথাবস্তু বিপ্লবী যুগের উজবেগী কৃষকের জীবন, তাহার আশা ও প্রয়াস। আবার আধুনিক নাটকে অনিবার্য-ভাবে আসিয়াছে উজবেগীদের এই মহাযুদ্ধকালীন বীরত্ব ও বিজয়ের আখ্যায়িকা। অর্থাৎ প্রাচীন হোক্ আধুনিক হোক্, বিষয়বস্তু মূলত উজবেগী জীবনের; কিন্তু রচনাকলায় তাঁহারা সযত্নে গ্রহণ করিয়াছেন শেক্‌স্‌পীয়র, শিলর হইতে চেখভ্, গর্কি প্রভৃতির রুশ নাটকের রীতি-পদ্ধতি পর্যন্ত। রঙ্গশালাও জন্ম লইয়াছে আধুনিক রঙ্গশালার নিয়মে, অনুসরণে। বাঙলা নাটকেই কি আমরা কৃষ্ণ যাত্রা কিংবা 'শকুন্তলা' 'মৃচ্ছকটিকের' ধারায় চলিয়াছি? না, চলিয়াছি ঐ জগদ্বরেণ্য, মহানাট্যকারদের প্রদর্শিত পথে ও আধুনিক রঙ্গশালার নিয়মে?

কিন্তু সংশয় ইহাতেও নিরাকৃত হইবার কারণ নাই।—সমাজতন্ত্রী সভ্যতার অধিনায়কত্ব লাভ করিয়াছেন আজ বিশেষ করিয়া রুশ জাতি,—যেমন ধনিক-তন্ত্রী ব্যবস্থার পৌরোহিত্য লাভ করিয়াছিলেন এক দিন ইংরেজ জাতি এবং বিংশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব হইতে করিয়াছেন মার্কিন জাতি। কিন্তু এই দুই ব্যবস্থার মূলগত নীতি ও স্বভাবে আকাশ পাতাল পার্থক্য। তাহা না জানিলে স্বভাবতই মনে হইবে 'প্রভাবের' মধ্য দিয়া 'প্রাধান্যই' ক্ষুদ্রতর জাতিদের উপর চাপানো হয়। কারণ, এত দিন পর্যন্ত ইহাই ছিল ধনিক সভ্যতার নিয়ম। কিন্তু সমাজতন্ত্রী সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঠিক এই চিরকালের 'প্রাধান্যের'ই অস্বীকৃতি; সভ্যতার মৈত্রী-বন্ধনেরই উহা আয়োজন। উহার মূল কথা আধিপত্য বিস্তার নয়, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সূত্রে সহযোগিতা। স্বভাবতই এই রাজনৈতিক সত্য না বুঝিলে বিশ্বাস করা দুরূহ হয় যে, এক বড় জাতি অন্য ছোট জাতির উপর আধিপত্য করে না!

---

১ উজবেগ তরুণী রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নৃত্য শান্তিনিকেতন হইতে শিখিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' নাট্যাকারে (গঙ্গার মেয়ে নামে) উজবেগ ভাষায় বহু বহুবার অভিনীত হইয়াছে—এসব কথা আজ এতই সুপরিচিত যে এ তথ্যাবলী সংক্ষেপিত হইল। (লেঃ ১৯৬৩)

অবশ্য মানুষের সভ্যতার ও মানুষের মনুষ্যত্বে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিতে পারে যদি সত্যই-সত্যই কেহ সোভিয়েত ব্যবস্থার স্বরূপ জানিতে আগ্রহান্বিত হন; শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত ধ্যান-ধারণার বশীভূত না থাকিতে চান। তাহা হইলে তিনি দুই দিক হইতে সোভিয়েত ব্যবস্থাকে যাচাই করিতে অগ্রসর হইবেন। যথা, হয় তিনি মানব-বিদ্যার দৃষ্টিতে সোভিয়েত জীবনের মূল্য যাচাই করিয়া দেখিবেন। তখন ডীন অব ক্যাণ্টারব্যারির মত তাঁহার মনে হইবে —এই সভ্যতাতেই মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনার সত্যকারের পাদপীঠ রচিত হইয়াছে। নয় তিনি এই ব্যবস্থাকে যাচাই করিতে চাহিবেন সমাজবিজ্ঞানের নিস্পৃহ নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া;—তখন সিডনি ও বিয়েট্রিস্ ওয়েবের মত তাঁহারও সংশয় কাটিয়া যাইবে, মনে হইবে 'নতুন সভ্যতা' আবির্ভূত হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, তখন এই বৃহত্তর সত্যও বুঝা যাইবে যে, এই সংস্কৃতি-সৃষ্টিতে সোভিয়েত-কৃতি এমন একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে যাহাতে উহার ত্রুটি-বিচ্যুতিও ধরা পড়ে, আদর্শ-ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনাও কমিয়া আসে। এইখানেই সোভিয়েত সংস্কৃতির আসল এক শক্তি—উহা এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও চালিত; আপনার বিচ্যুতিকেও যাচাই করিতে সমর্থ।

অবশ্য এই দুই পথেরই নিকট ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠে এই সত্য যে, সংস্কৃতি জিনিসটা শুধু 'সংস্কার' নয়—অপরিবর্তনীয় রীতিনীতি ধ্যানধারণা নয়; এবং তাহা শুধু সংস্কৃত-চিত্তদেরই 'শাশ্বত' ও 'একচেটিয়া' বিত্ত নয়। আর্থিক, রাষ্ট্রিক ও শিল্পগত যে বিপ্লবের মধ্য দিয়া পশ্চাৎপদ ও পুরাতন জাতিরা সোভিয়েতে নবজন্ম লাভ করিতেছে, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করিতে পারেন, তাহাতে সমাজতন্ত্রবাদের প্রসারে তাহাদের 'কালচার' বিনষ্ট হইতেছে। কিন্তু কাহার সেই 'কালচার' যাহা বিনষ্ট হয়? অবসর-বিলাসী মোল্লা আমীর শ্রেণীর (লেজর ক্লাশের) দুই চার জনের, না পরিশ্রমজীবী (টয়েলিং মাসেস্) পঁচানব্বই জনের? আশ্চর্য নয়, সংস্কৃতি বা কালচার বলিতে শুধু অবকাশেরই সূক্ষ্ম ও স্থূল রচনাই আমরা বুঝিতে চাই। সেই অবসরভোগীদেরই আমরা তাই স্বতঃসিদ্ধরূপে সংস্কৃতির স্রষ্টা ও ভাগ্যনিয়ন্তা বলিয়া ধরিয়া লই। তাঁহাদের ছাড়াও যে সংস্কৃতি থাকিতে পারে, তাঁহাদের বিলোপেও যে সংস্কৃতির সমুত্থান সম্ভব, এই কথা আর তাই ভাবিয়া উঠিতেও পারি না। প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতেরা তাই ভাবিয়া দেখিতে চাহেন না—সোভিয়েত ব্যবস্থায়

কোন্ শ্রেণীর সংস্কৃতি অবজ্ঞাত হইয়াছে?—লোক-গীতি, লোক-কবিতা, লোক নৃত্য, এক কথায় লোক-জীবন ও লোক-সংস্কৃতির এমন গবেষণা, এমন অভ্যুত্থান, এমন প্রাণময় প্রেরণা ইহার পূর্বে কোথায় পাইয়াছিল উজবেগিস্তান, বুরিয়াৎ মঙ্গোলিয়া বা ইয়াকুটস্কের মানুষ?—সোভিয়েত-ভূমির ১৫০ এর অধিক জাতিসমূহের সাধারণ নর-নারী? আর কোথায় শতকরা ৯৫ জন পাইয়াছে এইরূপ সংস্কৃতির স্বরাজ?

কিন্তু সোভিয়েত সংস্কৃতির স্বরূপ লইয়াই শুধু প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন ইহাও যে সংস্কৃতি কি? কি তাহার স্বরূপ, মানুষের প্রাচীন স্মৃতি কি চিরায়ু? না তাহার দেহান্তর আছে, রূপান্তর ঘটে? সংস্কৃতি কি শুধু শাসক শ্রেণীরই সম্পদ, অবসরের রচনা? শতকরা পঁচানব্বই জনকে, সৃষ্টিশীল জনতাকে, সংস্কৃতি-বঞ্চিত না রাখিলেই কি সংস্কৃতি মরে? না, অবসরের কৃত্রিম বিলাসে বরং সংস্কৃতি আয়ুহীন হয়?—সাম্যবাদের অবশ্য মূল কথা হইল এই যে, মানব-সমাজ পরিবর্তিত হয় আর মানুষের সংস্কৃতিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে খাত বদলায়। তাই, যখন এতদিনকার শ্রেণীশাসিত সমাজ রূপান্তরিত হইয়া শ্রেণীহীন সমাজে রূপ পরিগ্রহ করিবে তখন এই শ্রেণীগত সংস্কৃতিরও শ্রেণীহীন সংস্কৃতিতে রূপান্তর অনিবার্য হইবে। এই মূল কথাটিতে লইয়া ভুল যে কত বড় হইতে পারে তাহাও সোভিয়েত ইতিহাসে আছে—ভবিষ্যতেও থাকিতে পারে।[১] প্রথম যুগে সাম্যবাদীরা যাহা কিছু প্রাচীন তাহাই শ্রেণীগত, অতএব অগ্রাহ্য বলিয়া স্থির করেন। শিল্পে সাহিত্যেও এ আজব সৃষ্টির উন্মাদনায় তাঁহারা ক্ষেপিয়া উঠেন। উহা 'বামপন্থী সাম্যবাদী' বিকৃতিরই সংস্কৃতিগত রূপমাত্র। এই উৎকট 'নতুন-ওয়ালারা' ভুলিয়া যান—শ্রেণীহীন সমাজ এখনো আসে নাই। যেই সমাজে আমরা নিঃশ্বাস লইতেছি তাহার বাস্তবরূপ না দেখিয়া কাল্পনিক শ্রেণীহীন সংস্কৃতি সৃষ্টি করা এক কল্পনা-বিলাস, তাহা সাম্যবাদের বিরোধী। ভারতীয় লেখকদের অনেকের 'কম্যুনিজম্' গল্পও অনেকদিন পর্যন্ত ফ্যাসানগত কল্পনা-বিলাস মাত্র ছিল; আজ তাঁহারা অনেক পরিমাণে বস্তুনিষ্ঠ হইয়াছেন। অবশ্য অনেকে শুধু 'ভোল' বদলাইয়া জিতিতে চাহেন। তবু মোটের উপর

---

১ এই কথা ভুলিয়া গেলে স্তালিন আমলের বিচ্যুতির আতিশয্য ও বর্তমান বিস্তালিনীকরণের তাড়না দুইটিই বড় হইয়া চোখে পড়ে। রুশ জাতীয় চরিত্রের একটা ঝোঁক সব কিছু চূড়ান্ত করিয়া করা, সেই প্রসঙ্গে তাহাও মনে রাখা দরকার। (লেঃ ১৯৬৩)

ভারতীয় সাহিত্যিক বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিতে এখন দৃঢ়-সঙ্কল্প। তাঁহাদের এই গোড়ার কথাটি আজ মনে জাগিতেছে—সাম্যবাদ ঐতিহাসিক বনিয়াদের উপরই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে; তাহার দৃষ্টি ঐতিহাসিক। ইতিহাসের অনিবার্য ধারায় বিশ্বাস করেন বলিয়াই সাম্যবাদী জানেন—মানুষের ভবিষ্যৎ সংস্কৃতি প্রাচীন সংস্কৃতির অনুবর্তন মাত্র হইবে না, হইবে রূপান্তর। তেমনি তাঁহার ঐতিহাসিক-বোধ অমোঘরূপেই তাঁহাকে বুঝাইয়া দেয়—মানবেতিহাসের কোন স্তরই অবজ্ঞেয় নয়,—মানব-প্রগতির পথে তাহা ঐতিহাসিক কারণে প্রকাশিত হইয়াছিল, ঐতিহাসিক কারণেই তাহার অবসান হইয়াছে। ইতিহাসের প্রাচীন স্মৃতি সেই কারণ-পরম্পরার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া গিয়া মানব-প্রগতি-ধারাকেই স্পষ্ট করিয়া তোলে, চিহ্নিত করিয়া দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝাইয়া দেয়—এই স্মৃতির সৌরভ যেমনি সংরক্ষণ-যোগ্য তেমনি ভাবী সংস্কৃতির সুমহৎ সম্ভাবনাও অশেষ আগ্রহে সংগঠন-যোগ্য।

আসল কথা, সংস্কৃতির অর্থ শুধুমাত্র সংস্কারের পুনরাবর্তন নয়;—সংস্কারের ঐতিহাসিক বিবর্তন। সমস্ত বিবর্তনের মধ্য দিয়া মানুষ ক্রমেই বেশি করিয়া 'মানুষ' হইতেছে, প্রাচীন সংস্কৃতিও হইতেছে এক ব্যাপকতর বিশ্ব-সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত।

সমাপ্ত

নির্ঘণ্ট

ঝ

ট

ড

ত

থ

ভ

য

র

দ্রষ্টব্য : ১০৬, ১০৭ পৃষ্ঠায় মর্টিমার উইলিয়ামের স্থলে মর্টিমার হুইলার হইবে।

লেখকের অন্যান্য বই

আলোচনা—সংস্কৃতি ও সাহিত্য :

সংস্কৃতির রূপান্তর।

বাঙলা সংস্কৃতি প্রসঙ্গ।

বাঙলা সংস্কৃতির রূপ (ছাপা নাই)।

বাঙলা সাহিত্য ও মানব-স্বীকৃতি।

বন-চাঁড়ালের কড়চা।

সাহিত্যের ইতিহাস :

বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (আদি ও মধ্যযুগ)।

বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (আধুনিক কাল প্রস্তুতিপর্ব
ইং ১৮০০-'৫৭

বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (আধুনিক কাল) (যন্ত্রস্থ)

বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা।

ইংরেজী সাহিত্যের রূপরেখা।

রুশ সাহিত্যের রূপরেখা (যন্ত্রস্থ)

কথা-সাহিত্য :

একদা, অন্যদিন, আর-একদিন ॥

ভূমিকা, নবগঙ্গা, জোয়ারের বেলা ॥

ভাঙনীকূল (যন্ত্রস্থ), স্রোতের দীপ, উজান গঙ্গা ॥

পঞ্চাশের পথ, উনপঞ্চাশী, তেরশ' পঞ্চাশ ॥

ধূলিকণা (ছোটগল্প) ॥

লঘু-রচনা :

[illegible]।